P27206

আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র।

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY
Serial No.
UNIVERSITY OF CALCUTTA

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদিত।

—০—

প্রথম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

১৩১৭।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।
১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড।

অ

অকারণে (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ	
অন্তিমে (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
অধ্যাপক রবার্টক	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র	
অনন্ত-সত্য (কবিতা)	সম্পাদক	
অবহেলন (কবিতা)	শ্রীহরিপদ মজুমদার	
অভিলাষার্থ চিন্তামণি	শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর	

আ।

আগরার পথে (কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	৭৬০
আলোকে আঁধারে—	শ্রীহরিপদ মজুমদার ...	৮১৭
আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর	৬৪৩
আক্ষেপ (কবিতা)	সম্পাদক	৬৯৮

ই

ইচ্ছামৃত্যু (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	

ও

ওমরের পথে (কবিতা)	সম্পাদক	

ক

কবি রজনীকান্ত	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ,	
কবিতা ও কবি প্রিয়া (কবিতা)	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	
করমেতি বাই	শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর	
কুনালের পিতৃভক্তি	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র	
কৃতজ্ঞতার বিনিময় (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
কৃষিতত্ত্বের আলোচনা	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার	

গ

গয়া	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ	৭৬৯
গ্রন্থপরিচয়		৫৭১, ৬৪৭

চ

চন্দ্রনাথবসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ	

জ

জন্ম ও মৃত্যু (কবিতা)	শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়	

ড

ডাক	শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ...	
ডাকের কথা	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	

ত

তুমি (কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	

ন

নর্ত্তকীরূপক (গল্প)	সম্পাদক	
নারী-হৃদয় (কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার	

প

পাষাণের কথা	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	৫৩৫, ৬৯৩ ও ৮০৮
পুরাতন (কবিতা)	সম্পাদক	৭১৯
পুরাতন প্রসঙ্গ	শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত এম্, এ,	৫৬৩, ৫৭৭, ৬৬০, ৭২১, ৭৯৩
পুরাতন প্রসঙ্গের কথা	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ	৭৯২
পূর্ব্বস্মৃতি (কবিতা)	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল,	৬৩৩
পূর্ব্বস্মৃতি (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪০
প্রণয় (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪৫১
প্রতিধ্বনি (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৮৪৪
প্রবাহ (কবিতা)	শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী	৪৭৫
প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৬৪৯

ব

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	
বরকুমার ব্রত	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার	
বিকাশ (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
বিচিত্র পিতৃকুলানুরাগ	শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর	
জ্ঞানেপৌত্তলিকতা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	

বেদ কি ?	শ্রীচন্দ্রধর সাংখ্যকাব্যতীর্থ	৪৩৩, ৬২৬
বৈজ্ঞানিকের পরিচয়	সম্পাদক	৪৫২
ব্যর্থ-প্রভাত (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ,	৭৪৪
ব্যর্থ-সন্ধ্যা (কবিতা)	ঐ	৮০৭
	ভ	
ভাষা বৈচিত্র	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ,	
	ম	
মশক	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৯৯
মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ প্রথা	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৪৫
মক্ষিকা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৬১৩
মাঘমণ্ডল	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৮২৭
মুহূর্ত্তের ভুল (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩৮
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)	সম্পাদক ৪৭৬, ৫৪৩, ৫৯১, ৬৮৩, ৭৫০ ও ৮১৮	
	র	
রামায়ণী সভ্যতা	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	৫২৯
রূপ (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৫৬
	শ	
শোভন (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	
	স	
সন্ধ্যা (কবিতা)	শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু	৭১২
সমালোচনা	৪৮৬, ৫৫৩, ৬৩৪, ৭০৯, ৭৭৫ ও ৮৪৯	
সহানুভূতি (কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার	৮৩৯
সংগ্রহ	৪৯২, ৫৫৭, ৬৩৮, ৭১৩, ৭৭৯ ও ৮৫৩	
	হ	
হরিদ্বার (কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	৫৯০
হীরক	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৬৯
	য়	
য়ুআন-চুয়ং বা হিউয়েন-সিয়াং	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার	

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অ

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর	বিচিত্র-পিতৃকুলানুরাগ	৬৬৫
	কয়মেতি বাই	৮৩১
শ্রীঅজয় চন্দ্র সরকার	য়ুয়নচুয়ং বা হিউয়েন-সিয়াং	৬০১
	কবিতত্ত্বের আলোচনা	৭৩০ ও ৭৯৯
শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মজুমদার বি, এল্	পূর্ব্ব-স্মৃতি (কবিতা)	৬৩৩

উ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	তুমি (কবিতা)	

ক

শ্রীকালিদাস রায়	শোভন (কবিতা)	
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	বারাণসী সভ্যতা	

খ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ,	চন্দ্রনাথ বসু	

গ

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	কবিতা ও কবিপ্রিয়া	

চ

শ্রীচন্দ্রধর সাংখ্যকাব্যতীর্থ	বেদ কি ?	৫৩৩ ও ৬২৬

জ

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়	ভস্ম ও মৃত্যু (কবিতা)	৫৮৩

দ

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ	ডাক	৭৮৬
শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ,	ডাকের কথা ...	৭৮৮

ন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	শ্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা	
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	হরিদ্বার (কবিতা)	
	আগরার পথে (কবিতা)	
শ্রীনরেন্দ্র নাথ মজুমদার	বরকুমার ব্রত ...	
	মাঘ মণ্ডল	

প

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ	অকারণে (কবিতা)	
	প্রতিধ্বনি (কবিতা)	

ব

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য	৭০২ ও ৭৩৫
	মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা	৮৪৫
শ্রীবিনয় কুমার সরকার এম্. এ,	ভাষা বৈচিত্র ...	৭৬১
শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর	আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	৬৪৩
শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত এম্, এ,	পুরাতন প্রসঙ্গ	৫৬৩, ২৭৭, ৬৬০ ৭২১ ও ৭৯৩
শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	প্রবাহ (কবিতা)	৪৭৫
শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার	নারী-হৃদয় (কবিতা)	৫৬২
	সহানুভূতি (কবিতা)	৮৩৯

য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	প্রণয় (কবিতা)	৪৫১
	বিকাশ	৬৬৮
	স্বপ্ন	৫৫৬
	অন্তিমে ,,	৭০৮
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	ইচ্ছামৃত্যু (গল্প)	৪৫৬
	কৃতজ্ঞতার বিনিময় (গল্প) ...	৬১৮
	মুহূর্ত্তের ভুল (গল্প)	৭৩৮
	পূর্ব্বস্মৃতি (গল্প)	৮৪০

র

শ্রীরজনীমোহন ঘোষ — কবিরঞ্জনীকান্ত ৪৬৫
ব্যর্থ-প্রভাত (কবিতা) ৭৪৪
ব্যর্থ-সন্ধ্যা (কবিতা) ৮০৭
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — পাষাণের কথা ৫৩৫, ৬৯৩, ৮০৮
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ — বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা ৫০৫

ল

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু — সন্ধ্যা (কবিতা)
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ — পুরাতন প্রসঙ্গের কথা

শ

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় — মশক ৪৯৯ মক্ষিকা

স

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর — অভিলাষার্থচিন্তামণি ৬৭৮
শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, — গয়া ৭৬৯
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র — অধ্যাপক রবার্টক ৫৮৪
সম্পাদক — অনন্ত সত্য (কবিতা) ৭৭৪
আক্ষেপ (কবিতা) ৬১২
ওমরের পথে ৭৩৭
নর্ত্তকীর কূপ (গল্প) ৫২৬
পুরাতন (কবিতা) ৭১৯
বৈজ্ঞানিকের পরিচয় ... ৪৫২
মৃত্যুমিলন (উপন্যাস) ৪৭৬, ৫৪৩, ৫৯১, ৬৮৩, ৭৫০ ও ৮১৮
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র — কুনালের পিতৃভক্তি ৭৮৯

হ

শ্রীহরিপদ মজুমদার — অবহেলন (কবিতা) ... ৬৪৬
আলোকে আঁধারে (কবিতা) ৮১৮
শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — হীরক ৬৬৯

চিত্র-সূচী।

অধ্যাপক রবার্ট ক
শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
৺দ্বারিকানাথ মিত্র
মশক
৺শ্যামাচরণ সরকার
অন্ধাবস্থায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদ কি ? *

একদিন এই ভারতের প্রতি নগর, প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী, প্রতি গৃহ পবিত্র ঋষিগণের বদনসনীরিত উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত-রূপ স্বরগ্রামমূর্চ্ছনামূর্চ্ছিত সাম গীতির সুমধুর স্বরে মুখরিত হইত। ঋষিতনয়গণ গর্ভাষ্টম বয়সে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ সাঙ্গ সরহস্য সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিয়া, সমাবর্ত্তনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ্যের পূর্ণ প্রভায় তাঁহাদিগের বদনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইত। সরলতার ও বিলাসবিমুখতার একত্র সমাবেশ সেই আর্য্যতনয়দিগের হৃদয়েই লক্ষিত হইত। মৃগাজিন বা কুশশয্যায় শয়ন, বল্কল পরিধান, প্রকৃতিপরিত্যক্ত ফলমূল অশন, ইঙ্গুদী ফলরসে অভ্যঞ্জন, স্বহস্তলিখিত তালপত্রবিনির্ম্মিত পুস্তক অধ্যয়ন, বংশনির্ম্মিত লেখনী, হরিতকীরসাপ্লুত মসী, দর্ভময়ী মেখলা প্রভৃতির আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাঁহারা আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য পরাধীনতা-স্বীকার করিতে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেন।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতি আমাদিগের জন্য যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই আমরা পরিতৃপ্ত থাকিব। তদতিরিক্ত বস্তু-সংগ্রহে অভিনিবেশ করিলেই আমাদিগের পরবশ্যতা গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থের জন্য লালায়িত হইতে হইবে। বিলাসিতা-পরিতৃপ্তির জন্য পরগৃহে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা উহাকে দূরে রাখাই ভাল।

আর আধুনিক নব্যভারতের ব্রাহ্মণগণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণতনয়ের, কি শোচনীয় পরিণতিই না ঘটিয়াছে! এখন তাঁহারা বলেন :—

"শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে!
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে!
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈঁতেখানা,
তেজহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বীর্য্য খোলস!"

তাই আজ বেদসম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধের অব-

---

* বারাণসীস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভাবণা করিতেছি। বেদবিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ হইলেও তাহার আলোচনা করিবার বাসনা স্বাভাবিক। কারণ, আলোচনাই জ্ঞানবিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াছেন। তাঁহারা বেদের দুরূহার্থ ব্যাখ্যা করিতে জীবনের প্রায় সমস্ত অংশ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি ছয়খানি দর্শনই তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। তন্মধ্যে কপিল, ব্যাস ও জৈমিনিই বেদ লইয়া অধিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার ব্যাসদেব ও কপিল উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। জৈমিনি কেবল মন্ত্র-ভাগের ব্যাখ্যায় সবিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন; ইহা তৎপ্রণীত মীমাংসা দর্শন পাঠ করিলেই অনুমিত হয়।

মহামতি জৈমিনি ব্রাহ্মণ ভাগের মীমাংসা করিতে গিয়া যে সূত্রাবলির রচনা করিয়া যায়েন, সবর স্বামী সেই সূত্রসমূহের ভাষ্য করিয়া সমগ্র মীমাংসা দর্শনটিকে এক মহাসাগরে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত উপাদেয়, কিন্তু ইহার পঠনপাঠন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মীমাংসা শাস্ত্র যথারীতি গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন লোক সম্প্রতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে। জৈমিনি ব্রাহ্মণভাগের উপর যত দূর আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, উপনিষৎ ভাগের উপর সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি উপনিষদের অর্থবাদত্ব স্বীকার করিলেও বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যতা তাহার প্রামাণ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ঋষি বলিয়াছেন—

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥"

পক্ষী যেমন উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়াই গগনমার্গে বিচরণ করে, সেইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম এই উভয়ই পরমপদ প্রাপ্তির কারণ। এই বাক্য অবলম্বন করিয়াই জৈমিনী কর্ম্ম মীমাংসা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাই মীমাংসা দর্শন নামে অভিহিত।

তিনি বলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে; কেন না, বেদ বলিয়াছেন, "স্বর্গকোমোঽশ্বমেধেন যজেত" অশ্বমেধ যাগ স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু। বৈদান্তিকেরা বলেন, তাহা নহে; কর্ম্ম সহকারী মাত্র, জ্ঞানই পরমপদপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ। কেন না, বেদ বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পরমপদ প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই। কর্ম্মযাগাদি করিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়; অনন্তর জ্ঞান হইলেই মুক্তি। বৈদান্তিকের এই সমাধান অতি উত্তম, অতি

উপাদেয় যুক্তিপূর্ণ। কর্ম্ম না করিলে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

বেদ কি ? ইহা বলিবার পূর্ব্বে বেদের একটি লক্ষণ বলা আবশ্যক। কেন না, ন্যায়বিদ্ বলিয়াছেন, "লক্ষণ প্রমাণাভ্যামেব বস্তুসিদ্ধি।" লক্ষণ ও প্রমাণ দ্বারাই বস্তু সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে বেদের লক্ষণ কি এবং প্রমাণই বা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটি প্রমাণ কোন কোন দার্শনিক স্বীকার করিয়াছেন, (যেমন কপিল "ত্রয়ানেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা, তৎ সাধকতমং যৎ, তৎ ত্রিবিধং প্রমাণং" সাংখ্য দর্শন। ১।৮৭। পতঞ্জলি "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" যোগদর্শন, সমাধিপাদ।৭।) এবং সেই ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তিত্বপ্রমাণই বেদ, তাহা হইলে মনু প্রভৃতি স্মৃতিও বেদ হইয়া দাঁড়ায়। বেদ ও স্মৃতি এক নহে। বেদ হইতে স্মৃতির আবির্ভাব। সম্যক্ প্রত্যক্ষানুভবের সাধনই আগম। ঈদৃশ আগমত্ব মনু প্রভৃতি স্মৃতিরও আছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে বেদের লক্ষণ হইল না। এখন যদি ঐ লক্ষণেই অপৌরুষেয়ত্ব বিশেষণাদি দেওয়া যায়, তাহা হইলেও অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। বেদ পরমেশ্বরপ্রসূত। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বাসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ সাম বেদ যজুর্ব্বেদোথর্ববেদঃ"। বলা যাইতে পারে, শরীরধারীজীববিনির্ম্মিত হইলেই পৌরুষেয় হইবে, পরমেশ্বর শরীরী নহেন, অতএব অপৌরুষেয় বলিলে দোষ কি ? কিন্তু এই সমাধানও সমীচীন নহে। কেন না, বেদ বলিয়াছেন, "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ —সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" পরমেশ্বর সহস্র মস্তকে বিরাজিত হইয়া থাকেন, তাঁহার সহস্র নয়ন এবং সহস্র পদ। শরীরী না হইলে এ উক্তির কোন অর্থ থাকে না। বুঝিলাম, পরমেশ্বরেরও শরীর আছে, তাঁহারও হস্তপদাদি আছে। কিন্তু তাঁহার শরীর কর্ম্মফলরূপ শরীর নহে, তিনি আমাদের ন্যায় সৎ বা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না। জীবগণ সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করে, সেই জন্য তাহাদিগকে কর্ম্মফলে শরীরধারণ করিতে হয়। আমি যে এই অর্থে অপৌরুষেয় বলিয়াছি, ইহাও বলা সঙ্গত নহে। তুমি যে শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বেদের কর্ত্তা পরমেশ্বর বলিতেছ, সেইরূপ অন্যান্য শ্রুতি আবার অগ্নি, বায়ু, আদিত্য প্রভৃতি জীব বিশেষকেই বেদের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন; যেমন "ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত, যজুর্ব্বেদোবায়োঃ, সামবেদ আদিত্যাৎ" অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হয়, মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদনামে অভিহিত। আপস্তম্ব বলিয়াছেন "মন্ত্র

ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নাম," যৌধায়ন বলিয়াছেন "মন্ত্রব্রাহ্মণমিত্যাহুঃ" জৈমিনি বলিয়াছেন "মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদঃ।" এবং অন্যান্য স্থলেও বেদের এইরূপই লক্ষণ দেখা যায় যথা :—

"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োরাহু বেদশব্দং মহর্ষয়ঃ
বিনিয়োক্তব্য রূপঃ যঃ স মন্ত্র ইতি চক্ষতে।
বিধিস্তুতিকরং শেষং ব্রাহ্মণং কথয়ান্তিহি।" ইত্যাদি

ইহার ভাবার্থ এই যে, মহর্ষিগণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে "বেদ" বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে যে অংশে বিনিযোক্তব্য রূপ অর্থাৎ যজেত, যাগ করিবে, (উপাসীত উপাসনা করিবে) ইত্যাদি বুঝায়, তাহাকে মন্ত্র এবং বিধির স্তুতিকর শেষ ভাগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। যজেত, উপাসীত, কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিধিবোধক বাক্যই বিনিয়োগ রূপ এবং ইহাকেই জৈমিনি প্রেরণা অর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন। বেদের দুইটি ভাগ বা অংশ। এক মন্ত্র, অপর ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা প্রভৃতি সংহিতাভাগ মন্ত্র এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভাগই ব্রাহ্মণ। এই উভয় ভাগই বেদ নামে আখ্যাত। কোন কোন উপনিষৎ ব্রাহ্মণের অন্তর্বা শিরোভাগ, এবং কোন কোন উপনিষৎ মন্ত্র ভাগের অন্তর্গত। ঈশাবাস্যোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রভৃতি মন্ত্র ভাগের অন্তর্গত; এবং ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট।

মাধ্যন্দিনী সংহিতার এবং শ্বেতাশ্বতর সংহিতার শেষ অংশ ক্রমে ঈশাবাস্যোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ নামে প্রখ্যাত। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আটটি প্রপাঠক এবং কাণ্ব ব্রাহ্মণের শেষ ছয়টি অধ্যায় ক্রমে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আখ্যা ধারণ করিয়াছে। এইরূপ সমস্ত উপনিষৎ বেদেরই অবসান ভাগ। কেহ কেহ উপনিষদের বেদত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি বেদান্ত শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের প্রতি একটু মনোযোগসহকারে দৃষ্টি করেন, তবেই আপনাদের ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে বলিয়াছেন, "বেদান্তোনাম উপনিষৎ প্রমাণং, তদুপকারীনি শারীরক সূত্রাদীনি।" বেদের অন্ত বেদান্ত, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎ বেদান্ত শব্দের মুখ্য অর্থ। তদুপকারীনি অর্থাৎ উপনিষদের অর্থবোধের অনুকূল শারীরক সূত্র প্রভৃতি, এবং উপনিষদের অর্থসংগ্রাহক ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গৌণার্থ। এইরূপ মুখ্য ও গৌণ ভেদে বেদান্ত শব্দের বিবিধ অর্থ সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপনিষৎ শব্দের প্রধান অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থও উপনিষৎ নামে খ্যাত। "সদৃ বিশরণ গত্যবসাদনেষু" অর্থাৎ সদ্‌ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন অর্থে পঠিত। উপ, নি, পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিলে উপনিষৎ পদ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মবিদ্যা সংসারবীজভূত অবিদ্যাদি দোষের বিশরণ অর্থাৎ বিনাশ করে; এই জন্য উপনিষৎ নামে আখ্যাত। অথবা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি করায় কিম্বা সংসার-সারতা বুদ্ধিকে অবসন্ন অর্থাৎ শিথিল করে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎবাচ্য। এই ব্রহ্ম বিদ্যাই পরা বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠা বিদ্যা; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ অপবর্গ হইয়া থাকে। সুতরাং এই স্থানেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখত্রিতয়ের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, উপনিষৎ আখ্যায় আখ্যাত গ্রন্থ বা শব্দসমূহপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞানই পরা বিদ্যা, এবং ঋগ্বেদাদি যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহার জ্ঞান অপরাবিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫) "বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী পুরুষ-গণ বলিয়াছেন, পরা এবং অপরা এই দুই প্রকার বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ব্ববেদ, এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষই হইল অপরা। অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গযুক্ত চারি বেদ—তথাবিধ শব্দরাশির বিজ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের বিজ্ঞান অপরা বিদ্যা। আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ পরমাত্মা অধিগত হয়, তাহাই পরাবিদ্যা। শ্রুতি স্থানান্তরে বলিয়াছেন "নাবেদ বিন্মনুতে তংবৃহন্তম" যিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই বৃহৎ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। এই উপনিষৎ অনেকগুলি; কিন্তু পরম পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরিয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই দশখানি উপনিষৎ ভিন্ন শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ, মৈত্রেয়্যুপনিষৎ, আরুণ্যেয়ুপনিষৎ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপনিষৎ আছে। ইহারা সকলেই নির্গুণব্রাহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত করে। অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্য-কাণ্ডেও অনেকগুলি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই সগুণ ব্রাহ্মবিদ্যার উপদেশে পরিপূর্ণ। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম বেদান্তবক্তৃতায়

('ফেলোশিপ লেক্‌চারে') উপনিষৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা উপনিষদের গূঢ় অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন। উপনিষদের মর্ম্ম বলিতে গেলে এই প্রবন্ধ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

বেদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং উপনিষৎ বেদ হইতে ভিন্ন নহে, তাহাও বলিলাম। এক্ষণে বেদের প্রমাণ কি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। ছান্দোগ্যোপনিষদে "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থম্" (ছা উ ।৭।১।২।) হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করি, এইরূপ শ্রুতি দেখা যায় এবং "বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ," * বেদই দ্বিজাতিদের নিঃশ্রেয়সকারী এইরূপ স্মৃতিও আছে। অতএব বেদ নিষ্প্রমাণ নহে। বেদ প্রমাণগ্রাহী এই বচন বোধ হয় সমীচীন নহে। কারণ, ছান্দোগ্যের শ্রুতি বেদের অন্তর্গত। আপনি আপনার প্রমাণ হয় না; এবং বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলে তদন্তর্গত বাক্যের প্রমাণতা, আর এই বাক্যের প্রমাণাভাব বেদের প্রামাণ্য; সুতরাং আত্মাশ্রয় দোষও হইবেক। আর বেদমূলক বলিয়াই স্মৃতি প্রামাণ্য। যতক্ষণ বেদের প্রামাণ্য নিশ্চিত না হইল, ততক্ষণ স্মৃতি তাহার জনক বেদকে প্রমাণিত করিতে পারিবে কেন? কোন অজ্ঞাত বালক যদি বলে, আমি ব্রাহ্মণতনয়, তবে যতক্ষণ বালকের পিতা পরিজ্ঞাত না হয়েন, ততক্ষণ সেই বালক ব্রাহ্মণতনয়রূপে পরিগৃহীত হয় না। অগ্রে তাহার পিতা ব্রাহ্মণ কি না, তাহাই বিচার করিয়া পরে তাহার বিচার। বেদে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির আশঙ্কাই হওয়া উচিত নহে। বেদবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি সার্ব্বজনীন হইলেও, উহা "সুনীল গগনের" ন্যায় ভ্রান্তিবিলুণ্ঠিত. অর্থাৎ আকাশ স্বতঃসিদ্ধ নীরূপ হইলেও, যেমন আমরা ভ্রান্তিবশে উহাতে নীলত্বের আরোপ করিয়া সুনীল আকাশ প্রভৃতি বলিয়া থাকি, সেইরূপ বেদবিষয়ক প্রত্যক্ষও ভ্রান্তিমাত্র। প্রত্যক্ষই যদি ভ্রান্তিমাত্র হইল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের কথাই নাই। কারণ, অনুমানের কারণ ব্যাপ্তি জ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান না হইলে অনুমিতি হয় না। যেমন আমরা পর্ব্বতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূমরেখা দর্শন করিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিয়া থাকি; এই অনুমান করিবার পূর্ব্বে আমরা মহানসাদিতে বহ্নি ও ধূমের একত্র অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং এই প্রত্যক্ষ হইতে যেখানে যেখানে ধূম, সেই সেই স্থানে বহ্নি এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে জাগরূক আছে; তাহাতেই আজ

সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতেছি। এই যে যেখানে ধূম, সেইখানে বহ্নি এই জ্ঞান—ইহাকেই ব্যাপ্তি জ্ঞান কহে। অতএব, অনুমান প্রত্যক্ষমূলক—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব বেদ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় হইলে, অনুমানেরও অবিষয়, ইহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রধর কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

শোভন।

তরুনারুণকর নীহার-হারে পড়ি'
উষারে করে শোভাশালিনী।
সরস বরষণে জ্যোছনা-পরশনে
মধুর জাগে কিবা যামিনী।
তপোজ স্বেদ-কণা হোমের আলো মাখি'
ঋষির ভাল করে শোভন।
পুণ্যালোক ভাতে নয়নজলে ঘবে,
মানব আঁখি মনোমোহন।

শ্রীকালিদাস রায়।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু।

২

ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এ দেশে জ্ঞানের যে বর্ত্তি জ্বালিলেন, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহাদের স্বনামধন্য শিষ্যগণ এই কার্য্যে প্রাণমন নিযুক্ত করিলেন। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এস্থলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা উচিত মনে করি; এই উন্নতি অথবা তথাকথিত উন্নতির দিনে আর একটি দিকে দেশীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ় করা হইল। স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতেছি। নূতন আদর্শের আলোকে স্ত্রীলোকের অজ্ঞতা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতে লাগিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহামতি বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় দেশীয় পণ্ডিত এবং অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য লোক যখন ইহাতে উৎসাহদান করিলেন, তখন কি আর বলিতে হইবে যে ইংরেজী শিক্ষায় পাইলে কিরূপ জোরে হাওয়া লাগিয়াছিল?

এই সকল শক্তি সমাজদেহের উপর ক্রিয়া করিয়া সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকেরা দেশের আচারে বীতশ্রদ্ধ হইল। তাহারা শুধু দেশীয় আচার পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, ভিন্ন দলের নিকট এই বিষয় লইয়া বড়াই করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একবার জনকতক যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাজার হইতে মুসলমানের দোকানের মাংস কিনিয়া আনিয়া খাইতেছিল। তখন কৃষ্ণমোহন বাড়ী ছিলেন না। আহার শেষ হইলে মাংসের হাড়গুলি প্রতিবেশী হিন্দুদের বাড়ীতে ফেলিয়া দিয়া এই যুবকেরা চীৎকার করিতে লাগিল, "ওই গোহাড়, ওই গোহাড়।" এইরূপে উত্তেজিত হইয়া প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কৃষ্ণমোহনের বাড়ীর লোকের উপর তর্জ্জনগর্জ্জন করিল। ততক্ষণে এই যুবকগণ চম্পট দিয়াছেন। রাত্রিতে যখন কৃষ্ণমোহন গৃহে ফিরিলেন, তখন সে গৃহে আর তাঁহার স্থান হইল না। তখনকার শিক্ষিতযুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার এই স্থানেই শেষ নহে। "সাহেবেরা" মদ খায়, অতএব মদ খাওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। অনেক যুবক গোলদিঘীতে বসিয়া, আড্ডা করিয়া, মদ খাইত। সে সময় সুরাপান সম্বন্ধে এতই স্বেচ্ছাচারিতা ছিল যে,

অনেক ভাল ভাল লোকও মদ্যপান করিতেন। রাজনারায়ণ বাবুর 'সেকাল ও একালে' এবং তাঁহার 'আত্মজীবনচরিতে' এই সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় নাকি নিয়মিত মদ্যপান করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু ও সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনেকে সুরাপান করাই কুসংস্কারবর্জ্জনের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। এ দেশীয় লোকে সুরাপানকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং ঐ সুরাপান করিয়াই দেখাইতে হইবে যে, আমরা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীব নহি। এইরূপ ধারণা অনেক শিক্ষিত, সংস্কারার্থী লোকের মনে উদিত হইয়াছিল। এইরূপ করাকে অনেকে সৎসাহস-প্রদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। আমি শুনিয়াছি, একজন শিক্ষাভিমানী নিজ পল্লীগ্রামে যাইবার সময় পাল্‌কীর উপরে মুরগী লইয়া যাইতেন। এইরূপ নির্ভীকতাকে লক্ষ্য করিয়াই ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন :—"এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে.....সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়—উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না।"

ভূদেব বাবু ইংরেজদের অনুকরণ করাকে নৈতিক ভীরুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশের আচার ব্যবহারকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া স্বাধীন চিন্তার নামে যখন যুবকগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসারবৃদ্ধি হইতেছিল, তখন যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা সমাজবন্ধনকে পুনর্ব্বার দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভূদেব বাবু তাঁহাদের অন্যতম। মৃত মহাত্মা চন্দ্রনাথ বাবু এ বিষয়ে তাঁহার আচার্য্য দেব ভূদেব বাবুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে মিশনারীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, সুযুক্তির দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ে টানিয়া লইয়াছিল, তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজ নিশ্চিন্ত ছিল না। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দুগণ নানাপ্রকারে এই সংস্কারার্থীর দলকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। যুক্তি অপেক্ষা ইট পাথরই বোধ হয় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

ভূদেব বাবু প্রমুখ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন।

তাঁহারা যুক্তির বলে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষী হইলেন, যুক্তির দ্বারা যুক্তির উচ্ছেদসাধন করিতে লাগিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে যাহা অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অবাস্তব, তাহা সমর্থন না করিয়া, ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্য ও অনুষ্ঠানগুলিকে যুক্তির দ্বারা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান করিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু এই কার্য্যকে একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন :—"আমাদের সম্মুখে বিরাট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সে বিরাট কাজ সম্পন্ন না করিলে আমরা আমাদের প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করিবার অধিকারী হইব না। কিন্তু সে বিরাট্ কাজ সম্পন্ন করিতে বিপুল শক্তি, বিষম সাধনা, ব্যাপক কাল আবশ্যক। আমাদের ইতিহাসে আমরা আজ বড় বিষম স্থানে উপনীত।" (হিন্দুত্ব—ভূমিকা।)

এই কর্ত্তব্যের ধারণা করিতে হইলে, আমাদিগকে একটি গোড়ার কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। এদেশে যখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব হইল, তখন আমাদের সমাজ বলিতে যে একটা একীভূত (Homogeneous) জনসমষ্টি ছিল, তাহা আমার মনে হয় না। জাতিভেদের শাসনে সমাজের যে কঙ্কালটি গড়াইয়া ছিল, তাহার ভিতরে সজীবতা বা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ছিল না। সমাজের এক অংশে আঘাত করিলে, অন্য অংশে সাড়া দিত না। সমস্ত সমাজ এক স্পন্দনে স্পন্দিত হইত না। সমাজের বিশাল দেহ নিয়মের কঠোর গ্রন্থিতে এমনই হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, অতি তীব্র আঘাতেও সে প্রবুদ্ধ হইত না। সুতরাং এই সমাজের এক অংশ যখন ইংরেজী শিক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন অপরাংশ পূর্ব্বেরই মত নিশ্চল ও অসাড় রহিল। নব্য সমাজ বলিতে যে বিদ্রোহিদলকে বুঝাইত, তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও প্রভাব অধিক ছিল। ইহাদিগের ভিতর দিয়া সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব সমাজের সকল অংশে সংক্রমিত হইবে। সুতরাং এই শিক্ষিত দলকে উপেক্ষা করিলে চলে না। অনেক হিন্দু হয়ত মনে করিবেন যে, চন্দ্রনাথ বাবুর চেষ্টা এই নব্যসমাজের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছিল, বৃহৎ হিন্দুসমাজের ইহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। এরূপ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের মনে ঘৃণার পরিবর্ত্তে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেওয়াও যেমন একটি কর্ত্তব্য, তেমনই আর একটি কর্ত্তব্য, হিন্দুধর্ম্মের

মধ্য হইতে স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুদিগের নিমিত্ত অনুরাগের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী আহরণ করা। সমাজবন্ধন যেস্থানে শিথিল হইয়াছে, সেস্থানে সে বন্ধন দৃঢ় করা, এবং যেস্থানে দৃঢ় আছে, সেস্থানে তাহা চিরকাল দৃঢ় রাখিবার বন্দোবস্ত করা উভয়ই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিভা এই কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

কেহ কেহ এইরূপ চেষ্টাকে গোঁড়ামি বলিয়া মনে করিতে পারেন। হিন্দুয়ানীকে বাড়াইয়া তুলিবার বিপদ অনেক। হিন্দুধর্ম্ম এত পুরাতন এবং তাহাতে কালক্রমে এত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এত বিভিন্ন আচার পূজা-পদ্ধতি আসিয়া ইহার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য-সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাওয়াকে কেহ কেহ উপহাসের বিষয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ গোঁড়ামি তাঁহাদের নিকট অমার্জ্জনীয়। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মে গোঁড়ামি না হইলে চলে না। সাহিত্যে, দর্শনে, বা বিজ্ঞানে গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে রাজি নহি; সে স্থানে সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং মনের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, যদি আর কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে সমস্ত বিশ্বাসের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ গোঁড়ামি-বিবর্জ্জিত চিত্তই জ্ঞানলাভের বিশেষ অনুকূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম—যাহাতে জীবন মরণের সম্বন্ধ আছে—যাহা প্রাণের অপেক্ষাও অনেকের প্রিয়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ উদারতা খাটে না। যাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পায় নাই, যাহারা ধর্ম্মের উপরের লহরীতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ভিতরে অবগাহন করিয়া প্রকৃত সত্যের পরিচয় পায় নাই, তাহারাই উন্মুক্তচিত্ত, ও গোঁড়ামিশূন্য হইতে পারে, তাহাদের নিকট ধর্ম্মের আবেগমাত্রই গোঁড়ামি, সর্ব্বপ্রকার একাগ্রতাই তাহারা অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যিনি ধর্ম্মের বিজয়-নিশান তুলিয়া তাহার মাহাত্ম্য-প্রচারে যত্নশীল, যিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার কার্য্যকলাপ সাধারণ পরিমাণের বিষয়ীভূত নহে। সেই স্থানেই বেশী গোঁড়ামি দেখিতে পাই, যে স্থানে পারকীয় ধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ লক্ষিত হয়, যেস্থানে অকারণে বা অন্য কারণে কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষিত হয়। চন্দ্রনাথ বাবুর রচনায় সেরূপ কখনও দেখি নাই। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুত্বের গৌরব। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাই আজীবন শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যেন বলিতেছেন "তোমরা যাহা খুঁজিতেছ, আমি তোমাদিগকে তাহা মিলাইয়া

দিব। পরের কাছে কেন যাইবে? একবার ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহ, একবার তোমার অতীতের দিকে নিরীক্ষণ কর, সবই আছে, ওগো সবই আছে। দেখ, এমন আর কোথায়ও আছে কি?"

"হিন্দুর সোঽহং বলিতেছে, হিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী, ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড-গ্রাহী, অপরিমিতসাহসসম্পন্ন, বিরাটমনা মনুষ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।" (হিন্দুত্ব—সোঽহং)।

"হিন্দুর মন জগতের ছাঁচে ঢালা মন (Cosmically constituted), এমন বিরাট মন আর কি আছে?" (হিন্দুত্ব—ভূমিকা)।

এমনই করিয়া তিনি অতীতের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে জাতি অতীতের গৌরব করিতে জানে না, তাহার ভবিষ্যৎও কখনও আশাযুক্ত হয় না।

কিন্তু এ গৌরব যখন একটা বৃথা গৌরবের সামগ্রী হইত তখন তিনি তাহায় প্রশ্রয় দিতেন না। এ গৌরব ততক্ষণ উন্নতির অনুকূল, যতক্ষণ আমরা এ গৌরবের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিব। "প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব।"

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব গৌরব, তাহার দিকে তিনি আলোকপাত করিয়াছিলেন। নূতনত্বের চাকচিক্যে মুগ্ধ, অনুকরণ-মুগ্ধ সমাজকে তিনি ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাচীনত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া চিরন্তন সত্যের রূপ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক আগ্রহে ও সরলতায়, তাঁহার বর্ণনা-কৌশলে হিন্দুর জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিও পরিত্যাগ করেন নাই, হিন্দু-জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তিনি একটা যুক্তি ও মহৎ সত্য বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। ভগবান লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। সেই জন্য "হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।"

(হিন্দুত্ব—কড়াক্রান্তি।)

চন্দ্রনাথ বাবু অবশ্য সমস্ত বিষয়ের সমর্থন করেন নাই। হিন্দুয়ানীর মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেও একান্ত ধর্ম্মানুরাগ যে তাঁহাকে পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মের দিক হইতে—কঠোর কর্ত্তব্যের দিক হইতে দেখিয়াছিলেন। শুধু তিনি যে, ইহাকে একটি তত্ত্ব বলিয়া মানিতেন. তাহা নহে, তাঁহার পারিবারিক ও বাহিরের জীবনেও তিনি এই সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বিধাতার কাজ করিতেছি এই মনে করিয়া তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী করিতেন। কি অপত্যস্নেহে, কি বন্ধুবাৎসল্যে, কি দাম্পত্য প্রেমে তিনি সর্ব্বত্র বিধাতার হস্ত অনুভব করিতেন, ধর্ম্মের দিক দিয়া এই নৈমন্দিন ব্যাপারগুলিকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় সংসারে অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মের সহিত আধ্যাত্মিক সূত্রে জীবন-ব্যাপারগুলি গ্রথিত করিয়া তিনি লোকশিক্ষার ও শিথিলতাগ্রস্ত সমাজ বন্ধনের যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে যুগপৎ আমাদের ভক্তির ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। কার্লাইল যেমন তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজ সমাজকে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু শুধু সেরূপ করেন নাই। তিনি প্রাচীন আদর্শের ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু আচার ও সামাজিক প্রবন্ধে এবং চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার সংযম-শিক্ষায়, ত্রিধারা, কঃপন্থা এবং হিন্দুত্বে যে আদর্শ লোকের সমক্ষে ধারণ করিলেন, তাহাতে পরিবর্ত্তনের স্রোত যে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নূতনত্বের মোহ যে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

অবশ্য চন্দ্রনাথ বাবুর এই সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে,—সেরূপ আশাই করা যায় না—কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের সময় যে সকল বীর-হৃদয় মনস্বী মহাপুরুষ অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরণোপান্তে উন্নতিকাম মানবমাত্রই প্রণত হইবে।

আজ কাল আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজসংস্কারক। আমরা কোনও একটি বিষয়কে লইয়া তাহারই দোষগুণ দেখিতে প্রবৃত্ত হই; এবং বিদেশীয় সমাজের অনুকরণে তাহার একটা না একটা সংস্কার নিশ্চয়ই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারি। বাল্য বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা মত আছে, এই সকল মত লইয়া সংস্কার করিতে হইলে সংস্কারের সংখ্যারই অন্ত থাকে না। ইহা আমাদের একদেশদর্শিতার ফল। আমরা সমাজকে পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করি না, কেবল অংশমাত্র দেখিয়া তাহার

সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হই; কাযেই সংস্কারও হয় না, সমাজও বিবাদ-বিতণ্ডায় অস্থির হয়। বাল্য বিবাহ সম্বন্ধেই ইহা দেখা যাইতে পারে। কোন একজন বা দশজন ডাক্তার বলিলেন যে, বাল্য বিবাহ দেশের অহিত করিতেছে, অমনই বাল্যবিবাহের সংস্কার আরব্ধ হইল। এমন কতবার হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ফল বেশী কিছু হইয়াছে কি? আমার মনে হয়, তাহার কারণ এই যে, বাল্য বিবাহ সমাজের অন্যান্য অংশের সহিত জড়িত বলিয়া সে সকল অংশের সংস্কার ব্যতিরেকে বাল্য বিবাহের সংস্কার কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবার যতদিন থাকিবে, ততদিন একটি ছোট মেয়েকে এক পরিবার হইতে অন্য পরিবারে লইয়া লালন পালন করিয়া তাহাকে সর্ব্বাংশে সেই পরিবারের কন্যার মত করিয়া লইবার চেষ্টা থাকিবে। একটি বড় মেয়েকে লইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পোষ্যপুত্র গ্রহণের বেলায়ও ঐরূপ ছোট ছেলেকে গ্রহণ করার রীতি আছে। তাহার পর, পিতা মাতা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবার রীতি যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়া বিবাহ হইবার প্রথা যতদিন না চলিতেছে, ততদিন বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে। আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম-প্রাণ, কাজেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ইহার যে সংস্কার হইবে, তাহাই স্বাভাবিক ও স্থায়ী হইবে, এইরূপ ধারণায় প্রণোদিত হইয়া চন্দ্রনাথ বাবু এক বিরাট ধর্ম্মসমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। এরূপ সমাজ পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব বস্তু, কামনার বস্তু, সমস্ত জগৎসমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

হিন্দুসমাজ অধঃপতিত, ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া তিনি কখনও নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নাই। নৈরাশ্য উন্নতির অন্তরায়, তাই তিনি নৈরাশ্যকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, শুধু আশার বাণী আশ্বাসের বাণী। হিন্দুরা বড় বৈরাগ্যপ্রিয়। দুঃখের অংশটাই তাঁহারা বাড়াইয়া তুলিতেন; য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে Pessimist বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখনও এ বৈরাগ্য, এ দুঃখের একান্ত উপলব্ধি আমাদের আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের কর্ম্মের প্রস্রবণকে জমাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই হিন্দু অসাড়, অলস, জড়তাপন্ন। কিন্তু হিন্দুদের এই মজ্জাগত Pessimismএর মধ্যে Optimism ও ছিল। এই Optimism এর প্রধান উপাদান পরকালে বিশ্বাস। পরকাল আছে বলিয়াই দুঃখ সহনযোগ্য। পরকাল আছে বলিয়াই শোক, জরা, মৃত্যুকে হিন্দু তুচ্ছ মনে করিতে পারিত। পরকালই দুঃখে সান্ত্বনা

সুখে ধৈর্য্য, ক্রোধে ক্ষমা, প্রতিহিংসায় মার্জ্জনা আনিয়া দেয়। চন্দ্রনাথ বাবুর Optimism এই পরকালবাদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে এমন Optimism যে তাঁহাকে পুত্রশোক পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে পারিত না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এই পরলোকের ছায়ায় চিরসান্ত্বনা লাভ করে। চন্দ্রনাথ বাবুর পরলোকে বিশ্বাস কিরূপ জীবন্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ, তাহা তাঁহার 'পৃথিবীর সুখ দুঃখের' ভূমিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহার পরলোকগত কন্যাকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস কি সহজে মিলে? যে দিকে তিনি চাহিয়াছেন, সেই দিকে বিশ্ব তাহার সুষমাসম্ভার লইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছে। তিনি কোন জিনিষের ভাল দিক দেখিতে পাইলে কখনও তাহার মন্দ দিকটা দেখিতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর সবই ভালর জন্য করেন। তিনি এই আশায় ও বিশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত সুখী ছিলেন। 'পৃথিবীর সুখদুঃখের' প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার এই আত্মতৃপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজ পরলোককে দূর হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করিতেছে, কাযেই ইহকাল লইয়া মত্ত হইয়া আছে। হিন্দু কখনও ইহকালের পার্থিব পন্থায় তৃপ্তিলাভ করিবে না। তিনি বলেন "যদি মরিতেই হয়, তবে পরকাল লইয়া মরা অপেক্ষা ইহকাল লইয়া মরায় মনুষ্যের অনিষ্ট, অপমান ও অগৌরব অনেক অধিক।" (কঃ পন্থা—১৩ পৃষ্ঠা)। হিন্দু পরকালের পন্থা ধরিয়া দরিদ্রভাবে চলিয়াছে, য়ুরোপ ও আমেরিকা ইহকালের পন্থা ধরিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, কিন্তু পরিণামে হিন্দুই জয়লাভ করিবে। এইস্থানেই চন্দ্রনাথ বাবুর Idealism এই কল্পনায় প্রতিভাত উন্নতি ও গৌরবের রাজ্য বাস্তব হইতে তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তিনি দোষানুসন্ধান না করিয়া বলিয়াছেন;—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। আমাদের যে সহস্র ত্রুটি, সহস্র অপরাধ তাহা মার্জ্জনা করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানগৌরব মণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির একখানি সুস্পষ্ট সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর মূল কথাগুলির আলোচনা করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইবে ভয়ে সে কথাগুলি বলা হইল না। চন্দ্রনাথ বাবুর পুস্তকগুলির সমালোচনা করিবার সময় আইসে নাই। তাহার উপর তাঁহার কতখানি প্রভাব, এবং চন্দ্রনাথ বাবুর রচনা স্থায়িত্বলাভ করিবে কি না, এ সকল বিষয় এখন স্থির

করিয়া বলা কঠিন। তবে বঙ্গভাষার প্রতি, বাঙ্গালার প্রতি, বাঙ্গালা দেশের প্রতি তাঁহার যে একান্ত অকৃত্রিম অনুরাগ, যাহা তাঁহার লেখার নানাস্থানে নানাভাবে পরিস্ফুট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সাবিত্রীচরিত্রের মাহাত্ম্য-বর্ণনা করিতে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের মাধুর্য্য-বর্ণন করিতে, সংযমশিক্ষার বিভিন্ন স্তর-প্রদর্শন করিতে, তাঁহার সেই একই স্বদেশপ্রেম, একই ধর্ম্মবিশ্বাস, একই গৌরবের আশা আত্ম-বিকাশ করিয়াছে। 'শকুন্তলা-তত্ত্ব'ই অনেকের মতে চন্দ্রনাথ বাবুর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বাবু 'হিন্দুত্বের' ভূমিকায় নিজেও সে আভাস দিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সমালোচনাই চন্দ্রনাথ বাবুর বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার প্রথম সোপান। তাঁহার আত্মজীবনচরিতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরেজী লিখি নাই, লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নহে।" 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার পূর্ব্বে একখানি ইংরেজীপত্রে তিনি কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা করেন, তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথ বাবুকে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার জন্য "পীড়াপীড়ি" করেন। 'বঙ্গদর্শনের' সহিত তাঁহার এই যে একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, এবং এই সূত্রে বঙ্গসাহিত্যের সহিত যে একটি প্রীতিকর বন্ধন গ্রথিত হইল, আজীবন সে পরিচয় তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই, সে স্নেহবন্ধন তিনি শিথিল হইতে দেন নাই। ভাষার পবিত্রতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি একান্ত মনে তাহার সেবা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সরল কথাকে অনর্থক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জটিল করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। যাহাতে সাধারণ লোকে সহজে বক্তব্য বিষয়ের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, এজন্য তিনি সমাসবাহুল্য এবং সংস্কৃতবাক্য-বিন্যাসের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভাষায় একটা সহজ প্রফুল্লতা ও বাধাহীন স্রোত ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু সমালোচক বা Reviewer ভাবে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার সমস্ত লেখায় তিনি এই সমালোচনার ভাবই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা, সমাজপ্রণালীর সমালোচনা, লোকচরিত্রের সমালোচনা, ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সমালোচনায় তিনি অশেষ পাণ্ডিত্য ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা কিন্তু সমালোচনামাত্র

নহে। একটি মহান্ আদর্শের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তিনি সমস্ত বিষয় যাচাই করিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। এই মহান্ আদর্শের জন্যই তাঁহার সমালোচনা এক জীবন্ত কাব্যের মত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্কিনের ললিতকলার সমালোচনার মত চন্দ্রনাথ বাবুর সমালোচনা এক মহতী সৃষ্টিকর্ত্রী কল্পনার আলোকে প্রতিভাত, পরিব্যাপ্ত, ব্যক্ত। উভয়ের সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে আদর্শ ছাড়িয়া দিলে সে সমালোচনা নিতান্তই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে।

চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচুর না হইলেও মূল্যবান্। রাজকার্য্যের অবসরে তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত উপাদান সংগ্রহ করিতেন, এবং তাঁহার নূতন কিছু বলিবার থাকিলেই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। অনাবশ্যক রচনায় সময় কাটাইবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি 'পৃথিবীর সুখদুঃখের' পূর্ব্বাভাষে বলিয়াছেন :—"আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই, এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এইজন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম, এদেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই।" ইহা স্পর্দ্ধার কথা নহে—স্পর্দ্ধা হইলেও এই শ্রেষ্ঠকবিজনোচিত স্পর্দ্ধা সাহিত্য চিরকাল মার্জ্জনা করিয়া থাকে।—কিন্তু ইহা গর্ব্ব নহে। এই কথা কয়েকটি একজন সাহিত্য-সেবা-ব্রতে ব্রতী, নিরহঙ্কার, কঠোর-সংকল্প-সাধন-প্রয়াসীর আত্মনিবেদন। এইরূপ করিয়াই চন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবু সাধারণকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত আমি তাহারই কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের পূর্ণতা ইহাতে নহে। বস্তুতঃ পরিবারের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তথায়ই তাঁহার গৌরব এবং তথায়ই তাঁহার চরম সার্থকতা। নিজ পরিবারের নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্যেই এই সাধুপুরুষের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরের আড়ম্বরের মধ্যে আসিতে চাহিতেন না। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, আত্মপরিচয় দিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন না। অনেকের সহিত তিনি মিশিতেন না ; যাঁহাদের সহিত মিশিতেন, তাঁহাদের সহিত তন্ময় হইয়া মিশিতেন—একটুও ফাঁক রাখিতেন না। ধনী লোকের সংসর্গে নিজের গর্ব্ব চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইলেও, এই দরিদ্র সাহিত্যসেবী কখনও সে সুযোগ গ্রহণ করিতেন না, পাছে তাঁহার সাধনা শিথিল ও ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহার

পারিবারিক জীবন এমন সরল ও অমৃতময় ছিল যে, তাহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত সাধের তৃপ্তি—সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা দেখিতে পাইতেন। এইরূপ পারিবারিক বন্ধনে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া তিনি নীরবে, নিভৃতে, ধর্ম্মসাধনা, সাহিত্যসাধনা, ও সংযমসাধনা করিতেন। এই সাধনায় তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে তিনি অন্তর্মুখী করিয়া লইয়া তাহারই তৃপ্তিসাধনে তাঁহার সমস্ত কল্পনার পরিণতি—সমস্ত বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাহিরের কোনও আকর্ষণই তাঁহার মনে রেখাপাত করিতে পারিত না। সেই জন্য দারিদ্র্যের ও সম্পদের মধ্যে তিনি তুল্যভাবে স্বাধীন-চিত্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। বহুকাল সরকারী অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বাধীনচিত্ততার জন্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে যশ অর্জ্জন করা কি কম সৌভাগ্যের কথা? সেই দুর্লভ সৌভাগ্য চন্দ্রনাথবাবুর পক্ষে ঘটিয়াছিল; কেন না, তিনি বাহিরের আকর্ষণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যে ব্যক্তি সুখলব্ধ বিশ্রামের ভক্ত, যে বিলাসিতার বাধ্য, যে ধন ও তাহার আনুষাঙ্গিক উপকরণে মত্ত, সে কেমন করিয়া স্বাধীন থাকিবে? চন্দ্রনাথ বাবু বাহিরের বস্তুকে অনিত্য বলিয়া মনে করিতেন, কাযেই অভাবকে তিনি কখনও অভাব বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিলাসের মাদকতা তাঁহাকে কখনও মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন "বিলাসের ন্যায় মনোহর শত্রু আর নাই। (কঃ পন্থা)।" বিলাসকে সেই জন্য তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃত বেদান্তবাদীর ন্যায় তিনি নিত্যসত্যের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, কাযেই বেশভূষার দিকে একেবারে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। পারিবারিক দুর্ঘটনায়ও তিনি এই বেদান্তোচিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ছেলের মৃত্যুর সময়ে তিনি কি প্রকার মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন একটি দুষ্টব্রণে অস্ত্র করিয়া দেওয়ায় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রতিদিন তাঁহার পুত্রের সংবাদ লইতেন, এমন সময় পুত্রটির মৃত্যু হইল। ডাক্তার চন্দ্রনাথ বাবুর অন্য পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আর কয়েকদিন ছোট ছেলেটি না বাঁচিলে চন্দ্রনাথ বাবুর জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে। ছেলেটি চিররুগ্ন ছিলেন, এজন্য চন্দ্রবাবুর স্নেহ তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু রোগশয্যায় শুইয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রটি অনন্তধামে চলিয়া গেল, তখন তিনি পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। আমি শোক সহ্য করিতে পারিব, সে বড় কষ্ট পাইতেছিল,

ভগবান তাহার কণ্ঠের অন্ত করিয়া দিয়াছেন, আমি আমার নিজের ক্ষতি সহিতে পারিব না! আমার জন্ত ভাবিও না। তোমাদের মাতাকে শান্ত কর গিয়া।" কি অপূর্ব্ব সাধনার বলে তিনি এই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব, আমরা ভাবিয়াও পাই না। ঈশ্বরের বিধানের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; অতি গুরুতর শোকেও তিনি এ বিশ্বাস তিলেকের জন্ত টলিতে দেন নাই। এই অপূর্ব্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, হিন্দুত্বে বিশ্বাস, জাতীয় উন্নতিতে বিশ্বাস, চরিত্র-মহত্বে বিশ্বাস ও সাহিত্যের গৌরবে বিশ্বাস লইয়া তিনি সুখ ও শান্তির বিচিত্র আশ্রয় রচনা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃ-স্নেহ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, বন্ধুস্বজনবাৎসল্যের আদর্শ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারকে প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। পরকালে যদি চরিত্রগৌরবের পুরস্কার থাকে, যদি সৌম্য, শান্ত, নির্ম্মল প্রকৃতির চরিতার্থতা থাকে, তাহা হইলে চন্দ্রনাথের অনন্ত জীবন সুখযুক্ত হইবে। আর ইহ-কালে যদি এই লুব্ধ, মুগ্ধ, বাসনাদগ্ধ সংসারে সত্যের আদর থাকে, যদি কঠোর সাধনার সফলতা থাকে, তবে চন্দ্রনাথের স্মৃতি গৌরবমণ্ডিত হইবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথ মিত্র।

প্রণয়।

—:০:—

গোলাপ সুন্দর নহে—নয়ন-রঞ্জন,
আদি বক্ষে নাহি ধরে নিশার শিশির;
প্রণয় মধুর নহে—চিত্ত-বিনোদন,
যদি তাহে নাহি থাকে নয়নের নীর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিকের পরিচয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান জগতের জড় ও অসার পদার্থ লইয়াই ব্যস্ত, বৈজ্ঞানিক জড় জগতের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতেই জীবন কাটাইয়া দেন। এই ধারণা ভ্রমাত্মক।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাহাকে কহে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের কি ধর্ম্ম, ইহাই প্রথমে বিবেচ্য। জগতে যাহা দেখা যায় বা অনুভব করা যায়, তাহার মূল-কারণানুসন্ধানই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ ঘটনার কারণানুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে মৌলিক তত্ত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন, এবং ঐ সকল তত্ত্বের দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনাগুলি বুঝাইয়া দেন। জগতের সার সত্যে উপনীত হওয়াই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ জ্ঞানলাভ করিবার অন্য উপায় থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি যে একই মহৎ সত্যের নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া সেই সত্যের ভিত্তি যেরূপ দৃঢ় করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায় দ্বারা সেরূপ করিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ যুক্তি দেখাইতে পারিবেন, অন্য কোন উপায় দ্বারা সেরূপ যুক্তিপ্রদর্শন সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার পূর্ব্বে সত্যানুসন্ধানে বিজ্ঞান কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেই ঐ মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যকরী করার পক্ষে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব প্রমাণিত হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জড় ও শক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে না। জড়পদার্থমাত্রই শক্তির আধার। একটা ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডের মধ্যেও শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তি সময় ও অবস্থাবিশেষে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং বাহ্যবস্তুর উপর কার্য্য করিয়া আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই জড় ও শক্তি অভিন্ন ভাবে গ্রথিত। এই ব্রহ্মাণ্ড জড়ের ও শক্তির একটি বৃহৎ সমষ্টি।

এই অনুমান সম্বন্ধে আজকাল সকল বৈজ্ঞানিকই একমত হইয়াছেন। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কেবলমাত্র জড় ও শক্তির সুবৃহৎ সমষ্টি বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। পরন্তু তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, কয়েক শ্রেণীর জড়পদার্থের চৈতন্য আছে। আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুই ঐ মতের প্রধান পরিপোষক। তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদাদির চৈতন্য আছে। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে "প্রকৃতি ও পুরুষ" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের জড়, শক্তি ও চৈতন্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে।

Energy বা শক্তি নানা আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ববিধ বিকাশই যে সেই একমাত্র মহাশক্তির রূপান্তরমাত্র,বিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে এবং সেই প্রয়াসে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। আধুনিক অনুমান অনুসারে এই বিভিন্ন শক্তিবিকাশ ইথর নামক এক সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থের স্পন্দন হইতেসমুদ্ভূত। বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দনদ্বারা একই শক্তি কখন্ উত্তাপ, কখন আলোক কখন তড়িৎ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক, মনুষ্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াগুলিরও কারণনির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, পূর্ব্বকথিত ইথরের অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দনদ্বারা আমাদিগের মানসিক ক্রিয়াগুলি (যথা চিন্তাশক্তি, ধারণাশক্তি ইত্যাদি) সম্পন্ন হয়। এই মত এখনও সর্ব্বানুমোদিত হয় নাই। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ক্রিয়া (বাহ্যিক ও মানসিক) যে একমাত্র মহাশক্তির বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী বিকাশমাত্র, তাহা বিজ্ঞান একদিন সপ্রমাণ করিবে। আবার আধুনিক চৈতন্যবাদের যেদিন প্রতিষ্ঠা হইবে, সেদিন বিজ্ঞান চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে। সমস্ত জগৎ তখন বৈজ্ঞানিকের চরণে প্রণিপাত করিবে।

পৃথিবীতে আমরা যে সকল জড়পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা ৭৪ প্রকার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে বিভক্ত। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও অনুমান করেন যে, উক্ত ৭৪ প্রকার মৌলিক পদার্থ (Elements), একটিমাত্র মূল পদার্থের রূপান্তরমাত্র। এ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানাপ্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত ভাবে আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। একাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান ও আশা করা যাইতে পারে

যে, ভবিষ্যতে কোন সময়ে বিজ্ঞানের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু ও ক্রিয়া একমাত্র মূল পদার্থের ও একমাত্র অনন্তব্যাপী মহা-শক্তির রূপান্তর ও বিকাশমাত্র। আবার ইহার সহিত চৈতন্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইলে, বিজ্ঞান চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে।

প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে হইলে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যোমযান প্রস্তুত করা যাইতে পারে, অথবা যুদ্ধে বিপক্ষ-সৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করা যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কালাতিপাত করেন না। ঐ সকল কার্য্য লইয়াও পৃথিবীর অনেক লোক ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহারা "বৈজ্ঞানিক"-পদবাচ্য নহেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের আবি-ষ্কৃত কোন সত্যকে বিভিন্ন মার্গে পরিচালিত করিয়া, তাহার দ্বারা তাঁহাদের অভি-প্রেত কোন কার্য্য করাইয়া লইতে চাহেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ মৌলিক সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। ইঁহারা উপরোক্ত শ্রেণীর লোকের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সহিত জগতের বিলাসবৈভবের কোন সম্পর্ক নাই। সত্যানুসন্ধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বন্ধ। লর্ড কেল্‌ভিন্, লর্ড র‍্যেল্‌সে, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মগণই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-পদবাচ্য। সাধারণে যাহাকে Materialism বলিয়া ঘৃণা করে, ইঁহারা তাহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ বিষয়ের বিচারে ব্যাপৃত।

বৈজ্ঞানিকের সহিত দার্শনিকের প্রভেদ অতি সামান্য। উভয়েরই লক্ষ্য সত্যানু-সন্ধান। কিন্তু দুইজন দুই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইতেছেন। দার্শনিকগণ কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত রহেন, বৈজ্ঞানিকগণ যুক্তিতর্কের সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দেন। কিন্তু সাধারণ লোক বিজ্ঞানের প্রথম সোপানগুলি দেখিয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা করিয়া রাখে এবং বৈজ্ঞানিকগণকে কেবলমাত্র জড়োপাসক ও জড়বাদী বলিয়া অপবাদ দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না; বিজ্ঞান কাহাকে বলে, না জানিয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া তাহাদের একদেশদর্শিতার ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বৈজ্ঞানিক মনুষ্যের পার্থিব অবস্থার উন্নতির সাহায্যকল্পে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন নাই। তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প সত্যানুসন্ধান। সেই মৌলিক সত্য যদি কেবলমাত্র জড়ই হয়

তাহা হইলে তাঁহারা জড়বাদী, যদি কেবলমাত্র শক্তিই হয় তাহা হইলে তাঁহারা শক্তিবাদী, এবং যদি চৈতন্য হয় তাহা হইলে তাঁহার চৈতন্য-বাদী; অথবা, জড়, শক্তি ও চৈতন্য ইহার মধ্যে দুইটির বা তিনটির সমষ্টি তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে পারে। মূল কথা যাহা "সত্য",—তাহাই তাঁহাদের ধর্ম্ম।

অকারণে।

—:—

(টেনিসনের অনুকরণ)

—■:০:•—

কে জানে নয়নে কেন অশ্রু বহে যায়!
নিভৃত মরমতলে নিগূঢ় বেদনাছলে
অনম লভিয়া কেন চোকে উথলায়?
শারদ প্রসন্ন শোভা নেহারি নয়নে
অতীত দিনের কথা ভাবি আন মনে।

জীবন বহিয়া গেছে বৃথা দুরাশায়;
মরীচিকা হেরি' দূরে মুগ্ধ মন ঘুরে ঘুরে
শ্রান্ত হয়ে পড়িয়াছে গোধূলি-বেলায়।
আকুল বেদনা সেই ভাসিছে পবনে
শেফালি-সৌরভে আর বিহগ-কূজনে।

প্রথম প্রেমের মত—তেমনি মধুর;
তেমনি আবেগভরা প্রাণ-মন-মুগ্ধ-করা;
তাহারি স্মৃতিতে এই হৃদয় বিধুর,—
উন্মুখ আছিল যবে হৃদয় নবীন
আত্মহারা মন ছিল সুখে উদাসীন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

ইচ্ছামৃত্যু।

তখনও উষার আলোক ফুটিয়া উঠে নাই—বিহগ-কূজনবিরহিত। রোগিনীর পাংশু মুখে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। শয্যাপার্শ্বে বর্ষীয়ান পিতা সমস্ত রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। কাতর কণ্ঠে কন্যা ডাকিল "বাবা"; "কি মা" বলিয়া পিতা মুমূর্ষু কন্যার ললাট স্পর্শ করিলেন। কন্যা যেন বিকার-ঘোরে বলিল—"একবার সুরেশ—"; আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মৃত্যু শেষ নিশ্বাস অপহরণ করিয়া চলিয়া গেল। মত্ত বায়ু যেমন প্রবল ঝটিকার সময় পক্ষি-শাবককে মাতার পক্ষচ্যুত করিয়া কোন অজানিত স্থানে লইয়া যায়; নিষ্ঠুর মৃত্যু তেমনই বৃদ্ধ সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের হৃদয়পঞ্জর ভগ্ন করিয়া তাঁহার বড় আদরে—বড় সোহাগের কন্যা শান্তশীলার প্রাণবায়ু লইয়া পলায়ন করিল। হায়, মানব জীবন!

কৈশোরে মাতৃহীনা, পিতৃস্নেহে পালিতা, শিশিরসিক্ত শেফালি পুষ্পের ন্যায় স্নিগ্ধ শান্তশীলা যখন দশ দিনের শিশু তখন এমনই এক অশুভ মুহূর্ত্তে তাহার জননী সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-শোভা লইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সে আজ সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বের কথা। ঐ যে নিস্পন্দ জড় দেহ—ঐ যে অর্দ্ধোন্মিলিত জ্যোতিহীন, দৃষ্টিহীন চক্ষু, যাহার প্রতি স্পন্দনে স্ত্রীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সাতকড়ি বাবু হৃদয়ে বল পাইতেন, দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করিয়া জীবনে সার্থকতা আছে মনে করিতেন—উহারা আজ তাঁহার নিকট বিশ্ব-সংসারের একটি বিরাট শূন্যতার আবরণ উন্মোচিত করিয়া যেন সপ্তদশ বর্ষের নিষ্ফল ব্রত উদ্‌যাপন করাইল। দশ দিনের শিশু কন্যা বুকে করিয়া সাতকড়ি স্ত্রীর শোক ভুলিয়াছিলেন;—আজ তাঁহার শোক সংবরণ করিবার কিছুই নাই। শান্তশীলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রীর প্রতিবিম্ব হারাইলেন।

শোকের আকস্মিক আঘাত অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া যখন বাহ্য বিকাশ বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তখন তাহার গভীরতা যত বৃদ্ধি পায় স্মৃতি তত প্রবল হইয়া উঠে। কেমন করিয়া দশ দিনের শিশু "মানুষ" করিয়াছিলেন, স্তন্যদায়িনী ধাত্রী যখন শান্তকে সামান্য অবহেলা করিত, তখন স্ত্রীর অভাব তাঁহার হৃদয়ে

কিরূপ ব্যথিত, সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার শান্তকে কত কষ্টে মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় শান্ত কিরূপ সাগ্রহে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিত;—এক এক করিয়া বৃদ্ধের সকল কথা মনে হইত, এবং শোকে—ক্ষোভে হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর নিষ্পেষিত করিয়া ক্ষীণ দৃষ্টি নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিত। সময় সময় বৃদ্ধের শোকাবেগ এত তীক্ষ্ণ হইত যে, তিনি ভূমিতে লুটাইয়া অশ্রুজলে হৃদয়ভার লঘু করিতেন।

২

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গেল। একদিন অপরাহ্নে সুরেশ নামক একটি যুবক বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সুরেশ দিব্যকান্তি, উচ্চ-শিক্ষিত যুবক। তিনি "দেশের এবং দশের জন্য" জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাই সংবাদপত্র-সম্পাদনের গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া শিক্ষায় এবং সংযমের সমন্বয়ে যে মানবত্ব দেবত্বে পরিণত করা যায় তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। হঠকারিতায় আত্মোৎসর্গ হয় না;—তাহার ইন্ধন যজ্ঞে আহরণ করিতে হয়; অধ্যবসায় তাহার বেদী, সংযম তাহার মূলমন্ত্র এবং প্রতীক্ষা অথবা যোগ তাহার আহুতি, তাহার উদ্‌যাপনের জন্য উৎকণ্ঠা নিন্দনীয় এবং নিষ্ফল—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সুধী সম্পাদক সাতকড়ি ত্রিশ বৎসর কর্ণধাররূপে সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর। পুরাতন ইতিকথা শুনিবার নিমিত্ত, ব্যক্তিগত জীবনের আলোক ও আঁধারের বিষম সমন্বয়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য এবং রাজনীতির জটিল রহস্য শুনিবার জন্য সুরেশ মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতেন—আজও আসিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিষ্যলাভ করিয়া সাতকড়ি সাদরে স্বীয় আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল তাঁহাকে অকপটে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আজ—"সুরেশ বাবু আসিয়াছেন" শুনিয়া অতর্কিতে বৃদ্ধের হৃদয়ে যেন বিপ্লব ঝটিকা বহিয়া গেল। এই কি সেই সুরেশ—যে সুরেশের নাম শান্তের শেষ নিশ্বাসে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল? সাতকড়ি স্মৃতিমন্থন করিয়া আর কোনও সুরেশের কথা মনে করিতে পারিলেন না। সুরেশ আসিলেন—প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পর চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ কন্যা-বিয়োগের কথা সুরেশকে জানাইলেন, কিন্তু এমন কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না যাহাতে এই দুই সুরেশের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারেন। বৃদ্ধের প্রচ্ছন্ন শোক উথলিয়া উঠিল।

৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের আহ্নিকাদি হইল না। তিনি শান্তনার আশায় শয্যার আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধ কি এক অনির্দ্দিষ্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রেতাত্মার ন্যায় ধীরে ধীরে শান্তের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিন মাস ঐ গৃহের দ্বার কেহ উন্মুক্ত করে নাই; আজ কাহার অদৃষ্ট ইঙ্গিতে সাতকড়ি কম্পিত হস্তে অর্গল উন্মোচন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন! সে গৃহ তেমনই সজ্জিত,—প্রতি দ্রব্যে শান্তের ছায়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন; দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া আকুল ভাবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধ গৃহের প্রতি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া যেন শান্তের অস্তিত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন; ঝাড়িয়া পুছিয়া যে স্থানের যে দ্রব্য সেই স্থানে তাহা সযত্নে রাখিয়া দিলেন। যেন শান্ত প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সযত্ন-সজ্জিত গৃহ দেখিয়া পিতৃস্নেহের গভীরতা উপলব্ধি করিবে। হায় অন্ধ স্নেহ!

৪

যখন গৃহের সকল দ্রব্য সংস্কৃত হইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, তখন সাতকড়ি শান্তের পোর্টমেণ্ট খুলিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। শান্তের জামা, কাপড়—শান্তের খাতা যাহাতে তাঁহার নিকট চাণক্যের শ্লোক শিখিয়া শান্ত লিখিয়া রাখিয়াছিল; তাহার পুতুল, বই, ফিতা—প্রতি দ্রব্য অশ্রুজলে বৃদ্ধের বক্ষ ভাসাইয়া দিল। তখনও তৃপ্ত হয় নাই—তখনও শক্তিশেল অনাকৃষ্ট। বৃদ্ধ বাক্সের মধ্য হইতে একখানি সুন্দর বাঁধান খাতা বাহির করিলেন। এই খাতা বৃদ্ধ উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখিবার জন্য বাঁধাইয়া আনিয়াছিলেন—তাহার পর খাতা খুলিয়া পায়েন নাই—কবিতা-গুলিও মানসপটে হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাতার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিত—"আত্ম নিবেদন"! বাহ্য সৌম্যের অভ্যন্তরে শান্ত যে তাহার "আত্ম নিবেদন" হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা সে সাতকড়িকে স্বপ্নেও অনুমান করিতে দেয় নাই। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বৃদ্ধ পড়িতে লাগিলেন—

"আত্ম-নিবেদন"

"আমার অবস্থায় স্ত্রীলোকের এক দেবতার উদ্দেশে আত্ম-নিবেদন করা উচিত। আমি চিরহতভাগিনী, তাই বিপথগামিনী;—মানবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছি। যিনি আমার আত্ম-নিবেদনের অধিকারী বিধাতা আমাকে তাঁহা-

হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ভালবাসার অঙ্কুর উদ্গত না হইতে যাঁহাকে আমি স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, আলেয়ার মত আমাকে একবার দেখা দিয়া তিনি কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে লুকাইয়া গেলেন, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না,—হৃদয়েও তাঁহার চিহ্ন রহিল না। মনে কেবল একটি সংস্কার আছে, আমার বিবাহ হইয়াছিল। পিতৃ-নির্দ্দেশে একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম—তিনি নাই; সুতরাং আমি বিধবা। আমার কর্ম্ম নিষ্ফল—জন্ম নিষ্ফল!

"শুধু কি তাহাই? আমি শৈশবে মাতৃহীনা। দশ দিনমাত্র মাতৃ-স্নেহ ভোগ করিয়া—আমি সে সৌভাগ্যেও বঞ্চিতা। জ্ঞান হইয়া কতবার "মা, মা" বলিয়া ডাকিয়াছি; কিন্তু পিতার অশ্রুসিক্ত মলিন মুখ দেখিয়া নীরব হইয়াছি। এক সৌভাগ্যে আমি সৌভাগ্যবতী। অসীম পিতৃস্নেহ আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাহাতেই সুখী,—আবার তাহাতেই অসুখী। যখন পিতার স্নেহ-সৌরভে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন পিতার ব্যর্থ জীবনের তাপ অনুভব করিয়া দুঃখে মরিয়া যাই। আমার জন্য পিতা কত না কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—করিতেছেন; আর হতভাগিনী আমি—দগ্ধ অদৃষ্টের অঙ্গারে তাঁহাকে দিন দিন পুড়াইয়া মারিতেছি?

"বৈধব্য কঠোর; বিড়ম্বনা তদপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টের। বৈধব্য অভ্যাস করা যায়; বিড়ম্বনার তাহা হয় না। পিতার বড় আদরের সোহাগের কন্যা, তাই পিতা বাল্যে আমার বিবাহ দেন নাই। যখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর—যৌবনের প্রথম উন্মেষে পৃথিবীর সব যখন সুন্দর বোধ হইত, যখন অনির্দ্দিষ্ট প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় আপনা আপনি চঞ্চল হইয়া উঠিত, যখন সমবয়স্কা বালিকারা স্বামী-স্নেহ-সম্পদে সংসারের সুখ-তরঙ্গে ভাসিতে থাকিত—সেই সন্ধিক্ষণে এক পূর্ণিমা রজনীতে আমার বিবাহ হইয়াছিল। তখন জানিতাম না যে, বিবাহ আমার পক্ষে মরীচিকা হইবে! শুভ-দৃষ্টির সময় একবার সলজ্জ-শঙ্কিত নয়নে স্বামীর মুখ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু বস্ত্রাবরণের মধ্যে অনুজ্জ্বল আলোকে সে মুখ স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই। তবু তাঁহার উদ্দেশে হৃদয় অর্পণ করিয়াছিলাম। কে জানিত, দেবতার ইচ্ছা নহে—আমার দান সফল হয়। মনে করিয়াছিলাম, পিতৃ-স্নেহে, স্বামী-প্রেমে মাতৃশোক ভুলিয়া যাইব; পিতার হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দিব। কুহকিনী আশা আমাকে স্বর্গের ছবি আঁকিতে দিয়া তুলি কাড়িয়া লইয়াছিল।

"বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর পিতা আমাকে শ্বশুর-গৃহে যাইতে দিতে পারেন নাই; জামাতাকে নিজ গৃহে রাখিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিবাহের একমাস পরে যখন আমি স্বামি-সন্দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আবেগ অনুভব করিতেছিলাম তখন শুভদিনে স্বামী আসিলেন। লজ্জার—শঙ্কার সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বামিসম্ভাষণের জন্য মনকে দৃঢ় করিলাম। পিতার স্বভাবতঃ মলিন মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। নিশাসমাগমে—পূর্ণিমার পূর্ণালোকে, কি এক আকাঙ্ক্ষাউদ্বেল হৃদয়ে এই গৃহে—এই শয্যার পার্শ্বে স্বামী-সন্দর্শনে আসিয়া দাড়াইলাম। অশ্রু প্রবোধ মানে না—আর লিখিতে পারি না"—

পৃষ্ঠাটি অশ্রু কলুষিত। পর পৃষ্ঠায় শান্ত লিখিয়াছে :—

"কাঁদিয়া হৃদয় শান্ত হইয়াছে। এমন সঙ্গী নাই—সখী নাই যে, হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিয়া শান্তি লাভ করিব। কাহাকেই বা বলিব, কেমন করিয়া বলিব,—আমার ভক্ত অদৃষ্টের অদ্ভুৎ রহস্য কেমন করিয়া জানাইব? যখন শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলাম তখন হৃদয়ের সমস্ত দৃঢ়তা কোথায় চলিয়া গেল; এক হাত ঘোমটা টানিয়া পলাইবার উপক্রম করিলাম। স্বামী আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমার হাত ধরিলেন এবং আমাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন। তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, এবং পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার বাহু-বেষ্টন শিথিল হইয়া গেল। মুক্তিলাভ করিয়া আমি একেবারে শয্যার নিম্নে নামিয়া আসিলাম। কতক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম! স্বামীর আর কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না! মনে করিলাম, তিনি আমার সঙ্কোচের প্রশ্রয় দিতেছেন, অথবা তাঁহার অভিমান হইয়াছে। ক্রমে নিস্তাকর্ষণ হইল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন মুক্ত বাতায়নপথে গৃহের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। লজ্জায়—সঙ্কোচে মরিয়া গেলাম। তখনও স্বামী শয্যায় নিদ্রিত। দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। হায়, কাল লজ্জা! তখনও যদি একবার চাহিয়া দেখিতাম,—তাহা হইলে এখন যাহা স্বপ্ন—যাহা কল্পনায় আনিতে পারি না, তাহার ছবি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজীবন ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে পারিতাম।

"কিন্তু সে কি কাল রাত্রি পোহাইয়া ছিল! বেলা হইল, ক্রমে দশটা—এগারটা বাজিয়া গেল। স্বামী তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। পিতা উৎকণ্ঠিত হইলেন; ধাত্রীকে জামাতাকে ডাকিতে বলিলেন। ধাত্রী আসিয়া আমাকে রহস্য করিয়া বলিল যাও' না, মা, জামাই বাবুকে ডাকিয়া দাও।' আমি

ভ্রূকুটি করিলাম। সে হাসিতে হাসিতে আমার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। আমি রান্নাঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রান্নাঘরে কেবল পৌঁছিয়াছি এমন সময় ধাত্রী কাঁদিয়া উঠিল, 'ওগো বাবু, গো।' 'কি হয়েছে—কি হয়েছে' বলিয়া পিতা উপরে ছুটিয়া যাইলেন। আমি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলাম।

"ক্রমে কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। ধাত্রী এবং পাচিকা কাঁদিতে লাগিল। পিতা দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর যখন ডাক্তার চলিয়া গেলেন, ধাত্রী আসিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং শুনিলাম, পিতার মূর্চ্ছা হইয়াছে। তখন বুঝিলাম, যাহা আমার সুখ-শয্যা বলিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা স্বামীর অনন্ত শয্যায় পরিণত হইয়াছে। এই আমার নিয়তি! ধাত্রীর অশ্রু দেখিয়া আমার নয়নে ও জল আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও আমার সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। সন্ধ্যার সময় বিবর্ণ মুখে পিতা শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিলেন, ধাত্রী আমার হাতের 'নোয়া' খুলিয়া লইল। আমি বিধবা।

"বিধবা!—কেন বিধবা হইলাম তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না? বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে যে একটা স্বপ্ন! তথাপি আমি বিধবা! হায়, ভগবান! কোন্ পাপে আমার ভাগ্যে এমন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল? শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছিলেন, স্বামীর হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ছিল; অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের গতিরুদ্ধ হইয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আমাকে হৃদয়ে লইতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিকল হইয়াছিল, সুতরাং আমিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। জগতে কে এমন সহৃদয় আছেন যে তিনি বুঝিতে পারিবেন, যখন এই কথা মনে হয় তখন আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বে এমন হইত না, কিন্তু যখন বৈধব্যের বিড়ম্বনা বুঝিতে পারিলাম—যখন কুহেলিকা অপসৃত হইয়া এক জাগ্রত স্বপ্ন হৃদয় জুড়িয়া বসিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, আমার সর্ব্বনাশ কত ভয়ানক! তখন মৃত্যুর বিনিময়ে মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করিয়া আত্মবলি দিতে বাধ্য হইলাম।

"লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়; লজ্জায়, ক্ষোভে, রোষে হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করি; কিন্তু যখন সংকল্প করিয়া লিখিতে বসিয়াছি' তখন আত্ম-গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বাবা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে

আমার এই কলঙ্ককাহিনী কখনও তোমার হস্তগত হইবে না। তবে আমার মৃত্যুর পর যদি কখনও ইহা তোমার হস্তগত হয়—জানি না তুমি তখন হৃদয়ে কত ব্যথা অনুভব করিবে। কিন্তু, বাবা, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনকে জয় করিতে দিই নাই।

"আমার বৈধব্যের একবৎসর পরে একদিন ফাল্গুবর্ষণ প্রাবৃটের মধ্যাহ্নে সুরেশ বাবু নামক একজন সুকান্তি যুবা পুরুষ বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দ্বারান্তরাল হইতে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেই দিন তাঁহার সহিত প্রথম পিতার পরিচয় হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার নিমিত্ত এবং বিষয়বিশেষের উপদেশ লইবার জন্য আমাদের বাটীতে আসিতেন। সেই প্রথম দিন পিতার জন্য পান লইয়া উপরে আসিতেছি, এমন সময় সুরেশ বাবু নিম্নতলে নামিয়া যাইতেছেন। পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে উভয়ের চক্ষু দৃষ্টিবিনিময় করিল। তাঁহার সেই উজ্জ্বল, সহাস্য, সৌম্য মূর্ত্তিতে কেমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যাহাতে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, সুতরাং তাঁহাকে উপরে উঠিয়া যাইতে হইল। তাহার পর আমি পিতার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি নামিয়া গেলেন।

"সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কথা পিতা আমার সহিত আলোচনা করিতেন, সেদিনও পরিচ্ছলে বলিলেন, 'এইমাত্র যে যুবক আসিয়াছিল, উহার শিক্ষা যেমন উচ্চ, হৃদয় তেমনই মহৎ। মুগ্ধ যুবা লোক-সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু জানে না যে, গন্তব্য পথ কত পিচ্ছিল—কত অশুভ আশঙ্কায় পরিপূর্ণ।' কথাপ্রসঙ্গে পিতা তাঁহার বিদ্যার এবং বিনয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। পিতার প্রশংসা আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে তাঁহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত করিল।

"তাহার পর সুরেশ বাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিতেন এবং তাঁহার চরিত্রগুণে অল্প দিনে পিতার বিশেষ প্রিয় এবং বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠেন। এমন কি তিনি উপস্থিত থাকিতে পিতা তাঁহার অভ্যাসবশতঃ আমাকে কক্ষমধ্যে ডাকিতে সঙ্কোচবোধ করিতেন না এবং আমি সঙ্কোচবোধ করিলে বলিতেন, 'লজ্জা কি, মা, ঘরে সুরেশ আছে। সুরেশ আমার ছেলের মত।' এমনই করিয়া কতদিন কাটিয়া গেল। সুরেশ বাবু তাঁহার সংযত শিষ্টাচরণে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বাহ্যিক ঘনিষ্ঠতার সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতাও বাড়িতে লাগিল। তাহার পর যখন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন কারণে তিনি না আসিতে পারিলে মন উচাটন হইত, আসিলে হৃদয় প্রফুল্ল হইত,—তখন একদিন শুনিলাম, তাঁহার পত্নী 'প্রেরিত

পত্রে' অনবধাবনতা বশতঃ তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তখন হৃদয়ে যে সহানুভূতির বেদনা বাজিয়া উঠিল, তাহা যে গভীরতার কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রান্ত করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম; এবং যখন তাঁহার একবৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইল তখন বুঝিলাম, স্ত্রী-হৃদয় নির্দিপ্ত উপাসনায় সন্তুষ্ট থাকে না—একদিন না একদিন তাহা ঈর্ষ্যাতের ছবি আঁকিয়া হৃদয়ের পুণ্য-পবিত্রতা মলিন করে। অভাগিনী বিধবা!

"সে দিন হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছিলাম লোক চক্ষুর অন্তরালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাহা লঘু হইল না। পরন্তু যে কঠোর সত্য এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহার অনুশোচনা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। যখন হৃদয় যুক্তির বাঁধ অতিক্রান্ত করিত, তখন দুই হাতে বুক চাপিয়া, চক্ষু মুদিয়া মনে করিতাম, আমার স্বামী আমাকে হৃদয়ে টানিয়া লইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সে কি কঠোর সংগ্রাম তাহা কে বুঝিবে? কাতর প্রাণে ডাকিতাম, প্রভু, আমায় রক্ষা কর। দুর্ব্বল হৃদয় অদৃষ্ট—অজ্ঞের অন্ধকারে আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। তাই মনকে দৃঢ় করিয়া মৃত্যু-সংকল্প করিলাম, হৃদয়ের বিনিময়ের পরিবর্ত্তে মরণের বিনিময় গ্রহণ করিলাম। বোধ হয়, ভগবান আমার সহায় হইয়াছিলেন তাই এই ইচ্ছা-মৃত্যুর উদ্‌যাপন আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এতদিন বৈধব্যের যে সকল কঠোরতা অবলম্বন করি নাই, এক এক করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলাম। পর-লোকের প্রেতাত্মার জন্য যেমন হৃদয় বলি দিয়াছিলাম, ইহলোকের অন্তরাত্মার জন্য তেমনই কারাগারের কঠোরতা গ্রহণ করিলাম। পিতা আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু, বোধ হয়, আমার বুদ্ধির পরিপক্কতা অনুভব করিয়া কোন আপত্তি করেন নাই। দিন দিন আমি মলিন হইয়া যাইতেছি লক্ষ্য করিয়া পিতা আমাকে মধ্যে মধ্যে শরীরের প্রতি যত্ন করিতে বলিতেন; কিন্তু সুরেশ বাবুর দুর্ভাগ্যে তাঁহার হৃদয়ে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহার সংসারের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছিল। তাঁহাকেও বিপদাশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত।

"যখন এক বৎসর পরে সুরেশ বাবু মুক্তাকাশের স্বাধীন বায়ুতে আসিলেন তখন আমি মরণের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হয় এবং বক্ষে কেমন একটু বেদনা অনুভব করি। পিতা মধ্যে মধ্যে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। আমি ছলনা করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতাম। পিতা জেলখানা হইতে সুরেশ বাবুকে

আনিয়া আহারাদি করাইলেন। বন্ধুগণ চলিয়া গেলে সুরেশ বাবু পিতার সহিত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। কারামুক্ত হইয়া শারীরিক স্বাধীনতার সহিত তাঁহার মনও অনেকটা স্বাধীন হইয়াছিল, তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শান্ত, তোমার শরীর এত দুর্ব্বল কেন; কোন অসুখ হইয়াছিল?' কিন্তু তিনি যতক্ষণ আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার মুখে প্রথম উচ্চারিত আমার নাম শুনিয়া আমি ততক্ষণ আরক্তিম মুখে অন্তরের অস্থিরতা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। পিতা আমার সঙ্কটে সহায় হইলেন। তিনি বলিলেন, 'প্রায় একবৎসর শান্তের শরীর কেমন কৃশ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।' সুরেশ বাবু বলিলেন, 'কেন?' এবং আমার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া যেন আমার হৃদয়ের কোন গোপন কথা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। এ দৃষ্টি তাঁহার জেলের অভ্যাস। কারাগারে কথায় যাহা জানা যায় না, দৃষ্টিতে তাহা জানিতে হয়।

"আমার উত্তরের আবশ্যক হইল না। বাহিরে আরও লোক আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইতে হইল। যাইবার সময় যে করুণ দৃষ্টি বিদায়-সূচনা করিল তাহাতে যেন তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমি যদি তাঁহার কথা ভাবিয়া থাকি, তিনিও আমার কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। হায়, মূঢ় কল্পনা!

"আজ কয়দিন 'শয্যাশায়ী' হইয়াছি—পিতা দিনরাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন আর আমি তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেমন পিকদানিতে ঔষধ জমা হইতেছে, আমার আয়ু তেমনই ফুরাইয়া আসিতেছে। আজ অবসর পাইয়া খাতা লইয়া বসিয়াছি; কিন্তু ভ্রান্তির মাত্রায় বুঝিতেছি, বোধ হয় আর কোন দিন এ খাতা ছুঁইতে পারিব না। আমার অসুখের পর সুরেশ বাবুর আমাদের বাটীতে আসিবার অবসর হয় নাই। বাবার নিকট শুনিয়াছি, বাঙ্গালার রাজনৈতিক আকাশ এখন ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি একদিন ও আসিতে পারিতেন না? অথবা তাঁহার না আসিবার কোন গূঢ় কারণ আছে? মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম! পিতাকেই বা কেমন করিয়া বলি, তাঁহাকে একবার আসিতে অনুরোধ করেন। পিতা, অধম সন্তানের এ দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিও। আজ মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া তোমাকে ফেলিয়া যাইতে হৃদয় বড় কাঁদিতেছে। কিন্তু জীবনে আমার বিপদ—মরণে আমার মঙ্গল। আর লিখিতে পারি না—চক্ষুতে যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি। পিতা—পিতা"—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি রজনীকান্ত। *

—:০:—

বিগত ২৮ এ ভাদ্র মঙ্গলবার কবি রজনীকান্ত সেন অসহ্য রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

কবির পরিচয় কাব্যে। রজনীকান্ত কোন বৃহৎ কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু কতিপয় সঙ্গীতরচনা করিয়া তিনি কয়েক বৎসরমধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে যে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। রজনীকান্তের সঙ্গীতের সহিত পরিচিত নহেন, শিক্ষিত সমাজে বোধ হয় আজ এমন কেহই নাই। শুধু কবিতা অপেক্ষা সুরতাললয়সমন্বিত গান সহজেই লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অদ্ভুত। একদিন সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের গানে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক কালেও, ৺হরিনাথ মজুমদারের বাউল সঙ্গীত অল্পকালমধ্যে বঙ্গদেশে যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনাই সেরূপ পরিচিত হইতে পারে নাই।

রজনীকান্তের কোমলকান্ত পদাবলীর বিশেষত্ব—তাহাদের খাঁটি স্বদেশীত্ব। সেগুলি বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত নহে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় রজনীকান্ত নিতান্তই বাঙ্গালীর ঘরের কবি। আধুনিক অধিকাংশ কবিতায় যে একটা অস্পষ্টতা ও অবসাদের ভাব পরিলক্ষিত হয়, রজনীকান্তের রচনায় তাহার ছায়ামাত্র নাই। প্রাঞ্জলতা তাঁহার রচনার প্রধান গুণ। সম্প্রতি বঙ্গভাষায় স্বদেশানুরাগ-প্রণোদিত সঙ্গীতের অভাব নাই কিন্তু রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" এবং "ভাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত"—এই সরল গান দুইটি দরিদ্র বাঙ্গালীর মর্ম্ম যেরূপে স্পর্শ করিয়াছে, অন্য কোন গানই তাহা পারে নাই।

রজনীকান্তের রচিত অধিকাংশ গানই 'বাণী' ও 'কল্যাণী' নামক দুইখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কল্যাণী' ১৩১২ সালে, ও 'বাণী' তাহার ২ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানি

* রাণাঘাট আলোচনা সমিতিতে পঠিত।

পাঠ করিয়া প্রথমেই মনে আক্ষেপ হয় যে, যিনি এই দুর্লভ কবি-প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তিনি দীন বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে আরও রত্নরাজি দান করিয়া যাইতে পারিলেন না। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।"—রজনীকান্তের প্রতিও এই উক্তি প্রযোজ্য। সকলেই অবগত আছেন, উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রজনীকান্ত বিগত ৮ মাস কাল মেডিক্যাল কলেজ হাস্পাতালে ছিলেন, তাঁহার বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহার বাণী-আরাধনার বিরাম ছিল না। এই রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তিনি তিনখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহার দুই খানি এখনও যন্ত্রস্থ। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনে সাহিত্য-সেবার উপযুক্ত অবসর থাকিলে, অথবা তাঁহার জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত না হইলে, তিনি 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' ন্যায় আরও অমূল্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ ৪৪ বৎসরমাত্র বয়সেই রজনীকান্ত সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

রজনীকান্তের কাব্যের সমালোচনার উপযুক্ত সময় এখন নহে। আজ তাঁহার অতি শোচনীয় অকাল মৃত্যুর স্মৃতি আমাদিগের হৃদয় পীড়িত করিতেছে। কাব্য অপেক্ষা কবির কথাই আজ আমাদের সমধিক মনে পড়িতেছে। তাঁহার চির-নীরব কণ্ঠস্বর এখনও আমাদের কাণে বাজিতেছে।

রজনীকান্তের হাসির গানে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে "রাজসাহীর ডি. এল্. রায়" বলিতেন। বস্তুতঃ বঙ্গ সাহিত্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যতীত অন্য কোন কবি হাসির গান রচনায় তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনীকান্তের কোন কোন হাসির গান রায়-কবির অনুসরণে রচিত হইয়া থাকিলেও ঐ সকল রচনায় তাঁহার নিজস্ব যথেষ্ট আছে। তাঁহার রচনা ছায়া অথবা প্রতি-ধ্বনিমাত্র নহে। একজন প্রবীণ সমালোচক লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী লেখকদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাশালী লেখকদের কতকটা অনুবর্ত্তী হইতেই হইবে; ইহা অপরিহার্য্য। তাহাতে ক্ষমতার অভাব বুঝায় না; পৌর্ব্বাপর্য্যমাত্র বুঝায়।"—রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্ত্তী এই হিসাবেই তাঁহাকে হাস্য রসের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।

কিন্তু রজনীকান্তের হাসির গানে ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে প্রভেদও বিস্তর। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সভায়, মজ্‌লিসে, হাস্যতরঙ্গ উত্থিত করে সত্য, কিন্তু হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এইরূপ অনাবিল হাস্য যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু রজনীকান্তের হাসির গান ও কৌতুক-রচনার অন্তরালে দেশের ও সমাজের জন্য গভীর মর্ম্মবেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

বাস্তবিক, আমাদের বেশভূষা, কথাবার্ত্তা ও আচারব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যই হাস্যরসের আকর। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে চারিদিকেই হাস্যরসের প্রচুর উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সুসঙ্গতির সীমারেখা ঠিক কোন স্থানটিতে অতিক্রান্ত হইলে হাস্যরসের উদ্ভব হয়, অনেকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা যিনি উহা নির্ণয় করিতে পারেন, তিনি হাস্যরসরসিক।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি পীড়ন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধঃপতন ইত্যাদি সুপরিচিত বিষয়ে রজনীকান্ত যে সকল ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র হাস্য-অবতারণার উদ্দেশ্যে রচিত—কেহ এরূপ মনে করিতে পারিবেন না। কপটাচার, ধর্ম্মাভাব ও স্বার্থান্ধতার প্রতি তীব্র শ্লেষের বাণ নিক্ষিপ্ত করিতে কবি কোথাও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। হাসির গানের ব্যপদেশে রজনীকান্ত সমাজের ক্ষতস্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে ঔষধপ্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে "বরের দর" সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এক বিবাহ-সভায় বরকর্ত্তা যৌতুকের ফর্দ্দ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছি।

"বরের দর" কবিতাটির শেষ পংক্তি এই—"দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ।"—এই স্থানে কবি নিজের হৃদয় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাস্য রসের আবরণ দিয়া রজনীকান্ত তাঁহার মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুক হাসির সঙ্গে বেদনার অশ্রু মিশ্রিত।—কমলাকান্তের ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতে পারিতেন!

"হাসির ছলনা করি কাঁদি।"

ভাবিয়া দেখিলে, তাপ ও আলোক যেমন একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ; এক ঈথরের কম্পনমাত্রার প্রকারভেদ—হাসি এবং অশ্রুও সেইরূপ হৃদয়ের উত্তেজনার মাত্রাভেদমাত্র। আমাদের অন্তরে একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য-

বোধবৃত্তি আছে, লঘু আঘাতে তাহা হইতে হাসির আলোক বিচ্ছুরিত হয়, গভীরতর ভাবে বিচলিত হইলে তাহা অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দেয়। হৃদয়-বৃত্তির প্রভেদ-হেতু যে পীড়ন একজনের মনে কৌতুক আনয়ন করে, তাহাই অন্যের চিত্তে বেদনা-সঞ্চার করিয়া থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ও রজনীকান্তের হাসির গানের স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার জন্য, দুইটি গান এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল লিখিয়াছেন—

যাও পাও নৃত্য কর মনের সুখে
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে ফুঁকে।
আছিস্ তুই পাঁচার মতন বসে' কেটা।
যাচ্ছিস্ কে উড়িয়ে ধুলি, যা' না বেটা;
দুদিনে ভবের খেলা ভবের লাঠা যাবে চুকে।
ইত্যাদি।

ইহার অনুরূপ রজনী কান্তের গান :—

আছ ত' বেশ মনের সুখে।
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
* *
সমাজের নাইক নাথা কেউত আর দেয়না বাধা,
সবি টের পাবে দাদা সে রাখ্‌ছে'বেরাক টুকে;
কে কারে করবে মানা? অমনি প্রায় ষোল আনা
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে;
যত খুন ডাকাতি প্রকরমা * *
এর মজা বুঝবে সেদিন যে দিন যাবে শিঙে ফুঁকে।
('কল্যাণী'—৬৬ পৃঃ)

ইহাকে হাসির গান বলিব, না পারমার্থিক সঙ্গীত বলিব?

রজনীকান্ত হাস্য রসকে কেবলমাত্র ক্ষণিক চিত্তরঞ্জনের উপায় মনে করেন নাই, উহাকে যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য বিদূষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া না দিয়া, শিক্ষক, সুহৃদ, উপদেষ্টা সকলেরই যে উহাতে অকুণ্ঠিত অধিকার আছে, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য রসের প্রসার সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; "নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য রসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাড়ামি করিয়া সভা-

জনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপভোগসহ বিশেষ কুটুম্বিতা ছিল। * * * যেখানে গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত, সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

"বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে। উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। * * * এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়।"

রজনীকান্ত সর্ব্বত্র হাস্যরসের এই গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত যে কেবল হাসির গানের কবি, তাহা নহে। হাসির গান সম্পর্কেই তিনি সাহিত্য-সমাজে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের জন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন—ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যায়।—অসাধারণ প্রতিভা-বলে, মধুর, প্রগাঢ়, ভক্তি রসের সহিত "নির্ম্মল উজ্জ্বল শুভ্র" হাস্য রসের একত্র সন্নিবেশে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অন্য কোন আধুনিক কবি এরূপ সফলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সৃষ্টির রহস্য, সৃষ্টির বিশালত্ব, সৃষ্টির বৈচিত্র্য, সৃষ্টির চিরশৃঙ্খলা, ইত্যাদি বিষয় তিনি এমন কৌতুকমিশ্রিত সরলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাঠ করিলেই মুগ্ধ হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি গানের উল্লেখ করিতেছি :—

* *

ডাক্‌ দেখি তোর বৈদ্যি নকে
দেখ্‌ব সে উপাধি দিলে,
ক'টা "কেন"র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন দেয় না যেতে অন্য দিকে।

*

কান্ত বলে, আছে জেনো, "কেন"র "কেন," তুল্য "কেন,"
যাও, নিখিল "কেন"র মূল কারণে,
সে রেখেছে কালের খাতায় লিখে।—

("নিরুত্তর"—'বাণী' ৪৪ পৃঃ)

কে পুরে দিলে রে,—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ক'াক
কি বিরাট বন্দোবস্ত ভাবতে লাগে তাক্।
কে ধরে আছে তুলে, কি ধরে আছে তুলে
পড়েনা শুতো খুলে বছর কোটী লাখ।

* *

'জ্ঞান' দেখে বুঝবি, পাছে 'জ্ঞানী,' এক বসে আছে,
কাজ তুই বুঝবি যদি, সেই জগৎ গুরুকে ডাক।"—

("গ্রহরহস্য"—'কল্যাণী' ৭৩ পৃঃ)

* *

সে কিরে মম বুড়কি বুড়ি, মণ্ডা জিলিপি কচুরী
যে ভাজ্রখণ্ডে খরিদ হবে উদরস্থ হয়ে যাবে?
সেতো হাঠ বাজারে বিকোয় না রে, থাকে নাতো গাছে ক'লে,
দিল্লীলাহোর নয়, যে রাজা করীম চাচা দেবে বলে'।
মামলাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিস সূত্রে যায় না পাওয়া,
সে যে নয় মলয়া হাওয়া, যে যাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে।
সে যে-যোগী কবির সাধনের ধন, ভক্তি মূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু" বলে যে জন ডাকে।

* * *

("সাধনার ধন"—'কল্যাণী,' ৬১ পৃঃ)

রজনীকান্তের অনেকগুলি ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ভাষা, ভাব ও ছন্দের পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে হইলে 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' অধিকাংশ কবিতাই উদ্ধৃত করিতে হয়। রচনা-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া রজনীকান্তের ভক্তি-সাধন প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করিব।

রজনীকান্তের সাধনা সরল ভক্তির সাধনা। তাঁহার উপাসনা—সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জিত। তিনি জটিল দার্শনিক তর্কের অরণ্যে যাইয়া পথহারা হয়েন নাই; বিশ্বাসের প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিতত্ত্বপ্রহেলিকা নহে।

তিনি বলিতেছেন :—

না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারই দেবতা,
তাই আমি হৃদে ধরি' হে;

তাই বলে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভরে' যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে।
('কল্যাণী'—৪৭ পৃঃ)

তাঁহার ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতাবলীর মধ্যে সাধনার একটা সূত্র পরিলক্ষিত হয়। সাধনার বিভিন্ন অবস্থা তাঁহার গীতাবলীতে কিরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।—

(১) প্রথমে, অতৃপ্তি। সংসারকে আমরা খুবই ভালবাসি, কিন্তু তথাপি সংসার লইয়া কেহই সন্তুষ্ট নহি। যতই সংসারের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, ততই এই অসন্তোষেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অতৃপ্তিই আত্মোন্নতির মূল। অতৃপ্তি আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী করে। এই অতৃপ্তির উদয়ে রজনীকান্ত গাহিয়াছেন—

এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার।
• •
হীন স্বার্থময় ধরা মিথ্যা ভরা
শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার। ('বাণী'—২ পৃঃ)

(২) অতৃপ্তি হইতে অনুশোচনা। অসার বিষয়-সুখে মগ্ন হইয়া জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে কাহার না মনে আক্ষেপের উদয় হয়?

যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ অবিশ্বাস ঘন মেঘে,
বহিল প্রবল পাপ-পবন ডুবাইল ঘোর অন্ধ তিমিরে।
('বাণী'—৩২ পৃঃ)

(মম) সুপ্ত হৃদয় করি নয়ন-নিমীলন
না করিব তব করুণা অনুশীলন,
মোহ ঘিরিল মোরে রহি চির ঘুম ঘোরে
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে, হায়। (ঐ—৩৩ পৃঃ)
যেমনটি তুমি দিয়াছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা;
(তুমি) দিয়াছিলে কত অমূল্য রতন—
(আমি) ফিরায়ে এনেছি ছাই, হে সখা।
('কল্যাণী'—৩১ পৃঃ)

(৩) তাহার পর, ব্যাকুলতা। প্রেমের কৃপালাভ করিবার জন্য প্রার্থনা—

ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
দেবতা গো দয়া করি' কর পরিত্রাণ। ('বাণী'—১৩পৃঃ)

* * * *

হৃদয়ে বহ্নি জ্বালা নয়নে অন্ধ তম
কোথা শান্তি নিদান, কর শান্তি বিধান ('বাণী'—১৪ পৃঃ)

(৪) সাধনার পরবর্ত্তী স্তর প্রেমানন্দ। ব্যাকুল প্রার্থনার দয়াময় কখনই বধির থাকিতে পারেন না। শুদ্ধচিত্তে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভক্তের হৃদয় সিক্ত হয়:—

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,—

* * * *

যেন তোমায় পুণ্যপরশ, করে' তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ বিবশ হইয়া থাকি:—
('বাণী'—২৮ পৃঃ)

(৫) এই অবস্থার পর, ভগবানের কৃপালাভ। প্রথমে, বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় ভক্ত-হৃদয়ে ভক্ত-বৎসলের ক্ষণিক বিকাশ—এই অবস্থা রবীন্দ্র বাবু একটি গানে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।"

রজনীকান্ত গাহিয়াছেন:—

কোন্ শুভ গ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে
চকিতে যেন গো, পাই দরশন।
সেই ক্ষুদ্র এক পল, কৃতার্থ, সকল,
রোমাঞ্চিত তনু, ঝরে দুনয়ন।

* * *

আঁখি মুদি,' আমার নিখিল উজল,
আঁখি মেলে,—আমার আঁধার সকল
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই
তুমি জান গো, সাধক-শরণ!
('বাণী'—৩০ পৃঃ)

(৬) ভগবৎ প্রেম প্রগাঢ় হইলে, অন্তরে বাহিরে সেই চিরসুন্দর, চির-স্বপ্রকাশ, চির মঙ্গলময়ের উপলব্ধি। ইহাই ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন। ভক্ত কবি এই অবস্থায় আসিয়া গাহিতেছেন:—

পূর্ণজ্যোতিঃ তুমি, ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি
চন্দ্রমা কহিছে, তুমি সুশীতল।
('কল্যাণী'—৩৭ পৃঃ)

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-সৃষ্ট নন্দনপ্রভাময়।
তুমি অমৃত-বারিধি হরি হে, তাই তোমারি ভুবন ভরি হে,—
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয়,
স্তরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা সুধা না রয়।
('কল্যাণী'—৫০ পৃঃ)

চন্দ্রালোকিত 'নিশীথে' তিনি গাহিতেছেন—

বিস্তৃত হৃদয়-কন্দরে,—হের পরম সুন্দরে
হৃতরে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা।
(ঐ—৫৪ পৃঃ)

(৭) সাধনের চরম অবস্থা আত্ম-সমর্পণ।—তখন আর কোন দুঃখ নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—

(আমি) দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত,
(তুমি) আমারে যা দাও, সবই তোমারি মত।
* * * * *
কিসে মোর ভাল হয়; তুমি জান, দয়াময়,
* * * * *
চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।
('বাণী'—২৩ পৃঃ)

তখন সর্ব্বস্ব ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া তন্ময়চিত্ত সাধক গাহিতেছেন—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি হৃদয়ে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহা রব।
(ঐ—২০ পৃঃ)

(৮) সাধনের শেষ ফল, ভগবানের সহিত মিলন। এই 'মিলনানন্দ' কেহ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই, উহা অনির্ব্বচনীয়। ভক্ত কবি গাহিতেছেন :—

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি,
তাত! জননী! সখে। হে গুরো। হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!
* * *
নিত্য! নিরাময়! হে প্রভো! হে প্রিয়!
সকল আঁখি মম অন্তরেন্দ্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!
('কল্যাণী'—৪৩ পৃঃ)

আমরা এ স্থলে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি—

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই যোড় কর করি
কর্ তাহা দরশন।—"

ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রজনীকান্তের কত দৃঢ় ছিল, তাহা আমরা তাঁহার রোগশয্যায় রচিত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। আসন্ন মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া তিনি 'অমৃত' নামক একখানি নীতিগর্ভ কবিতাপুস্তক এবং 'অভয়ঃ' ও 'আনন্দময়ী' নামক দুইখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। হাস্যরসিক কবি সত্য সত্যই রোগ ও মৃত্যুকে পরিহাস করিয়া আনন্দময়ীর অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাণান্তকর রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া বাগ্দেবীর এইরূপ একনিষ্ঠ উপাসনার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। যখন আরোগ্যের আশা অন্তর্হিত, বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত, তখনও রজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

আমার সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে দূর
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ দূর।
ঐগুলো সব মায়াবররূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকাকূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে, দয়াল, করেছ দীন আতুর।—
* * * *
('প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩১৭)

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ নয়ন কর অন্ধ,
চির যবনিকা পড়ে যাক্ হে, নিভে যাক্ রবি তারা চন্দ্র।
* * * *

তুমি, মূর্ত্তিমান্ হয়ে এস প্রাণে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ,
এসে দাও অভিনব চিত্ত—ভুঞ্জিতে সে বিশ্বানন্দ।
('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ)

একদিন রজনীকান্ত গাহিয়াছিলেন :—

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে।
* * *
করি ভবের সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না
কাহারো আকুল ক্রন্দনে!
('কল্যাণী'—১০ পৃঃ)

২৮শে ভাদ্র রজনীতে রজনীকান্তের বান্ধবগণ এই গানটি গাহিতে গাহিতে তাঁহার দেহ ভাগীরথী তীরে লইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রবাহ।

—:—

প্রণয়ের স্বপনের মত
হাসে আলো কিরীটে উষার ;
প্রকৃতির হৃদে শত শত
উঠে বেণু লহরী আবার।
বাড়ে বেলা—আলোক-লহরী,
শোভে বিশ্ব উজ্জ্বল কিরণে ;
মর্ম্ম-দ্বার যেন মুক্ত করি'
ভাসে ধরা প্রণয়-প্লাবনে।

মহিমায় বিশ্ব আলোকিয়া
গরিমায় হেসে চলে যায়,
আঁধারে দুয়ারে আসিয়া
চাহে আলো লইতে বিদায়।
ওই চিতা গোধূলীর গায় ;
শেষ আশা গেল যেন ছলি' ;
উষা—সন্ধ্যা কত আসে যায়—
নাহি ফিরে, যায় যাহা চলি'।

শ্রীবিজয়াকান্ত মজুমদার চৌধুরী।

মৃত্যু-মিলন।

—:•:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

প্রেমিকা।

দিবাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিম গগনে মেঘের ক্রীড়া,—যেন দিগঙ্গনার চঞ্চল অঞ্চল পবনে আন্দোলিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছে—নানাবর্ণের বিকাশ দেখাইতেছে। পাখীরা কলরব করিতে করিতে নীড়ে ফিরিতেছে। শক্ত সিংহের উদ্যানে রজনীগন্ধা ফুটব ফুটব করিতেছে, বেল-কলি ফুটিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিতেছে; আর উদ্যানের এক প্রান্তে—বৃক্ষ-মূলে সৈনিক যে প্রস্তরখানি গড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই শিলাখণ্ডের উপর সেই দুই জন যুবতী—শক্ত সিংহের কন্যা রেবা ও তাহার সহচরী ভদ্রা উপবিষ্টা। রেবার মুখে সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছান্ধকারের মত চিন্তার ভাব, সেই সরলহাস্যে সদাপ্রফুল্ল মুখে সে ভাব যেমন নূতন, তেমনই অশোভন; প্রস্ফুটিত কমলবনে শরতের রবিকরই শোভা পায়—অকালজলদোদয় নহে। আজ আর রেবার নয়নে সে কৌতুকদীপ্তি নাই—কণ্ঠে সে কলহাস্য আর তাটিনী-গীতের মত ধ্বনিত হইতেছে না।

ভদ্রা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সত্য বল, তুমি কি ভাবিতেছ?"

রেবা চেষ্টা করিয়া অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল, বলিল, "আমার ভাবনা! আমি ভাবিতেছি, কবে ভদ্রার বিবাহ হইবে।"

"সে জন্য তোমার অত চিন্তা কেন? কিন্তু মনের ভাব কথায় ফুটে—তুমি যে বিবাহের চিন্তায় বড় ব্যস্ত হইয়াছ! সে জন্য অত ভাবিও না। ঠাকুরাণী বলিতেছিলেন, নিহারুণের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির হইতেছে—"

সহসা রেবার রক্তাভ গণ্ড রক্তশূন্য—সন্ধ্যার আকাশের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ভদ্রা বুঝিতে পারিল, তাহাকে না ধরিলে রেবা পড়িয়া যাইত। ভদ্রা বিস্ময়াধিক্যে নিষ্পলনেত্রে রেবার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে রেবা লজ্জিতা হইল।

লজ্জায় তাহার পাণ্ডু গণ্ড আবার রক্তাক্ত হইয়া উঠিল—যেন নিদাঘ-দিগন্ত হইতে সহসা মেঘ সরিয়া গেল—দিনান্ত-শোভা আবার প্রকট হইল।

ভদ্রা বলিল, "তোমার কি হইয়াছে, আমাকে বল।"

রেবা তৎক্ষণে আত্মস্থা হইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, ভদ্রা তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল,—তাই তাহাকে ভুলাইবার জন্য সে প্রফুল্লতার ভাণ করিল, হাসিয়া বলিল, "আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।" রমণী সহজে মনোভাব গোপন করিতে পারে; প্রয়োজনসঞ্জাত অভ্যাস হইতে সে ক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু 'রতনে রতন চিনে'; রমণীর মনোভাব রমণীর নিকট গোপন থাকে না। ভদ্রা বলিল, "কথাটা সত্য। সত্য সত্যই তোমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সহসা আজ এ ইচ্ছা কেন?"

রেবা যেন কিছু বিপদে পড়িল। ভদ্রাকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে?

শেষে রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রা, কোন দিকে কেহ নাই ত?"

ভদ্রা বলিল, "কেন?"

"দেখ।"

ভদ্রা দেখিয়া বলিল, "না।"

তখন রেবা গীতের উপযোগ করিল। প্রথমে যেন প্রথমমলয়বিকম্পিত কুঞ্জ-কুটীরে প্রথম-বিকশিত মালতী-মুকুলে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া উঠিল:—

"আপনি উথলে নয়নের জল;
কে জানিত, প্রেম যাতনা-ভার?
আকুল হৃদয় সে নেছে লইয়া,
কেমনে তাহারে ফিরা'ব আর?"

ভদ্রা বলিল, "সে কে? তাহাই ত আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

রেবা সে কথার উত্তর দিল না। এবার তাহার কণ্ঠস্বর আরও সুস্পষ্ট—আরও মধুর—আরও দূরগামী—যেন বসন্তের প্রথম কোকিল পল্লবের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে গাহিয়া উঠিল:—

"পবনে তাহার কোমল পরশ;
তারকায় ফুটে নয়ন তা'র;
কুসুমে তাহার মৃদু মধু হাসি;
ভুবনে নাহিক সে বিনা আর।"

ভদ্রা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সখি, পুরুষের মধ্যে কে সেই ত্রিলোত্তমা—বিশ্বের সৌন্দর্য্যসার যাহাতে সন্নিবিষ্ট—যে তোমার হৃদয় হরণ করিয়াছে ?"

এবারও রেবা উত্তর দিল না। আবার গীতধ্বনি ধ্বনিত হইল। এবার স্বর-লহরী যেন পবনে হিল্লোলিত হইয়া গেল,—যেন পরিপূর্ণ বসন্তের বিকশিত শোভার কেন্দ্র হইতে পিকের উচ্ছ্বসিত স্বর ধ্বনিত হইল :—

"যদি একবার আসে সে আবার,
লুটায়ে পড়িব চরণে তা'র ;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিবে তা'র
অবিরল মোর নয়ন-ধার।"

স্বরলহরী গগনে মিলাইয়া গেল। রেবা মুহূর্ত্তের জন্য ঈষন্মুক্ত-ওষ্ঠাধরে বসিয়া রহিল, যেন গানের সঙ্গে তাহার মনের কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, সে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবে।

ভদ্রা তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সখি, সে কে ?"

রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ গান কাহার রচনা জান ?"

ভদ্রা বলিল, "জানি, এ গান প্রেমিক কবি অজয় সিংহের রচনা। তিনি নহিলে এমন গান আর কে রচনা করিতে পারে ?"

"অজয় সিংহ কে ?"

"তিনি রাজভ্রাতা। তিনি যেমন কবি—তেমনই বীর।"

"কবি কি বীর হয় ? অস্ত্রের ঝলকে কি কল্পনা-কুসুম বিকশিত হয় ?"

"ঠাকুর বলেন, কবি নহিলে বীর হয় না। কল্পনা নহিলে রণ-নিপুণতা জন্মে না ; রণ-কৌশল কল্পনা-সাপেক্ষ। শুনিয়াছি, অজয় সিংহ অসাধারণ বীর। তিনি অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ,—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত অস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন—আবার তাঁহারই মত অকৃতদার।"

"অকৃতদার !"

"তিনি নাকি বলেন, 'আমার সম্পদকে অনেক রমণী বিবাহ করিতে উৎসুক হইবে, কিন্তু সে ত আমাকে নহে। যদি কখনও বুঝিতে পারি, কোন রমণী আমাকেই বিবাহ করিতে সমুৎসুক, তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব ; নতুবা নহে।' রাজা তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ; তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই।"

"একথা প্রেমিক কবির উপযুক্তই বটে।"

ভদ্রা কিন্তু এ সকল কথায় মূল প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয় নাই। সে বলিল, "রাজার বা রাজ-ভ্রাতার সংবাদে আমাদের কায কি? তাঁহাদের সব সাজে। তুমি বল, তোমার কি হইয়াছে।"

রেবা হাসিল—ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া মুক্তাফলতুল্য দশন দেখা দিল। সে বলিল, "আমার আবার কি হইবে?"

ভদ্রা বলিল, "তুমি আমার কাছে মনের কথা গোপন করিতেছ। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত অভিমানে ভদ্রার নয়নদ্বয় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

রেবা এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না; সযত্নে অঞ্চলে ভদ্রার নয়ন মুছিয়া দিল; বলিল, "তোমার নিকট কি আমি কোন কথা গোপন করিতে পারি?"

"যে দিন সেই সৈনিক যুবক এই প্রস্তরখানি সরাইয়া দিয়াছিল—সেই দিন হইতে আমি তোমার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছি কেন?"

"সে দিন আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে; আমি বুঝিয়াছি, রাজপুতের বাহু আজও বলহীন হয় নাই।"

"অশুভক্ষণে সে সৈনিক তোমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে,—তোমার প্রফুল্লমুখে বিষাদের ছায়া আনিয়াছে—সোণার কমল মলিন করিয়াছে।"

"অশুভক্ষণে, না শুভক্ষণে?"

"অশুভক্ষণে।"

"না।"

রেবা এমন দৃঢ়স্বরে এই "না" বলিল যে, ভদ্রা বিস্মিতা হইল।

ভদ্রা বলিল, "তবে তুমি তাহাকে ভালবাসিয়াছ?"

রেবা কোন উত্তর করিল না। তাহার মস্তক ভদ্রার স্কন্ধচ্যুত হইল। এত দিন যে কথা প্রকাশ পায় নাই—মনেই বদ্ধ ছিল, আজ তাহা ব্যথার ব্যথী সখীর কথায় প্রকাশের সুযোগ পাইল। তাই রেবা কাঁদিতে লাগিল।

ভদ্রা বহুক্ষণ কিছু বলিল না; বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এদিকে সূর্য্যরশ্মি মেঘে মিলাইবার উপক্রম হইল।

তখন ভদ্রা বলিল, "তুমি ভাবিও না। আমি ঠাকুরাণীকে এ কথা জানাইব। যদি অসম্ভব না হয়, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কেহই বিলম্ব করিবেন না।"

সহসা রেবা মুখ তুলিল,—তখনও তাহার গণ্ডে অশ্রুপাতচিহ্ন—নয়ন অশ্রু-সজল,—যেন রজনীতে ঝঞ্ঝাবাতের—বারিপাতের পর প্রভাতের তপনকিরণে প্রস্ফুটিত কুসুম মুখ তুলিয়া চাহিল।

ভদ্রা বলিল, "আমি আজই ঠাকুরাণীকে বলিব।"

রেবা উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন ধূলাবলুণ্ঠিতা ফণিনী সহসা ফণা তুলিল। ব্যথিতা প্রেমিকামূর্ত্তি ঘুচিয়া গেল;—দর্পদর্পিতা রাজপুতবালা সদর্পে বলিল, "না। কে সে সৈনিক? তাহার পরিচয় জানি না। অপরিচিত সৈনিকের জন্য আমি কি পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিব?"

ভদ্রা বিস্মিতা হইল, বলিল,"এ কথা অপ্রকাশ রাখিলে যদি ঠাকুর নিহারণের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করেন?"

রেবার চক্ষুর সম্মুখে সব অন্ধকার বোধ হইল; সে বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে বলিল, "রাজপুতবালা মরিতে ভয় করে না। তাহার ভয় কলঙ্কে।"

ভদ্রা নীরবে ভাবিতে লাগিল।

যখন দুই সখীতে এইরূপ কথা হইতেছিল—তখন তাহাদের উদ্দিষ্ট সৈনিক তাহাদের নিকটেই ছিলেন। তাহারা দুইজন যে স্থানে বসিয়াছিল—তাহার পশ্চাতে—অদূরে বৃক্ষিকূলে একটি তরুণ তমাল ছায়া ও অন্তরাল রচনা করিতেছিল। সৈনিক তাহারই পশ্চাতে ছিলেন। তিনি আরও দুই দিন এই পথে গিয়াছেন; এই স্থানে বিশ্রামের বাসনা নিবৃত্ত করিয়াছেন। কিন্তু পতঙ্গ কতক্ষণ বহ্নির আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে? আজ মৃগয়ার পর তিনি এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অশ্ব কিছু দূরে এক বৃক্ষে বদ্ধ ছিল।

সৈনিক যাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই রেবা যখন আসিল, তখন একবার তাঁহার মনে হইল, এমন করিয়া চোরের মত ভদ্রনারীকে লক্ষ্য করা অশোভন। কিন্তু মন আপনাকে আপনি বুঝাইল, এখন কেমন করিয়া ফিরিব? অপরিচিতারা দেখিলে কি মনে করিবেন? এখন এই স্থানে অবস্থান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তাই সৈনিক তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। রেবার কণ্ঠে পরিচিত সঙ্গীত শুনিয়া সৈনিকের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল,—বিবাহ-বিষয়ে অজয় সিংহের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—রেবার কথায় তাঁহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতেছিল। শেষে অবসর বুঝিয়া সৈনিক সখীদ্বয়ের অলক্ষিত অবস্থায় প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অদূরবর্ত্তী রাজপথে অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া সখীদ্বয় চাহিয়া দেখিলেন, সৈনিক যাইতেছেন!

অদ্রা ও রেবা বিস্মিত নয়নে এ উহার দিকে চাহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতিথি।

সৈনিক যুবক শক্ত সিংহের গৃহদ্বারে আসিয়া অশ্বকে স্থির করাইয়া অবতরণ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহের সম্মুখে অলিন্দে বসিয়া ছিলেন। গৃহদ্বারে সৈনিককে উপস্থিত দেখিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি নিকটে আসিলে সৈনিক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি এই পথে দূরে গিয়াছিলাম; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি; আজ রাত্রির জন্য এই গ্রামে আশ্রয় সন্ধান করিতেছি। আশ্রয়ের কোন স্থান পাইতে পারি কি?"

শক্ত সিংহ বলিলেন, "গৃহে অতিথি আসিলে আমরা তাহা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমার গৃহে যখন আসিয়াছ, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

সৈনিক কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শক্ত সিংহ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "অতিথির অশ্ব অশ্বশালায় লইয়া যাও।"

পুত্র সৈনিকের হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিল। শক্ত সিংহ অতিথিকে লইয়া গৃহে চলিলেন।

সন্ধ্যার পর শক্তসিংহ ও সৈনিক আসিয়া অলিন্দে উপবেশন করিলেন। শক্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্বশুর সে দিন বৈবাহিকের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অলিন্দে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সৈনিকের পরিচয় লইতে লাগিলেন। সৈনিক বলিলেন, তিনি শতসেনার নায়ক।

সৈনিকের পরিচয় লইবার পর শক্ত সিংহের বৈবাহিক শক্ত সিংহকে বলিলেন, "তোমার রাজার সৈনিকে প্রয়োজন কি? রাজ্যরক্ষা ও প্রজারক্ষা ব্যতীত সৈনিক পোষণের অন্য উদ্দেশ্য কেবল প্রজার রক্তশোষণ। তোমাদের রাজার সৈন্যপোষণে কেবল শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"

শুনিয়া সৈনিকের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অস্ত্যাসবশে অসির সন্ধান করিলেন।

শক্তসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

বৈবাহিক বলিলেন, "তোমাদের রাজা কেবল মুসলমানের বিলাস-ব্যসনের অনুকরণ করিতেছেন। তিনি রাজপুতকলঙ্ক,—প্রজারক্ষায় তাঁহার মনোযোগ নাই।

সৈনিকের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শক্ত সিংহ বলিলেন, "বৈবাহিক, তুমি পাঁচ বৎসর পরে আমার গৃহে পদধূলি দিতেছ। পাঁচ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

বৈবাহিক বলিলেন, "আমি কিছুই শুনি নাই,—কিছুই দেখিতেছি না।"

"তুমি যে বনে বাস কর, সে বনে বুঝি মানুষের বাস নাই ? থাকিলে তুমি অবশ্যই রাজার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাইতে।"

"সত্য সত্যই কি তোমাদের রাজা প্রজারক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন ?"

"তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই কার্য্যই করিতেছেন।"

এই কথা বলিয়া শক্ত সিংহ রাজার কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। চকে অগ্নি নির্ব্বাপণের কথা,—ব্যাধিতের গৃহে গমনের কথা,—নগরপালের শাস্তির কথা, শক্ত সিংহ সব বলিতে লাগিলেন। সে সব কথা শেষ করিয়া শক্ত সিংহ বলিলেন, "এখন আমাদের রাজার মত রাজগুণে বিভূষিত রাজা রাজপুতানার দুর্ল্লভ।"

তখন বৈবাহিক বলিলেন, "আমি এ সব কথা শুনিয়াছি ; সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য ওরূপ কহিতেছিলাম।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমাদের রাজার এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুতের গৃহ আজ শতছিদ্র ; তাহার এক ছিদ্র রুদ্ধ হইলেই বা কি হইবে ?"

শক্ত সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময় একজন চারণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শক্ত সিংহ তাহাকে সযত্নে বসাইলেন। তিনি চারণের গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। রাজপুতের গৌরবগাথা কোন্ রাজপুতের শ্রুতিসুখকর নহে ?

চারণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শক্ত সিংহ তাহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। চারণ গাহিতে লাগিল। রাজপুতের গৌরবের গান গাহিতে গাহিতে চারণ যেন তন্ময় হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে উচ্ছ্বসিত—বিষাদে বিচলিত—ভীতিতে বিকম্পিত—ক্রোধে উচ্ছলিত—ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সে গান শ্রোতাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিল ; তথায় যেন তাহার প্রতিধ্বনি হইতে

লাগিল। গাহিতে গাহিতে চারণের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গীত অবসানে চারণ যেন শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। গৃহে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সৈনিক চারণকে গীতের একটি পদের পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন।

চারণ কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সৈনিক বলিলেন, তিনি গানটি শিখিবেন।

শক্তসিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে একটিমাত্র পদের আবৃত্তি করিতে বলিতেছ কেন?"

সৈনিক বলিলেন, "আর সমস্ত পদ আমার শিক্ষা হইয়াছে।"

চারণ বিস্ময় প্রকাশ করিল।

তখন সৈনিক গানের আর সমস্ত পদের আবৃত্তি করিলেন।

শক্তসিংহের বৈবাহিক বলিলেন, "তুমি কি শ্রুতিধর?"

সৈনিক বলিলেন, "আমি গান ভালবাসি। গান সহজেই আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া যায়।"

শক্ত সিংহ বলিলেন, "যখন গীতে তোমার এমন আসক্তি, তখন তুমি গাহিতে পার। আমাদিগকে একটি গান শুনাও।"

সৈনিক বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার কণ্ঠ কর্কশ,—আমার গান আপনাদের শ্রবণযোগ্য নহে।"

কিন্তু চারণ ও শক্ত সিংহের বৈবাহিক উভয়েই সৈনিককে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। শেষে শক্ত সিংহও সেই অনুরোধে যোগ দিলেন।

তখন সৈনিক অনন্যোপায় হইয়া গাহিতে স্বীকৃত হইলেন।

সৈনিক একটি বাদ্যযন্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। "কক্ষমধ্যে একটি বীণা আছে; আনিয়া দিতেছি" বলিয়া শক্ত সিংহ উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। সৈনিক ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং তাহা আনিতে গমন করিলেন।

সৈনিক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেই কে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। সৈনিক তাহার বসনাগ্রমাত্র দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে বসনাগ্রও যে তাঁহার পরিচিত! তিনি বুঝিলেন, রেবা সেই কক্ষে ছিল।

সৈনিক বীণা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অল্পক্ষণমধ্যেই বীণায় সুর বাঁধিয়া লইলেন, তাহার পর ঝঙ্কার দিয়া গান আরম্ভ করিলেন।

সে সঙ্গীত যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইতে লাগিল,—সে যেন সৈনিকের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রবাহিত স্বরলহরী :—

কুসুম-কাননে হেরেছিনু তা'রে,
কুসুমের মাঝে কুসুমরাণী ;
নয়ন-আলোকে বিজলী ঝলকে,
ভ্রমরগুঞ্জন অমিয়-বাণী।
সে অবধি মোর মরু এ জীবনে
সুখের নিঝরে অমৃত ঝরে ;
পোহায় আঁধার অমানিশা ঘোর
তরুণ-অরুণ-মধুর-করে।
সঁপেছি হৃদয় চরণে তাহার,
দেখিবে কি তা'র নলিন আঁখি,
করুণা-কোমল সুখ-সিঞ্চিত
প্রেমের অকূল পুলক মাখি' ?

যুবক নীরব হইলেন। সুমধুর স্বরলহরী যেন ধীরে ধীরে গৃহসংলগ্ন কুসুম-কাননে মিলাইয়া গেল। যুবক গীতবিদ্যাবিশারদ বটে।

শক্ত সিংহ বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, তোমার কণ্ঠ কর্কশ !"

শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গান কাহার রচনা ?"

সৈনিক উত্তর করিলেন, "রাজভ্রাতা অজয়সিংহের।"

শক্ত সিংহের বৈবাহিক শক্ত সিংহকে বলিলেন, "বৈবাহিক, তুমি বলিতেছিলে, এখন তোমাদের রাজার মত রাজগুণে বিভূষিত রাজা রাজপুতানায় দুর্লভ। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহার দুষ্ট আদর্শের প্রভাব আজও দূর হয় নাই।"

শক্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"রাজভ্রাতা কোমল মধুর প্রেমগীত রচনা করিতেছেন, আর সৈনিক যুদ্ধ না করিয়া সেই গীত গাহিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া সৈনিকের নয়নে যেন রোষদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। প্রেমিক কবি অপমানিত সৈনিকরূপে দেখা দিল। তিনি আবার বীণা তুলিয়া লইলেন—তারে ঝঙ্কার দিলেন। এবার আর সুর করুণ—কোমল—মধুর নহে ; এবার সুর গভীর—গম্ভীর—উদাত্ত, যেন বীণার অপমানিত হৃদয় প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত হইয়াছে।

তাহার পর সৈনিকের কণ্ঠ বীণার সুরে সুর মিশাইল। সৈনিক গাহিতে লাগিলেন :—

কে চাহ জীবন ? এস মোর সাথে ;
তূণীরে সাজাও বাণ।
বাঁচিয়া কে চাহে মরিয়া থাকিতে ?
লহ অসি খরশান।
অপমান-নত ও শির তোমার
গর্ব্বে দাঁড়াও তুলি' ;
শত্রুশোণিতে প্রক্ষালি' ফেল
লুণ্ঠিত-লাজ-ধূলি।
স্মর, হৃত তব পূর্ব্বগৌরব,
স্মর, বীর বীরাঙ্গনা।
ভীরু, তব দেহে বহে না কি আর
তাঁ'দের রুধির-কণা ?
গৌরব-তরে কে ডরে সমরে,
ঢালিতে শোণিতধার ?
ভীরুজন মরে শত শত বার,
বীর মরে একবার।

সে গীত যেন গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ সকলে নীরব—মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন।

তাহার পর শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গীত কাহার রচনা ?"

সৈনিক বলিলেন, "রাজভ্রাতা অজয়সিংহের। প্রেম কেবল কুসুমকাননে কিশলয়শয়নে সুখসহচর নহে। প্রেম বীরের হৃদয়ে শক্তি—বাহুতে বল।"

সমালোচনা।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা। *

ভূমিকার সমালোচনায় সাধারণতঃ বিশেষ লাভ হয় না। কারণ, সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনীতে অনেকে আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় দিয়া উঠিতে পারেন না, দিলেও তাহা বিষয়ের তুলনায় নীরস ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। কাযেই তাহার সমালোচনা ফলোপধায়িনী হয় না। আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সে ধরণের ভূমিকা নহে। ইহা একটি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বাভাস বা অবতরণিকা। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ও উদ্যমের সহিত বঙ্গীয় পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। এই ভূমিকায় তিনি একখানি বিস্তৃত শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায়, শিক্ষা-বিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমনৈতিক দর্শনে, কোমৎ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীবিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা'-প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন,তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন;—জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধি লাভ করা যায় কি না,সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকা-লেখক হীরেন্দ্রবাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের' গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃষক সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে আগ্রহদৃষ্টিতে ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে ভাবে যে, সে সমস্ত ক্ষেত্রটাই এক দিনমানে কর্ষণ করিয়া ফেলিবে; কিন্তু প্রখর মধ্যাহ্নের উত্তাপে তাহার ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু কর্ষিত ভূমি আর্দ্র করিয়া জানাইয়া দেয় যে, তাহার আশার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র পূর্ণ করিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে; তথাপি দিনশেষে কর্ত্তব্য-সাধনের তৃপ্তি তাহার শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হৃদয়কে শান্তির সুধায় নিষিক্ত করে। এ ক্ষেত্রে যদি এই বিপুল অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নবীন উৎসাহদৃপ্ত লেখকের ভাগ্যে নাও ঘটে, তাহা হইলেও যে এ উদ্যম পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

---

* শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার, এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সংসারে মানুষ এক বিচিত্র জীব। সে যে প্রকাণ্ড জাতির একটি উপবিভাগ মাত্র তাহার অন্যান্য অংশের সহিত জড়িত থাকিয়াও সে বিচ্ছিন্ন। জন্তুবিভাগের নিম্নস্তরে মানবের যে সকল জ্ঞাতি আছে, তাহাদের সহিত মানবের সাদৃশ্য থাকিয়াও যেন নাই। আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য জন্তুবিভাগের অন্তর্গত হইলেও, তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও স্মৃতি, বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি তাহাকে জীবজগতের বহু উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে মানব দেবত্বের অভিলাষী। যে চিৎশক্তি ঈশ্বরে আরোপিত করিয়া মানুষ তৃপ্তি অনুভব করে, তাহারই কণা মনুষ্যহৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়া মানবকে সাধারণ জীবজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মস্তকোপরি আকাশ বা স্বর্গ। পৃথিবীর জীব—মানুষ, স্বর্গের আভাসোদ্দীপ্ত মানুষ—নরদেবতা। এই পশুত্ব ও দেবত্ব-সম্পন্ন মানবের মানবত্ব এক বিস্ময়ের বস্তু। দেবত্বের দ্বারা পশুত্বের বিজয়-চেষ্টাই মানব-সভ্যতার নিগূঢ় ইতিহাস। মানবীয় মনোবিকাশের ইতিহাস উন্নতির কি অবনতির দিকে চলিয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে যে, বহুযুগব্যাপী সাধনায় মানুষ পশুত্বকে দেবত্বের দ্বারা সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না; প্রকৃতিগত পশুধর্ম্মকে মানুষ উচ্চ প্রবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছে কি না। মানবজীবনের অন্ধকারে যাহা আলোকরশ্মিপাত করিয়া সৌন্দর্য্যে ও গৌরবে উদ্ভাসিত করে, যাহা স্পর্শমণির ন্যায় মানবের নীচ ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করে, তাহাই শিক্ষা।* উন্নতিকাম, সভ্যতাদৃপ্ত, জ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে শিক্ষার ন্যায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একমাত্র অতীত সভ্যতার গৌরবে অভিমানী মুক্তি-প্রয়াণের পথিক ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষা-বিজ্ঞানের লেখক একটি অতি সময়োপযোগী, সমীচীন ও গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

মানব শিক্ষার দ্বারা তাহার মানবতার পূর্ণত্ব সম্পাদন করিয়া লয়। এই পূর্ণত্ব কল্পনার বস্তু, সাধনার বস্তু, আরাধনার বস্তু। এই পূর্ণত্বের আদর্শ সম্মুখে না রাখিতে পারিলে, শিক্ষা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায়, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর জন্য এই সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষা দুরাশামাত্র মনে

* "The purpose of Education is to give to the body and to the soul all the beauty and all the perfection of which they are capable." Plato. "Education is the harmonious and equable evolution of the human faculties"—Stein.

হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া আদর্শকে সঙ্কীর্ণ ও খর্ব্ব করিলে মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্যগঠনের আশা সুদূরপরাহতা হইবে। আদর্শকে পরিম্লান করা কর্ত্তব্য নহে। এই স্থানেই Realism অপেক্ষা Idealismএর প্রয়োজন অধিকতর বলিয়া বোধ হয়।

মানুষ সমস্ত সৃষ্টির সারভূত। পৃথিবী তাহার যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া মানব-প্রয়োজনে অর্ঘ্যদান করিতেছে। সামান্য কীটাণু হইতে পরিভ্রাম্যমাণ গ্রহ-উপগ্রহ পর্য্যন্ত, কঙ্কর হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই মানবের জ্ঞানের অঙ্গীভূত। ইহারা কোন না কোন প্রকারে মানব-মনের সংসর্গে আসিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর, এবং তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে বিশালতর করিয়া দিতেছে। সুতরাং মানবমনের পূর্ণবিকাশ দেখিতে হইলে, প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে। শিক্ষাকে যদি মানবত্ববিকাশের উপায়ভূত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত প্রকৃতি— চেতন এবং জড়—কি প্রকারে সেই মনোবিকাশে সহায়তা করে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং প্রকৃতির কোন্ অংশ ঠিক কোন্ স্থানে এবং কি ভাবে মনের অভিব্যক্তিতে সহায়তা করে, তাহা সবিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে মানবের স্থান কোথায়, জড়জগৎ কি ভাবে মানবমনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং মানব-চরিত্রকে প্রভাবিত ও সঙ্কুচিত করে, সমাজ তাহার বন্ধনে এবং বিধিবিধান প্রভাব বিস্তার করিয়া কিরূপে মানস-প্রণালী ও চরিত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া দেয়, ইহা শিক্ষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। শিক্ষা-তত্ত্বের এইরূপ বিশালতা যে কেবল কল্পনাপ্রসূত, এ কথা আজকাল আর বলা যায় না। কেন না পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, মনস্তত্ত্ব, চরিত্রনীতি প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিক্ষাকে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ মানবমনের পূর্ণবিকাশ বিধান করিতে হইলে এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। সাহিত্য ও কাব্য জীবনের কতখানি স্থান অধিকার করে, সমাজের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, অতীতের ইতিহাস চরিত্রগঠনের পক্ষে এবং মনোবৃত্তি-স্ফুরণের পক্ষে কতখানি সহায়তা করে, ধর্ম্মের প্রভাব কি ভাবে সঞ্চারিত হইয়া আত্মাকে উন্নত হইতে উন্নততর মার্গে লইয়া যায়, এই সকল তত্ত্ব প্রকৃত শিক্ষার অঙ্গীভূত। এ গুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কোন ব্যক্তিবিশেষের, বা ব্যক্তিসঙ্ঘবিশেষের খেয়ালের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনে শিক্ষার অবিঘ্ন পরিসমাপ্তির আশা করা

যাইতে পারে না। পণ্ডিতপ্রবর Bunsen এ স্থানে শারীরতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—If man is the apex of the creation it seems to be right on the one side, that an historical inquiry into his origin and development should never be allowed to sever itself from the general body of natural science, and in particular from physiology. But on the other hand, if man is the apex of the creation, if man is the end to which all organic formations tend from the very beginning, if man is at once the mystery and the key of natural science ; if that is the only view of natural science worthy of our age, then ethnological philology is the highest branch of that science for the advancement of which this Association (the British Association at Oxford) is instituted." * ভাষাতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে এস্থানে যাহা বলা হইয়াছে, অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। মনুষ্য যদি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণাম হয়, তবে সমস্ত সৃষ্টির বিজ্ঞানই, ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে, মনুষ্য-বিজ্ঞান। "The science of man therefore or as it is sometimes called, Anthropology, must form the crown of all the natural sciences" † এই স্থানেই শেষ নহে। সমস্ত জড় বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান-আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এমন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে ; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি।

* Maxmuller's Science of Language vol II. p. 8.

† Do Do Do p. 7.

এই বিরাট আয়োজনের সূচনায় আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমাদের একমাত্র আশঙ্কা যে লেখক অন্ত পথে গিয়া পাছে আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত করেন। এই আড়ম্বরপূর্ণ পূর্ব্বাভাসের পরে আমরা যদি দেখিতে পাই যে, তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানের নামে পাটীগণিতের একখানি জীর্ণ সংস্করণ বাহির করিতেছেন, অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের একখানি নিতান্ত সাধারণ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই দুঃখিত হইব। এমন সুন্দর ভিত্তির উপরে যদি একটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিছু নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে আর নৈরাশ্যের অবধি থাকে না। সে জন্য আমরা লেখক মহাশয়কে প্রথম হইতে সাবধান হইতে বলিতেছি।

বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাহা হইলেও লেখক যেরূপ ভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম—শিক্ষা-পদ্ধতি; দ্বিতীয়—শিক্ষা-তত্ত্ব। প্রথম বিভাগ ঐতিহাসিক প্রণালীতে স্থির করিতে হইবে। "প্রথম বিভাগে দেশ কাল ও অবস্থানুসারে মানবসমাজের আদর্শের বিভিন্নতানুযায়ী যত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির বিবরণ থাকিবে।" "মানব সভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, বিচিত্র আদর্শের বিকাশ, মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও লক্ষণ আলোচিত হইবে। মিসর, গ্রীস, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ, বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত মধ্য যুগের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ এবং বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যে আদর্শ, যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই শিক্ষার ইতিহাসে সেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজপ্রকৃতি ও আদর্শ সমূহের চিত্র প্রদান করা হইবে।" (শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা—৮ পৃঃ)

"দ্বিতীয় বিভাগে দার্শনিক প্রণালীতে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শিক্ষা কাহাকে বলে, মানব চরিত্রের উপর শিক্ষার কিরূপ প্রভাব, মানব সমাজের কোন এক আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি আছে কি না, শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং অবস্থাভেদে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন বিধেয়, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শিক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। ঐতিহাসিক প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা বৈচিত্র্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে।" আলোচ্য গ্রন্থ হইতে যে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছি,

তাহা হইতেই 'শিক্ষাবিজ্ঞানের' বিস্তৃত পরিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পারে। এই বিশালতার কথা মনে হইলে, লেখক মহাশয়কে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এ ভূমিকাটি না ছাপিলেই ভাল করিতেন। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে যে "পায়সের আস্বাদ ভক্ষণে।" আমরা তাঁহার সঙ্কল্পের সহিত পরিচয় লাভ করা অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যের সহিত পরিচয় লাভ করিতেই বেশী উৎসুক ছিলাম। তাঁহার সঙ্কল্পের পরিচয় পাইয়া কেবল আতঙ্ক হইতেছে, পাছে তিনি এ সঙ্কল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, ভূমিকা আগে না ছাপিলেই ভাল হইত।

তবে গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একজন উৎসাহী, কর্ম্মনিষ্ঠ শিক্ষক। অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার ও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শিক্ষা-ব্রতের "সন্ন্যাসী"কল্প প্রচারক। আমাদের কামনা, তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া এই বিস্তৃত সমালোচনার উপসংহার করিব। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা'র ভাষা যেন ইংরেজী পদসংস্থান-রীতির ভারে প্রপীড়িত। "এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানব বিষয়সমূহে জ্ঞান সম্পূর্ণতা ও প্রণালী-বদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইয়া 'বিজ্ঞান' পদবাচ্য হয়।" "সুতরাং জীবন্ত ও ধারা-বাহিক রূপে চলন্ত এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও বিভিন্নতাবিশিষ্ট মানব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে" ইত্যাদি পড়িলে ইংরেজির অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। "বহমান স্রোতস্বতী" অমার্জ্জনীয়। "এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য ইতিহাসেরও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না।" "History repeats itself" এই কথাটিই প্রবাদের মত চলিয়া আসিতেছে। যদি সেই প্রবাদটির অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে কথা অন্য ভাবে বলা উচিত ছিল। যে ভাবে তিনি কথাটি বলিয়াছেন, তাহাতে যেন মনে হয়, যে ঐটিই প্রবাদ।

যাহা হউক এ সকল সামান্য ত্রুটি; গ্রন্থকার ভবিষ্যতে একটু সতর্ক হইয়া লিখিবেন, এই জন্যই এ অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

সংগ্রহ।

—:০:—

সাহিত্য।

—:০:—

বার্ণস।

—:০:—

বার্ণস স্কটলণ্ডের জাতীয় কবি; তাঁহার কবিতা স্কটলণ্ডবাসীর হৃদয় যেরূপ স্পর্শ করিয়াছে, তেমন আর কাহারও কবিতা করে নাই। আবার জগতের ইতিহাসেও বার্ণসের সমাদরের তুলনা বিরল। বার্ণস কৃষক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন দারিদ্র্যের সহিত—প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে অতিবাহিত। তাঁহার অনেক কবিতা শস্যক্ষেত্রে কায়িকশ্রমের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে বিরচিত। অথচ তিনি একটি জাতির জাতীয় কবি।

বার্ণসের সমাদরের কারণ টেন বুঝাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের মানসক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ও চাঞ্চল্য সপ্রকাশ হয়। ভাষার লালিত্যহেতু সাহিত্যের মতামত ও বিজ্ঞানের অবিকারকথা সহজবোধ্য হইয়াছিল। অন্তর্গতবহির্য রাজতন্ত্রে ও সংস্কৃত শাসনপ্রণালীতে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নদিগের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। শতাব্দীর শেষভাগে প্রজাতন্ত্রের বিষাণ বাজিয়া উঠে। তখন বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে ইংলণ্ডে পল্লীর উচ্ছেদ ও নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। সাধারণ লোক আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, সমাজের উচ্চতরস্থদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ফ্রান্সে ব্যবসায়ের ও আর্ম্মাণীতে মতের বিপ্লবতূর্য্য ধ্বনিত হয়। এক দিকে প্রজাসাধারণের ক্ষমতাভিলাষ অপর দিকে দার্শনিক মতের প্রচার—এই দুই স্রোতের যুক্ত বেগে য়ুরোপের সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্স ও আর্ম্মাণী হইতে দুই প্রবাহ রক্ষণশীল ইংলণ্ডের সমাজে প্রবেশ করিতেছিল। এই নব ভাব সর্ব্বপ্রথম বার্ণসের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং, তাঁহার সমাদর অবশ্যম্ভাবী।

সমাদর।

সংপ্রতি লর্ড রোজবেরী বার্ণসের সম্বন্ধে একটি সাতিশয় দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। লর্ড রোজবেরী বার্ণসের পরম ভক্ত। তিনি এই বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি।

লর্ড রোজবেরী বলেন, কবি ব্ল্যাকলকের নিকট স্কটলণ্ডের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হইবার নহে। তিনি বার্ণসের কবিতায় প্রশংসা করিয়া পত্র না লিখিলে বার্ণস জামেকায় যাইতেন। তথায় দাসত্বের হীনতার মধ্যে তাঁহার কবিতার সর্ব্বনাশ ঘটিত। হয়ত সেই দেশের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইত না। যদিও তাঁহার

দারিদ্র্য।

জীবনান্ত না হইত—তাঁহার প্রতিভার প্রাগান্ত যে হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যদি বার্ণস সেই প্রবাসে অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কবিতার উৎস শুষ্ক হইয়া যাইত। দারিদ্র্য প্রতিভাকে প্রদীপ্ত করে, অর্থ তাহার জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত করে। জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে ধনীর লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকের একান্ত অভাব। সকল উৎকৃষ্ট রচনাই দারিদ্র্যের তাপে বিকশিত। এই দারিদ্র্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, তুষারপাতে শীতল হিম ঋতুতে জীর্ণ কুটীরে বার্ণসের জন্ম, তাঁহার জন্মের কয় দিন পরে কুটীরের এক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়াতে প্রসূতি প্রসূতকে লইয়া বটিকার মধ্যে প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। গৃহে শ্রমের অন্ত ছিল না, কিন্তু পর্য্যাপ্ত আহার্য্য মিলিত না। ফলে বার্ণস শিরঃপীড়াগ্রস্ত হয়েন, উত্তরকালে ইহা হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট হইত। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া তিনি বিদেশে যাইতেছিলেন। অপর্য্যাপ্ত আহার—অত্যধিক পরিশ্রম—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই তিন বহ্নির তাপে বার্ণসের দেহে অকালজরার চিহ্ন সপ্রকাশ হয়।

কবি-প্রতিভা।

প্রকৃত কবি-প্রতিভার প্রাচুর্য্য বার্ণসকে অমর করিয়াছে। এই প্রতিভার প্রাচুর্য্যের প্রমাণ এই যে, কৃষক কবির যে কবিতা অনেকের মতে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, সে কবিতা লিখিয়া তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অসাধারণ সম্পদ না থাকিলে কেহ এমন করিতে পারে না।

পবিত্রতা।

বার্ণসের নৈতিক পদস্খলন যে হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু তিনি সে কথা গোপন করিতেন না, পরন্তু প্রকাশ করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতার বিষয় বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ পুণ্যচরিত্র ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল, তাহাতে করুণার সুধাধারা সদা-প্রবাহিত ছিল। একবার একখানি চিত্রে মৃত সৈনিকের পার্শ্বে তাহার পত্নী, পুত্র, ও কুক্কুরের প্রতিকৃতি দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সয়তানের জন্যও তাঁহার দুঃখ।

প্রেম।

বার্ণসের প্রগাঢ় প্রেম অনেকে বুঝিতে পারেন না। বার্ণস কল্পনার আলোকে রমণী-দিগকে দেখিতেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাই তিনি বহু রমণীকে ভালবাসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কল্পনায় রমণীমাত্রকেই প্রেমাস্পদ মনে করিতেন। তাই তাঁহার প্রেমের কবিতা মাধুর্য্যে মনোহর। তাঁহার মতে, প্রেমই জীবনের উদ্দেশ্য। তাই তিনি যে সমিতি সংস্থাপিত করেন, তাহার সভ্য-মাত্রকেই বলিতে হইত যে, তিনি এক বা একাধিক রমণীর প্রেমার্থী। তাঁহার প্রেমসঙ্গীত মাধুর্য্যে মনোহর, কোমলতায় কমনীয়, অশ্রুতে অভিষিক্ত, উচ্ছ্বাসে উদ্ভাবিত।

নির্ভীকতা।

বার্ণস অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। তিনি যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন প্রচলিত ধর্ম্মাচারে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সে সকলের উপর তীব্র

বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ভণ্ডামির ও অন্তঃসারশূন্য আচারের বিরোধী ছিলেন। মনুষ্যত্বই তাঁহার নিকট সমাদরযোগ্য, আভিজাত্য বা উপাধি ধূলির ন্যায় তুচ্ছ। বেশভূষায় মানুষকে বড় করিতে পারে না। তিনি বলিতেন, উপাধি বেশভূষারই মত। তিনি ইংলণ্ডে জনসাধারণের ক্ষমতার প্রচারক। তিনি যে ভাবের অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে ভাব তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু বার্ণস যখন সেই ভাব স্বীয় কবিতায় ব্যক্তকরিয়াছিলেন তখন তাহা বিপন্ন ও নিষ্পিষ্ট, দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত—জনসাধারণের হৃদয়ে আশার আলোক প্রদীপ্ত করিয়াছিল! সমাজের উচ্চস্তরে—বিলাসবিলাসী ধনবান্‌দিগের নিকট সে ভাব তখন সমাদৃত হওয়া দূরে থাকুক্—ঘৃণিত ছিল।

এ সকল কবিতার কথা—এই নবভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও বার্ণসের কবিতার অমরতার অক্ষয় ভাণ্ডার বিদ্যমান। প্রেমের কবিতাই তাঁহাকে অমর করিতে সক্ষম—যথেষ্ট, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল প্রেমগীতির রচনা করিয়াছিলেন, আজও স্কটলণ্ডের কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ পার্ব্বত্য পথে বা উষর পর্ব্বতে কৃষকের কণ্ঠে সেই সকল প্রেমগীত নিত্য গীত হয়। লর্ড রোজবেরি বলিয়াছেন, বার্ণস যে মৃত, এ কথা তিনি মনেই করিতে পারেন না। তাঁহার মনে হয়, বার্ণস জীবিত। স্বজাতির হৃদয়ে বার্ণস যেরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। স্কটলণ্ডের শিরায় আজও বার্ণসের শোণিত প্রবাহিত। সমগ্র দেশে তাঁহার প্রভাব। সে প্রভাব স্কটলণ্ড হইতে ক্রমে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সত্যই প্রকৃত কবি-প্রতিভার অধীশ্বরগণ কোন বিশেষ দেশের—কোন বিশেষ জাতির বা কোন বিশেষ কালের নহেন। তাঁহারা পৃথিবীর। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সমগ্র মানবজাতির উপভোগের সামগ্রী। সে কীর্ত্তি কালজয়ী। তাই স্কটলণ্ডের জাতীয় কবি আজ সমস্ত জগতে সমাদৃত।

অমরতা।

শিল্প।

শিল্প-বিদ্যালয়।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে উন্নত শিল্প শিক্ষা দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থানে শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রদান-প্রণালী সন্তোষজনক, এ কথা বলা যায় না। কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিলে ফল সন্তোষজনক হয়, সে বিষয় লইয়া অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আলোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডব্লিউ এস্. হাডাওয়ে ভারতীয় আর্ট স্কুলের শিক্ষাপ্রদান-সম্পর্কিত ব্যাপারের আলোচনা করিয়া 'ইণ্ডিয়ান

রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রে একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। লাহোরের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ কন্‌ফারেন্স বা শিল্প-সমিতিতে পাঠ করিবার জন্য এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধটির মর্ম্মাভাস প্রদান করিলাম।

ভারতের সুবিধা।

শিল্প-বিদ্যালয়সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে ভারত অন্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যশালী। প্রথমতঃ ভারতে শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক নহে; সুতরাং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রতিভাসম্পন্ন ও মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করা সহজসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়সমূহ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইতে পারেন, তৃতীয়তঃ অন্য দেশে যে প্রকার 'হাতে কলমে' শিক্ষা-প্রদান অসম্ভব, ভারতে সে প্রকার শিক্ষাপ্রদানে পূর্ণমাত্রায় সাফল্যলাভ করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়।

অতঃপর হাডাওয়ে মহাশয় অন্যান্য দেশের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্যের তুলনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রতীচ্য দেশে তিন প্রকারের শিল্প-শিক্ষাগার আছে। প্রথম চিত্রবিদ্যালয়; ঐ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, অঙ্কনবিদ্যা (drawing) ও বর্ত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে আদর্শ-গঠন-শিক্ষা প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয়, আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ স্কুল বা শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়; এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রায় সকল প্রকার শিল্পবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কাষ্ঠ ক্ষোদাই, ধাতুশিল্প, বুটাদারের কায, কলাই, নক্সা প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হয়। তৃতীয়, সান্ধ্য বিদ্যালয়; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যা-লয়ে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেযোক্ত বিদ্যালয়ে অল্পবিস্তর তাহা প্রায় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

চিত্রবিদ্যালয়ের শিক্ষা।

প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ নিজে বেঁধিয়া ও অপর ছাত্রগণের অঙ্কন ও চিত্রের সহিত আপনাদের অঙ্কনের ও চিত্রের তুলনা করিয়া যাহা পায়ে, তাহাই শিক্ষা করে। শিক্ষকগণ ছাত্রগণের অঙ্কনের দোষ প্রদর্শন করেন না, কি উপায়ে সেই দোষের পরিহার করা যাইতে পারে, তাহাও ছাত্রদিগকে প্রায় বলিয়া বা বুঝাইয়া দেন না। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ শিল্পী; তাঁহারা সপ্তাহে দুই দিন এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা করিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের প্রকোষ্ঠে আসিয়া থাকেন। ঐ সময় তাঁহারা ছাত্রদিগের চিত্রের ও অঙ্কনের সমালোচনামাত্র করিয়া থাকেন। যে সকল ছাত্র অসাধারণ চিত্র-কৌশল প্রদর্শন করে, শিক্ষকগণ তাহাদিগের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকেন। অল্পে অল্পে যাহাদের শিল্প-কৌশল বিকাশপ্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র চেষ্টায় ও পরিশ্রমের দ্বারা যাহারা শিল্প-কৌশল শিক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, শিক্ষকগণের প্রদত্ত উৎসাহের অভাবে তাহারা সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রত্যহ সাত আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চারি হইতে সাত বৎসরে শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করে। ছাত্রগণ সাধারণতঃ

চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও উপদেশই প্রাপ্ত হয় না। তাহারা কেবল রেখাঙ্কন ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে উপদেশ পায়। বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ছাত্রগণ গ্রীক ও রোমক প্রতিমূর্ত্তির অনুকরণ করিতে শিখে, তাহার পর জীবন্ত আদর্শ দেখিয়া রেখাঙ্কন ও চিত্রণ শিক্ষা করিয়া থাকে। ছুটীর সময় ছাত্রবর্গ প্রাকৃতিক পদার্থ অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিয়া থাকে। ছুটীর সময় ছাত্রগণ যে সমস্ত শিল্পকার্য্য করে, তাহার একটি প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে ছাত্রগণ ঐরূপ কার্য্যে উৎসাহ পায়। যে সকল ছাত্র এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, তাহারা জীবের প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারদর্শী হয়; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই সাপ্তাহিক পত্র, মাসিক পত্র প্রভৃতিতে ও পুস্তকের ছবি আঁকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই প্রকৃত আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষা-প্রদান-পদ্ধতিই এ অবস্থার প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে অনেক আবশ্যক বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ শিল্পিগণ উপযুক্ত সহকারীদিগের সাহায্যে ছাত্রদিগকে পুস্তক বাঁধাই, কাষ্ঠ কোদাই, মকাশী, সোণারূপার কায প্রভৃতি শিখাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অনেক লোক স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করে।

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি প্রথম দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মিশ্রণমাত্র। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তাহার প্রায় সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষানবীশদিগকে ভাল করিয়া তাহাদের কায শিখাইবার জন্য প্রধানতঃ এই সকল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অনেকে কলকারখানায় শিক্ষানবীশি করে। কিন্তু কলকারখানায় সকল কায সহজে শিক্ষা করা সম্ভবে না, সেইজন্য তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য এই শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। কারখানায় মজুরগণ একই প্রকার কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা যে কায করে, তাহা ভিন্ন অন্যপ্রকার কায করিবার ও শিখিবার অবকাশ তাহাদের প্রায় হয় না। সেই জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এই তিন প্রকার বিদ্যালয়েরই প্রয়োজন আছে।

প্রতীচ্য খণ্ডে শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেই নূতন নূতন শিল্পকার্য্য করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। শিক্ষকগণ সে বিষয়ে ছাত্রদিগকে বিশেষ সাহায্য করেন না। য়ুরোপীয় শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে যে যে বিষয়ের শিক্ষা প্রদান ও যে যে পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাপ্রদান আবশ্যক, ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে শিল্প-শিক্ষকগণের একটি সমিতি হইয়াছিল। সেই

সমিতিতে অনেকে অনেক সুন্দর সন্দর্ভ পাঠ করেন। তন্মধ্যে এক জন মণিকার (Jeweller) একটি অতি আবশ্যক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে প্রণালীতে কারখানার কার্য্য পরিচালিত হয়, ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। সে পদ্ধতিটি এইরূপ,—ছাত্রগণ এক জন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্পীর সহিত একত্র শিল্পকার্য্য করিবে। সেই অভিজ্ঞ শিল্পী কি ভাবে কার্য্য করেন, কি ভাবে সুন্দর ও অভিনব কারুকার্য্যের মতলব বাহির করেন, তাহারা তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিবে। শিল্পীও ছাত্রগণকে কারুকার্য্য বুঝাইয়া দিবেন। ছাত্রগণ এক দিনেই সেই সুদক্ষ শিল্পীর শিল্প-কৌশল শিখিতে সমর্থ হইবে না সত্য, কিন্তু যে উপায়ে সুদক্ষ শিল্পী ঐ কার্য্য করিতে পারেন, তাহারা ক্রমশঃ সেই উপায় জানিবে। কিরূপে স্বয়ং কারুকার্য্য করিতে হয়, তাহা অনেক সুদক্ষ শিল্পী জানেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের শিল্প সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি ও অন্যকে বুঝাইবার শক্তি না থাকিতে পারে, এরূপ স্থলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। পূর্ব্বে এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। এখনও ইহার প্রবর্ত্তনা করা আবশ্যক।

মিঃ হাডাওয়ে শিল্প-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইনি বলেন, শিল্প-বিদ্যালয়কে শিল্পের পরীক্ষাগারে পরিণত করা বিধেয় নহে। শিল্প-বিদ্যালয়ে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিততা বিশেষভাবে প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ একাদিক্রমে অধিকক্ষণ একবিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে পারে না,—সেই জন্য দুই ঘণ্টাকাল কায করিবার পর তাহাদিগকে কিছু ক্ষণ অবকাশ দেওয়া আবশ্যক। ইহা ভিন্ন ছাত্রগণকে রেখাঙ্কনে ও রেখাবিজ্ঞান বা জ্যামিতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

বিবিধ।

খাইবারে পাঠান।

ইংরাজাধিকৃত ভারতে খণ্ডরাজ্যের স্থানে বিশাল সাম্রাজ্য সংগঠনের ফলে ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসসহচর ঘূর্ণাবর্ত্তের অবসানে যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্নিগ্ধ ছায়া সাহিত্যের, শিল্পের ও বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এখন ভারতে :—

"শুভ্র গঙ্গা বহি যায়, রক্তবিন্দু নাহি তায়,
শ্যামল যমুনা নিরমল,
দেখিলে জুড়ায় নেত্র, স্বর্ণ-কান্তি শস্য-ক্ষেত্র,
আগে যেথা ছিল রণস্থল।"

কেবল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুরন্ত পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক অনুসৃত গিরিপথে

মধ্যে মধ্যে অশান্তির ধূমপুঞ্জ গগন মলিন করিয়া অন্তর্নিহিত বহ্নির পরিচয় প্রদান করে। কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ণেল হানা দেখাইয়াছিলেন, সীমান্ত-সংগ্রামে তৎকাল পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের ৭১৪, ৪৮০, ৪৮০, টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সংপ্রতি মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড 'ডেলি ক্রনিকেল' পত্রে খাইবারে পাঠানদিগের সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

পরিচয়।

ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান এই দুই দেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালায় পাঠানের বাস। সে অতিবাদনে অভ্যস্ত নহে—সাক্ষাতে সেলাম করে না—নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে আগন্তুকের মুখপানে চাহে। তাহার মুখশ্রী রমণীমুখশ্রীর মত সুন্দর; তাহার হাসি মধুর। বিপদের মধ্যে বাস করিয়া সে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাই সে ভাবে "হেসে নাও, দু'দিন বই ত নয়।"

যোদ্ধা।

সে গোঁড়া মুসলমান। অভিনব ধর্ম্মমত বা রাজনৈতিক ধারণা তাহার নিকট অসহনীয়। সে বন্দুক ভালবাসে, বোমা ঘৃণা করে, তাই বাঙ্গালী তাহার নিকট ঘৃণিত। লুণ্ঠনাভিযানে তাহার পরম আনন্দ; মৃত হইলে সে বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। লেখকের শরীররক্ষকদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, তাহার কোন বন্ধু সেনাদল হইতে কয়দিনের ছুটীতে যাইয়া তাহার কোন শত্রুর দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া, দুইজন লোককে হত্যা করিয়া ও একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া যথাকালে পল্টনে ফিরিয়া আসিয়াছিল—যেন কিছুই হয় নাই। কাহারও সহিত তাহার বিবাদ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, একজন শরীররক্ষক বলিয়াছিল, "না। আমার বাসভূমি ইংরাজ-অধিকারের অতি নিকটে।" যেন ইহাতে সে বড় দুঃখিত। যুদ্ধে তাহাদের পরম আনন্দ পাঠানদিগের বাসগ্রামমাত্রই দুর্গ। চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যস্থলে দুর্গ। গ্রামটি নদীর বা সাধারণ রাজপথের অদূরবর্ত্তী হইলে প্রায়ই পরিখা-বেষ্টিত হয়।

গৃহস্থ।

খাইবারে পাঠান গৃহস্থ। খাইবারের রাজপথ ইংরাজের অধিকৃত। এ পথে যুদ্ধ করিলে ইংরাজ যোদ্ধার শাস্তি-বিধান করেন। সেই জন্য এ পথে পাঠানগণ যুদ্ধ করে না—শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কলহে বিরত থাকে। এই শান্তি অবশ্য অস্ত্রের দ্বারা সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত। ইংরাজের ভয় ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব। মঙ্গলবারে ও শুক্রবারে আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে গতায়াতকারী বণিক-দিগের রক্ষার জন্য ইংরাজ সরকার হইতে সেনাদল প্রেরিত হয়। এই সেনাদলে সংরক্ষিত হইয়া—উষ্ট্র, গর্দ্দভ বা মহিষপৃষ্ঠে মাল বোঝাই দিয়া বণিকগণ অগ্রসর হয়। উপরে পর্ব্বত শিরে রক্ষিদল দণ্ডায়মান থাকে। পথে দুর্গের বাহুল্য। দেখিতে পাওয়া যায়, পৃষ্ঠে বন্দুক বাঁধিয়া পাঠানগণ পশু চরাইতেছে বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এই যাত্রী-দিগের দিকে চাহিয়া থাকে। বোধ হয়, সে কালের সেই লুণ্ঠনসুযোগের অন্তর্ধানে তাহারা দুঃখিত। ক্রমে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় এসার বৃদ্ধি হইতেছে। এখন চারিজনমাত্র রক্ষী লইয়া লেখক ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; পূর্ব্বে শতজন রক্ষীও যথেষ্ট বিবেচিত হইত না।

ভবিষ্যৎ।

কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে, বলা দুষ্কর। মস্কট হইতে বন্দুক আমদানী চলিতেছে; পাঠানের অস্ত্রের অভাব নাই। ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না। রণোন্মাদনার সময় তাহার জ্ঞান থাকে না। বিশেষ ইংরাজ-শাসনে পর্ব্বতের ক্ষুদ্র পরিসরে বদ্ধ হইয়া পাঠান অধীর হইয়া উঠিতেছে। হয়ত একদিন সে সকল বাধা ভাঙ্গিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইবে। তখন উপত্যকা রক্তস্রোতিতে রঞ্জিত হইবে; গিরিগহ্বর আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষরবে প্রতিধ্বনিত হইবে। সেরূপ ঘটনা যে ভারতবাসীর পক্ষে দুর্ঘটনা তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মশক।

দিবাবসানে ধরাবক্ষ যখন অন্ধকারে আবৃত হইতে থাকে, সেই সময় বাঙ্গালার বহু জিলায় তিমিরাবগুণ্ঠিত বায়ুমণ্ডল মশকের সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। রুদ্ধপবনগতি ভাদ্রপদের সায়াহ্নে মশক-দংশনে অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। এই দংশনকারী জীব অতি ক্ষুদ্র,—নিতান্ত উপেক্ষিত। লোক মশা মারিবার জন্য কামান সাজাইতে চাহে না; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, যে সকল শত্রুর বিনাশ-সাধনে মানুষ কামান সাজাইতে ব্যস্ত, সেই সকল শত্রু অপেক্ষা এই অতিশয় অবজ্ঞাত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, মুহূর্ত্তগুঞ্জনকারী জীব সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর। সিংহ,শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদগণ মানবসমাজের যত ক্ষতি করে, ভীষণ বিষধর মানব-জাতির যত শঙ্কিকর করে, তাহা এই ক্ষুদ্রশত্রুকৃত ক্ষতির তুলনায় নিতান্তই উপেক্ষার যোগ্য। প্রতিবৎসর মশকদংশনে অখণ্ড বঙ্গে ষোল হইতে আঠার লক্ষ লোক শমনভবনে নীত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক এত লোক দশ বৎসরেও নিহত হয় না। এই ক্ষুদ্র শত্রুকে আমরা এতই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখি যে, এই ক্ষুদ্র শত্রুই যে আমাদের ঘরে ঘরে পতিপুত্রবিয়োগবিধুরা রমণীগণের কাতর ক্রন্দনের উদ্ভব করিতেছে,—একথা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না। কথাটি কিন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে।

আজ কয়েক বৎসর হইল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ সাবধানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মশকই জনপদবিধ্বংসী ম্যালেরিয়া রোগের বিসর্পক বা বাহক। সে পরীক্ষা এত সাবধানে অনুষ্ঠিত যে, আপাততঃ তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাতও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রোনল্ড রস ও তাঁহার পরে কয়েক জন ইতালীয় ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেন যে, অ্যানোফিলিস-জাতীয় মশকের দংশনে লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। তদবধীতন বৈজ্ঞানিক-সমাজ সে সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিত বলিয়া

স্বীকার করেন নাই। সে সিদ্ধান্তের উপর অনেক বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছিল। তখন London School of Tropical Medicines এর পক্ষ হইতে ডাক্তার ম্যাথন ও ডাক্তার লো এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরীক্ষার ফলে মশকই ম্যালেরিয়ার বিসর্পক এই সত্য নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হয়। ইঁহারা দুই জন এবং সিনোর টোজ নামক আর এক ব্যক্তি, ও ভৃত্যাদি সমভিব্যাহারে রোমের ক্যাম্পেনা অঞ্চলে নামক স্থানে এক কুটীরে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক। কিন্তু তাঁহারা যে কুটীরে বাসা লইয়াছিলেন, সেই কুটীর লৌহের জালুতী (wire gauze) দ্বারা এমন ভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, মশকগণ কিছুতেই তাহার ভিতর প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হইতে সমস্ত দিবাভাগে ঐ স্থানের সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন, শীত রৌদ্র বৃষ্টি সকলই অবাধে সহ্য করিতেন, মাঠে মাঠে পরিশ্রম করিতেন, ঐ স্থানের ও উহার সন্নিহিত স্থানের জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতেন, কিন্তু সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই সেই রুদ্ধ-মশক-প্রবেশ কুটীরে প্রবেশ করিতেন। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, ম্যালেরিয়াবাহী মশক দিবাভাগে বাহির হয় না। এই পরীক্ষকমণ্ডলী কোনও প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। ফলে দেখা গেল যে, ঐ স্থানের ইটালীয় কৃষকগণ বারংবার ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বরে পড়িয়াছিল, আর সেই মশকহীন কুটীরবাসী ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনও ঐ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন নাই।

এদিকে কতকগুলি এনোফেলি-জাতীয় মশককে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত খাওয়াইয়া একটি খাঁচার মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয় এবং তাহাদিগকে "লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল ডিজিজেস্"এর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা ডাক্তার পি. বার্ক্কার মাসনকে ও মিঃ জর্জ্জ ওয়ারেনকে ঐ মশক কর্ত্তৃক বিলক্ষণরূপে দষ্ট করান। বলা বাহুল্য, ইঁহারা দুই জন পূর্ব্বে কখনই ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন নাই। স্বাস্থ্যবান বলিয়াই ইহারা পরীক্ষায় জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু দংশনের পঞ্চকাল মধ্যেই ইহারা দুই জনেই যুগপৎ ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ইহাদের শোণিতকণিকায় ম্যালেরিয়ার পরজীব দেখা গেল। ইঁহারা উভয়েই বারংবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। শেষে কুইনাইন সেবনে ইহারা উভয়েই সে রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পায়েন।

এই পরীক্ষার পর মশকই যে ম্যালেরিয়ার কারণ, ইহা সত্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস জন্মিল। তাহার পর বহুবিধ পরীক্ষার দ্বারা অ্যানোফিলিস্-জাতীয় মশকের সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পর হংকং, কেপ কোষ্ট, ক্রাং, ইস্মেলিয়া প্রভৃতি স্থানে মশকের উৎপত্তির কারণ বিদূরিত করিয়া এবং মশকের ডিম্ব ধ্বংস করিয়া দেখা গিয়াছে, মশকের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া উচ্ছিন্ন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মশকই যে মানবদেহে ম্যালেরিয়া-বিষ বিসর্পিত করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই শত্রুর সকল সন্ধানই আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইহার জীবনকথা অতিশয় বিস্ময়জনক। এক একটি স্ত্রী-মশক আড়াই শত হইতে তিন শত পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব অবস্থা হইতে পরিণত মশকাবস্থা প্রাপ্ত হইবার মধ্যে ইহার পর পর চারি বার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থা-চতুষ্টয়ের নাম এই ;—(১) ডিম্ব (egg), (২) অর্ভক বা শুক কীট (larva), (৩) কোষস্থ বা মূক কীট (pupa) ও (৪) মশক (imago)। নিম্নে সেই অবস্থা-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মশকজাতি নানা ভাগে বিভক্ত। একজাতীয় মশার নাম কুলেক্স (Culex), আর এক জাতির নাম ষ্টেগোমাইয়া (Stegomyia), আর এক জাতির নাম অ্যানোফেলিস (Anopheles); এইরূপ আরও অনেকজাতীয় মশক আছে। ইহার মধ্যে অ্যানোফেলিস্-জাতীয় মশাই ম্যালেরিয়ার বাহক। এই জাতীয় মশকই এই সম্বন্ধের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সকল জাতীয় মশাই এই অবস্থা-চতুষ্টয়ের অধীন; সেই জন্য সাধারণতঃ সকল মশকেরই এই দশা-বিপর্য্যয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। মশকজাতি পতঙ্গ (Insecta) জাতির মধ্যেই গণ্য। তাহারা দ্বিপক্ষ (diptera) পতঙ্গ। তন্মধ্যে ইহারা মশক সম্প্রদায় (Culicidae)-ভুক্ত।

ভ্রূণ বা ডিম্ব অবস্থা। স্ত্রী-মশক জলের উপরই ডিম্ব প্রসব করে। ডিমগুলি জলে বিন্যস্ত হইলেই ভরিয়া যায়. সেই জন্য মশকজননী সেগুলিকে নৌকাকারে সজ্জিত করিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়; সকল জাতীয় মশক এক প্রকার জলে ডিম্ব প্রসব করে না। কুলেক্স ও অ্যানোফিলি-জাতীয় মশক মৃত্তিকাসংলগ্ন জলে ডিম্ব প্রসব করে। তন্মধ্যে কুলেক্স বদ্ধ, স্রোতহীন জলে এবং অ্যানোফিলিস অল্পস্রোত জলে ডিম্ব পাড়ে। শেষোক্তজাতীয় মশক সময় সময় বদ্ধ জলেও ডিম্ব পাড়িয়া থাকে। ষ্টেগোমাইয়া-জাতীয় মশক মৃত্তিকাসংলগ্ন জলে আদৌ ডিম্ব পাড়ে না। টব, নল, ভাঙ্গা তৈজস প্রভৃতিতে সঞ্চিত জলে ইহারা ডিম্ব পাড়িয়া থাকে। প্রাতঃকালই মশকবিশেষের ডিম্ব প্রসবের সময়। প্রসবের পর দুই তিন দিনের মধ্যেই সেই ডিম্ব ফুটিয়া অর্ভক বাহির হয়। ডিম্বাবস্থাতে ইহারা কোন্ জাতিভুক্ত তাহা বুঝিবার উপায় আছে। কুলেক্স-জাতীয় মশার ডিমগুলি পরস্পর সংলিপ্ত, যেন একখানা নৌকাকারে সজ্জিত। কিন্তু অ্যানোফিলি-জাতীয় মশার ডিমগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিলেও যেন পরস্পর পৃথক্। অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে এই পার্থক্য বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

(২) অর্ভক বা শুক কীট (larva) অবস্থা। এই অবস্থায় ইহারা সুতার মত পাকান পাকান অতি ক্ষুদ্র চঞ্চল জীব। স্থির বদ্ধ জলে ইহা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কোষরূপে জলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে ইহারা জলের তলে ডুবিয়া যায়। স্থির জলে ইহারা উপরে ভাসিয়া থাকে। অ্যানোফিলিস্ মশকের অর্ভক সহজে ডুবিতে চাহে না। ইহারা নাড়া পাইলে মরিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাদের মস্তক, ধড় ও পুচ্ছ দৃষ্ট হয়। মস্তকটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাসার্থ বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্ভকাবস্থায়

ইহাদের পুচ্ছদেশ হইতে একটি বায়ুবাহী নল বিস্তৃত দেখা যায়। যখন ইহারা স্থির হইয়া জলের উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তখন এই নলটি জলের উপরে ভাসমান থাকে। ইহার দ্বারা বায়ু লইয়া ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাস করে। কুলেক্স জাতীয় মশকীডকের বায়ুবাহী নল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ইহা যখন জলের উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তখন পুচ্ছদেশটি ঊর্দ্ধ দিকে রাখিয়া মস্তকটি নিম্নদিকে জলের ভিতর নিমজ্জিত করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে অ্যানোফিলি-জাতীয় মশকীডকের শ্বাসনলটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহারা জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরালভাবে জলের উপরিভাগের ঠিক নিম্নেই অবস্থিতি করে। এই অবস্থায় মশকীডকগণ বারংবার খোলস পরিত্যাগ করে এবং দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পায়। শীতে ইহাদের বৃদ্ধি মন্থর এবং তাপে দ্রুত হয়। এইরূপে তিন চারি সপ্তাহ কাল ইহারা বারংবার নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া পরে তৃতীয় দশায় উপনীত হয়। অভুক্ত অবস্থায় ইহাদের বুভুক্ষা ও চাঞ্চল্য অত্যন্ত তীব্র থাকে:

(৩) কোষস্থ বা মূককীট অবস্থা (Pupa stage)। ইহাকে সমুত্তার্ণাবস্থা বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই সময় ইহাদের দেহ কোষমধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় ইহাদের শরীরে দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, কিন্তু ইহারা যেন নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থিতি করে। এই সময় ইহাদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ, ধড় দীর্ঘ, পুচ্ছ বক্র ও মস্তক একটু বৃহৎ হয়। ইহারা তখন যেন একটা বড় রকমের কমার (,) মত বোধ হয়। এই সময় ইহাদের মস্তকের দিকে দুইটি শ্বাসবাহী নল দেখা দেয়। ইহারা এই সময় জলের উপরিভাগেই ভাসিতে থাকে। কিন্তু কোনও রূপে উত্যক্ত হইলে সরিয়া যায় বা জলের তলে ডুবিয়া যায়। এই সময় ইহাদের বুভুক্ষা একেবারেই থাকে না। প্রায় সপ্তাহকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ইহারা কোষ ছিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ মশকরূপে বাহির হয়।

(৪) মশকাবস্থা (Imago stage)। চতুর্থাবস্থায় এই ক্ষুদ্র জীব পূর্ণাঙ্গ মশকে পরিণত হয়। ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। বিভিন্নজাতীয় মশকের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান। কুলেক্স-জাতীয় মশার বর্ণবৈচিত্র্য নাই, ইহারা কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া বসে। ইহাদের শুঁয়াগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাদের পুরুষজাতির শুঁয়া (Palpi) গুলি স্ত্রীজাতির শুঁয়া অপেক্ষা দীর্ঘতর। পক্ষান্তরে অ্যানোফিলি-জাতীয় মশকগুলির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, ইহারা যখন বসে, তখন ইহাদের ধড়, মস্তক ও হুল ঠিক সোজা,—যেন সরল রেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। ইহাদের পালকে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে। ইহাদের শুঁয়াগুলিও দীর্ঘ। পুরুষ ও স্ত্রীজাতির শুঁয়াগুলি সমান। সকল শ্রেণীর পুংজাতীয় মশকের শৃঙ্গের (antennæ) উপর লম্বা লম্বা লোম বা পালক আছে।

সকল শ্রেণীর মশকই বৃক্ষপত্রের রস পান করে। স্ত্রী মশক সুবিধা পাইলেই জীবের রক্তও শোষণ করে। পুরুষ মশা একেবারেই শোণিত পান করে না। স্ত্রী মশক অন্যে অন্যে জীবের চর্ম্মমধ্য দিয়া জীবদেহে হুলটি প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় এবং সেই হুলের ভিতর দিয়া জীবদেহে তাহার লালা ঢালিয়া দেয়। ঐ লালা শরীরের যে স্থানে প্রবিষ্ট হয়,

ম্যালেরিয়া-মশক (এনোফিলিস্)

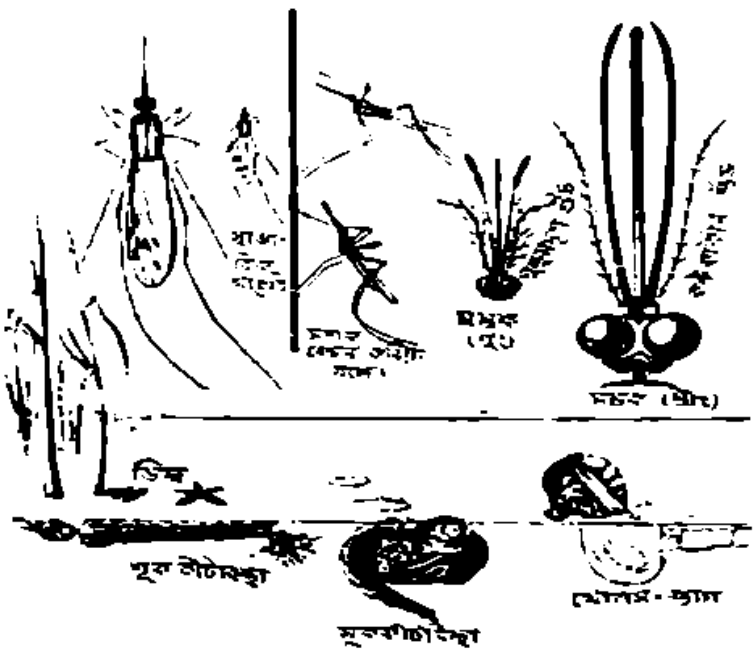

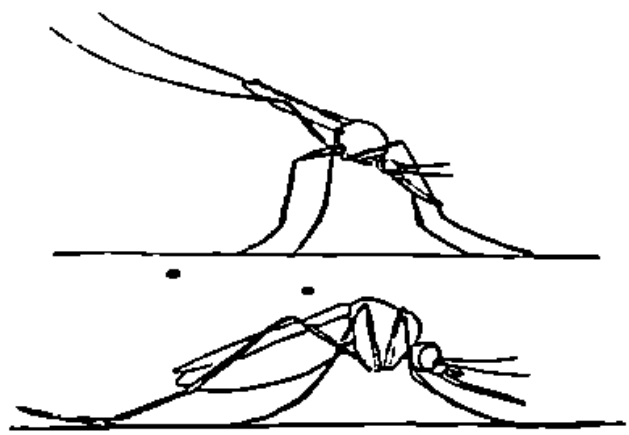

পূর্ণবয়স্ক সাধারণ মশক ও ম্যালেরিয়া মশক।

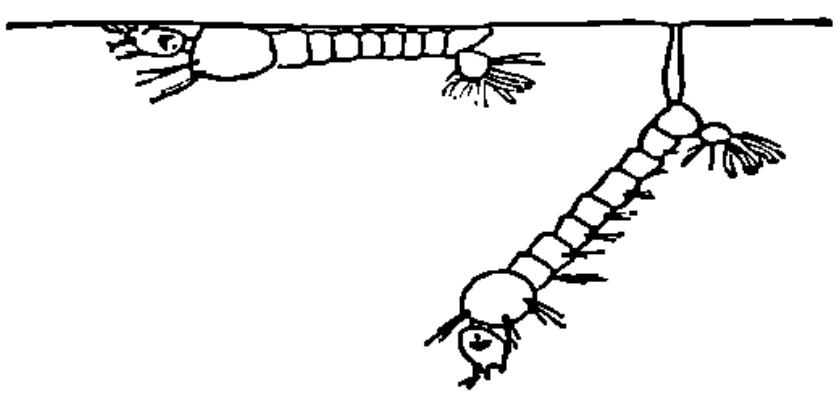

মশকের শাবক। জলের সমান্তর রেখায় ম্যালেরিয়াবাহী মশকের শাবক।

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬নং ও ৬৪।১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেই স্থানটি জ্বালা করে। ফলে ঐ স্থানে অনেক রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। লালার সহিত মিশ্রিত হইলে রক্ত তরল থাকে, জমাট বাঁধে না। সুতরাং মশকের পক্ষে রক্ত পান করা সহজ হয়। কেহ কেহ বলেন, মশকের রক্ত-মিশ্রণে স্থানীয় রক্ত একটু পাতলা হইয়া যায়।

সুস্থ মশকের দংশন কেবল দষ্ট স্থানে জ্বালা উৎপন্ন করে। রোগাক্রান্ত মশকের দংশনই জীবদেহে ব্যাধিবীজ সংক্রমিত করিয়া দেয়। সকল শ্রেণীর মশকই মানবদেহে একই প্রকার ব্যাধিবীজ বিসর্পিত করিয়া দেয় না। অ্যানোফিলি-জাতীয় মশা মানব-দেহে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। কুলেক্স-জাতীয় মশা শ্লীপদ রোগের বিসর্পক। ষ্টেগোমাইয়া-জাতীয় মশা পীতজ্বরের বীজ মানবদেহে সঞ্চারিত করে। কেহ কেহ বলেন যে, ডেঙ্গু জ্বরও মশক দ্বারা বিসর্পিত হইয়া থাকে।

মশক কি ভাবে মানবদেহে রোগবীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রোগাক্রান্ত মশকের দংশনই মানবকে রোগাক্রান্ত করে। একটা সুস্থ অ্যানোফিলি-জাতীয় স্ত্রী মশক কোন এক ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পান করিলে শোণিতের সহিত তাহার উদরে ম্যালেরিয়া রোগ-বীজ প্রবিষ্ট হয়। এই রোগবীজ এক প্রকার পরভৃক জীবাণু। উহারা অ্যানোফিলিস্ মশকের উদর-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মশকের উদরে অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইলে উহারা মশকের লালার সহিত বাহির হয়। এই সময় সেই স্ত্রীজাতীয় অ্যানোফিলিস্ যদি মানুষকে দংশন করে, তাহা হইলে সেই লালার সহিত ঐ রোগবীজ মানবদেহে প্রবেশ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই রোগবীজ পরভৃক জীবাণু। ইহা একটি পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেই গ্রাস করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মশকের হুলের ভিতর দিয়া মশকের লালার সহিত মিশিয়া ইহারা জীবশরীরে প্রবেশ করে, এবং ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত রক্তকণিকাটিকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, অল্পকালের মধ্যে ইহা সমস্ত লোহিত কণিকায় বংশবৃদ্ধি করিয়া ফেলে। ইহারা রক্তকণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই রক্তকণায় একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখা দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিলে এই দাগ স্পষ্টই দেখা যায়।

ম্যালেরিয়ার এই বীজ মশকশরীরে ও মানবশরীরে কি ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। মশক ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিস্তারে কি ভাবে সহায়তা করে, তাহা এখন সাধারণের বোধগম্য করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিছু কাল পূর্ব্বে চাকা মেডিক্যাল স্কুলে লেক্‌চেম্বার্স কর্ণেল হল এ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও সরল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আরও কয়েক জন সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক এ কথা প্রকৃষ্টভাবে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অ্যানোফিলিস যে ভাবে ম্যালেরিয়া বিসর্পিত করে, কুলেক্স, ষ্টেগোমাইয়া প্রভৃতি জাতীয় মশকও সেই ভাবে

প্লীহন ও পীতজ্বর বিস্তৃত করিয়া থাকে। সুতরাং সে কথা আর স্বতন্ত্র করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির সহিত মশকগণের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রাচীন ভারতেও পরিজ্ঞাত ছিল। কপিলাবস্তু নগর দেখিয়া পুনর্ব্বসু ঋষি যখন অগ্নিবেশ প্রভৃতিকে জনপদবিধ্বংসে ব্যাধির কথা বুঝাইয়া দেন, তখন তিনি ভূতবিকৃতিই জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মশক বিকৃতির ফলে মশকাদি জন্মে, তাহার ফলে নানা জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। অনেক প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে এ সম্বন্ধে প্রাচীন বিস্তৃত মত পাওয়া অসম্ভব হইয়া হইয়া পড়িয়াছে।

একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মশকগণ বৃক্ষপত্রের রস পান করে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, যে সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ হয়, সে সময় অ্যানোফিলি-জাতীয় মশকগণ "ভাঁট" পাতার রস পান করিয়া থাকে। ঐ সকল মশক ম্যালেরিয়াক্রান্ত কি না, তাহা দেখিবার আমার সুবিধা হয় নাই; কারণ, উহা দেখিবার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আমি তখন পাই নাই। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, ম্যালেরিয়াক্রান্ত মশকগণ সহজাত সংস্কারবশে রোগপ্রশমনার্থ ভাটপাতার রস পান করে। দেখা গিয়াছে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় 'ভাঁট' পাতার রস ও ভাঁটাপাতা সিদ্ধ জল পান করিলে ম্যালেরিয়া রোগ দ্রুত প্রশমিত হয়। ম্যালেরিয়ার সময় এই ক্ষুদ্র বৃক প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমার পরীক্ষার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ, সম্যক্ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও অভাব, সুতরাং আমার এই সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু যদি কোন বৈজ্ঞানিক এই বিষয়টি একটু মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি একটি মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়া জগতের বিশেষ উপকার করিয়া যাইতে পারিবেন। সেই জন্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বৈজ্ঞানিক সমাজকে এই বিষয়টি জানাইলাম। *

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

---

* চিত্রগুলি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'স্বাস্থ্যরক্ষা' হইতে গৃহীত।

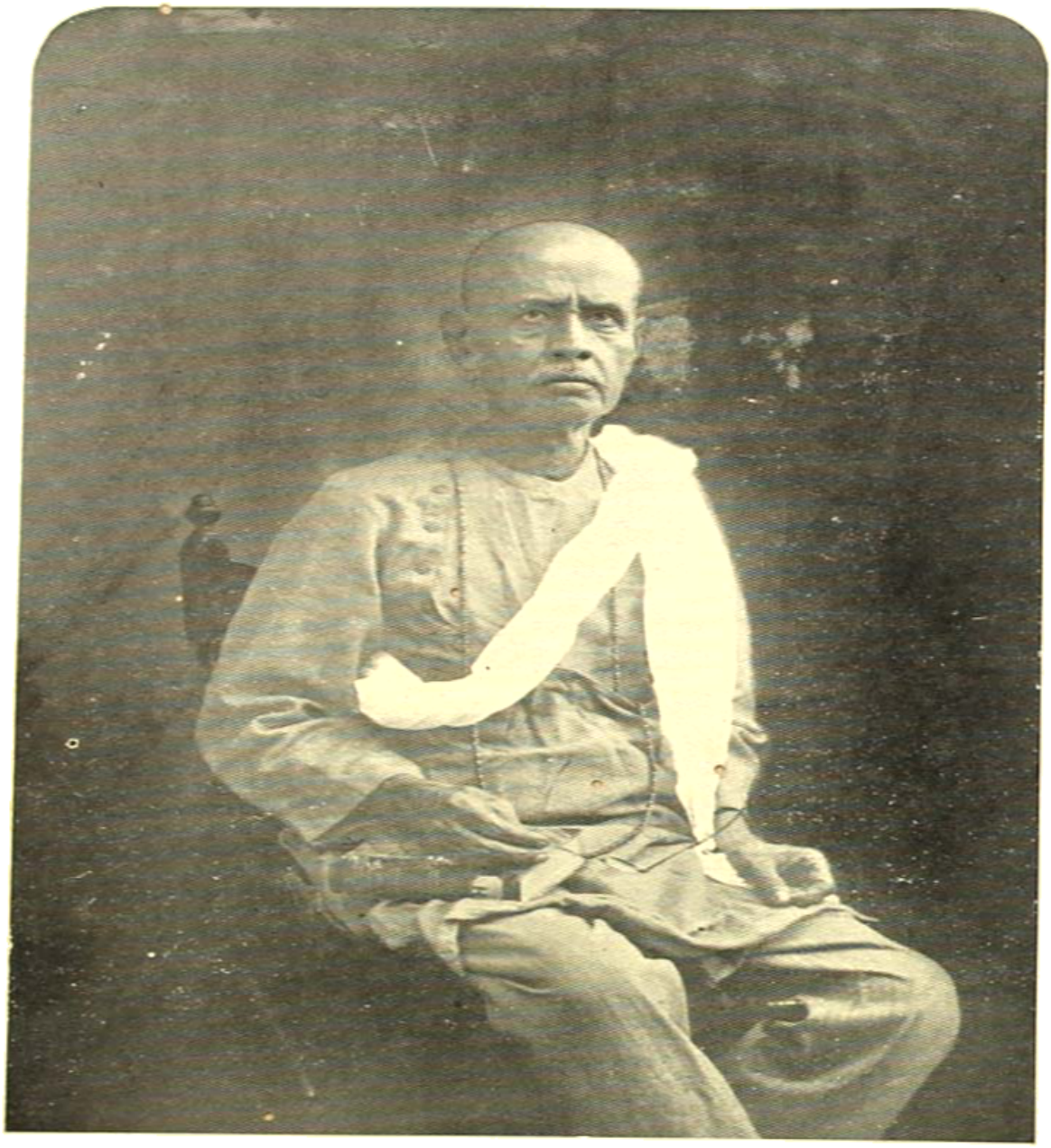

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা।*

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, ইউক্লিডের এই প্রতিজ্ঞার চেয়ে নিরীহ প্রস্তাব বোধ করি সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা এত সহজবোধ্য এবং সর্ব্বজনবোধ্য, যে ইহার প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান কেহ কর্ত্তব্য মনে করেন না; এই জন্য ইহা ইউক্লিড-প্রণীত শাস্ত্রের আরম্ভেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ইউক্লিডের শাস্ত্র সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আকৃতি এবং আয়তন মাত্র লইয়াই ইউক্লিডের কারবার। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, তাহাদিগকে ওজন করিতে দাম লাগে না, ডাকে পাঠাইতে মাশুলও লাগে না, তাহাদের আছে কেবল দৈর্ঘ্য অথবা বিস্তার অথবা আয়তন মাত্র। দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে বা আয়তনে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারাও পরস্পর সমান বলিয়া গৃহীত হয়, যে ছাত্র ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রতিজ্ঞা কোন রকমে পার হইয়া আসিয়া আটকাইয়া যায়, সেও এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ইউক্লিডের সীমানা ছাড়াইয়া যখন অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখনও এই স্বতঃসিদ্ধে দ্বিধাবোধের কোন সম্যক্ হেতু পাওয়া যায় না। রামু আর শ্যামু উভয়ে যদি ঠিক্ হরির সঙ্গে একবয়সী হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সমানবয়সী হইবে; উভয়ের গায়ের রঙ যদি ঠিক্ কেদারের মত ঘন কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইবে; এই সকল তথ্য স্বীকার করাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহার অন্যথাভাব কল্পনাতেও বোধ করি আসে না।

যে সকল বিষয়ের অন্যথাভাব কল্পনাতে আসে, যাহা মনে আনিতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আঘাত পায় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে; তাহার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। আকাশের বর্ণ নীল, চিনি খাইতে মিষ্ট, কেদারের বয়স সতের বৎসর তিন মাস, বৃন্তচ্যুত নারিকেল ফল বেলুনের মত উধাও না উঠিয়া ভূমিতে পড়ে, নেপোলিয়ন খুব বীর ছিলেন,

---

* ৭ই ভাদ্র শনিবার, দেবালয়ে মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ইত্যাদি সত্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ লব্ধ সত্য ; ইহা অন্যরূপ হইতে পারিত। ইহার অন্যথাভাব আমরা স্বচ্ছন্দে কল্পনা করিতে পারি। সেইরূপ চাপ পাইলে বায়ু সঙ্কুচিত হয়, গরমে বরফ গলিয়া জল হয়, চুম্বকে লোহা টানে ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপার সত্য হইলেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত। চুম্বক যদি লোহাকে না টানিয়া ঠেলিয়া দিত, শোলা যদি জলে না ভাসিয়া ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুতেই আহত হইত না ; আমরা ঐ সকল বিপরীত ঘটনাকেই প্রাকৃতিক সত্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইতাম।

অতএব সত্যের শ্রেণিভেদ রহিয়াছে।

কতকগুলি সত্য আমরা মানিতে বাধ্য, না মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্রোহাচারণ করিবে; যদি কেহ উহাতে দ্বিধা বোধ করে, পাগলা গারদে তাহার স্থান। আবার কতকগুলি সত্য আছে, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য নহি ; তাহা না মানিলে বুদ্ধি-বৃত্তি অবজ্ঞাত হয় না, তাহার উল্টা মানিলেও কেহ পাগল বলিতে পারিবে না, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে হইবে।

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান, এই সত্যটি কোন্ শ্রেণীর সত্য ? ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য হইতে পারে ; কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রেও কি তাহাই ? পদার্থবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইব। একটা সোণার গিনি খানিকটা জলের সমান গরম, একটা রূপার টাকাও সেই জলের সমান গরম ; গিনি ও টাকা সমান গরম হইবে কি না ? যে কোন ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিবে,—হাঁ, সমান উষ্ণ হইবে বৈকি ? এই উত্তর সত্য, কিন্তু কিরূপ সত্য ? ইহা কি ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধের মত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ?

যাঁহারা পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। উভয়ে জলের সমান উষ্ণ হইয়াও পরস্পর সমোষ্ণ না হইতেও পারিত। হয় নাই যে, তাহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

আমরা হাতে ছুইয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন্ জিনিষটা গরম, কোন্‌টা ঠাণ্ডা মোটামুটি স্থির করিয়া থাকি, কিন্তু পদার্থবিদ্যা শাস্ত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিতে একেবারে নারাজ।

পদার্থবিদ্যামতে উত্তাপ নামে এমন একটা কিছু আছে, যাহা কোন দ্রব্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহা সর্ব্বদা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চলাফেরা করে। যে দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা বলেন, সেই দ্রব্যের উষ্ণতা

অধিক, আর যে দ্রব্যে উত্তাপ প্রবেশ করে, পদার্থবিজ্ঞানমতে সেই দ্রব্যের উষ্ণতা অল্প। কোথায় উষ্ণতা অধিক, কোথায় অল্প, তাহা জানিবার ইহাই পদার্থবিজ্ঞান-মতে একমাত্র উপায়; এবং উষ্ণতার তারতম্যের ইহাই একমাত্র লক্ষণ। যদি দুই দ্রব্য পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে উত্তাপের বিনিময় হইতেছে না, অর্থাৎ এটার উত্তাপ ওটায় অথবা ওটার উত্তাপ এটায় আসিতেছে না, তখনই বুঝিতে হইবে, উভয় দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। উষ্ণতা আর উত্তাপ এক জিনিষ নহে। উত্তাপ চলাফেরা করে, উষ্ণতর দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া শীতলতর দ্রব্যে প্রবেশ করে। যেখানে দেখিবে, দুই দ্রব্যের মধ্যে উত্তাপের যাতায়াত নাই, সেইখানে বুঝিতে হইবে, উষ্ণতারও প্রভেদ নাই; উভয় দ্রব্য সমান উষ্ণ; কাজেই উত্তাপের চলাফেরা বন্ধ। উত্তাপের এই আচরণ দেখিয়া উষ্ণতার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। জল যেমন উঁচু হইতে নীচে গড়াইয়া আসে, উত্তাপ তেমনই গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে আসে; জলের সহিত উচ্চতার যে সম্বন্ধ, উত্তাপের সহিত উষ্ণতার সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। ঘরের মেজের কোন্ দিক্‌টা উঁচু স্থির করিতে হইলে জল ঢালিয়া দিলেই বুঝা যায়, উঁচু দিক্ হইতে নীচু দিকে জল গড়াইয়া আসে। সেইরূপ উত্তাপ কোথা হইতে কোথায় আসিতেছে নিরূপণ করিলেই উষ্ণতা কোথায় অধিক, কোথায় অল্প, তাহা বুঝা যাইবে।

উষ্ণতার যদি এই লক্ষণ হয়, তাহা হইলে গিনিটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে এই যে, গিনিটা জলে ফেলিলে গিনির উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ গিনিতে যাইবে না। সেইরূপ টাকাটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে বুঝাইবে যে, টাকাটা জলে ফেলিলেও টাকার উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ টাকায় যাইবে না। বেশ কথা—তাহা না যাক্। ধরিয়া লইলাম, গিনি ও জলের মধ্যে উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদের পরস্পর আচরণ এইরূপ। টাকা ও জলের মধ্যেও উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদেরও পরস্পর আচরণ এইরূপ। এখন গিনি ও টাকা যদি কাছাকাছি পাশাপাশি রাখা যায়, উহাদের পরস্পর আচরণ কিরূপ হইবে? উহাদের মধ্যে পরস্পর উত্তাপের বিনিময় হইবে কি না? কে বলিতে পারে, হইবে কি না? গিনি সোণার জিনিষ—অবস্থাভেদে সে জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। টাকা রূপার জিনিষ—অবস্থা ভেদে সেও জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। কিন্তু এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে যে, গিনি ও টাকা—অর্থাৎ এক টুকরা সোণা ও এক টুকরা রূপা—সেই অবস্থাতে পরস্পরের মধ্যেও উত্তাপের

লেনাদেনা করিবে না? করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। লজিক শাস্ত্র ইহার কোন উত্তর দিতে অক্ষম। তবে পর্য্যবেক্ষণে উত্তর পাওয়া যাইবে, হাঁ কি না?

আর'একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। সোণার গিনি যে জলের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, রূপার টাকাও সেই জলের প্রতি সেই ব্যবহার করিতেছে, অতএব সোণা ও রূপা পরস্পরও সেইরূপ ব্যবহার করিবে এরূপ বাধ্যবাধকতা আছে কি না? গদাধরের সঙ্গে রামের যে ব্যবহার, গদাধরের সঙ্গে শ্যামেরও সেই ব্যবহার, তাহা বলিয়া কি রাম শ্যামের পরস্পর ব্যবহারও কি ঠিক সেইরূপই হইবে? গদাধর রামকে দেখিলে ঘুষি তুলে, গদাধর শ্যামকে দেখিলেও ঘুষি তুলে অতএব রামও শ্যামকে দেখিলে ঘুষি তুলিবে, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য? যদি বল, রাম-শ্যামের দৃষ্টান্ত লইলে এখানে চলিবে না, ইহা পদার্থবিদ্যার ব্যাপার;—আচ্ছা, পদার্থবিদ্যা হইতেই একটা দৃষ্টান্ত লইব। খানিকটা চা খড়িতে সলফুরিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাস করে, নাইট্রিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাস করে, তাই বলিয়া সলফুরিক এসিডে নাইট্রিক এসিড ঢালিলেও কি ফ্যাস করিবে? কখনই না? চা খড়ির প্রতি সলফুরিক এসিডের আচরণ ঐ উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে; আবার চা খড়ির প্রতি নাইট্রিক এসিডের আচরণ এই উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। চা খড়ির প্রতি এসিডদ্বয়ের দুইটার আচরণ দেখিয়া উহাদের পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

সেইরূপ সোনার গিনি ও রূপার টাকা পরস্পর ঔত্তাপ বিনিময় করিবে কি না তাহা সোনা ও রূপা উভয়ের ধাতুগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সোণা কিংবা রূপা তৃতীয় দ্রব্য জলের প্রতি কিরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া পরস্পরের আচরণ কিছুতেই স্থির করা যায় না। লজিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ঐ দুই premise হইতে কোনরূপ conclusion অর্থাৎ সিদ্ধান্ত টানা চলে না।

লজিকে পারে না বটে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণে পারে। প্রকৃতপক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, গিনি যখন জলের ঔত্তাপ লয় না, টাকাও যখন জলের ঔত্তাপ লয় না, গিনি ও টাকা তখন,—কেন জানি না, ঔত্তাপের লেনা দেনা করে না, প্রকৃতির এই বিধান। ইহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য—ইহা পরীক্ষিত সত্য; স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। কাজেই আমরা উহা মানিয়া লই। ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারিত; গিনির ঔষ্ণ্যতা জলের সমান, টাকার ঔষ্ণ্যতাও সেই জলের সমান, হইয়াও গিনি ও টাকা সমোষ্ণ না হইতেও

পারিত। না হইলে তাহাই আমাদিগকে মানিতে হইত, প্রকৃতির উপর আমাদের কোনরূপ হুকুম চলিত না।

দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারা পরস্পর সমান হইবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও সকল শাস্ত্রে ও সকল ক্ষেত্রে উহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে না, ইহা দেখা গেল কিন্তু দুই দ্রব্যকে কখন্ কোন্ গুণ দেখিয়া সমান বলিব, তাহাও একটা উৎকট সমস্যা।

শরীরী জড় দ্রব্যের বেলায় সমস্যা ত বটেই; ইউক্লিডের শাস্ত্রের মত যে সকল শাস্ত্র অশরীরী দ্রব্য লইয়া বিচার করেন, সেখানেও সমস্যা নিতান্ত সহজ নহে।

মনে কর দুই গাছা লাঠি সমান দীর্ঘ কি না, স্থির করিতে হইবে। এক গাছা লাঠি শ্যামবাজারে রামের নিকট, আর এক গাছা বৌবাজারে শ্যামের নিকট আছে। দৈর্ঘ্যের তুলনা দুই উপায়ে হইতে পারে। শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিয়া দুই গাছা লাঠি পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে, দৈর্ঘ্য সমান কি না? একটার উপর আর একটাকে চাপাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান কি না তাহার নিরূপণের প্রথা ইউক্লিড বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় উপায়—অন্য একটা মাপকাঠি বা গজকাঠি শ্যামবাজারে আনিয়া শ্যামবাজারের লাঠির ও বৌবাজারে আনিয়া বৌবাজারের লাঠির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা চলিতে পারে।

যদি এই গজকাঠির মাপে দেখা যায়, উভয় লাঠিই দৈর্ঘ্যে সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি, তাহা হইলে উভয়কেই সমান দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়। বলা বাহুল্য, কার্য্যতঃ এই রীতি অবলম্বন করাই সুবিধা; এবং ইহার মূলই হইল ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু এইখানে কোন ব্যক্তি যদি বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বসেন, দৈর্ঘ্য তুলনার এই রীতি দুষ্ট, আমি ইহা মানিব না, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরুত্তর করা কঠিন হইয়া পড়ে। উষ্ণতার ইতরবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কারণে একই দ্রব্যের দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বজনসম্মত; একই জিনিষ গরম হইলে দৈর্ঘ্যে বাড়ে, ঠাণ্ডায় দৈর্ঘ্যে কমে; শ্যামবাজার ও বৌবাজারে যদি উষ্ণতার কোন তারতম্য না থাকে, তাহা হইলে এ তর্ক উঠিবে না। কিন্তু যিনি বাদী, তিনি একবারে মূলে টান ধরিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, কেবল স্থানভেদেই কি দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইতে পারে না? যে আকাশে বা যে দেশে আমাদের এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের এমন ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে না, এক স্থানের দ্রব্যকে কেবল অন্য স্থানে লইয়া যাইবামাত্র

অন্য কারণ অসত্ত্বেও তাহার দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়? ইহা অসম্ভবও নহে, অকল্পনীয়ও নহে।

তুমি শ্যামবাজারের লাঠিকে বৌবাজারের লাঠির সহিত মিলাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান বলিতেছ; কিন্তু আমি বলিতেছি, একের দৈর্ঘ্য অন্যের দ্বিগুণ। তবে শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিবামাত্র তাহার দৈর্ঘ্য কমিয়া অর্দ্ধেক হয়; আবার বৌবাজারের লাঠি শ্যামবাজারে আনিবামাত্র উহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ এক লাঠি শ্যামবাজারে, অন্য লাঠি বৌবাজারে, ততক্ষণ তাহাদের দৈর্ঘ্য সমান নহে। গজকাঠি দিয়া মাপিলেও ইহার মীমাংসা হইবে না। সকল দ্রব্যেরই দৈর্ঘ্য যদি স্থানসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ঐ গজকাঠিরও দৈর্ঘ্য স্থানসাপেক্ষ হইবে। উহা শ্যামবাজারে আনিবামাত্র উহার ইঞ্চির দাগগুলা বড় বড় হইবে, এবং বৌবাজারে আনিবামাত্র দাগগুলা খাট হইয়া পড়িবে। কাজেই শ্যামবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি বৌবাজারের সাতফুট পাঁচইঞ্চির সমান না হইলেও এই প্রভেদ ধরিবার কোন উপায় পাওয়া যাইবে না।

ফলে আমাদের বিশ্বজগৎ যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশের যদি এইরূপই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে স্থানভেদে দৈর্ঘ্য বিচারের ব্যত্যয় হইলেও আমরা কোনরূপ পরিমাপের দ্বারা তাহা ধরিতে পারিব না; কেন না যে গজকাঠি লইয়া পরিমাপ করিতে যাইব, সেই গজকাঠিই যখন স্থানভেদে ছোট বড় হইয়া যাইবে, তখন এই প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি সেখানে খাটিবে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যখন বলিতেছে, স্থানভেদে ঐরূপ দৈর্ঘ্যভেদের কোন প্রমাণ নাই, এবং প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কাহাকেও কখন জীবন যাত্রায় ঠকিতে হয় নাই, তখন এ সকল নিষ্ফল ন্যায়-শাস্ত্রের কচকচি তুলিয়া লাভ কি? সমুদায় ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যা প্রচলিত পরিমাণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার যাবতীয় সম্পাদ্য ও উপপাদ্যে কেহ কখনও কোন ভুল বাহির করিতে পারেন নাই; তখন ইহার গোড়ার কথা লইয়া এরূপ টানাটানি করিয়া উপহাস্য হইবার দরকার কি?

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, জীবন যাত্রার জন্য যে কাণ্ডজ্ঞানটুকু আবশ্যক, সেই কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে জীবন যাত্রা এক রকম নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। প্রকৃতি দেবী যিনি মনুষ্যকে জীবন যাত্রায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যকে যে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেই হইবে, এরূপ তাঁহার আদেশ নাই। গোপদ্ত হইতে মনুষ্য পদ্ত পর্য্যন্ত কাহাকেও তিনি জীবন যাত্রা

বিষয়ে ন্যায়-শাস্ত্রের অধীন করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। ঘাসজলের ব্যবস্থা হইলেই গরুর গোজীবন চলে; আবার ডালরুটির ব্যবস্থা হইলেই মানুষেরও জীবন যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়; এবং পৃথিবীর উপর যে দেড়শত কোটি মনুষ্য পশু বিচরণ করিতেছে, তাহাদের পৌনে ষোল আনার অধিক লোক এই ডাল রুটির অধিক কিছু চাহে না; ইহাতেই তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত আছে। আজিকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা যে কল কারখানা বসাইয়া পৃথিবীতে একটা তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছি, ভূপৃষ্ঠের উপর ছুটাছুটি করিবার জন্য নিরেট ভূমির উপর রেলগাড়ী চালাইয়া, সাগর-পৃষ্ঠের উপর কলের জাহাজ চালাইয়া, আর হাওয়ার ভিতরে হাওয়ায় উড়িবার জন্য হাওয়ার জাহাজ চালাইয়া লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়াছি, ইহাও সেই ডালরুটির জন্য। ডালরুটির অন্বেষণ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের অভ্যন্তরে আবিষ্কার করা যায় না। এই ডালরুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও উহাকে একবারে পরম পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কতকগুলি লোক চাহে না ও চাহিবে না। তাহাদের মতে ঐ ডালরুটি-বিষয়ক কাণ্ড-জ্ঞানই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে; তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু নহিলে তাহাদের প্রাণের পিয়াসা কিছুতেই মিটে না। এই পিয়াসা মিটাইবার জন্যই নৈয়ায়িকেরা তৈলের আধার পাত্র বা পাত্রের আধার তৈল এই বিচারে জীবন কাটাইতেন; এবং এই পিয়াসা মিটাইবার জন্য এই সেদিনও শেফীল্ড সহরে ব্রিটিশ আসোসিয়েশনের অধিবেশনে গণিত-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি বার আর পাঁচে সতের এই তথ্যের তাৎপর্য্য অন্বেষণের জন্য মাথা কুটিতে পণ্ডিতদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।

ক্ষেত্রতত্ত্বের ন্যায় ব্যাবহারিক শাস্ত্র কতকগুলি সংজ্ঞা ও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া তাহার ভিত্তির উপর বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে; এবং সেই অট্টালিকার মধ্যে আমাদের ব্যাবহারিক জীবন যাত্রা অবাধে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মূল আকর্ষণ করিয়া যুক্তির অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার চলিতে পারে। একটামাত্র গজকাঠি লইয়া যখন আমরা শ্যামবাজারে ও বৌবাজারে, হুগলিতে ও দিল্লিতে, ভূমণ্ডলে ও সূর্য্যমণ্ডলে ও নক্ষত্রবিমণ্ডলে দীর্ঘতা মাপিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা ধরিয়া লই যে, উষ্ণতাদির তারতম্যে ঐ দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র দেশভেদে বা স্থানভেদে সেরূপ কোন তারতম্য হয় না। ইহা আমরা ধরিয়া লই, এবং মানিয়া লই মাত্র; কিন্তু মানা উচিত কি না তাহা ভাবিয়া দেখি না। মানা উচিত হউক আর অনুচিতই হউক, আমাদের জীবনযাত্রার ইহাতে কোনরূপে

ঠকিতে হয় না। ঠকিতে হয় না, কেন না কোন দুই দ্রব্যকে যখন আমরা কোন বিষয়ে সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করি, ঐ সমানতা আমাদের মনঃকল্পিত একটা সংজ্ঞা মাত্র; আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ মনগড়া পারিভাষিক অর্থে 'সমান' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার মধ্যে কোন পরমার্থ তত্ত্ব নিহিত থাকে না। ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আজকাল যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাসের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকট আমার বাচালতা মার্জ্জিত হইবে।

দুইটা জিনিষকে আমরা সমান বলি কখন্? দূরে হইতে নিকটে আনিয়া এটার পাশে ওটা রাখিয়া, অথবা এটার উপর ওটা চাপাইয়া যদি দেখিতে পাই, দুইটার দৈর্ঘ্য মিলিয়া গিয়াছে, তখন আমরা তাহাদিগকে সমান বলি। নিকটে থাকিলেও সমান বলি, দূরে থাকিলেও সমান বলি। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সমান' এই শব্দটির সংজ্ঞাই এই। দূরে থাকিতে উহাদের দৈর্ঘ্যের কোন প্রভেদ ছিল কি না, সে প্রশ্নই আমরা তুলি না। সমান শব্দটিকে যদি ঐ সঙ্কীর্ণ অর্থ দেওয়া যায়, এবং এই অর্থেই আমরা যদি সর্ব্বদা ঐ শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে সেই প্রশ্ন তুলিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। এবং সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া যদি কোন শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করি, সেই শাস্ত্রেও কোন ভুল আসে না।

সোণা, রূপা ও জল ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই প্রথমে নজরে পড়ে। ঔজ্জ্বল্যে, বর্ণে, স্পর্শে, শব্দে কোন বিষয়েই ইহারা সদৃশ নহে; অথচ উহাদের পরস্পর একটা সাদৃশ্য আছে, যাহা আছে বলিয়া ঐ তিন দ্রব্যকেই আমরা জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, সেই সাধারণ ধর্ম্ম কি, যাহা স্বর্ণখণ্ডে, রৌপ্যখণ্ডে এবং খানিকটা জলেও বর্ত্তমান রহিয়াছে? যাহা আছে বলিয়া ঐ তিন পদার্থই জড়ত্ব লাভ করিয়াছে?

তিনটা দ্রব্যের একটা সাধারণ ধর্ম্ম অতি সহজেই ধরা পড়ে; উহার নাম ভার বা ওজন। সোণা, রূপা, জল, তিনেরই ওজন আছে; এবং যে সকল দ্রব্যকে আমরা জড় দ্রব্য বলি, তাহাদের সকলেরই ওজন আছে; অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ওজনই তাহা হইলে জড়ত্ব। কিন্তু যাঁহারা পদার্থ বিদ্যার একটু চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ওজন জড়ত্ব নহে। উহা জড় দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম হইলেও স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; উহা আগন্তুক ধর্ম্ম, আকস্মিক কারণে উহার উৎপত্তি। আমাদের এই পৃথিবীর এমন একটা গুণ আছে, যাহাতে সকল দ্রব্যই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পতনে মুখ; এবং এই পতনোন্মুখতা আছে বলিয়াই ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের ওজন আছে। সোণা-

রূপার যে ভার, তাহা সোণারূপার নিজগুণে নহে, তাহা পৃথিবীর নিকট অবস্থিতি-সাপেক্ষ। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে যাইবে, তার ততই কমিবে; আবার ভূপৃষ্ঠে কূপ খুঁড়িয়া নীচে নামিলে তার তাহাতেও কমিবে। কলিকাতার কোন দ্রব্য দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ওজন একটু কমে; ধবলগিরির মাথায় তুলিলে আরও একটু কমে; ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্যের ওজন নব্বই মণের ওজনের সমান, চাঁদ যত দূরে আছে, তত দূরে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার ওজন এক সেরের ওজনের সমান দেখা যাইবে। আবার ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যদি ভূকেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া ঐ নব্বই মণের ওজন এক কাঁচ্চার ওজনও হইত না, একবারে লোপ পাইত। অতএব সোণা রূপা বা যে কোন জড় দ্রব্যের ওজনকে সেই দ্রব্যের স্বাভাবিক নিজস্ব ধর্ম্ম বলিতে পারি না; উহা পৃথিবীর সন্নিধানে অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন ধর্ম্ম; উহা একটা আকস্মিক ঘটনা বা আগন্তুক ঘটনা হইতে লব্ধ ধর্ম্ম; পৃথিবী বা তদ্বিধ কোন প্রকাণ্ড জিনিষ নিকটে না থাকিলে কোন জিনিষেরই ওজন থাকিত না।

কাজেই ওজন দেখিয়া জড়ত্বের নিরূপণ হয় না। এক মণ চাউলের ওজন যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে উহার ভার-বহনের ক্লেশ কাহাকেও সহিতে হইত না; কিন্তু উহার তত লঘু, যাহার উপর উহার উদর-পূরণের শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহার কিছুই লাঘব হইত না। কলিকাতায় চাউল দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ওজন কিছু কমে, কিন্তু উদর-পূরণের শক্তি কিছুই কমে না। ফলে চাউলের ওজন না থাকিলে দোকানদার উহার পুরা দাম দাবি করিত; তবে ঘরে আনিবার সময় মুটে ভাড়াটা হয়ত লাগিত না। সেইরূপ সোণার ওজন না থাকিলেও উহার সুবর্ণত্ব কিছুই কমিত না;—যে সুবর্ণত্বের উপর ভামিনী-সমাজে উহার সমাদর প্রতিষ্ঠিত; বরং ভামিনীদের মধ্যে যাঁহারা একশ ভরিতেই এখন সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা তখন একশ মণের দাবি করিয়া বসিতেন।

জড়ের জড়ত্ব যদি ওজনে না হয়, তবে জড়ের জড়ত্ব কিসে? ইংরেজিতে mass বলিয়া একটি শব্দ আছে, উহাই জড়ের জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক। কথায় কথায় বলা হয় এই massএর অর্থ quantity of matter। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ mass শব্দের ভাল প্রতিশব্দ নাই; গ্রন্থলেখকেরা অনুবাদে যাঁহার যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমিও একটা নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; mass অর্থে দ্রব্য শব্দ প্রয়োগ করিব। আমাদের দর্শন শাস্ত্রে পারিভাষিক অর্থে দ্রব্য শব্দের প্রয়োগ

আছে ; সেই শব্দটিকে আমরা mass অর্থে ব্যবহার করিতে পারি। এই দ্রব্যটা massive—ইহার mass বেশী—এই অর্থে আমি বলিব, ইহাতে দ্রব্য আছে অনেকখানি। এই দ্রব্য শব্দকেই জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এই দ্রব্য-পরিমাণ নিরূপণের উপায় কি ? পদার্থবিদ্যা এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব ; এই ক্ষমতা দেখিয়া দ্রব্যের মাত্রা নিরূপিত হয়। যে কোন দ্রব্যে ধাক্কা দিলে উহা বিচলিত হয় অর্থাৎ কতকটা বেগ অর্জ্জন করিয়া সেই বেগে চলিতে থাকে। দুইটা দ্রব্যে সমান ধাক্কা দিলে দুইটাই বেগ অর্জ্জন করে। যদি সমান ধাক্কা পাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের উভয়ের দ্রব্য সমান বলিয়া গৃহীত হয়। যদি সমান বেগ অর্জ্জন না করে, তাহা হইলে দ্রব্য অসমান বলিয়া গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক হইবে, সেটার দ্রব্য অল্প, যেটার বেগ অল্প হইবে সেটার দ্রব্য অধিক। শূন্য কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা হটমট করিয়া ছুটিয়া পড়ে ; পূর্ণ কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হয়। পূর্ণ কুম্ভের দ্রব্য-পরিমাণ অধিক, শূন্য কুম্ভের অল্প। দুইটা হাতীর দাঁতের ভাঁটা পরস্পরের অভিমুখে সমান বেগে ছুটিয়া আসিলে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া ও পরস্পরের ধাক্কা খাইয়া বিপরীত মুখে ফিরিয়া যায়। যদি সমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদের দ্রব্য সমান বলা হয় ; আর যদি অসমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে যেটার বেগ অধিক সেটার দ্রব্য অল্প, যেটার বেগ অল্প সেটার দ্রব্য অধিক বলিয়া গৃহীত হয়।

পরস্পরের ধাক্কা পাইয়া যাহা অধিক বিচলিত হয়, তাহাতে অল্প দ্রব্য ও যাহা অল্প বিচলিত হয়, তাহাতে অধিক দ্রব্য আছে। দুই সমান দ্রব্য সমান ধাক্কা খাইয়া সমান বেগই অর্জ্জন করে। দ্রব্য-পরিমাণের ইহাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়। ওজন করিয়া দ্রব্য নির্দ্দেশের চেষ্টা অনুচিত ; কেন না, স্থানভেদে ওজনের তারতম্য হয় ; কিন্তু যাহাকে দ্রব্য বলিতেছি, যাহা অঙ্কের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন তারতম্য হয় না। এক সের চা'লের বা দশ ভরি সোণার ওজন সর্ব্বত্র সমান নহে, কিন্তু এক সের চাল সর্ব্বত্রই এক সের চা'ল, আর দশ ভরি সোণা সর্ব্বত্রই দশ ভরি সোণা। সের আর ভরি প্রকৃত পক্ষে দ্রব্য-পরিমাণ নির্দ্দেশ করে, ওজনের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে না। এক ভরি সোণা আর এক ভরি রূপা, উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়েরই দ্রব্য-পরিমাণ সমান ; কেন না, সমান ধাক্কায় উহারা সমান বলে বিচলিত হয়। হুগলিতেও হয় আবার দিল্লীতেও হয়, ভূমণ্ডলেও হয় আবার চন্দ্রমণ্ডলেও হয়। কাজেই এই ভরি-পরিমিত দ্রব্য সোণা-রূপার স্বাভা-

বিক ধর্ম্ম, নিজস্ব ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম পৃথিবীর সান্নিধ্যের কোন অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক ভরি সোণা আর এক ভরি রূপার দ্রব্য সমান হইল, কিন্তু উহাদের ওজন সমান হইবে কি না? যুক্তি শাস্ত্র এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিত শত বৎসর মাথা ঘামাইয়াও এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না। দ্রব্য আর ওজন এক নহে; দ্রব্য সমান হইলেই ওজন সমান হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। জড় পদার্থের ওজন উহার স্বাভাবিক গুণ নহে; কিন্তু যাহাকে দ্রব্য বলিয়াছি, তাহা জড় দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ। কাজেই এক ভরি সোণা ও এক ভরি রূপার দ্রব্য-পরিমাণ সমান হইলেও উহার ওজন সমান হইতেও পারে, হইতে নাও পারে। সমান বটে কি না উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

ওজনের হেতু পৃথিবীর সান্নিধ্য—পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান। পৃথিবীর টান কোন্ জিনিষের উপর অধিক তাহা পৃথিবীকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি আমাদের গৃহকর্ত্রীদিগের মত পৃথিবী সোণাকেই বেশী পছন্দ করেন, সোণার প্রতিই বেশী টান দেন, তাহা হইলে এক ভরি সোণার ওজন এক ভরি রূপার ওজনের চেয়ে অধিক হইবে; আর যদি পৃথিবীর সেরূপ কোন পক্ষপাত না থাকে, তাহা হইলে এক ভরি সোণা ও এক ভরি রূপা ওজনে সমান হইবে।

পৃথিবীর এইরূপ পক্ষপাত আছে কি না, তাহা পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের যিনি শীর্ষস্থানীয়, সেই নিউটন পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর এরূপ কোন পক্ষপাত নাই। এ বিষয়ে পৃথিবী একবারে উদাসীন। পৃথিবীর কাছে মুড়িমিছরির এক দর, কাচকাঞ্চন তুল্যমূল্য, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমান আদর। নিউটন পেণ্ডুলমের সাহায্যে এই তত্ত্বনির্ণয় করেন; যিনি পদার্থবিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন; ইহা লইয়া সময়ক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না যে, এক ভরি সোণার ওজন ঠিক এক ভরি রূপার ওজনের সমান হইবে; পাঁচ সের চাউলের ওজন পাঁচ সের লোহার বাটখারার ওজনের সমান হইবে; দ্রব্য সমান হইলেই যে ওজন সমান হইবে, ইহা নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না। অথচ অদ্ভুত এই যে, নিউটনের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খ পর্য্যন্ত ওজনের সমতা দেখিয়া দ্রব্যের সমতা মানিয়া লইয়া আসিতেছে।

তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল আর পাল্লায় লোহার বাটখারা রাখিয়া, নিক্তির এক ধারে সোণা আর এক ধারে রূপা রাখিয়া, আমরা ওজনের সমতা দেখিয়া লই। উহা ওজনের যন্ত্র, দ্রব্য নিরূপণের যন্ত্র নহে। দেখি আমরা ওজন, কিন্তু চাই আমরা দ্রব্য। চাউলের যদি ওজন না-ই থাকিত,তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হইত না; ক্ষুধা নিবৃত্তি সমান হইত, উপরন্তু মুটে ভাড়া লাগিত না। সোণার ওজন না থাকিলে গৃহিণীদের লাভ বিনা লোকসান হইত না। কাজেই চাই আমরা দ্রব্য, কিন্তু দেখিয়া লই ওজন। নিক্তির দুই পাল্লায় দ্রব্য সমান হইলে ওজনও সমান হয়, কেন না পৃথিবী অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে দুই ধারেই সমান টান দেন, সোণা আছে কি রূপা আছে তাহা দেখেন না। পৃথিবী যদি সোণারূপার সমান আদর না করিতেন, তাহা হইলে দুই পাল্লায় সমান দ্রব্য রাখিলেও ওজন সমান হইত না। সোণার প্রতি টান অধিক হইলে সোণার দিকটাই পৃথিবীর দিকে চলিয়া পড়িত। অতএব দ্রব্যসামাজে ভারসামাজ হয়, ইহাও পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের হাতে এই নিক্তি যন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একবারে ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারে পরিণত হন। কিন্তু নিক্তি যতক্ষণ হাতে থাকে,ততক্ষণ তিনি গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।

এই নিক্তির সাহায্যে তিনি এক অদ্ভুত তথ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। লোহা আর গন্ধক একত্র তপ্ত করিলে উহা এক নূতন জিনিষে পরিণত হয়, তাহা না লোহা না গন্ধক। এই অভিনব জিনিষে লোহার লৌহত্ব বা গন্ধকের গন্ধকত্ব কিছুই থাকে না। রূপ রস গন্ধ স্বাদ সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয়ের যোগে এক নূতন জিনিষ তৈয়ার হয়।

রসায়নবিৎ পণ্ডিত কিন্তু নিক্তির ওজনে দেখাইবেন, পুরাতন দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু উহার ওজনটুকু যায় না। লোহা আর গন্ধক ওজন করিয়া লও, যে নূতন দ্রব্য উভয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হইল, তাহার ওজন নিক্তির ওজনে লোহার ওজন আর গন্ধকের ওজনের ঠিক যোগ-ফল।

ফলে জিনিষের রূপান্তর হয়, কিন্তু নূতন জিনিষে সাবেক জিনিষের ওজনটুকু বাহাল থাকে। আবার যখন পৃথিবীর নিরপেক্ষতার ফলে ওজন সমান হইলে দ্রব্যও সমান বলিতে হয়, তখন মানিতে হইবে, এই রাসায়নিক সম্মিলনে দ্রব্যেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না।

রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে সহস্রবিধ রাসায়নিক কাণ্ড অহরহঃ সম্পাদিত হইতেছে। আবার প্রকৃতির বৃহত্তর পরীক্ষা-

সাধে কত রকমের রাসায়নিক কাণ্ড নিত্য ঘটিতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু নিষ্কিঞ্চনধারী রসায়নবিৎ জোরের সহিত বলিতে চাহেন, এই সকল ভাঙ্গা-কারখানায় জড় পদার্থের দ্রব্য-পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। এক কণিকাও নূতন জন্মে না, এক কণিকারও ধ্বংস হয় না। দ্রব্যের যখন হ্রাসবৃদ্ধি নাই, অর্থাৎ জড়ের জড়ত্ব যখন কমেও না বাড়েও না, তখন জড়পদার্থ অবিনাশী, হয় ত অনাদি। অতএব লাবোয়াসিয়ার সময় হইতে শতাধিক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড় পদার্থকে অমরত্ব দিয়া তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ধূপদীপাদি উপচার দ্বারা তাহার পূজা আরম্ভ করিয়াছেন।

জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই, ইহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য; নিষ্কির ওজনে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ এমন পণ্ডিত অনেকে আছেন, যাঁহারা ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি বা অবস্তুতে বস্তুর পরিণতি, উভয়ই মানব মনের কল্পনাতীত; অতএব ঐ তথ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অনেক বড় বড় দার্শনিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া এই স্বতঃসিদ্ধের সমর্থনে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে দিনও দেখিলাম আমষ্টার্ডম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলমানের কেমিষ্ট্রী গ্রন্থের ইংরেজি তর্জ্জমায় এই প্রসঙ্গে ছোট হরপে মুদ্রিত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের অবিনাশিতা কেবল পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ সত্য নহে। উহার অন্যথাভাব কল্পনাতীত, অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ।

দ্রব্যহীন জড় পদার্থ যে কল্পনার অগোচর নহে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ঈথর নামে যে বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাকে জড় পদার্থ বলিব কি না তাহা জানি না। অন্য জড় পদার্থের মত তাহার দেশব্যাপকতা আছে, অন্য জড়ের মত তাহার শক্তিমত্তা আছে, অথচ তাহার ভার বা ওজন নাই এবং যে ধর্ম্মকে আমরা দ্রব্য বলিয়াছি, সেই দ্রব্যবত্তা তাহার আছে কিনা তাহাও সংশয়ের বিষয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেনেল, যিনি ঈথরের তরঙ্গ-স্বরূপে আলোক-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি ঈথরের দ্রব্যবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন, কিন্তু আজকাল দ্রব্যবত্তার কোন সম্পর্ক না রাখিয়াও আলোক তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে।

দ্রব্যহীন জড় পদার্থের কল্পনা যে হইতে পারে না, ইহা বলা চলে না; তবে যদি ঐ সকল দ্রব্যহীন পদার্থকে জড় পদার্থ নাম না দাও, সে স্বতন্ত্র কথা। লর্ড কেলবিন কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঈথর নিজে দ্রব্যহীন পদার্থ; তবে ঈথরে ছোট

ছোট ঘূর্ণী জন্মিয়া উহাকে দ্রব্যবান্ জড় পদার্থে পরিণত করে। যাক্ এই সকল হেঁয়ালির আলোচনায় এখন ক্ষান্ত থাকা যাক্। কিন্তু আজকাল একটা নূতন তত্ত্বের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেটাকে একবারে ফেলিতে পারা যায় না। তাড়িত নামক পদার্থ এতকাল সম্পূর্ণ হেঁয়ালির মধ্যে ছিল। সেই হেঁয়ালি এখনও আছে; কিন্তু তাড়িতের কণিকা লইয়া এখন আমরা খেলাধুলা আরম্ভ করিয়াছি। রেডিয়ম নামক ধাতুর কথা খবরের কাগজের প্রসাদে আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন; এই রেডিয়ম হইতে সর্ব্বদা তাড়িতের কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল রেডিয়াম কেন, আরও নানাবিধ জিনিষ হইতে তাড়িতের কণা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহাও আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই তাড়িত কণিকাগুলি কিন্তুত কিমাকার পদার্থ, ইহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। এই তাড়িত কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া চলে; কোথায় কত বেগে ছুটিতেছে, তাহা নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। কাচে রেশম ঘষিয়া বা গালায় পশম ঘষিয়া যখন ঐ ঐ বস্তুতে তাড়িতের সঞ্চার করা যায়, তখন তাড়িতের কণিকাগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া আসে, এবং নিশ্চল ভাবে স্থির থাকে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া তাড়িতের কণিকাগুলি ধীরে চলে; কিন্তু রেডিয়ম ধাতু হইতে কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। এই তাড়িত কণিকাগুলি জড় পদার্থ বটে কি না এই সমস্যা। কণিকাগুলির ওজন আছে কি না কেহ জানে না, কিন্তু তাহাদের দ্রব্য আছে, সে বিষয়ে এখন বড় একটা সংশয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধাক্কা দিবার এবং ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া দ্রব্যের নিরূপণ হয়, জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন, ঘোড়া হঠাৎ থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন, ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত; উভয়েরই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা আছে। তাড়িতেরও সেইরূপ ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই আজ আমরা তাড়িতের ধাক্কার টানাপাখা হইতে ট্রামগাড়ী পর্য্যন্ত চালাইতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিজলি বাতি জ্বালাইয়া আঁধার ঘর আলো করিতেছি। মাইকেল ফারাডে, যাঁহার প্রসাদে আজ আমরা বিজলি বাতির আলো ও টানাপাখার হাওয়া ভোগ করিতেছি, তাড়িতের এই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার প্রবৃত্তি তাঁহারই আবিষ্কৃত। তাঁহার পূর্ব্বে এই তথ্য গুহায় নিহিত ছিল।

তাড়িতে যখন এই প্রবৃত্তি আছে, তখন উহা দ্রব্যবিশিষ্ট জিনিষ এবং উহাতে

জড়ত্ব বর্ত্তমান। তাড়িত-কণিকার আবিষ্কারের পর দেখা গিয়াছে, তাড়িতের কণিকাগুলিতেও এই জড়ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, অচল থাকে, ততক্ষণ উহাদের জড়ত্ব থাকে না; যখন বেগে চলে, তখনই উহাদের জড়ত্ব জন্মে; এবং যখন বেগ খুব বাড়ে, তখন জড়ত্বও বাড়িয়া যায়। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল কথা নিতান্তই হেঁয়ালি ঠেকিবে; কিন্তু উপায় নাই। এই সকল বাক্যের তৎপরতা বুঝাইবার এ সময় নহে। সোণা রূপা জল বাতাস প্রভৃতি আমাদের চিরপরিচিত জড় পদার্থের সহিত এই অভিনব জড় পদার্থের এইখানে প্রভেদ। পাঁচ ভরি সোণার দ্রব্য-পরিমাণ সর্ব্বদাই পাঁচ ভরি; উহা বাক্সে বন্ধ থাকিলেও পাঁচ ভরি, আর বেগে ছুটিলেও পাঁচ ভরি। কিন্তু তাড়িত কণিকাগুলি যখন ধাতু পদার্থের গায়ে নিশ্চলভাবে জমিয়া থাকে, তখন উহার দ্রব্য পরিমাণ নাস্তি; যখন টেলিগ্রাফের তার বাহিয়া চলিতে থাকে, তখন অস্তি; আর যখন রেডিয়ম হইতে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অস্তি। সেকণ্ডে দশ বিশ হাজার ক্রোশ বেগে ছুটিতেছে, এমন তাড়িত কণিকা আজকাল বৈজ্ঞানিকদের হাতের মুঠায়; ঐ সকল কণিকার দ্রব্যপরিমাণ প্রচুর। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়াছেন যে, যে কণিকার বেগ সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি, তাহার জড়ত্ব একবারে অপরিমেয়—পরিমাণের অতীত হইবার সম্ভাবনা হয়। সোণা রূপা জল বাতাসের দ্রব্য-পরিমাণ বেগ বাড়িলে বাড়ে না, কিন্তু তাড়িত কণিকার বেগ বৃদ্ধির সহকারে দ্রব্যের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তাড়িত কণিকাকে জড় পদার্থ বলিতে কাহারও আপত্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থ—সোণা রূপার মত জড় পদার্থ—বহু সংখ্যক তাড়িত কণিকার সমবায়ে উৎপন্ন, এইরূপ একটা নূতন কথা উঠিয়াছে। রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের পরমাণুগুলি আপনা হইতে ভাঙ্গিতেছে এবং সেই ভঙ্গুর পরমাণুর মধ্য হইতে তাড়িত কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় পদার্থের পরমাণুগুলি তাড়িত কণিকাদ্বারাই নির্ম্মিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে শ দরুনে বা হাজার দরুনে তাড়িত কণিকা আটকান আছে; আটকান আছে বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে তাহারা বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক একটা পরমাণু যেন এক একটা ঘূর্ণী—বহুসংখ্যক তাড়িত কণিকার ঘূর্ণী। লর্ড কেলবিন ঈথরের ঘূর্ণী কল্পনা করিয়াছিলেন; এখন অনুমান হইতেছে, জড় পরমাণু তাড়িত কণিকার ঘূর্ণী। ঘূর্ণীর মাঝে পড়িয়া কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে, এই জন্যই উহাদের দ্রব্যবত্তা; এবং কণিকাগুলির দ্রব্যবত্তার

ফলে পরমাণুটিরও দ্রব্যাবস্থা। এই দ্রব্যাবস্থা যখন বেগসাপেক্ষ, তখন জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই বলিয়া শান্তি উপভোগ আর চলিবে না। বেগ বাড়িলে যদি দ্রব্য বাড়ে, তখন দ্রব্যের উৎপত্তি নাই, এ কথা টিকিবে কেমন করিয়া?

জড় পদার্থের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে জড় পদার্থকে একবারে নির্ব্বাসন করিতে চাহেন এবং জড়ের স্থানে শক্তি নামক পদার্থকে বসাইয়া তাঁহারই শ্রীচরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ করিতে চাহেন। জড় পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইহাঁরা যেন অনিচ্ছুক; আমাদের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে কারবার করে না; শক্তির সহিতই ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক; শক্তির আঘাত পাইয়া শক্তির বাহনস্বরূপ জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এই হেতু শক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারবার দেখিয়া জড় পদার্থের কল্পনা হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রকে অব্যাহতি দিতে এই দলের পণ্ডিতেরা উৎসুক। আগে বলা হইত, জড় শক্তি-দেবতার বাহন; শক্তির আধার জড়। ইহাঁরা বলিতেছেন, শক্তিই সর্ব্বময়ী; জড়ের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না।

বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত এই শক্তির তাৎপর্য্য কি? কাব্যের ভাষা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের গদ্যে উপস্থিত হইলে দেখা যায়, এই শক্তি কাজ করিবার শক্তি। এই কাজ শব্দটি আবার বিজ্ঞানশাস্ত্রে অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। কোন ভারী জিনিষ যখন নীচে নামে, তখন সে কাজ করে; আর যত উর্দ্ধে উঠে, তত কাজ করিবার ক্ষমতা পায়। পৃথিবীর টানে সকল বস্তুরই ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে ভূমির অভিমুখে যাহা পড়ে, তাহা কাজ করে। প্রোক্রেসর রামমূর্ত্তির মত বুকের উপর চব্বিশ ঘণ্টাকাল হাতী চড়াইয়া রাখিলে কোন কাজ হয় না, কিন্তু এক কাঁচ্চা দ্রব্য হাত খানেক নীচে নামিলেই খানিকটা কাজ হয়। দুই হাত নামিলে দ্বিগুণ কাজ হয়। যেখানে যত রকম শক্তি আছে, সমস্তই এই কাজ করিবার শক্তি। বেগে চলন্ত বস্তুর শক্তি আছে, কেন না চলন্ত বস্তু যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিয়া সেই বোঝাকে কাজ করিবার শক্তি দেয়। তপ্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন না উহার উত্তাপ দ্বারা যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিতে পারা যায়। তাড়িতযুক্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন না ঐ তাড়িত প্রয়োগেও আমরা বোঝা তুলিতে পারি। রসায়নে শক্তি আছে;

কেন না ঐ কয়লা পোড়াইয়া আমরা বোঝা তুলিতে পারি। এঞ্জিনে আমরা কয়লা পোড়াইয়া কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি বাহির করিয়া লই এবং সেই শক্তির প্রয়োগে বড় বড় বোঝা ঊর্দ্ধে তুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র জড়কে অবিনাশী বলিয়াছিল,—আর ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তির অবিনাশিতা প্রতিপন্ন করিয়া জয়ধ্বজা তুলিয়াছে। শক্তির অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝায় যে, শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণের কখনও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। এই তত্ত্বটি স্পষ্ট বুঝিতে হইলে দুই একটা দৃষ্টান্ত আবশ্যক হইবে।

চলন্ত দ্রব্যের শক্তিমত্তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু চলন্ত দ্রব্যের শক্তি অতি সহজে উত্তাপে পরিণত করা যায়। নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারিলে হাতুড়ি ও নেহাই উভয়ই গরম হইয়া উঠে। চলন্ত রেল গাড়ীর এঞ্জিন ব্রেক দিয়া থামাইবার সময় এঞ্জিনে গাড়ীতে আরোহীতে ও লগেজে যে শক্তিরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহার সমস্তটা উত্তাপে পরিণত হইয়া ব্রেকের পিঠ হইতে ঝর ঝর করিয়া অগ্নিকণা নিকলিতে থাকে। চলন্ত দ্রব্য থামিয়া যায়, তাহার শক্তির তিরোধান ঘটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে খানিকটা উত্তাপের আবির্ভাব হয়। এখানে হইল চলন্ত দ্রব্যের শক্তির উত্তাপে পরিণতি। আবার উত্তাপের পরিণতিতে নিশ্চল দ্রব্য চলচ্ছক্তি পাইয়া বেগে চলিতে থাকে। উদাহরণ এঞ্জিন; এখানে কয়লা পোড়াইলে উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপের কিয়দংশের তিরোভাব ঘটে; তৎপরিবর্ত্তে এঞ্জিনযুক্ত রেলগাড়ি মাল আরোহী ও লগেজ চলিতে আরম্ভ করে—অর্থাৎ চলচ্ছক্তি অর্জ্জন করে। উত্তাপের স্থানে শক্তি অন্যরূপে আবির্ভূত হয়। বলা হয়, এই সকল দৃষ্টান্তে শক্তির ধ্বংস বা উৎপত্তি দেখা যায় না। দেখা যায় যে, শক্তি এক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শক্তির পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাই। দেখা যায় যে, জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শক্তির আনাগোনা চলাফেরা চলিতেছে; সেই অবসরে শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু শক্তির পরিমাণের ইতরবিশেষ ঘটিতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল শক্তির যাবতীয় রূপ ঝুড়াইয়া ও পাকার করিলে দেখা যাইবে, শক্তির পরিমাণে কমও নাই, বৃদ্ধিও নাই। শক্তির এক কণিকা কেহ নূতন উৎপাদন করিতে পারে না বা ধ্বংস করিতে পারে না।

বিশ্ববিখ্যাত জুল সাহেব এইরূপ হিসাব দিয়াছেন। এক সের জলকে এক ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, সেই উত্তাপকে যদি এঞ্জিন যোগে রূপান্ত-

রিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এক সের জল পৌনে আট শত ফুট উর্দ্ধে তোলা চলিবে। পক্ষান্তরে পৌনে আট শত ফুট উঁচু হইতে এক সের জল ঢালিয়া দিলে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা যদি ছড়াইয়া না পড়িয়া সেই এক সের জলেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ জল এক ডিগ্রি গরম হইবে। অর্থাৎ এক সের জলকে পৌনে আট শত ফুট উপরে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি উত্তাপে পরিণত হইলে সেই জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি মাত্র বাড়াইয়া দিবে।

সর্ব্বত্র এইরূপ হিসাব বাঁধা আছে। এতটা চলচ্ছক্তি খরচ করিয়া আমরা এত উত্তাপ পাই, আবার এতটা উত্তাপ খরচ করিয়া আমরা এতটা চলচ্ছক্তি পাই। এক রকমের শক্তি খরচ না করিলে অন্য রকমের শক্তি পাওয়া যায় না। কোন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, কোন না কোন স্থানে অন্য কোন রকমের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, শক্তির রূপ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শক্তি অবিনাশী, হয় ত অনাদি।

বলা হয়, এক সের জল এক ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, আর এক সের জল পৌনে আট শত ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তি লাগে, উভয়েরই পরিমাণ সমান। কিন্তু এই সমানতা কিরূপ? এই প্রবন্ধের আরম্ভেই এই সমান শব্দটির অর্থ লইয়া কিছু গোলে পড়া গিয়াছিল। এখানেও সেই গোল আছে কি না?

একটা টাকা দুইটা আধুলির সমান—কিরূপ সমান? টাকা যে জিনিষে অর্থাৎ যে রূপাতে নির্ম্মিত, আধুলিও সেই রূপাতে নির্ম্মিত। এখানে টাকায় ও আধুলিতে সমানতা আছে। নিক্তির এক পাল্লায় টাকা আর পাল্লায় দুটা আধুলি রাখিলে দেখা যাইবে, উভয়েরই ওজন সমান। তুলা যন্ত্রে তুলনা করিয়া সমান দেখা যায়, অতএব এক টাকা দুই আধুলির তুল্য। আবার ওজন সমান হইলে দ্রব্যপরিমাণ সমান হয়, এই হেতু দ্রব্যপরিমাণেও উহারা তুল্য। পরন্তু এক টাকার বদলে দুই আধুলি এবং দুই আধুলির বদলে এক টাকা সর্ব্বদা পাওয়া যায়; উহাদের মূল্য সমান; অতএব উহারা তুল্যমূল্য। অতএব একটা টাকা ও দুইটা আধুলি উপাদানে সমান, ওজনে ও দ্রব্যে সমান এবং মূল্যেও সমান।

আবার আমরা বলি, একটা টাকা ষোল আনা পয়সার সমান। এবার কিরূপ সমান? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এখানে উপাদান এক নয়; ওজনও এক নয়; একটা টাকায় যে দ্রব্য আছে, ষোল আনা পয়সায় দ্রব্য তার চেয়ে

প্রচুর অধিক আছে ; তবে কিসে সমান ? উত্তর,—উভয়ের মূল্য সমান ; এক টাকার বদলে সর্ব্বদা ষোল গণ্ডা পয়সা ও ষোল গণ্ডা পয়সার বদলে সর্ব্বদা একটা টাকা পাওয়া যায়, এই বলিয়া উহারা তুল্যমূল্য। এখানে সমান অর্থে তুল্য-মূল্য ; তুল্য নহে।

অতএব টাকাকে আমরা যে অর্থে দুই আধুলির সমান বলি, ঠিক্ সে অর্থে উহাকে ষোল আনা পয়সার সমান বলিতে পারি না। ইংরেজি ভাষায় এক টাকা ও ষোল আনা পয়সাকে equal না করিয়া equivalent বলা হয়।

এখন এক রকমের শক্তি খরচ করিয়া যখন আমরা তাহার বিনিময়ে অন্যরূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের হার যখন বাঁধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁধা আছে, তখন ইহার ঐ দুই মূর্ত্তিভেদকে তুল্য না বলিয়া তুল্যমূল্য বলাই উচিত ; equal না বলিয়া equivalent বলাই উচিত। খানিকটা উত্তাপের বিনিময়ে যতটা গতিশক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে উত্তাপের equal না বলিয়া উত্তাপের equivalent বলাই হইয়া থাকে। জুল সাহেব heatএর mechanical equivalentই বাহির করিয়াছিলেন।

বস্তুতই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদের মধ্যে আর কোনরূপ সাদৃশ্য বা স্বজাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এক মাত্র দৃষ্ট হয় তুল্যমূল্যতা। তাড়িত শক্তির সহিত তাপ-শক্তির কোথায় কোন গূঢ় সাদৃশ্য আছে কি না তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও বলিতে পারেন না, কিন্তু এতটা তাড়িত শক্তির বদলে এতটা তাপশক্তি পাওয়া যাইবে,তাহা তাঁহারা অক্লেশে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন। একটা টাকা বদল দিয়া কত পয়সা পাওয়া যাইবে, অথবা এক খানা নোটের বদলে কত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা গবর্মেণ্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন। যতদিন গবর্মেণ্টের সেই বাঁধাবাঁধি আইন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ঐরূপ বিনিময়ে কাহাকে ঠকিতে হইবে না। হাজার টাকার বদলে একখানা চৌতা কাগজ পাইয়াও আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব, যে আমার এক পয়সা কমে নাই ; আমার ধনের পরিমাণে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। প্রকৃতি রাণীর গবর্ণ-মেণ্টেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানেও তাড়িত শক্তির পরিবর্ত্তে উত্তাপ ও উত্তাপের পরিবর্ত্তে তাড়িতশক্তি পাওয়া যায় এবং বিনিময়ের হারও নির্দ্দিষ্ট আছে। হার নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াই হাজার মণ বোঝা নামাইতে বা তুলিতে কত মণ কয়লা পোড়াইতে হইবে, এবং চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া এত বাতির সমান বিজলি বাতি জ্বালাইতে কত আউন্স কয়লা বা দস্তা পোড়াইতে হইবে, তাহার হিসাবেও কখনও ঠকিতে হয় না। দুই গবর্ণমেণ্টে প্রভেদ এই যে,

প্রকৃতি স্বাধীন এলাকা বিশ্বব্যাপী ; আর তাঁহার আইনকানুনে বিধিব্যবস্থার কখনও খাপ্‌খেয়ালি নাই। তদ্ভিন্ন আর কোন ভেদ নাই।

একটা গরুর বদলে দশটা ভেড়া ও দশটা ভেড়ার বদলে একটা গরু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গো-স্বামী, সমস্ত গরুকে ভেড়ায় পরিণত করিয়া মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন,—আমার গোশালায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই এবং বিনিময়ের ঐ হার যদি চিরকাল বজায় থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অদল বদল করিয়া কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। একটা গরু দশটা ভেড়ার তুল্যমূল্য হইবে ; এমন কি এই অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে দশটা গরু একটা ভেড়ার সমান বলিয়া গণ্য হইবে। এই বৃহত্তর বিশ্বশালায় শক্তির কখনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, ইহাও একটা সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে সত্য। সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেও ইহা পরীক্ষালব্ধ সত্য ; কিন্তু ইহার ভিতর কোনরূপ স্বতঃসিদ্ধতা নাই। এই যে পারিভাষিক অর্থ, তাহা আমরাই অর্পণ করিয়াছি। কাজ করিবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলি ; এই পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনগড়া। এই শক্তির কোন ধর্ম্ম আমরা যদি পর্য্যবেক্ষণে আবিষ্কার করি, তাহাতে স্বতঃসিদ্ধতা কিছুই থাকিতে পারে না।

ফলে যে সকল তথাকল্পিত সত্য লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি ও তাহাদিগকে সমাতন সার্ব্বভৌমিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্ব্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য। পরম দেবতা কোথায় কি ভাবে আছেন আমরা জানি না ; আমরা তাঁহার মনগড়া পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিতেছি।

ফলতঃ আমরা পাঁচটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া এই বিশ্বজগতের কিয়দংশমাত্র প্রত্যক্ষ করি ; এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোথায় কি আছে তাহার কোন সন্ধান রাখি না। অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি কোন কালে না পাই, তাহা হইলে এই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে আমরা কখনও যাইতে পারিব না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপে যে ভাবে আমাদিগকে জানায়, তেমনি ভাবে আমরা জানি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপযোগী বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় না থাকিয়া অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগী অন্য কোনরূপ ইন্দ্রিয় যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। বর্ত্তমান প্রাকৃতিক বিধানে অভিব্যক্তির পরিণামে আমরা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বর্ত্তমান মনোবৃত্তি পাইয়াছি। বিশ্বজগৎ আমাদিগকে যেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরা সেইরূপেই গড়িয়া উঠিতেছি এবং এই সঙ্কীর্ণ গঠন প্রণালীর

ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশকে আমরা যে ভাবে দেখিবার অধিকারপাইয়াছি,সে অংশকে সেইভাবেই দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয় অন্যরূপ হইলে জগতের মূর্ত্তিও অন্যরূপ হইত; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় সেই একই জগতের মূর্ত্তিরও অন্যরূপ বিবরণ দিত। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিকৃত বা সর্ব্বসাধারণের তুল্য নহে, তাহার নিকট জগতের মূর্ত্তিও অন্যরূপ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান ভাষা তাহার নিকট অর্থহীন। আমরা অধিকাংশ লোকে যাহা দেখিতেছি, তাহা বিশ্বজগতের একটা বিশেষরূপ সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তিমাত্র;—আমরাই বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যলব্ধ এই মূর্ত্তি আমাদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছি, এবং ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছি। জড় ও শক্তি আমাদেরই মনঃকল্পিত মূর্ত্তির প্রকারভেদমাত্র। একটা সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে উহাদের অবিনাশিতা আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি। অন্যরূপ পারিভাষিক অর্থ দিলে এই জড়ের এবং এই শক্তির অবিনাশিতা থাকিত না; অথচ তাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভাষা অন্যরূপ হইলেও ফল অন্যরূপ হইত না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কর্ম্ম সেই সঙ্কীর্ণ মনগড়ামূর্ত্তি কল্পনার প্রধান উপায়। যেরূপে যে ভাবে দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা সুসাধ্য হয়, বিশ্বজগৎ আমাদিগকে তেমনি করিয়া গড়িয়াছেন ও আমরা তেমনি ভাবে দেখিতেছি। বিশ্বজগৎ আর আত্মজগৎ পরস্পরকে পরস্পরের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; অন্যভাবেও গড়িতে পারিত না, এমন নহে। পরস্পর উপযোগিতা না থাকিলে আমরা ক্ষণমাত্র টিকিটে পারিতাম না। উপযোগিতা আছে বলিয়াই আমাদিগকে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় না। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ। ঠকিতে হইলে আমরা টিকিতে পারিতাম না। কিন্তু গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল পরীক্ষালব্ধ বা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার মাত্র; আমরা দেবতাকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি এবং এক একটি পুতুলের এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি। বিজ্ঞান যে এই মনগড়া মূর্ত্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা হীনতা নাই; কেন না যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার অনুকূল সঙ্কীর্ণ ভাবে মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকেও সঙ্কীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নর্ত্তকীর কূপ।

—•:ঃ•—

১

রামরাজা বিদার বেজনগর আক্রমণ করিয়াছেন। নগর সুরক্ষিত—সহজে শত্রুহস্তগত হয় নাই; কিন্তু অবরুদ্ধ নগরে নগরবাসীদিগের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। নগরে খাদ্য-দ্রব্য ফুরাইয়া আসিয়াছে, কূপে জল শুকাইয়া উঠিয়াছে। ধনীরা অতি কষ্টে কিছু খাদ্যসংগ্রহ করিতে পারিতেছেন। দরিদ্রগণ অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া পীড়িত হইতেছে; নগরে ব্যাধির বিস্তার বাড়িতেছে। সকলেই চিন্তিত, সকলেই বিজাপুরের সম্রাট ইস্‌মাইল আবদুল শাহার প্রতি-শ্রুত সাহায্যের আশায় পথ চাহিয়া আছেন। কিন্তু বিলম্বহেতু আশার আলোক নিরাশার অন্ধকারে বিলয়োন্মুখ হইতেছে। তথাপি পুরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণে সম্মত নহে। সকলেই সকল কষ্ট সানন্দে সহ্য করিতেছে। তদ্ভিন্ন পুরাঙ্গনারাও পুরুষদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন; আপনারা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যোদ্ধৃবর্গের আহার যোগাইতেছেন। কিন্তু এমন করিয়া আর কয় দিন কাটিবে? জল ফুরাইলে আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত উপায় থাকিবে না। অবরুদ্ধ নগরীর অধিকারী আমীরের নয়নে নিদ্রা নাই, মনে সুখ নাই। প্রজার কষ্টে, ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রাসাদ-চূড়ায় উঠিয়া পথের দিকে চাহিতেছেন,—শাহার সৈন্যদল আসিতেছে কি না। শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র পুরমধ্যে গোলাবর্ষণ করিতেছে—গৃহাদি ভগ্ন হইতেছে; কত বীরের জীবনান্ত হইতেছে। নগরের উপর আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা যেন নিদাঘদিনান্তের প্রলয়-মূর্ত্ত—বজ্রগর্ভ—কৃষ্ণ মেঘের মত অবস্থান করিতেছে।

২

আলমা বিদারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী। তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও অনন্য-সাধারণ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাহার খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত করিয়াছিল। শাণিত হইলে অস্ত্রের ধার যেমন তীক্ষ্ণতর হয়, শিক্ষার ফলে তাহার কণ্ঠস্বর তেমনই মিষ্টতর হইয়াছিল। আলমার গান না হইলে নবাবের প্রাসাদে ও আমীর ওমরাহদিগের গৃহে উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত না। অনেক সময় তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির দরবারে গাহিতে যাইতে হইত। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী ছিল। এই বিপদের সময় সে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া পুররক্ষার সঙ্কল্প করিল। সে দরিদ্রদিগের

গৃহে গৃহে খাদ্য ও ঔষধ বিতরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। শ্রান্তি নাই—ক্লান্তি নাই—সে ক্ষুধিতের ও ব্যাধিতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিল। আপনার কষ্ট সে কষ্ট বলিয়াই মনে করিল না। অজস্র সুখে অভ্যস্তা নর্ত্তকীর এই দৃষ্টান্তে পুরবাসীরা ও সৈনিকদল দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইল। কিন্তু বিধাতা বুঝি বিমুখ! আলমার গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রসন্নসলিল কূপের জল ও তাহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় উভয়ই ফুরাইয়া উঠিল। তথাপি অবরোধ শেষ হইল না—শাহার সাহায্য আসিল না।

৩

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা; রাজপথ সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। দুই জন সহচর সঙ্গে লইয়া আলমা নগরের প্রান্তস্থিত দরিদ্রপল্লী হইতে ফিরিতেছে। গুরু শ্রমে তাহার দেহ শীর্ণ হইয়াছে; রক্তাভ গণ্ডে অস্থি দেখা দিয়াছে; তপ্তকাঞ্চন বর্ণ মলিন হইয়াছে। শ্রান্তদেহে সে গৃহে ফিরিতেছে।

পথিপার্শ্বে ভগ্ন দেবালয় হইতে আগত শিশুর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া আলমা সেই দিকে চলিল। আলোকধারী সহচর সে দিকে যাইতে ইতস্ততঃ করিল। সে ভগ্ন দেবালয়ে দিবসে বিষধরগণ বিশ্রাম করে। সে মৃত্যু-মন্দিরে নিশায় প্রবেশ করা দুঃসাহসিকের কার্য্য। কিন্তু আলমার আদেশে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিচারককরধৃতআলোকবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে যে দৃশ্য আলমার নয়নে পতিত হইল তাহা নরকেরই উপযুক্ত। মন্দিরের পাষাণ ধর্ম্মতলে—শুষ্কবেদীমূলে একটি শীর্ণকায় পুরুষের শব পড়িয়া আছে—তাহার পার্শ্বে একজন কঙ্কালসার রমণী একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া একটি শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যতা! রমণীর নয়নে কি পৈশাচিক দীপ্তি! আলমা বলিল, "তুমি কে? এ ভীষণ স্থানে কেন আসিয়াছ?"

রমণী উত্তর করিল, "আমি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি। অনন্যোপায় হইয়া আমি ও আমার স্বামী এই দেবমন্দিরে পুত্রকে নিহত করিয়া তাহার শোণিত পান করিব, স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এই স্থানে আসিয়া স্বামীর শেষ শ্বাস বায়ুতে মিশাইয়াছে। আমি—আমি—"

আলমা বালককে বক্ষে তুলিয়া লইল। সহচরদিগকে রমণীকে আনিবার জন্য আবশ্যক উপদেশ দিয়া শিশুকে বক্ষে লইয়া অত্যন্ত মন্থর গতি পরিহার করিয়া দ্রুত পদে সেই অন্ধকারাবৃত পথে গৃহাভিমুখগামিনী হইল।

৪

আলমা গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পদভরে তোরণের হর্ম্ম্যতলস্থ একখানি প্রস্তর নিম্নে পড়িয়া গেল। আলমার মনে হইল যেন প্রস্তর খানি গড়াইয়া কোন তরল পদার্থে ডুবিয়া গেল। সে বালককে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া শয্যায় রাখিয়া আসিয়া ভৃত্যদিগের দ্বারা সেই স্থানে কয়খানি প্রস্তর উঠাইল। নিম্নে অন্ধকার গর্ত্ত। বর্ত্তিকার আলোকে সোপান দেখা গেল। ভৃত্যগণ সাহস করিয়া সেই অজ্ঞাত অতলে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন আলমা বলিল, "আমি জলের শব্দ শুনিয়াছি। আমি যাইব।" ভৃত্যগণ বলিল—"এমন কায করিবেন না। এ শয়তানের ছলনা।" আলমা বলিল, "যদি সহস্র লোকের জীবনোপায় করিতে যাইয়া আমার এ তুচ্ছ জীবন যায় তাহাতে দুঃখ কি?" ভৃত্যের হস্ত হইতে বর্ত্তিকা লইয়া আলমা দ্রুতপদে সোপানে অবতরণ করিতে লাগিল। সে কিছু দূর যাইলে বর্ত্তিকা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। ঝপ করিয়া শব্দ হইল।

চারিদিক অন্ধকার। উপরে ভৃত্যবর্গ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

আলমা প্রকোষ্ঠ হইতে হীরক-খচিত বলয় মুক্ত করিল—অন্ধকারে হীরক জ্বলিয়া উঠিল; সেই আলোকে আলমার পদতলে জল দেখা গেল। সে বলয় অমূল্য, আলমা তাহা জলে নিক্ষিপ্ত করিল। বলয়-পতন-শব্দে নিম্নে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। আলমা জানু পাতিয়া বসিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

এ কথা নগরে প্রচারিত হইল। এই দৈব কৃপায় নগরবাসীদিগের হতাশ হৃদয়ে নূতন আশা সঞ্চারিত হইল। ভগবান তাহাদের সহায়।

কয় দিন পরে শাহার সেনাদল আসিল। বিদার শত্রুকবলমুক্ত হইল।

বহুদিন আলমার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আজও নর্ত্তকীর কূপের কিম্বদন্তী তাহার পুণ্যস্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

রামায়ণী সভ্যতা।

শিক্ষা-প্রণালী।

রামায়ণী যুগে ভারতে শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, রামায়ণ-পাঠে তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। তৎকালীন আচারব্যবহার ও রীতি-নীতি হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আদিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্রগণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা দশরথ তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। রাজকুমারগণও শিক্ষাগুণে অল্পকাল-মধ্যেই সর্ব্ববিষয়ে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন।

সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ। ২০
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
* * * *
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ। ২১
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।
১৮শঃ সর্গঃ।

উপর্যুক্ত শ্লোক হইতে বিশেষ ভাবেই অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে রাজ-কুমারদিগের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; এবং বেদ অধ্যয়ন, অস্ত্র পরিচালন, নীতি শিক্ষা, গজারোহণ, অশ্বারোহণ, রথারোহণ ও পিতৃসেবাদিই শিক্ষনীয় বিষয় ছিল।

এই শিক্ষা গুরুগৃহে সম্পন্ন হইত, কি ছাত্রগৃহে গুরুর দ্বারা সম্পাদিত হইত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।*

তখন বেদ-পাঠে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার ছিল না। প্রত্যেক গৃহস্থই বেদ পাঠ করিতে পারিতেন, এবং বেদ-পাঠ প্রত্যেক গৃহস্থের প্রত্যহিক অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

রামের বনগমনের দিন অযোধ্যা এক অভাবনীয় বিষাদময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

---

* দশরথ এবং রাবণ গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তদীয় রামায়ণের অনুবাদে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মূল রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না।

ন চাস্মন্ন্যত্র চাযোধ্যম্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাপ্যেতস্ত পণ্যানি নাপঠন্ গৃহমেধিনঃ ॥২।৬৮।৪

"সে দিন অযোধ্যানগরের কেহই আমোদআহ্লাদ করিল না—বণিক্ ব্যবসায়িগণ পণ্যদ্রব্য সজ্জিত করিল না এবং গৃহস্থেরা বেদ পাঠ করিল না।"

তখন বেদ-পাঠ প্রত্যেক গৃহস্থের দৈনিক কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। বেদ পাঠ না করিয়া কেহই অন্ন গ্রহণ করিতেন না। রামের বনগমনে লোকের মনে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহারা সে দিন আহার করা দূরে থাকুক—বেদ-পাঠ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন বেদ-পাঠে কাল অতিবাহিত করিতেন।

তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ ॥১।১৮।৩৬

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "না পঠন গৃহমেধিনঃ" পাঠ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে আর্য্যসমাজে আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজের Mass Education-এর ন্যায় সাধারণ শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত ছিল।

বেদ্ যে তখন আর্য্যসমাজের চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যেই কেবল আবদ্ধ ছিল, তাহাও নহে। তখন অনার্য্যগণও বেদ পাঠের অধিকারী ছিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে দেখা যায়, হনুমানের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

নানৃগ্বেদবিনীতস্ত নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
না সামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥ ২৮
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥ ২৯

"লক্ষ্মণ, ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ এইরূপ উৎকৃষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু একটিও অপ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে, ব্যাকরণ প্রভৃতিও ইনি বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন।"

অন্যত্র রাবণ সম্বন্ধে বিভীষণ রামকে বলিতেছেন—

এষো হিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্রশূরঃ ॥৬।১১১।২০

"রাবণ আহিতাগ্নি, মহাতেজস্বী, এবং বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।" এতদ্ব্যতীত সুপার্শ্বও রাবণকে "বেদ বিদ্যাব্রত স্নাত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(শঙ্কা। ৯৩) সুতরাং বেদ যে আর্য্যসমাজের ব্রাহ্মণগণেরই কেবল সম্পত্তি ছিল তাহা নহে। তখন আর্য্য অনার্য্য সকলেই বেদ-পাঠে অধিকারী ছিলেন।

তখন মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ছিল। ঋক্-বেদজ্ঞগণ হোতা, যজুর্ব্বেদজ্ঞগণ, অধ্বর্য্যু ও সামগায়কগণ উদ্গাতা উপাধিতে ভূষিত হইতেন। ত্রিবেদজ্ঞগণ ব্রহ্মা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

তখন ঋষিগৃহে শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতেন। ঋষিগণও স্ব স্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করিতেন। অধ্যাপনার বিষয়গুলি "শাস্ত্র" নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরই শত সেবক রাখিবার প্রথা ছিল।* এই শত সেবকের ভরণপোষণের ব্যয় অধ্যাপককেই বহন করিতে হইত। অধ্যাপকগণ ধনবান ও রাজাদিগের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। রাজা দশরথ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন ও দেশাদি দানে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (অ—১৪)

কিরূপে "শাস্ত্রে"র অধ্যাপনা হইত, লিখিত গ্রন্থাদির সাহায্যে হইত কি মৌখিক শিক্ষাদান প্রণালী তখন প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার সম্বন্ধে রামায়ণে সবিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

রামায়ণের সময় ভারতে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া রামায়ণে কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে বর্ণমালা উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই রচনা-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সকল রচনা ঋষিগণের স্বাভাবিক মনোভাব হইতে স্ফূরিত ও জনগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হইত। বেদ প্রভৃতি যে সকল সুপ্রাচীন মন্ত্র পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাবদ্ধ হইয়াছে সে সকল রচনাকালেই লিখিত ও গ্রন্থাকারে পরিণত হয় নাই। বেদ মন্ত্র ও অনুশাসনগুলি রচিত হইয়া শ্রুতি স্মৃতির সাহায্যে প্রচারিত হইত বলিয়া সেগুলি যথাক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

ইহার পর ক্রমে ব্যাকরণ, বর্ণমালা পরিকল্পিত হইয়া বেদাঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে। রামায়ণে ব্যাকরণের উল্লেখ আছে। সুতরাং রামায়ণের সময় বর্ণমালার অবয়ব কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে মুদ্রা লিপি, ধাতুলিপি, প্রস্তরলিপি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়া, লেখনিসম্ভবা লিপি আরম্ভ হইয়াছে—ইহাই লিপিপ্রবর্ত্তনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বলিয়া মনে

* যা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কাঞ্চিদ্রাশতাদুপচরত্যথা ৪।১।৯৮।১১

হয়। রামায়ণে এতৎ সম্বন্ধে কিরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় এস্থলে তাহার আলোচনা করা গেল।

রামায়ণের কোন স্থানেই পত্র, লেখনী, মসী, গ্রন্থপ্রভৃতি বা এইরূপ লিপ্যাদ্যুদ্যোদক কোন শব্দের উল্লেখ নাই। পরন্তু যে সকল স্থানে ঐ রূপ কোন আভাস পাইবার আশা করা যাইতে পারে, সেই সকল স্থানে লিপি-প্রবর্ত্তনের অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

রাম হনুমানের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।"

"বোধ হইতেছে ইনি বহুবার ব্যাকরণ শুনিয়াছেন।"

অন্যত্র সুমন্ত্র রাজা দশরথকে বলিতেছেন—

শ্রুয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণেচ যথা শ্রুতম্ ॥ ১। ৯। ১

"পুরাণে যাহা শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ করুণ।"

এইরূপ "শুনিয়াছেন," "শুনিয়াছি" প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রুতি ও স্মৃতির প্রাধান্যের সমর্থক। এই সকল বাক্যের ব্যবহারবাহুল্য দেখিয়াই অনুমিত হয় যে, লিখন-প্রণালী রামায়ণের পরবর্ত্তী সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামায়ণে 'অধ্যয়ন' ও 'পঠন' শব্দের উল্লেখ আছে। 'পাঠ' ও 'অধ্যয়ন' দ্বারা কেবল যে লিখিত গ্রন্থ পাঠই বুঝায় তাহা নহে। স্মৃতি আবৃত্তিকেও পাঠ এবং অধ্যয়ন বলা হইয়া থাকে। তৎকালে বেদ-বেদাঙ্গের আলোচনাই অধ্যয়ন ও মন্ত্র উচ্চারণ 'পাঠ' বাচ্যে অভিহিত হইত। মুনি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় স্মৃতি হইতে শিষ্যদিগকে বলিয়া যাইতেন ও শিষ্যগণ একাগ্র মনে তাহা উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। আশ্রমসমূহে এইরূপে শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতেন।

তৎকালে লিপি-প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিলে গুরুতর কার্য্যাদিতে চিঠি পত্রের উল্লেখ থাকিত। রামায়ণে এইরূপ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন। রাম হরধনু ভঙ্গ করিলে মিথিলাপতি রামকে কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ গুরুতর কার্য্য পিতার (দশরথের) বিনা অনুমতিতে ও বিনা অবগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া মিথিলাপতি অযোধ্যায় লোক প্রেরণ করিলেন।

কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্ম্মাত্মা কৃতশাসনান্ ॥ ২৭
যথানুক্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা ॥ ২৮

বাল—৬৭ সর্গ।

"কৌশিক বিশ্বামিত্র 'তাহাই হউক' বলিলে রাজা (জনক) মন্ত্রীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক রাজা দশরথকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া নরপতি দশরথকে যথাযথ বিবরণ নিবেদনপূর্ব্বক আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।"

এ স্থলে লিপি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লিপিপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ স্থানেই লিপির আভাস আশা করা যাইত।

রাজা দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে যে সকল লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

"ত্বরতামিতি কর্ত্তব্যং সর্ব্বানেব ব্রবীমি বঃ। ২।৬৮।৫

এখানেও লিপির উল্লেখ নাই। *

এ তাবত আমাদের মনে হয়, রামায়ণী যুগে ভারতে লেখনিসম্ভবা লিপির প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

স্মৃতিশাস্ত্রে পঞ্চ প্রকারের লিপির কথা উক্ত হইয়াছে।

"মুদ্রালিপি শিল্পলিপি লিপিলেখনিসম্ভবা।
গুণিকা ঘূণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চ স্মৃতাঃ।"

রামায়ণে 'লেখনিসম্ভবা' লিপির কোন আভাস পাওয়া না যাইলেও মুদ্রালিপি (ধাতুলিপি) ও শিল্পলিপির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুদ্রালিপি ও শিল্প (চিত্র) লিপি ভারতের অতি প্রাচীন সম্পদ।

ঋগ্বেদে স্বর্ণমুদ্রা ও হিরণ্যপিণ্ডের উল্লেখ আছে। রামায়ণী যুগে 'নিষ্ক' ও 'সুবর্ণ' নামক মুদ্রার প্রচলন ছিল। রামায়ণের বহুস্থানে তাহার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা কোন নামাঙ্কিত ছিল কি না রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তৎকালে অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতিতে যে নামাঙ্কিত করা হইত তাহার আভাস রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* লিপিবিজ্ঞান প্রচলিত থাকা কালের যে কোন গ্রন্থেই যে এইরূপ স্থানে লিপির উল্লেখ থাকিবে এবং তাহা না থাকিলে তৎকালে লিপি-প্রণালী ছিল না বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, এইরূপ মত আমরা পোষণ করিতেছি না। লিপিবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতে আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা যাইবে।

হনুমান রামের যে অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে রামের নাম অঙ্কিত ছিল। সেই অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া হনুমান সীতাকে বলিতেছেন :—

"রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্। ৫।৩৫।২

বেদে যে "ক্ষুরপ্রজ" শব্দের উল্লেখ আছে, ঐ সকল "ক্ষুরপ্রজ" সাহায্যেই এই সকল ধাতুলিপির কার্য্য সম্পাদিত হইত।

ইহার পর ক্রমে লেখনিসম্ভবা লিপির প্রয়োজনানুসারে তাহার উপকরণাদির (লেখনি, মসী ইত্যাদি) উদ্ভব হইয়াছে ও গ্রন্থাদি লিখিত ও রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং রামায়ণী যুগে লৌখিক শিক্ষাদান প্রণালী প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যায়।

তৎকালে যে সকল সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পাদির বিষয় আলোচিত হইত, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

তুমি।

তুমি স্নিগ্ধ প্রভাতে রবির কিরণ রক্ত আকাশ-গায়;
তুমি সান্ধ্যললাটে জ্যোতির তিলক উজলি' অমল-কায়।
তুমি নৈশ আকাশে বিমল চাঁদিমা জ্যোছনার হাসিরাশি;
তুমি কুঞ্জ কুটীরে কোকিল-কূজন নৈশ সমীরে ভাসি'।
তুমি নন্দনবনে স্ফুট পারিজাত সুরভি পীযূষমাখা
তুমি কিশোরীহৃদয়ে বাঞ্ছিত-ছবি প্রেমের তুলিতে আঁকা।
তুমি কামিনী-কণ্ঠে কমনীয় হার, ফণীর মাণিক যথা;
তুমি প্রেমিক-নয়নে স্নিগ্ধ সলিল ঘুচাতে বিরহ-ব্যথা।
তুমি আমার বিশ্ব উজল করেছ দিবা প্রেমের ছবি;
তুমি অন্ধনয়ন ফুটায়ে আমায় দেখাও তোমারি ছবি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাষাণের কথা।

(৫)

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে নগরের দিক হইতে কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। তখন শিশির কাল। হিমকণসিক্ত প্রান্তরে শুভ্র তুষারের ক্ষীণাবরণ শুভ্র উত্তরচ্ছদের ন্যায় দেখাইতেছিল। হিমকণসিক্ত পত্রপল্লবে তুষারখণ্ড আবদ্ধ থাকায় মনে হইতেছিল যেন বনস্পতিগণ পুণ্যাহে লাজ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। নৈশ তমোভেদ করিয়া যখন পূর্ব্বপ্রান্তে বাহ্লীকাঙ্গনার সীমন্তে সিন্দূর-ছটার ন্যায় অরুণরাগ লক্ষিত হইল, তখন জনসঙ্ঘের পাদপেষণে প্রান্তরের তুষারাবরণ কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে, অসাধারণ কোলাহলে বিহগকুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, নানারাগরঞ্জিত উষ্ণীষে ও শিরস্ত্রাণে সমগ্র প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জনতার মধ্যদেশে রজ্জু-রক্ষিত কোষ্টপালগুপ্তপথ, স্তূপবেষ্টনী হইতে নগরদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেন একটি বিশাল কালব্যাল অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় লম্বমান হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ পূর্ব্বে পুরাঙ্গণাগণ এই পথ পরিষ্কৃত করিয়া গেল, তাহাদিগের পরে কুমারীগণ দলে দলে অঞ্চল ভরিয়া নানাবিধ পুষ্প লইয়া আসিয়া সুগন্ধি কুসুমে পথ আচ্ছন্ন করিয়া গেল। সুগন্ধজলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে সদ্যঃস্নাত বালকগণ আসিয়া পুষ্পরাশি অভিষিক্ত করিয়া গেল। ইতোমধ্যে স্তূপের চারি তোরণের আবরণ-পার্শ্বে উপবিষ্ট বাদকগণ যন্ত্রসংযোগে স্তুতিগান আরম্ভ করিল। আমরা যে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলাম তাহা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য পরিচারকগণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি গন্ধবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নগরদ্বারে তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নগরতোরণ হইতে দেবযাত্রা নির্গত হইল। দেবযাত্রার পুরোভাগে পংক্তির পর পংক্তি চীবরধারী ভিক্ষু ও শ্রমণ। প্রতি পংক্তিতে পাঁচ জন, এইরূপ শতাধিক পংক্তি নির্গত হইল। পরে বাদিকা ও নর্ত্তকীদল পুণ্যসঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন করিতে করিতে ভিক্ষুগণের পদানুসরণ করিল। তাহাদিগের পরে বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নগরের দেবদাসী, গণিকা, নেমাশোভিকাগণ আসিল। ইহারা নগরদ্বার হইতে নির্গত হইলে অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণ সপ্তচ্ছত্র পরিলক্ষিত হইল। শ্বেতচ্ছত্র দর্শনে জনতা হইতে বিশাল কলরব উত্থিত হইল, কোষ্টপালগণের রজ্জুবন্ধন উল্লঙ্ঘিত করিয়া জনসঙ্ঘ নগরাভিমুখে প্রতিগমনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় যাত্রার পথ অবাধ রহিল, কিন্তু সে কলরব আর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে

প্রশমিত হইল না। শ্বেতচ্ছত্র ক্রমে নিকটে আসিলে দৃষ্ট হইল যে, উহার নিম্নে সুবর্ণদণ্ডযুক্ত মুক্তা ও হীরকখচিত চন্দ্রাতপ। রাজা অগরাজু ও তাঁহার মহিষীগণ নিজহস্তে চন্দ্রাতপের স্বর্ণদণ্ড ধারণ করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রাতপের নিম্নে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছত্রদণ্ডধারী পাটলীপুত্রের সেই লোলচর্ম্ম মহাস্থবির। তাঁহার পার্শ্বে শ্বেতাঙ্গ, দীর্ঘকায়, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি দক্ষিণহস্তে একটি স্ফটিকাধার লইয়া আসিতেছেন। মহাস্থবির সেই স্ফটিকাধারের উপরে স্বর্ণছত্র ধারণ করিয়া আছেন। হিমক্লিষ্ট প্রভাতে নগ্নপদে স্বল্পাচ্ছাদন সত্ত্বেও বোধ হইতেছিল যেন, তাঁহার বয়সের অর্দ্ধশতাব্দী কালের হ্রাস হইয়া গিয়াছে, লোলচর্ম্ম পুর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কালভারাবনত দেহযষ্টি দণ্ডের ন্যায় ঋজু হইয়াছে, বোধ হয় নির্ব্বাণলাভ হইলেও তাঁহার আকারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। তাঁহার পার্শ্বচর প্রৌঢ়কে দেখিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন, অন্যান্য সকলে বিস্ময়স্তিমিতনয়নে চাহিয়া রহিল। অদ্য দেবযাত্রায় তথাগতের শরীর-ভার বহনের সৌভাগ্য কাহার হইল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। চন্দ্রাতপের পশ্চাতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ ও তাঁহাদিগের পশ্চাতে নগরের যে কেহ অবশিষ্ট ছিল সকলে বাহির হইয়া আসিল। দেবযাত্রা সম্পূর্ণরূপে তোরণদ্বার অতিক্রম করিল। আজিকার দিনে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ ব্যবহৃত হইল না—রাজা হইতে সামান্য নাগরিক পর্য্যন্ত সকলেই নগ্নপদে দেবযাত্রায় যোগদান করিলেন। ক্রমে যাত্রার পুরোভাগ স্তূপের তোরণের সম্মুখীন হইল। সদ্যঃস্নাত কৌশেয় বস্ত্র পরিহিত যবন শিল্পিচতুষ্টয় জলধারা, অর্ঘ্য ও পুষ্প প্রদানে দেবযাত্রার পূজা করিলেন; পরে যথাক্রমে সমগ্র দেবযাত্রা তিন বার স্তূপবেষ্টনী পরিক্রমণ করিল ও পরে পূর্ব্বতোরণ দিয়া বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরি-ক্রমণের পথে সপ্তবার স্তূপ প্রদক্ষিণ করিল। দেবযাত্রার পুরোভাগ দক্ষিণ তোরণের সম্মুখীন হইলে আর্ত্তিমিদোর পরিক্রমণের পথে আসিয়া বর্ত্তুলাকার স্তূপগাত্র স্পর্শ করিবামাত্র দুই খণ্ড বিশাল প্রস্তর অন্তর্হিত হইল; দৃষ্ট হইল, মানব দেহ পরিমিত স্থান উন্মুক্ত হইয়াছে। যবন শিল্পীর আহ্বানে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত দশজন উল্কাধারী উন্মুক্ত পথে অগ্রসর হইল। অগরাজু, পাটলীপুত্রবাসী মহাস্থবির ও তথাগতের শরীরভারবাহী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ব্যতীত অপর সকলেই বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। চামরহস্তে অগরাজু, স্বর্ণচ্ছত্রহস্তে মহাস্থবির ও শরীরভারহস্তে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ উল্কাধারিগণের পশ্চাতে গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছি, গহ্বরমধ্যে বিস্তৃত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কক্ষের মধ্যভাগে

বিশাল পাষাণনির্ম্মিত আধারে সুবর্ণপাত্রে তথাগতের শরীরসহ স্ফাটিক নিধান নিহিত হইয়াছিল। ক্রমে রাজা,—মহিষীগণ পরে যথাযোগ্য অনুক্রমানুসারে রাজপুরুষ ও নগরবাসিগণ গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথাগতের শরীর দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনক্রিয়া সমাধা করিলেন। শেষ নাগরিক যখন গর্ভগৃহ হইতে নির্গত হইল, তখন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বিপ্রহর কাল অতীত হইয়াছে! ক্রমে প্রান্তর ও নগরোপকণ্ঠ পটমণ্ডপে ও হরিদ্বর্ণ পল্লবাচ্ছাদিত কুটীরে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। নাগরিকগণের কথোপকথনে জানিতে পারিলাম যে, দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে জনসঙ্ঘের একপ্রাণীও নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। দেখিলাম, প্রান্তরে নূতন নগর বসিয়াছে, রাজপুরুষগণ রাজপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, পথিপার্শ্বে—পটমণ্ডপে বা সামান্য বস্ত্রাচ্ছাদনে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে, ক্রেতারও অভাব নাই। নানাস্থান হইতে রন্ধনের ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। জনসঙ্ঘ দেব-দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া উৎসবানন্দে উন্মত্ত হইল। বেইনের বহির্দ্দেশে পুষ্পবিক্রেতৃগণের বিপণি। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাহাদিগের সঞ্চিত পুষ্পরাশি বিক্রীত হইয়া গেল, দিবাবসানের পূর্ব্বে আর তাহাদিগের পণ্য-সংগ্রহ হইল না। স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ হইতে নগরদ্বার পর্য্যন্ত প্রধান রাজপথ। এই পথে পুষ্পবিক্রেতাদিগের, পরে সুরা ও তাম্বুল বিক্রেতাদিগের বিপণি। দেবার্চ্চন সমাপ্ত হইলে নগরবাসিগণ যেন মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়া উঠিল; স্তূপবেষ্টনী হইতে বহির্গত হইয়াই দলে দলে আসব পানে ধাবমান হইল। পণ্য-শালায় প্রবেশ করিয়া পূর্ণপাত্র পান, বাহিরে আসিয়া তাম্বুল ক্রয় ও তাম্বুল বিক্রেত্রীর সহিত হাস্যপরিহাস, কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইলে পুনরায় আসবের বিপণিতে প্রবেশ, এই কর্ম্মেই বোধ হয় অধিকাংশ নাগরিক দিনযাপন করিয়াছিল। নাগরিকগণ উৎসবের দিন যে পরিমাণ সুরা গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহাতে সপ্ত শত বর্ষ পরে হইলে তাহাদিগকে হূণজাতির সহিত তুলনা করিতাম। বৃক্ষতলে কোন স্থানে বারনারীগণ যন্ত্র-সংযোগে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছে; তাহাদিগের স্ফীত কলেবর ও রক্তনেত্র কাদম্বের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। উৎসবের জন্য নৌত্তিকগণ বোধ হয় কদম্ববৃক্ষের কাণ্ড পর্য্যন্ত মকরন্দে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। কোন স্থানে কোন বিলাসী নাগরিকের বিশাল পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। উৎসবের দিবসে নৃত্যগীত ও হাস্যকোলাহলে বস্ত্রাবাস পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে, সুরার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। পথে দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ অর্চ্চনান্তে স্নানার্থ নদীতীরে চলিয়াছে। নদী-

বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ জলযান, নানাভরণ ভূষিত হইয়া মহোৎসবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নদীবক্ষে উৎসবের স্রোত সমভাবে প্রবাহিত, নদী-তীর্থের পথ নাগরিকগণের পাদপেষণে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র নদীর জল বহু লোকের সমাগমে মলিন হইয়া উঠিয়াছে। নদীবক্ষেও ক্ষেপণী হস্তে উৎসব-বিহ্বল তরুণ ও তরুণী, বৃদ্ধ ও বালক। নদীর সান্নিধ্যে বৃক্ষতলে কোন স্থানে চীবরধারী ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিতেছেন, মুণ্ডিতশীর্ষ উপাসক ও উপাসিকাগণ "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আজীবনসঞ্চিত কলুষরাশি ক্ষয়ের চেষ্টা করিতেছেন। কোন স্থানে স্থবির ও ত্রৈপিটকোপাধ্যায়গণ অভিধর্ম্ম কোশ ব্যাখ্যা ও অভিধর্ম্ম বিভাষা শাস্ত্রের কূটতর্ক লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। এইরূপে দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরের মধ্যে উৎসব ক্ষণেকের জন্ত স্থগিত হইল, সকলেই আহারের চেষ্টায় ব্যস্ত হইল। সুবৃহৎ পটমণ্ডপে রাজা ও রাজীগণ সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারের আয়োজন করিয়াছেন। মর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে ভিক্ষু ও স্থবিরগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, রাজা, বৃদ্ধ মহাস্থবির ও নবাগত শ্বেতাঙ্গপুরুষ তখনও অভুক্ত অবস্থায় আছেন, তাঁহারা ভোজন-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভিক্ষুগণের আহার শেষ হইলে সকলে পুনরায় স্তূপ-বেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তখন দিবাকর অস্তমিতপ্রায়। ইতোমধ্যে পরিচারকগণ আমাদিগের পুষ্পসজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, নানাবিধ কাচ ও স্ফটিকনির্ম্মিত দীপ ও পাত্র আনীত হইয়াছে, কারণ সন্ধ্যাসমাগমে স্তূপে দীপোৎসব হইবে। ক্রমে সমগ্র স্তূপ-বেষ্টনী ক্ষুদ্র প্রদীপমালায় সজ্জিত হইল, স্থানে স্থানে উল্কাশ্রেণী সন্নিবিষ্ট হইল, বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্ত স্তূপীকৃত ইন্ধন সংগৃহীত হইল। একে একে সপরিবারে সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ সুসজ্জিত হইয়া বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; নানারত্ন-খচিত, সর্ব্বাভরণভূষিতা, বিচিত্রবেশধারিণী পুরাঙ্গনাগণের একত্র সমাবেশে ভীষণাকার পাষাণবেষ্টনী পুনরায় যেন কুসুমসজ্জায় সজ্জিত হইল।

সন্ধ্যাসমাগমে সমগ্র প্রান্তর আলোকমালায় ভূষিত হইল, প্রতি পটমণ্ডপে, বস্ত্রাবাসে, প্রতি পর্ণকুটীরে প্রদীপশ্রেণী প্রজ্জ্বালিত হইয়া উঠিল। প্রান্তরের স্থানে স্থানে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত হইল। রাজপুরুষগণের আদেশে প্রান্তরের বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল, স্তূপের ও বেষ্টনীর আলোক গুলি প্রজ্জ্বালিত হইলে মনে হইল, যেন চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষমণ্ডল

ইতস্ততঃ উল্কানিক্ষেপ করিতে করিতে নগরপ্রান্তে প্রান্তরমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দীপোৎসবের সহিত উৎসবের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল, সুরা ও তাম্বূলের বিপণিতে প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। রজনী-কালে আলোকমালা ও জনসঙ্ঘের কোলাহলের ভয়ে নিশাচরগণ বহুদূরে পলায়ন করিল। সন্ধ্যা অতীত হইলে রাজা অগ্রমহিষীসমভিব্যাহারে স্তূপের গর্ভ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। গর্ভমধ্যে মহাস্থবির ও নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ পূর্ব্ব হইতে আসীন ছিলেন। রাজা ও রাজ্ঞীগণ আসনগ্রহণ করিলে নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সকলকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা হইতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল।

তিনি বলিলেন, মহারাজ প্রিয়দর্শী ত্রিংশদ্বর্ষকাল চেষ্টা করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে যত স্থানে ভগবান শাক্যের শরীর ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শীর দেহাবসানের পর তথাগতের শরীর-দর্শন মগধবাসী ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। আমরা বহু চেষ্টায় উদ্যান প্রদেশে একটি শরীর-নিধান হইতে কিয়দংশমাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মৌর্য্য রাজবংশের অধঃপতনের পর যখন বন্যার স্রোতের ন্যায় শকতাড়িত যবনজাতি বাহ্লীক হইতে আসিয়া কপিশা ও উদ্যান অধিকার করিয়াছিল, তখনও শরীর-গর্ভ অনেক চৈত্য স্তূপাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কারণ যবনগণ তখনও সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হয় নাই বা এতদ্দেশবাসিগণের সহিত সহানুভূতি করিতে শিক্ষা করে নাই। অধুনা যবনগণ এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং বিদেশীয়গণের অধিকারে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সদ্ধর্ম্মের উন্নতি অতিঅল্পকালমাত্র আরব্ধ হওয়ায় তাহার বাহ্য লক্ষণ এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। সদ্ধর্ম্মের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, হয়ত তাহাও সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। তক্ষশিলা মহা বিহারের অধিকারে ত্রিংশদ্বর্ষ যাপন করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছি, তক্ষদত্তের পুত্র সিংহদত্তকে শতদ্রুনদীতীর হইতে সুবস্তুনদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত সকলেই কৃপা দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মৈত্রেয়নাথের অনুকম্পাবলে আমি গৌতমের শরীরাংশ লাভে সমর্থ হইয়াছি। মহারাজ, যিনি আপনার নগরে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি আর্য্যাবর্ত্তে মহাস্থবিরগণের স্থবির অর্হৎ পাদ ও বোধিসত্ত্বপাদ।

অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী অবনতির পরে সদ্ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাসিগণের সুষুপ্ত মমতা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি মৌর্য্যাধিকারকালে মহাশঙ্খের প্রকৃত গৌরব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই চেষ্টায় এই মহানুষ্ঠান সফল হইয়াছে। তিনি সমগ্র বৌদ্ধ জগতের প্রণম্য। তাঁহারই আদেশে আমি তক্ষশিলা হইতে তথাগতের শরীরাংশ লইয়া শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তে আগরাজুর রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারই আদেশে যবন রাজ্য হইতে যবন শিল্পী প্রেরিত হইয়াছে এবং তাঁহারই আদেশে সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাসিগণ প্রাণপণ শক্তিতে স্তূপ-নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। মহাস্থবির নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বাক্যে লজ্জিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা অগরাজুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি তক্ষদত্তপুত্র সঙ্ঘস্থবির সিংহদত্তের প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন। অদ্য যিনি তথাগতের শরীরভার বহন করিয়া তক্ষশিলা হইতে আটবিক মহাকোশলে আসিয়াছেন, তিনি একদাকালে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যভাগের অধিকারী ছিলেন। বিতস্তানদীতটে ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষ নবাগত যবনরাজের অব্যাহত গতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজিত হইয়াও যিনি পুরুবংশের গৌরবরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সিংহদত্তের পূর্ব্বপুরুষ। শকতাড়িত যবনপ্লাবনে যখন সমগ্র পঞ্চনদে আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন স্বাধিকারচ্যুত হইয়া সিংহদত্ত প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ত্রিংশবর্ষকাল অতীত হইয়াছে, এখন সিংহদত্ত তক্ষশিলা সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি যখন তীর্থ-পর্য্যটনে টঙ্কদেশে গিয়াছিলাম, তখন সিংহদত্ত শিশু; তিনি পৌরবজাতির অগ্রণী তক্ষদত্তের একমাত্র পুত্র। কুমারপাদ সিংহদত্তের বয়ঃক্রম এখন ষষ্ঠি বর্ষের অধিক হইবে। সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি যবনরক্তে শতদ্রুতীর হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্লাবিত করেন নাই বটে, তিনি পৌরবজাতির সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী অধিকারচ্যুত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্র পঞ্চনদ আজ তাঁহার যশঃসৌরভে পরিপূর্ণ। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে অস্ত্রবিধ বিজয়গৌরবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আসুরিক বলে যবনের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি মানসিক বলে সমগ্র যবনজাতিকে পদানত রাখিয়াছেন। যাহারা সাকেত ও মাধ্যমিক পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে, তাহারা অবশেষে তক্ষশিলার সিংহদত্তের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। কপিশা হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত, গান্ধার হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত এই

তরুণ মহাস্থবিরের মানসিক বলে বিজিত হইয়াছে। আজ সদ্ধর্ম্মের উন্নতির অঙ্কুর-মাত্র দেখা দিয়াছে, আমি শতাধিক বর্ষকালব্যাপী ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করিতেছি। অধিকতর উন্নতির সময় অদূরবর্ত্তী। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সূচনায় আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমপ্রান্তে যে মেঘ দৃষ্ট হইয়াছিল, মৌর্য্যরাজ্যের অবসানে সেই মেঘোৎসৃষ্ট প্লাবনে মুমূর্ষু সঙ্ঘে পুনরায় বলসঞ্চার হইয়াছে। পুনরায় পশ্চিমপ্রান্তে মেঘ দেখা দিয়াছে, কুরুবর্ষে আর্য্যজাতির ও বাহ্লীকে যবনজাতির অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, উত্তরমরু হইতে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় শকজাতি আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরখণ্ড আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য মহানদী শকপ্লাবন রুদ্ধ করিয়াছে। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া স্রোতের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যেদিন এই স্রোতোবেগ বন্ধনমুক্ত হইবে, সেই দিন ইহা অবাধগতিতে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থান প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। বন্যার গতি যবনপ্লাবনের ন্যায় শতক্রতীরে রুদ্ধ থাকিবে না, ইহার বেগ প্রবলতর; প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা প্লাবনে ভাসিয়া যাইলেও যাইতে পারে; যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে মহদুপকার সাধিত হইবে। কারণ, মরুবাসী এই সকল জাতি যখন প্রাচীন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তদ্দেশের আদিম অধিবাসিগণ যদি একেবারে অভিভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই পুনরায় আধিপত্যের কিয়দংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। মরুবাসী বর্ব্বরগণ সত্বরই নূতন দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিকট নতশীর্ষ হইয়া থাকে। যদি সদ্ধর্ম্মের অঙ্কুরমাত্রও পঞ্চনদে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে কালে সমগ্র শকজাতি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি, মানবজীবনের পরিমাণ অতিক্রম করিয়াছি, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারিতেছি যে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতির দিন আসিতেছে। সে দিন সুদূর নহে, সদ্ধর্ম্মের নবীন গৌরব মৌর্য্যাধিকারকালের লুপ্তপ্রায় গৌরবাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইবে। আমার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, আমার জন্ম অদ্যাপি শেষ হয় নাই, সুতরাং আমাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, আমার দেহ-পরিবর্ত্তনের সময় আসন্নপ্রায়। কিন্তু যাহারা থাকিবে তাহারা দেখিবে, সদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থানকাল সমাগতপ্রায়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, আর্য্যাবর্ত্তে এমন বল নাই যে, তৎকর্ত্তৃক শকজাতির আক্রমণের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিরুদ্ধ হয়। শিক্ষার ও দূরদর্শিতার অভাবে আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যগণ আসন্ন বিপৎপাতসম্বন্ধে চিন্তাশূন্য। যখন শকজাতি আক্রমণ করিবে, তখন রাজন্যবর্গ একে একে সকলেই বিনষ্ট

হইবে। ইহার পর মহাস্থবির তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সিংহদত্ত কহিলেন, মহারাজ, সযত্নরক্ষিত তথাগতের শরীরাংশ আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যদি কোন দিন রাজ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, যদি আপনার রাজ্যে আপনার রাজ্যবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্মে বীতরাগ হয়, তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনি বা আপনার উত্তরাধিকারিগণ আমাদিগের শরীরাংশ আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তক্ষশিলা মহানগরীর মহাবিহারের অধ্যক্ষ যিনি থাকিবেন, তিনি সাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন। সিংহদত্ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, যেদিন নগরবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে, তাহার বহুপূর্ব্বে হূণগণের পরশুর আঘাতে তক্ষশিলার ভিক্ষুগণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, বিশাল মহাবিহারের অগ্নিদগ্ধ ভস্মাবশেষ বায়ুভরে সিন্ধুতীরে উপনীত হইবে; যেদিন শরীরনিধানের উপরে মহাভার স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেদিন তক্ষশিলা নগরীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না; খস, হূণ দরদবংশজাত মেষপাল মহাবিহারের ধ্বংসবিশেষের উপরে সানন্দে মেষচারণ করিবে; তক্ষশিলা নগরীর নাম পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে শ্রুত হইবে না।

রাজা, সিংহদত্ত, মহাস্থবির ও রাজ্ঞীগণ গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলে সশব্দে শিলাখণ্ডদ্বয় স্বস্থানে আসিল। তখন উৎসবামোদ থামিয়া আসিয়াছে, দীপমালা নির্ব্বাণোন্মুখ, হিমকণস্পৃষ্ট শীতল বায়ু নিদ্রালস নাগরিকগণকে স্পর্শ করিতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তি নগরাভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে; বিপণিশ্রেণী যেন ইন্দ্রজালবলে অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল সুরাপ্লাতোন্মত্ত নাগরিক ও বারাঙ্গনাগণের দেহ মৃতদেহের ন্যায় পথে পথে লুণ্ঠিত হইতেছে। চিন্তাভারাবনতদেহে নিঃশব্দে সকলে রথারোহণে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট প্রদীপগুলি পরিচারকগণ নির্ব্বাপিত করিল, যে সকল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। রক্ষিগণ ব্যতীত বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। ক্রমশঃ বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পথে শয়ন করিয়া যাহারা তখনও উৎসবামোদ ভোগ করিতেছিল, তাহারা আশ্রয়ানুসন্ধান করিতে বাধ্য হইল। ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে আর্ত্তিমিদোর অনাবৃতদেহে স্তূপবেষ্টনীর দক্ষিণ তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, মুষলধারে বৃষ্টিপতিত হইতে লাগিল। কাহার প্রতীক্ষায় যবনশিল্পী নিদ্রা ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা আর বুঝা গেল না।

——— শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-মিলন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

যুবক-যুবতী।

—•—

সৈনিক পরদিবস প্রত্যূষে যাত্রা করিবেন বলিয়া গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি অশ্বশালায় গমন করিলেন। তাঁহার অশ্ব প্রভুর পদশব্দ শুনিয়া আনন্দে হ্রেষারব করিয়া উঠিল। সৈনিক তাহার গ্রীবায় করতল সংস্থাপিত করিয়া তাহাকে আদর করিলেন; অশ্ব সম্মুখের দক্ষিণ পদে ভূমি খননের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অশ্ব সজ্জিত করিয়া গৃহ ত্যাগ করিবার সময় সৈনিক দেখিলেন, গৃহস্বামী দ্বারে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সৈনিক তাঁহার নিকট আবার বিদায় লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। অশ্ব রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

গ্রামের ও রাজধানীর মধ্যে একটি বৃহৎ প্রান্তর ব্যবধান। রাজপথ সেই প্রান্তরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অশ্ব গ্রাম অতিক্রান্ত করিয়া প্রান্তরে উপনীত হইল। তখন কেবল দিবালোক ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বসূচনা হইতেছে। পথের দুই পার্শ্বে তরুশ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুই পার্শ্বের বৃক্ষে বৃক্ষে উর্ণনাভের বিস্তৃত জাল—রজনীর মধ্যে রচিত; তাহাতে শিশির বিন্দু বদ্ধ হইয়া আছে। জাল অশ্বারোহীর উষ্ণীষে ও মস্তকে বাধিতে লাগিল—জড়াইয়া যাইতে লাগিল। প্রকৃতির মূর্ত্তি স্নিগ্ধ—শান্ত। তখনও প্রান্তর-বৃক্ষে রজনীর স্নিগ্ধ প্রশান্তি-চিহ্ন বিদ্যমান। তখনও প্রান্তরে লোক দেখা দেয় নাই,—পথ জন-শূন্য। সেই পথে অশ্বচালনা করিয়া সৈনিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিশায় উরগ পথ পার হইয়া গিয়াছে;—ধূলির উপর তাহার গমনচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিহগ আহার সন্ধানে ফিরিয়া ধূলির উপর চরণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পর সে রক্তাভা গাঢ় হইতে ফিকা হইয়া আসিল;—সূর্য্যোদয় হইল।

সৈনিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। তিনি হৃদয়মধ্যে অন্যবিধ সৌন্দর্য্যের চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

সৈনিক গত রজনীতে কথায় কথায় অবগত হইয়াছিলেন, শক্ত সিংহ দুহিতা রেবার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র—এক কন্যা; কন্যা বড় আদরের। তিনি কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু মনোমত পাত্র পাইয়া উঠিতেছেন না। তিনি স্থির করিয়াছেন, কন্যার বিবাহ দিয়া কোন তীর্থে যাইয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু কন্যার বিবাহ না দিয়া তিনি বাহির হইতে পারিতেছেন না।

সৈনিক যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভাবনা বাড়িতে লাগিল,—চিত্ত ততই চঞ্চল হইতে লাগিল। সৈনিক মনে করিতেছিলেন, এই রমণীরত্নলাভ ব্যতীত জীবন ব্যর্থ হইবে। তাঁহার হৃদয়ের সকল বাসনা সেই একই কামনায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। সৈনিক ভাবিতে ভাবিতে একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সহসা সৈনিকের সুশিক্ষিত অশ্বের দ্রুত গতি মন্দীভূত হইল। অশ্বের গতি পরিবর্ত্তন সৈনিক যেন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অশ্ব প্রান্তর, নগরোপকণ্ঠ অতিক্রান্ত করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছে। পথ আর জনশূন্য নহে; তাই অশ্ব মন্দ গমনে অগ্রসর হইতেছে। সৈনিক দেখিলেন, নাগরিকগণ কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া নগরের পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সৈনিক গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করা অবধি ভদ্রার আর বিশ্রাম ছিল না। সে কেবল সৈনিককে লক্ষ্য করিতেছিল। রেবার ভাব লক্ষ্য করিয়া সে কেবল কিসে সৈনিকের সহিত তাহার বিবাহ সম্ভব হইবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

শক্তসিংহের বৈবাহিক যখন সৈনিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন ভদ্রা দ্বারান্তরাল হইতে শুনিতেছিল। পরদিন প্রভাতে সে পুরোহিতের গৃহে গমন করিল। পুরোহিতের কন্যা তাহার সমবয়স্কা, উভয়ে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট যাইত। আজ কথায় কথায় সে রেবার কথা উত্থাপিত করিল; বলিল, শক্ত সিংহ তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া পুরোহিতপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুপাত্রের সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

তখন ভদ্রা বলিল, "একটি সম্বন্ধ উপস্থিত। কিন্তু তথায় বিবাহ হইতে পারে কি না, জানা হয় নাই।" এই কথা বলিয়া সে সৈনিক আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের কথা বলিল।

শুনিয়া পুরোহিতকন্যা বলিলেন, "সেজন্য চিন্তা কি? বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে।"

ভদ্রা এই জন্যই আসিয়াছিল। সে বলিল, "বটেই ত।"

পুরোহিতকন্যা ভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। পুরোহিত তখন 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ করিতেছিলেন।

কন্যা পিতাকে বলিলেন, "বাবা, ভদ্রা তোমার কাছে আসিয়াছে।"

পুরোহিত মুখ তুলিলেন। ভদ্রা তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

ভদ্রা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কন্যা পিতাকে বলিলেন, "এক স্থান হইতে রেবার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। সেস্থানে বিবাহ হইতে পারে কি না, ভদ্রা তাহাই জানিতে আসিয়াছে।"

তখন ভদ্রা সৈনিক আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, পাত্রের সেই পরিচয় দিল।

পুরোহিত মনোযোগসহকারে ভদ্রার কথা শুনিলেন।

অল্পক্ষণ বিবেচনার পর তিনি বলিলেন, "এ সম্বন্ধ অতি উত্তম। অন্য বিষয়ে অভিপ্রেত হইলে এ পাত্রে কন্যাসমর্পণ বাঞ্ছনীয়।"

তাহার পর পুরোহিত শক্ত সিংহের ভবনে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন, "অদ্য ও কল্য দুই দিন আমি ব্যস্ত আছি। পরে যাইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। তুমি এ সম্বন্ধে আমার মত সকলকে জানাইও।"

পুরোহিতকে পুনরায় প্রণাম করিয়া ভদ্রা বিদায় হইল।

কিন্তু ভদ্রা তখনই গৃহে ফিরিতে পারিল না। পুরোহিতকন্যা নানা কথায় তাহাকে আবদ্ধ রাখিলেন। ভদ্রা তখন গৃহে ফিরিতে বড় ব্যস্ত। তাহার মনের উল্লাসে যাহার উল্লাস, তাহাকে এ সংবাদ না দিয়া কি থাকা যায়?

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রা গৃহে ফিরিল; ফিরিয়াই সে রেবাকে বলিল, "আজ সুসংবাদ আনিয়াছি।"

রেবা চাহিয়া দেখিল, ভদ্রার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

ভদ্রা বলিল, "আমি পুরোহিত মহাশয়ের গৃহ হইতে আসিতেছি।"

রেবা অধিকতর বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"সৈনিকের পরিচয় দিয়া—সৈনিক তোমার যোগ্য পাত্র কি না, তাহাই জানিতে গিয়াছিলাম।"

বলিয়া ভদ্রা হাসিতে লাগিল। রেবা তাহার ভাব দেখিয়া পুরোহিতের মত উপলব্ধি করিল বটে, কিন্তু সন্দেহ মিটিল না। আবার মুখ ফুটিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা করে।

ভদ্রা তাহা বুঝিল, বলিল, "সংবাদ ভাল। তিনি বলিলেন, এ সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়।"

রেবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "শুভ সংবাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে যে ?"

রেবা বলিল, "তুমি ত ব্যবস্থা আনিলে। তাহার পর ?"

"সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না। ব্যবস্থা আনিবার পূর্ব্বেও যে সব করিয়াছে, পরেও সে-ই সব করিবে।"

এই কথা বলিয়াই ভদ্রা চলিয়া গেল ; রেবা ডাকিল—সে ফিরিল না।

রেবার জননী রন্ধনশালায় রন্ধনে ব্যাপৃতা ছিলেন। ভদ্রা সোৎসাহে তাঁহার কার্য্যে সহকারিতা করিতে লাগিল। সে সেই সময় প্রস্তাব করিতে করিতে সৈনিকের সহিত রেবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। রেবার জননী প্রথমে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তখন কথায় কথায় সে রেবার অভিপ্রায়ের আভাস দিল। জননীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ; তিনি তখনই মনে করিলেন, যেরূপেই হউক, এ বিবাহের সংঘটন করিতে হইবে। কন্যার সুখের অপেক্ষা আর কিছুই বড় নহে।

সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর শক্ত সিংহ যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন রেবার জননী তাঁহার নিকট যাইয়া এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিলেন।

শক্ত সিংহ হাসিয়া বলিয়া বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ ? কে সে সৈনিক ? তাহার পরিচয় কে জানে ?"

রেবার জননী বলিলেন, "সে ত আত্মপরিচয় দিয়াছে। সে ত বাঞ্ছনীয় পাত্র।"

শক্ত সিংহ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, "সে ত বংশপরিচয়। অন্য পরিচয় কে জানে? সৈনিক বালক নহে; কন্যা কি সপত্নী-সন্তাবণে যাইবে?"

এ কথা ত কাহারও মনে হয় নাই! রেবার জননী নির্ব্বাক্ হইলেন। ভদ্রা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ছিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবসের আলোক নিবিয়া গেল।

তখন—কিছুক্ষণ চিন্তার পর—রেবার জননী ভদ্রার নিকট রেবার অভিপ্রায়ের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

শক্ত সিংহ শয়ান ছিলেন; উঠিয়া বসিলেন। ইহাই আদরের কন্যার অভিপ্রায়? তিনি ভাবিতে লাগিলেন। যেন বিষম চিন্তায় তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "তবে আমি সব সন্ধান লইব। রেবা যদি পতিপ্রেমে আবদ্ধ হইলে সব দুঃখ ভুলিতে পারে, তবেই ভাল।"

সে সন্ধানের জন্য শক্ত সিংহকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না। তিন দিন পরে সৈনিক আবার তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এ তিন দিন সৈনিক মন সংযত করিতে পারেন নাই,—কেবল আশঙ্কা-সংচর চিন্তায় চঞ্চল হইয়াছেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আজ শক্ত সিংহের নিকট কন্যাকর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও জানিয়াছিলেন, শক্ত সিংহের কন্যাকে বিবাহ সামাজিক হিসাবে তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।

শক্ত সিংহ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর আবশ্যক কথা জানিবার জন্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈনিক পূর্ব্ব বারের মত আত্মপরিচয় দিলেন। তাহার পর শক্ত সিংহ তাঁহার সন্তানদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৈনিক বলিলেন, "আমার কোন সন্তান নাই।"

"আজও সন্তান জন্মে নাই?"

"আমি অকৃতদার।"

"বিবাহে কি কোন বাধা আছে?"

"না।"

"তবে বিবাহ কর নাই কেন?"

"উপযুক্ত পাত্রীর অভাব। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত; আমার সন্ধানের সময় নাই।"

"উপযুক্ত পাত্রী পাইলে কি তুমি বিবাহ করিবে?"

সৈনিক লজ্জা-নম্র ভাবে সম্মতি জানাইলেন।

তখন শক্ত সিংহ আপনার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সৈনিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•::•—

দুই ভ্রাতা।

রজনী কেবল পোহাইয়াছে;—পশ্চিম গগনে জড়কিরণ চন্দ্রের শ্বেত গোলক ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছে। রাজা একাকী অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিলেন। গত রজনীতে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে অনতিবেগে ঝড়ও বহিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতীয় সঙ্কলিত অনাথ-আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছিল। ঝড়বৃষ্টিতে তাহার কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, রাজা তাহাই দেখিতে যাইতেছিলেন।

আজ পবন ধৌতধূলি—সুখ-স্পর্শ। পথিপার্শ্বে তরুরাজির পত্র হইতে সঞ্চিত ধূলি ধৌত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের চিক্কণ শ্যামবর্ণ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে গৃহগুলি ধূলিধূসর—বিবর্ণ দেখাইতেছিল, আজ তাহাদের মূর্ত্তি স্নিগ্ধ ও সুন্দর।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রাজা অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যখন নগর ছাড়াইয়া নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইলেন, তখন অদূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অজয় সিংহ আসিতেছেন। তিনি অশ্ব নিশ্চল করাইলেন।

দেখিতে দেখিতে অজয় সিংহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সম্মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হইলেন।

রাজা স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজয়, প্রত্যূষে কোথায় গিয়াছিলে?"

অজয় সিংহের উত্তর দিতে সামান্য বিলম্ব হইল। সেই অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, ভ্রমণে গিয়াছিলেন বলিলে জ্যেষ্ঠ আর প্রশ্ন করিবেন না; অসত্য বলিবেন কি? জ্যেষ্ঠের নিকট মিথ্যা কহিতে অজয় সিংহের প্রবৃত্তি হইল না। মিথ্যা তীক্ষ্ণ ছুরি সহজে

আইসে, বীরের তত সহজে আইসে না। তিনি বলিলেন, "গত রাত্রিতে প্রাসাদে ফিরিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন, "রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কোথায় আশ্রয় লইয়াছিলে?"

অজয়সিংহ প্রান্তরের দিকে অঙ্গ নিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ প্রান্তরের পরপারস্থ গ্রামে শক্তসিংহ নামক একজন গৃহস্থের গৃহে।"

"প্রাসাদে যাও", বলিয়া রাজা অশ্বচালনা করিলেন।

অজয় সিংহ প্রাসাদাভিমুখগামী হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, অল্পদিনের ব্যবধানে তিন রাত্রি প্রাসাদ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির কথা রাজা অবগত ছিলেন।

রাজা কি ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কথার উত্তর দিতে অজয় সিংহের ক্ষণস্থায়ী সঙ্কোচ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

দেখিতে দেখিতে রাজার অশ্ব অনাথ-আশ্রমের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইলেন। একজন ভৃত্য আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গেল।

যে স্থানে নগরোপকণ্ঠের সীমায় খরস্রোতা ঝরঝিণী গর্ভস্থ শিলায় শিলায় আঘাত করিয়া ফেনময় কলহাস্যে বহিয়া যাইতেছে, সেই স্থানে শিলাসঙ্কুল মনোরম স্থান বাছিয়া যুবরাজ অবস্থায় রাজা বিরাম-বাটিকা রচনার উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়াছিলেন। গৃহের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হয়; যেন আর কোন কার্য্যেই তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। লোকে তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল; কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ জানিত না।

গৃহনির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রহিল—প্রাচীরের প্রস্তরখণ্ড,—কারুকার্য্য-বহুল কার্নিস,—ক্ষোদিত স্তম্ভ,—সব উপাদান পড়িয়া রহিল। অর্দ্ধগঠিত ভিত্তির উপর তৃণ জন্মিতে লাগিল—উপাদানসমূহ লতাগুল্মে আবৃত হইয়া গেল। লোক সেই লতাগুল্মবন দেখাইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিত—"এই রাজার বিরাম-বাটিকা।"

রাজা যখন পার্ব্বতীর নিকট অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তখন প্রথমেই এই স্থানের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। এই স্থানের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই বিরাম-বাটিকা-নির্ম্মাণ-কল্পনা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া—অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর গৃহের ও গৃহবেষ্টন উদ্যানের আদর্শ স্থির করিয়াছিলেন। সে গৃহ ও সে উদ্যান কল্পনানুযায়ী

সুন্দর করিতে তিনি কোন বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন নাই। ভাস্করকীর্ত্তি নিকষপ্রস্তর, নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর—কারুকার্য্যকমনীয় শিলাখণ্ড—সবই সংগৃহীত হইয়াছিল। উদ্যানের জন্য বহুবিধ তরু, লতা ও পক্ষী সংগ্রহ করিতে লোক বাহির হইয়াছিল। জলাশয়খননকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। যুবরাজের ইচ্ছা ছিল, রাজকার্য্যের পরিশ্রম ও রাজধানীর কোলাহল হইতে মধ্যে মধ্যে অবসর লইয়া এই বিরাম-বাটিকায় বিশ্রাম ভোগ করিবেন; পত্নীর সাহচর্য্যে—প্রেমচর্চ্চায় সুখলাভ করিবেন। সেই বাসনায় উত্তেজনায় তিনি আপনার অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নীর উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন।

এই সময় পত্নীর ব্যবহারে যুবকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার ঊর্দ্ধগামী বাসনা ধূলায় লুটাইল; কঠোর বাস্তবের চাপে কোমল কল্পনা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। যুবরাজ প্রতিদিন দুই তিন বার বিরামবাটিকার নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেন। সেই গৃহের কল্পনা যেন তাঁহাকে কণিনীর দৃঢ়পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। এক দিন তিনি আর সেদিকে গমন করিলেন না; সকলে ভাবিল, তিনি হয় ত অসুস্থ—নহে ত কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। যুবরাজ আর সে দিকে গমন করিলেন না—সে গৃহের সংবাদও লইলেন না।

কয় দিন পরে স্থপতি কয়টি বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইল। শুনিয়া তিনি যেন বিরক্ত হইলেন। শেষে সে আসিয়া কয়টি বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "গৃহনির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ রাখ।"

স্থপতি বিস্মিত ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

সেই দিন যুবরাজ আদেশ প্রচার করিলেন, বিরাম-বাটিকার নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ থাকিবে। যাহারা সেই সুখকল্পনার সাফল্য-চেষ্টায় দিকে দিকে গিয়াছিল—তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে লোক প্রেরিত হইল।

লোক বলাবলি করিতে লাগিল, রাজারাজড়ার খেয়াল—এই আছে, এই নাই। যাহাদের অবসর অনন্ত, অর্থ অজস্র, জনবল অসাধারণ, তাহাদের কল্পনাও উদ্দাম—চিত্তও চঞ্চল।

যুবরাজের কর্ণেও সে সকল কথা উঠিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। হায়—তাঁহার দুঃখ কে বুঝিবে, তাঁহার হতাশার কে পরিমাণ করিবে, তাঁহার মর্ম্মবেদনার অংশ কে লইবে? তাঁহার এ অকস্মাৎ বেদনা জুড়াইবার স্থান নাই। এ বেদনার কথা তিনি কাহাকে বলিবেন? কে এই মরুভূমিতে স্নিগ্ধ সরসতার

সঞ্চার করিতে সমর্থ? তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ আলা জুড়াইবার নহে—এ বেদনার ঔষধ নাই। সম্মুখে যদি আলোকলাভের আশা থাকে, তবে মানুষ সেই আশার দূরপথ অন্ধকারে অতিবাহিত করিতে পারে। কিন্তু যাহার সে আশা নাই,—যাহার সম্মুখে,—নিকটে ও দূরে কেবল অন্ধকার সে কোন্ আশায় সেই চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারে পথ অতিক্রান্ত করিবে? কিন্তু তাঁহাকে ত তাহাই করিতে হইতেছিল! সে চিন্তাও কি বেদনার কারণ!

রাজপুত্রের কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। লোক দেখে, তাঁহার কাষ নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অবসর ও নাই। লোক-সংসর্গ যখন ক্লেশের কারণ—আহত আশা যখন নির্জ্জনে—গোপনে নয়ন-ধারায় কিছু শান্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় তখনও তাঁহার সকল কার্য্যেই লোক-সমাগম-বাহুল্য তাঁহাকে পীড়িত করে। সে সময় তাঁহার মনে হইত,—অতি দীন দুঃখীও তাঁহার অপেক্ষা সুখী,—সে নির্জ্জনে শান্তি লাভের চেষ্টা করিতে পারে, সে আপনি আপনার কার্য্যের নিয়ন্তা।

বিশ্রাম-বাটিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সে ব্যথা রাজা ভুলিতে পারেন নাই। যে কণ্টক অহরহঃ বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করে তাহাকে বিস্মৃত হওয়া কি সম্ভব? তাই সে দিন প্রথমেই তাঁহার সেই অসমাপ্ত কল্পনার কথা রাজার মনে হইয়াছিল।

এখন রাজাদেশে আবার সেই অসমাপ্ত কার্য্যের সমাপ্তির চেষ্টা হইতেছে। লতাগুল্মবন পরিষ্কৃত হইয়াছে; শৈবাল-সমাচ্ছন্ন স্তম্ভ—বালুকাবৃত মর্ম্মর—মৃত্তিকামলিন শিখাও বাহির হইয়াছে। আবার শ্রমজীবিগণের কলরবে—যন্ত্রাদির শব্দে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে—অলিন্দ খনিত হইতেছে—উদ্যান রচিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে রাজা আবার তেমনই যত্নে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানের এক পার্শ্বে—তরুরাজির ন্যায় পল্লবের অন্তরালে রুগ্ন, ব্যাধিত ও অনাথদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। আর পুরাতন ভিত্তির উপর সেই কল্পিত আদর্শে আশ্রমবাসিনীর বাস-গৃহ রচিত হইতেছে।

আশ্রমবাসিনীর জন্য সেরূপ গৃহের প্রয়োজন কি? লোক বলাবলি করিতে লাগিল, রাজা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেছেন না। তিনি আপনার সে কল্পনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—তাহাই সফল করিতেছেন।

সত্য সত্যই রাজা অসীম যত্নে গৃহ-রচনা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। যে কল্পনা যৌবনে একবার তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল,—প্রৌঢ়ে যেন সেই কল্পনা

আবার তাঁহাকে তেমনই ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের মত অবসর নাই; তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। তথাপি তিনি গৃহ-পর্য্যবেক্ষণের সময় করিয়া লয়েন। যাহার কাষ যত অধিক, সে ইচ্ছা করিলে তত অধিক কার্য্যের অবসর করিয়া লইতে পারে। বিশেষ সে সকল কার্য্যে যদি তাহার সত্য সত্যই অনুরাগ থাকে, তবে কখন তাহার অবসরের অভাব হয় না।

আজ রাজা যে সময় পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে সময় শ্রমজীবীরা কার্য্য আরম্ভ করে নাই; চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল বৃক্ষশাখায় বিহগকূজন—কেবল অদূরবর্ত্তী তটিনীর কলকল ধ্বনি।

রাজা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ক্রমে তিনি তটিনীতীর-বর্ত্তী উদ্যানসীমার উপনীত হইলেন। সেই স্থানে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড নিপতিত ছিল। কোন্ দূর অতীত কালে কোন্ তুষারবাহ এই শিলা দৈত্যকে বহন করিয়া আনিয়াছিল? তখন আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর রূপ কিরূপ ছিল? তখনও ভূমি নরবাসের যোগ্য নহে। তখন এ ভূমি কোন্ জাতীয় জীব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল—তাহা কে বলিতে পারে? এই শিলাখণ্ড সেই অতীত যুগের নিদর্শন।

রাজা সেই শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। সম্মুখে নদী—তাহার পরপারে উচ্চাবচ ভূমি ক্রমে দূরে চক্রবালে বিলীন হইয়াছে। রাজা সেই শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন; নির্জ্জনে পূর্ব্বকথা ভাবিতে লাগিলেন। মানুষের জীবন কি কেবল হতাশার ভাবমাত্র?

রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—এই বিশ্রাম-বাটিকা এত দিন তাঁহারই প্রেমসুখ-কল্পনার মত অসমাপ্ত—অব্যবহৃত উপাদানের সমষ্টিমাত্র ছিল। আজ সে গৃহ সম্পূর্ণ হইতেছে। আর তাঁহার সেই প্রেমসুখকল্পনা!—

রাজা আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন—এ কি? তিনি ভীতি-তাড়িত জনের মত সত্বর সেই স্থান হইতে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন; দ্রুত অশ্ব-চালনা করিয়া প্রাসাদে ফিরিলেন।

সেই দিন রাজা মন্ত্রীকে অজয় সিংহের প্রাসাদে অনুপস্থিতির কথা বলিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, রাজভ্রাতার মৃগয়াপ্রিয়তা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বহুদিন অতিক্রান্ত-যৌবন হইয়া আপনি যুবক চরিত্রের অভিজ্ঞতার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মৃগয়াপ্রিয়তায় মানুষকে নিত্য একই পথে লয় না—একদিকে কি প্রতিদিনই মৃগয়া করিতে রাত্রি হইয়া যায়?"

তাহার পর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে কি পরামর্শ হইল।

সমালোচনা।

—:০:—

বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?*

"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ"—ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত,—প্লেগ, বিসূচিকা প্রভৃতি বহু ব্যাধিবিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ ভাবনা বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। সম্প্রতি সরকারী কাগজপত্রের, বিশেষতঃ আদমসুমারীর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের বিচারে অনেকের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় কেহ কেহ আপনাদের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারের বর্ণে সত্যকে রঞ্জিত দেখিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং আপনাদের ঈপ্সিত সংস্কারকেই কল্পিত ব্যাধির অমোঘ ভেষজ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই আগ্রহের আতিশয্যে কেহ কেহ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতির প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া সমাজ-সংস্কারকেই প্রধান্য দিতেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের আরম্ভে দেউস্কর মহাশয় বলিয়াছেন,—"একটা রব উঠিয়াছে—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আসন্ন কাল উপস্থিত। বঙ্গে দিন দিন মুসলমানের যেরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ও হিন্দুর যেরূপ বংশক্ষয় ঘটিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে হিন্দুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে অধিক দিন লাগিবে না; বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ মুমূর্ষু জাতিতে পরিণত হইয়াছে।"—ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল) এই মতের সমর্থক। তিনি প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় এই মত ঘোষিত করিয়া সমাজে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার কারণ-নির্ণয়ের চেষ্টা ও ব্যাধির ঔষধ বিষয়ে ইঙ্গিতও করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত, শ্রমশীল, বহুদর্শী। কিন্তু তিনি পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারবশে ও আদমসুমারীর বিবরণ হইতে তথ্যসংগ্রহে অনবধানতাহেতু যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সেই সকল ভ্রমনির্দ্দেশই দেউস্কর মহাশয়ের পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁহাকে যে জটিল সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই আলোচ্য। তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদভাগ অকিঞ্চিৎকর—এমন কি, অনাবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার রচনায় বাঙ্গালী হিন্দু

* বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত—কলিকাতা, ১৩১৩, মুক্তিয়া ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ আনা।

জাতির যে চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই মনোযোগ-সহকারে দেখা কর্ত্তব্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এই যে, সামাজিক ব্যবস্থার দোষে—জাতিভেদ প্রভৃতির জন্য বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ জাতিভেদ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেগুলির বিলোপ করিয়া হিন্দুসমাজের উন্নতি-সাধন-চেষ্টা শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 'শকুন্তলা'র কাহিনী-কথন-চেষ্টারই মত হইবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে তুলনায় সমালোচনা করিয়া মুসলমানকে জয়মাল্য-দান করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেকের মতভেদ অনিবার্য্য। বিধবা-বিবাহের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যে দেশে বালিকামাত্রেরই বিবাহ অত্যাবশ্যক সংস্কার, সে দেশে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন বা অল্পপ্রচলনকে জাতীয় ধ্বংসের কারণ-মধ্যে গণ্য করা সমীচীন নহে। বিধবা-বিবাহের বহুল প্রচলনে কুমারীর সংখ্যাবৃদ্ধি অনিবার্য্য। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের কৌলীন্য প্রথা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিখ্যাত 'টাইম্‌স' পত্রে সাহিত্য-রসিক মিষ্টার বার্ণার্ড শ' য়ুরোপের কুমারীদিগের কথায় wasted mothers of a nation সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বিধবা-বিবাহের বহুল প্রচলনে জন-সংখ্যা-বৃদ্ধি-সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সন্দেহের সঞ্চার হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরবর্ত্তী "অনাচরণীয়" জাতি-সমূহকে "আচরণীয়" করিয়া না লইলে হিন্দুর বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁহার এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করিলে কিরূপে জাতীয় বল-বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবগতির জন্য আর একটি কথা বলিতে পারি। হিন্দু-ধর্ম্মকে বিদেশীয় অজ্ঞ লেখকগণ যেরূপ অসহিষ্ণু, রক্ষণশীল ও পরধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম জগতে বিরল। গত আষাঢ় মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 'আসামে আহোম' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'চুকাফার সহচর ধর্ম্মহীন শানেরা (আহোমেরা) হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জিলার অন্তঃপাতি শান্তিপুর-সন্নিহিত মালিপোতা নামক গ্রামের ৺কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য রাজা চুড়ানফাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণরামের বংশ-ধরেরা আসামে 'পার্ব্বতীয়া গোস্বামী' "নামে খ্যাত।" মিষ্টার অ্যাণ্ডারসন সম্প্রতি

লিখিয়াছেন, আসামে গোস্বামীদিগের দ্বারা বর্ব্বর জাতিরা হিন্দুধর্ম্মের বিশাল বক্ষে আশ্রয় লাভ করিতেছে।* এই রূপে হিন্দুসমাজে যে বললাভ হইতেছে, সে বিষয়ে অন্ধ হইলে চলিবে না। তাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনের সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু সত্যের উদ্ধার হয় না।

দেউস্কর মহাশয় দেখাইয়াছেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন। তিনি প্রমাণ-প্রয়োগের পর বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছে, এ কথা যথার্থ নহে। আধিদৈবিক বিপদের জন্য মধ্যে কিছু দিন বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছিল। সেই বিপদের অবসানের সহিত আবার হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর ভয়ের কোন কারণ নাই।"

দেউস্কর মহাশয়ের সহিত আমরাও বলি,—"কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে সবিশেষ অভিজ্ঞ। সুতরাং হিন্দুর বংশক্ষয় বা সংখ্যালঘুতার কারণালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাসমূহের জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকরতা, নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব, ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ ও তন্নিবারণের উপায় প্রভৃতির প্রতি সদ্ধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বীয় পুস্তিকায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রসঙ্গাবতারণ করিয়া দেশবাসীকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়াবলী জ্ঞাপন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।" অথচ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়বিধান একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আর আমরা সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া রোগজীর্ণ জাতির জন্য ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র! সার ক্রেডারক লেলি সত্যই বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ের বণিক মানচিত্রে রেখা টানিয়া জাহাজে মাল তুলিবার সুবিধার জন্য রেলপথ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া মনে করেন, তিনি ভারতবাসীর উপকার করিলেন। কিন্তু রেলপথ-বিস্তারে দেশের পরিবর্ত্তনের কথা—বাঁধে জল আটকাইয়া শস্যহানির ও অরোৎপত্তির বিষয় কেহ বিবেচনা করেন না। রাজা দিগম্বর মিত্র যখন রেলপথের ও রাজপথের বিস্তারই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া-বিস্তারের কারণ বলিয়াছিলেন, তখন কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। পূর্ব্বে দেশের স্বাস্থ্য এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে, তখন কেহ আজিকার এই দুর্দ্দশার কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই; জনসাধারণ গতযাতের

* বর্ত্তমান সংখ্যার 'সংগ্রহ' দ্রষ্টব্য

সুযোগ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল। ক্রমে ভূমি আর্দ্র হইয়া, নদীবহুল বাঙ্গালার নদী মজিয়া, আজ বাঙ্গালাকে ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি করিয়াছে।

ম্যালেরিয়া কেবল যে লোকের মৃত্যুর কারণ তাহা নহে। রোগভোগের পর যাহারা জীবিত থাকে তাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। মিষ্টার জোন্সের ম্যালেরিয়া বিষয়ক পুস্তকের আলোচনা কালে 'পাইওনিয়ার' বলিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া রোগীকে বলহীন, অসহায়,—এমন কি চরিত্রহীন করে। আসামের ইঅ্রলালাদি সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া-জীর্ণ জাতির বিকৃত চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল। মেজর রস দেখাইয়াছেন, চেষ্টা করিলে এ দেশে অটুটস্বাস্থ্য-সম্ভোগ অসম্ভব নহে। প্যানামার ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা—উপদেশ ও আদর্শ উভয়ের দ্বারা লোককে অবস্তক ব্যবস্থার বিষয় বুঝান—গ্রামের উন্নতিসাধন কর্ত্তব্য হইয়াছে। জলকষ্ট-সম্বন্ধীয় মন্তব্যে বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট ও ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে সার হার্বার্ট রিস্‌লি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এ সকল বিষয়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহকারিতা ব্যতীত সরকারের কর্ত্তব্য-সাধন দুঃসাধ্য। আশা করি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই দিকে দৃষ্টি দিয়া শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবেন।

লেউকর মহাশয় এই সকল কথার আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে যে শ্রমশীলতার ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালী হিন্দুর কৃতজ্ঞতায় তিনি তাহার পুরস্কার পাইবেন।

রূপ।

চন্দ্রের কলার প্রায় লভি বৃদ্ধি দিন দিন
পূর্ণ ইন্দু সম পায় যৌবনে বিকাশ,—
ক্ষয়-প্রাপ্ত ছায়ামাখা হ'য়ে ক্রমে জ্যোতিহীন
মৃত্যু অমা অন্ধকারে লভে সে বিনাশ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

—:০:—

সাহিত্য।

—:০:—

কুমারী ঔপন্যাসিক।

—:০:—

ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় নাটকের যেমন প্রচুর প্রচলন ও অসাধারণ আদর ছিল, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময় উপন্যাসের সেইরূপ প্রচলন ও আদর হইয়াছিল। আবার সেই সমাদর ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। কেবল ইংলণ্ড নহে, য়ুরোপের সর্ব্বত্র, আমেরিকায়, এমন কি বাঙ্গালায়ও উপন্যাস, সাহিত্যের অন্য সকল শাখা অপেক্ষা, অধিক পুষ্টলাভ করিতেছে। য়ুরোপে বহু কুমারী উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মেরী করেলি-প্রমুখ অনেকের উপন্যাস অসাধারণ আদরলাভ করিয়া লেখিকাকে সম্মানে ও সম্পদে ভূষিত করিয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তার এমিল রিস কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, কুমারীদিগকে উপন্যাস রচনা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

অভিজ্ঞতার অভাব।

জীবন বহু ব্যক্তির ও বহুবিধ ঘটনার সহিত পরিচয়ে ও বিরোধে ব্যয়িত হইলেই মানুষ প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করে। কুমারীদিগের ভাগ্যে সেরূপ পরিচয় বা বিরোধ কিছুই ঘটে না। তাঁহারা অনেক সময় সে সকল পরিহার করেন; অধিকাংশ স্থলে সে সকল তাঁহাদের জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার বহির্ভূত। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে জীবনের প্রকৃত আস্বাদ না পাইয়া জীবনের বিচিত্র সমস্যার সমাধানচেষ্টা একান্তই হাস্যোদ্দীপক।

কুমারীর প্রেম।

কুমারীদিগের পক্ষে কুমারীর প্রেমের কোন কোন দিকে আলোক-পাত-ফলে ছায়ালোকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব নহে, সত্য। কিন্তু কেবল কুমারীদিগকে লইয়াই উপন্যাস রচিত হয় না। বিষয়ী পুরুষ, বিজয়ী বীর, হতাশ প্রেমিক—উপন্যাসে ইহাদিগের স্থান আছে। আবার কুমারীদিগের প্রেমও উজ্জ্বল মণির মত নানা দিকে আলোকপাতে নানাবর্ণের বিকাশ করে। কুমারীর পক্ষে সে সকলের অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার অসাধারণ অভাব। এ অবস্থায় কুমারীদিগের পক্ষে মানবচরিত্র-চিত্রণে—উপন্যাসরচনায় সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা স্বভাবতঃই সুদূরপরাহত।

সত্য বটে কুমারীর রচিত অনেকগুলি উপন্যাস ইংলণ্ডে আদৃত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আদর সর্ব্বত্র স্ত্রীত্বের—উৎকর্ষের প্রমাণ নহে। সাহেব বলিয়াছেন, যিনি একটিমাত্র শিল্পকীর্ত্তি দেখিয়াছেন, তিনি একটিও দেখেন নাই; যিনি সহস্র সহস্র শিল্পকীর্ত্তি দেখিয়াছেন, তিনিই একটি দেখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। সংসারে ও সমাজে মানবজীবনের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এই বহুদর্শনের সুযোগ কুমারীদিগের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহারা কূপমণ্ডূক। তাঁহাদের বিশ্ব সেই সঙ্কীর্ণসীমায় বদ্ধ। জীবনের তাঁহারা কি জানেন?

কূপমণ্ডূক।

কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের আর এক দোষ—অত্যুক্তি। তাঁহারা অভিজ্ঞতার অভাবে কল্পনাবলে চরিত্র-সৃজনে ব্যাপৃত হয়েন। ফলে তাঁহারা দেবতা-চরিত্র অঙ্কিত করেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই স্বার্থ-সঙ্ঘাত-তাড়িত, পাপতাপপূর্ণ পৃথিবী দেবতার বাসভূমি নহে। এই দেব-চরিত্র-অঙ্কন ক্ষমতার অল্পতার পরিচায়ক। জোয়ার মহিলে কেহ বীরকে তাঁহার শূকরপালের কুটীরে অভ্যর্থনা করিতে সাহস করিতেন না; মুরিলো মহিলে কেহ ভিক্ষুক বালকের কলঙ্করূপের চিত্র চিত্রিত করিতেন না। এ সাহস যে ক্ষমতার পরিচায়ক, সে ক্ষমতা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই দিব্য সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়া তুলে। আবার এই কথা মনে করিয়া যে সকল কুমারী ঔপন্যাসিক পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তা হয়েন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে একেবারে নরকের-চিত্র চিত্রিত করেন। মধ্যপন্থা তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত। পাপের যে তারতম্য থাকিতে পারে—কৃষ্ণবর্ণের যে বহু রূপ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর—কল্পনার অতীত। অভিজ্ঞতার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়া যুবতীদিগের অনিষ্ট করেন।

অত্যুক্তি।

যে সকল যুবতী উপন্যাস হইতে আদর্শ-সংগ্রহ করে, এই সকল উপন্যাস তাহাদিগকে বিবাহ ও সংসার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দান করিয়া তাহাদের অপকার করে। ঘটনাচক্রে তাহাদের অনেকের ভাগ্যে সংসারধর্ম্মপালন ও সন্তানলাভ ঘটে না। যাহাদের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, তাহাদিগকে এই সকল উপন্যাস বিবাহের ও সংসারধর্ম্মপালনের অযোগ্য করিয়া দেয়। ইহাতে সমাজের বিশেষ অপকার সংঘটিত হয়।

অনিষ্ট।

এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? লেখক বলেন, এই সকল উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য সমিতি-গঠন আবশ্যক। আর কোন কুমারী উপন্যাস প্রচার করিলে তাঁহার ছয়মাস কারাদণ্ডের বিধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয়, কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের রচনার বিপদ কোন দেশেই এরূপ কঠোর দণ্ডবিধানের মত "সঙ্গীন" হইয়া উঠে নাই। এ ক্ষেত্রে লেখক মহাশয় ও বিপদের ব্যাপ্তি না বুঝিয়া অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। তবে উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় অন্য সকল উপন্যাসের মত এ সকল উপন্যাসও পরীক্ষিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

উপায় কি?

ইতিহাস।

—※(•):—

চার্ণকের হিন্দু পত্নী।

—•◎•—

এদেশে মুসলমান শাসনের শেষ দশায় ও ইংরাজের প্রাধান্য সূচনার সময় কোন কোন য়ুরোপীয় ভারতবর্ষীয় মহিলাকে বিবাহ করিতেন। কলিকাতার স্থাপয়িতা জব চার্ণক ইহাদিগের অন্যতম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিশ্বাস 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে চার্ণকের হিন্দু পত্নীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। চার্ণকের বংশ-পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তিনি ১৬৪৪ বা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে আইসেন এবং কাশিমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। ইহার পর তিনি পাটনার কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারিপদে বৃত হয়েন। পাটনায় তিনি পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন, ভারতীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন ও সর্ব্বদা নবাবের দরবারে যাতায়াত করিতে থাকেন। জনরব, তিনি প্রচলিত বহু "কুসংস্কারের" বশবর্ত্তী ছিলেন, এবং মোহর্ম উপলক্ষে পাঁচ পীরের পূজা দিতেন।

পরিচয়।

হেজেস চার্ণকের সহযোগী ছিলেন। উভয়ে বন্ধুত্ব ছিল না, পরন্তু শত্রুতা ছিল। হেজেস লিখিয়াছেন, হুগলী ও কাশিমবাজারের শাসনকর্ত্তা ভুল চাঁদের উপদেশ মত এক-জন হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ করে যে, চার্ণক একজন হিন্দুর পত্নীকে আপনার শুদ্ধান্তশোভিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পাটনায় অবস্থানকালে না কি পতি-গৃহ হইতে ধনরত্নাদিসহ পলায়িতা কোন মহিলাকে আত্মসাৎ করিলে নবাব তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে বাদশজন সৈনিক প্রেরণ করেন। তাহারা তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার উকীলকে ধরিয়া লইয়া যায় ও দুইমাস কারারুদ্ধ রাখে। পরে চার্ণক নগদ ৩০০০৲ টাকা, ৩ খানি রসাত ও কয়খানি তরবার দিয়া মামলা মিটাইয়া ফেলেন। হেজেসের সহিত চার্ণকের সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে এ কথায় বিশ্বাস করা সমীচীন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

কলঙ্ক-কথা।

শুনা যায়, ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নদীকূলে ভ্রমণকালে চার্ণক স্বামীর শবের সহিত সহমরণের জন্য কোন ব্রাহ্মণ যুবতীকে আনিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে চার্ণকের কয়টি সন্তান জন্মে; ইহাদিগের মধ্যে তিনটি কন্যা তিনজন ইংরাজের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। প্রকাশ, এই হিন্দু রমণী স্বয়ং খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতা না হইয়া স্বামীকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কবে তাঁহার মৃত্যু হয়, জানা যায় না; তবে প্রচলিত মত এই যে, তিনি স্বামীর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়েন। চার্ণক কলি-কাতার সেণ্ট জন্‌স গির্জ্জার প্রাঙ্গণে তাঁহাকে গোর দেন ও প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু দিনে

হিন্দু পত্নী।

সমাধির উপর একটি করিয়া মোরগ বলি দিতেন। এই সমাধিস্থানে—সম্ভবতঃ একই সমাধিতে চার্পেকের দেহাবশেষও সমাধিত হইয়াছিল।

বিবিধ।

—•—

আসামের সীমান্তপ্রদেশ।

—•—

কিছুদিন পূর্ব্বে মিষ্টার সেট আসামের যে ইতিহাস রচিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আসামের ইতিহাসের বিচিত্র বিবরণ জানিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়—এতদিন কেহ এই বিচিত্র বিবরণ বিবৃত করেন নাই কেন? মানুষের অনুসন্ধিৎসা আফ্রিকার অজ্ঞাত বনভূমিতে যে আলোকপাত করিয়াছে, আসামের বনভূমি সে আলোকপাত হইতে কেন বঞ্চিত হইয়াছে। সম্প্রতি মিষ্টার আণ্ডারসন 'ট্রান্সঅ্যাক্ট এণ্ড্ একস্‌প্লোরেসন' পত্রে আসামের সীমান্তপ্রদেশ-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনিও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাতির ও দেশের ইতিহাস-রচনা লোকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। তাহা না হইলে সেমিটিক জাতিকর্ত্তৃক অধ্যুষিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুপরিচিত, আর ইণ্ডো-চাইনিস বা তিবেটো-বার্ম্মিস জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রকৃত মিলন-স্থান ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত অপরিজ্ঞাত রহিত না। এই প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মৃত্তিকারূপে দণ্ডায়মান, নীল পর্ব্বতমালা বসন্তে বিকশিত কুসুমগন্ধামোদিত বনে আবৃত—আর তাহার পশ্চাতে গিরিশৃঙ্গে তুষারের শ্বেত শোভা। এই প্রদেশের অধিবাসীরা বিরক্ত বা উত্তেজিত না হইলে কামল-কুসুমেরই মত প্রফুল্ল। এ যেন কবিতার রাজ্য। তিনি এই প্রবন্ধে দেশের ও দেশবাসী-দিগের পরিচয় দিয়াছেন।

আসামের অধিবাসীরা মনোজ্ঞ জাতি। তাহারা মুসলমানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে নাই বলিয়া এ প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই—অবরোধ-প্রথা প্রচলিত নাই। রাজ-পথে অনবগুণ্ঠিতা, অকুণ্ঠিতা অঙ্গনাগণের সভাবসিদ্ধ সাধারণ দৃশ্য।

প্রেমলীলা।

আসামের রমণীগণ সুন্দরী। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যখ্যাতি ও আসামের ইন্দ্রজালের কথা "যদ্দে যথা তথা।" আসামে বাল্য-বিবাহ নাই; পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত প্রেম-পরিচয় বা কোর্টসিপ প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূর্ণিমায় বীহু উৎসবের সময় যুবকযুবতী—প্রেমিকপ্রেমিকা গৃহত্যাগ করে। ইহার পর আদালতে বহু মোকর্দ্দমা হয়। কুমারীর স্বজনগণ লোকাচাররক্ষার্থ প্রেমিকের নামে নালিশ রুজু করে; কুমারীও বলে, সে স্বেচ্ছায় সাধারণতঃ কুমারীর স্বজনগণ কিছু অর্থদণ্ডে সন্তুষ্ট হইয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলে; কারণ, প্রকৃত ব্যাপার-বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ

ছিল না। তবে এইরূপ ব্যাপারে সময় সময় প্রকৃত দোষী বিনা দণ্ডে বা লঘু দণ্ডে অব্যাহতি পাইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না কারণ, আসামের রমণীদিগের নিকট সতীত্ব সমাদৃত। এই কুবিদ্যাবীদিগের মধ্যে অসাকীর্ণ মনস্তত্ত্বের পথে সুলভ পাপ দুর্লভ।

জাতিবৈচিত্র্য।

জাতিতত্ত্বের হিসাবে, ঐতিহাসিক হিসাবে, ভাষাতত্ত্বের হিসাবে—আসামের মত বৈচিত্র্যবহুল দেশ দুর্লভ। সার আলেকজাণ্ডার মাকেঞ্জীর বিবরণে ও মিষ্টার গেটের পুস্তকে আসামের বহু জাতির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু জাতিনির্ণয় কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই—অল্পকালে শেষ হইবার নহে; কারণ, আসামে বহু জাতি আশ্রয় লইয়াছে এবং স্ব স্ব আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বহুদিন আসামের কামাখ্যাবনে বিলাসপ্রেমী বিলাসবিলাসী অধঃপতিত শাক্তদিগের শিথিলমুষ্টিচ্যুত রাজদণ্ড ইংরাজের হস্তগত হইবার কৌতূহলোদ্দীপক কথাও অবগত হওয়া যায়।

বিদেশী ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে দিল্লী, আগ্রা, রাজপুতানা প্রভৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া আসামের শান্ত সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ মাধুরী উপভোগ করাই ভাল। নদীপথে সচরাচরই প্রশস্ত। যাঁহার অবসর আছে, তাঁহার পক্ষে ডাক জাহাজে না যাইয়া মাল জাহাজে যাওয়াই ভাল, তাহাতে অবসর মত স্থান দেখিবার সুবিধা হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ সাধারণতঃ বহুদিন ঐ কার্য্যে করিয়া আসিতেছেন, নদীতীরবর্ত্তী বহুস্থানই তাঁহার পরিচিত। তিনিই সেই সকল স্থানের বিবরণ বিবৃত করিয়া যাত্রীর অবকাশরঞ্জনের সহায়তা করিতে পারেন। বুড়ী হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত বৈচিত্র্যের অভাব। কেবল কর্দ্দমাক্ত নদীকূলে কুম্ভীর পলান; পশ্চাতে বাঁশের বন, আর দূরে উত্তরে হিমালয়ের চূড়া কোথাও নীল—কোথাও রবিকরে স্বর্ণাভ মক্ষিণে গারো গিরিমালা। কিছু দূর অগ্রসর হইলে দেখিবে, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের রাজধানী গৌহাটীর নিকটে গিরিমালা নদীকূল স্পর্শ করিয়াছে। এখন গৌহাটী হৃতগৌরব, কেবল শত-কিম্বদন্তীজড়িত কামাখ্যা-মন্দির তাহার অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। নদীগর্ভে কামাখ্যা শৈলে মন্দির সুদৃশ্য—শোভন, সুন্দর। এই মন্দিরে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে হিন্দুযাত্রীর সমাগম হয়। গৌহাটী হইতে শিলং যাইতে হয়। পথে প্রাকৃতিক মনোরম। দিলীপ-সুদক্ষিণার মত বন্ধ মার্গশাখীর নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এই পথে অগ্রসর হইতে কত আনন্দ! বনপথের দৃশ্য গম্ভীর—স্নিগ্ধ—সুন্দর।

শোণিতপুর।

কিছু দূর অগ্রসর হইলেই তেজপুর—বর্ত্তমান সময়ে এইদিকে চা-বাগানের বাহুল্য। এই স্থানে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বহু উল্লেখযোগ্য সামগ্রীর সন্ধান পাইবেন: চারিদিকে ভূমিকম্পে ভূপতিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—এই সকল ভগ্নাবশেষে বহুস্থলবনজাত লতার মত বহুবিধ কিম্বদন্তী বিজড়িত। ইহাই বাণ রাজার রাজধানী। বাণপুত্রী ঊষা স্বপ্নে কোন অনিন্দ্যসুন্দর যুবককে দেখিয়া তাঁহাকে তরুণ হৃদয় দান করেন। সখী চিত্রলেখার চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের মনোজ্ঞ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকেই ঈপ্সিত বলিয়া চিনিতে পারেন। উত্তরে

সাক্ষাৎ হয়। বাণ জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তখন কৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে ভূমি শোণিত-রঞ্জিত হয়, তাই এ স্থানের নাম তেজপুর বা শোণিতপুর। কিম্বদন্তী, তেজপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতমালা—এই যুদ্ধে শুক্রধ্বজের অস্ত্র বাণের আরাধ্য দেবতা মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। লেখকের মতে এই কিম্বদন্তী আসামের এই অঞ্চলে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে দ্বন্দ্বের রূপকমাত্র। অদূরে বিশ্বনাথে একটি পর্ব্বত সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—মহাদেব ইহাকে উপাধানরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে, নদীগর্ভে মাজুলী দ্বীপ। এই দ্বীপে সোণ্ডাগিগণের মঠ আছে। এই সোণ্ডাগিগণের চেষ্টায় আসামের বর্ব্বর জাতিরা ক্রমে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে।

আসামের বনভূমি শিকারীর সুখস্বর্গ। এই বনভূমিতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুর প্রাচুর্য্য। আর বহুবিধ পক্ষীর অন্ত নাই। জাতিবৈচিত্র্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজ-রাজ্য-বিস্তারের ফলে ও খৃষ্টানধর্ম্মযাজকদিগের চেষ্টায় এই প্রদেশে অসভ্যজাতি সমূহের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার হইতেছে। অজ্ঞানতার অন্ধ তিমির ভেদ করিয়া জ্ঞানালোক বিকশিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই প্রদেশে জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না; নরহত্যা নিত্য সঙ্ঘটিত হইত। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভরসা করা যায়, জনাকীর্ণ বঙ্গদেশ হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অদূর ভবিষ্যতে আসামের অরণ্যকে শ্রমজীবীর কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়া দেশের দারিদ্র্য-দমনতার সমাধানে সহায়তা করিবেন।

নানা কথা।

নারী-হৃদয়।

যে মেঘ সুশীততোয়ঃ করে বরিষণ,
বজ্র-বহ্নি হৃদয়ে সে ধরে!
নারী-হৃদে—কোমলতা মাধুর্য্য-আধার—
অগ্নিময় তেজ বাস করে!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

—•::•—

[বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে—দেশে যে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, কয়জন মনীষীর মানসক্ষেত্রে সেই ভাব পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে নবীন আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। সেই সময় বঙ্গদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের সহযোগী। তিনি এক্ষণে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বিশ্রাম-ভোগ করিতেছেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের ও ঘটনাবলীর যে বিবরণ বিবৃত করিতেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের রচনা দেখিয়া আবশ্যক সংশোধনও করিয়া দিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ধারাবাহিক রূপে 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত হইবে। ইহা হইতে পাঠক তৎকালের বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের ইতিহাস জানিতে পারিবেন।—'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক।]

২৪শে আশ্বিন, ১৩১৭।

তখনও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আইসে নাই, সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পশ্চিমাকাশের লঘু ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ভিতর দিয়া তখনও কিকিমিকি করিতেছিল; অদূরে সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিতেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার একবার Controversy হইয়াছিল বটে; সে আজ অনেক দিনের কথা। 'ভারতী' পত্রিকার পুরাতন ফাইল্ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে আমার প্রবন্ধগুলি দেখিতে পাইবে; যতদূর স্মরণ হয়, প্রত্যেক প্রবন্ধের নিম্নে আমার নাম দেওয়া আছে। তর্ক উঠিয়াছিল, কোম্‌তের পজিটিভিজম্ (Positivism) লইয়া, 'সুপ্রভাতের' যে সংখ্যায় উক্ত বাদানুবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাখানি আমাকে দেখাইও। আমি তখন কলেজে অধ্যাপনা করিতাম না; ওকালতি করিতাম। রাজনারায়ণ বাবু তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন।

"সম্প্রতি অন্ ইয়ার্ড মিলের সমস্ত চিঠিপত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেগুলি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অনেকদিন পূর্ব্বে যখন কোম্‌তের চিঠিপত্রগুলি ফরাসি ভাষায় পড়িয়াছিলাম, তখন মনে একটা বড় আকাঙ্ক্ষা হইত যে, ষ্টুয়ার্ট মিলের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তিনি কোম্‌তের চিঠিগুলির উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করা যাইত। কিন্তু এই পত্রগুলির মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছুই পাইলাম না। উক্ত দার্শনিকদ্বয়ের সম্বন্ধ কেমন রহস্যময় ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! যিনি কোম্‌তের Synthetic Philosophy আলোচনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই, তিনিই আবার সেই প্রবন্ধেই কঠোর সমালোচক হইয়া কোম্‌ৎকে বিদ্রূপ করিয়াছেন! কোম্‌তের শিষ্য কর্ন্‌ভ্‌ মিল্‌কে একখানি পত্র লিখেন; তিনি জানিতে চাহেন, কেন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ কোম্‌তের এমন কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিতেছেন; তদুত্তরে মিল্‌ লিখেন—"আমি কোম্‌ৎকে খুব শ্রদ্ধা করি; আমার ভয় হয় তাঁহার মন্দ ও ভ্রান্ত ভাবগুলি তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রের ভাল অংশটিকে বা নষ্ট করিয়া ফেলে; অথবা তিনি যে সুন্দর সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা মানবচক্ষুর্ে এমন করিয়া ধাঁধাঁ দিবে যে, লোকে তাঁহার ভ্রমগুলির প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। সত্য মিথ্যা সকলগুলিই তাহারা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে।

"তোমরা জান, ঐ ঝগড়ার সূত্রপাত কি লইয়া। ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ চাহেন Representative Government এবং Enfranchisement of Women; কোম্‌ৎ ঠিক তাঁহার বিরুদ্ধমতের পরিপোষক। তাঁহার মতে ও দু'টা ধাঁকা, অসার বস্তু। উভয়ে অনেক চিঠি লেখালিখি করিলেন; উত্তরের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। কোম্‌ৎ হতাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, মিল্‌ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ধ্রুবদর্শন শাস্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা হইতে পারিবেন, এখন দেখিতেছেন, তাহা হইল না। কিন্তু যখন তাঁহার দর্শন শাস্ত্র কোম্‌তের জীবিকা-র্জ্জনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার মাষ্টারি চাকরিটি গেল, তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করাও হইল না, তাঁহার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইল, তখন ষ্টুয়ার্টমিল্‌ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মোল্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট্‌ এবং অন্যান্য বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কোম্‌তের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে কয়েক বৎসর তাঁহাকে অর্থসাহায্য করা হইলে পর, কোম্‌তের স্বদেশবাসীরা দরিদ্র দার্শনিককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

"কোম্‌তের এই অর্থকষ্টজনিত দারিদ্র্যের জন্য তিনি নিজে অনেকটা দায়ী। যখন তিনি তাঁহার পুস্তকের এক এক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি Polytechnic School এর কর্তৃপক্ষীয় কোনও না কোনও ব্যক্তির তীব্র সমালোচনা করিতেন। একবার তাহা লইয়া তাঁহাকে আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের মধ্যে অ্যারাগো নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা, বেশী মাহিনার একটি পদ খালি হইলে, কোম্‌ৎকে তাহা না দিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কোম্‌ৎ তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। সেই প্রতিবাদ মুদ্রণকালে মুদ্রাকর প্রমাদ গণিল; সে দেখিল যে, একজন দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টার্ অ্যারাগোর ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির যে কড়া সমালোচনা করিতেছে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে মুদ্রাকরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ভয়ে ভয়ে সে প্রতিবাদের কথা অ্যারাগোকে জ্ঞাপন করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা মুদ্রিত হইলে তিনি মুদ্রাকরের উপর বিরক্ত হইবেন কি? অ্যারাগো বলিলেন, 'আমি বিরক্ত হইব কেন? অঙ্কশাস্ত্রে যাহার কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই,—না সামান্য, না বিশিষ্ট, কোনও প্রকার ব্যুৎপত্তি নাই, এমন একটা লোককে ঐ পদে উন্নীত না করিয়া যদি আমি গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন একজনকে গণিতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি, তজ্জন্য লজ্জিত হইবার কোনও কারণ দেখি না। দর্শনকার মহাশয় আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত করিতে পার।' মুদ্রাকর ও প্রকাশক কোম্‌ৎকে না জানাইয়া তাঁহার পুস্তকের গোড়ায় অ্যারাগোর চিঠিখানি সন্নিবেশিত করিয়া দিল। কোম্‌ৎ তাহা দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন; তিনি মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়া আদালত হইতে খেসারৎ পাইলেন।

"এই সব ঝগড়া বিবাদের জন্য স্ত্রীর সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। স্ত্রী প্রায়ই তাঁহাকে এই দ্বন্দ্ব কলহ হইতে বিরত হইতে বলিতেন। কাপ্তেনের সহিত কোম্‌তের স্ত্রীর পলায়ন-ব্যাপারটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি সঠিক অবগত নহি; তবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কোম্‌ৎ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন নাই; কিন্তু ১৮৪৪ সালে চিরন্তন বিবাদ কলহ উপলক্ষে স্ত্রীপুরুষে আপোষে পৃথক্ হইলেন। সেই অবধি স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি নিজের আয় হইতে বাৎসরিক দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার স্ত্রীকে দিতেন; তাঁহার যতই অর্থকষ্ট হউক, ঠিক নিয়মমত এই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক স্ত্রীকে বরাবর দিতেন।

"এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটি বিয়োট্রিচি (Beatrice) দেখা দিয়া-

ছিলেন ; যুবতীর নাম ক্লোটিল্‌ডি (Clotilde) ; তাঁহার স্বামী কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য যাবজ্জীবনস্থায়ী নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যুবতী বিশেষ গুণবতী ছিলেন ; দার্শনিক কোম্‌ৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া বলিলেন, 'এস আমরা বিবাহ করি ; আমাদের উভয়ের সাংসারিক জীবনে যে দারুণ tragedy হইয়া গিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পর এ বিবাহে কোনও দোষ আছে কি না। ক্লোটিল্‌ডি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ এই বিবাহে সম্মত হইলেন না। অতি অল্পদিন পরেই ক্লোটিল্‌ডি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন কোম্‌ৎ তাঁহারPositive Politics বা ধ্রুব রাজনীতি নামক প্রকাণ্ড পুস্তকখানি ক্লোটিল্‌ডির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ক্লোটিল্‌ডির সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার জীবন কেবল দর্শনশাস্ত্রসৃষ্টি কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত ; তিনি যে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারিয়াছেন তাহা শুধু এক বৎসর কাল ক্লোটিল্‌ডির সহিত আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার ফলে।

"বোধ হয়, এই প্রসঙ্গে আমার একটি নিজের কথা বলিয়া লইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্লোটিল্‌ডি-কোম্‌ৎ-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া ক্লোটিল্‌ডির বিরচিত Lucie নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দৃষ্টে আমি একটি গল্প রচনা করিয়াছিলাম। আমার পরম আত্মীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ কর।' পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল ; আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার নাম দিয়া এই গল্প প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে ; তখন আমার জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমার স্বাক্ষরিত গল্পটি প্রকাশিত হইলে লোকে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিবে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া ছাপাখানায় উপস্থিত হইলাম ; সমস্ত টাইপ্‌গুলি ওলোট্‌ পালোট্‌ করিয়া দিয়া গল্পটি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম ; তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। পরে বিহারীবাবুর নিকট আমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। আর কখনও এরূপে আমার লেখা নষ্ট হয় নাই। ফরাসী ভাষা হইতে Paul and Virginia বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলাম ; বোনাপার্টের জীবন-চরিত অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত। কবিতাও লিখিতাম।

"ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ ও মিসেস্‌ টেলরের প্রণয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয়

জানা আছে ; এই যে মিলের চিঠিপত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী টেলরও মিলের ন্যায় নাস্তিক ছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার নারী-হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, পূজারিণীর ন্যায় মিলের চরণে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন,—মানুষ যে কতদূর perfectionএ পৌঁছিতে পারে, তাহা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কে দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্বামীর নিকট গোপন করেন নাই। সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতেন। স্বামী বলিলেন,—'তাইত ইহার একটা বিধান করিতে পারা যায় না কি ? ব্যাপারটা ত' ভাল নয়। একটা কায করা যা'ক্, তুমি এখন প্যারিসে গিয়া থাক না কেন ? দিন কতক ছাড়াছাড়ি হইলে এ নেশা কাটিয়া যাইতে পারে।' অনেক বিবেচনা করিয়া প্যারিসে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীমতী টেলর তাঁহার স্বামীকে লিখিলেন—'আমার পক্ষে এখানে থাকা নিরর্থক, ইহাতে কোনও ফল দর্শিবে না, অনুমতি কর ত ফিরিয়া যাই।' তাহাই হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সামাজিক হিসাবে অবৈধ সম্বন্ধ লইয়া কোনও scandal, কোনও লোকাপবাদ হইবার কোনও কথাই ছিল না। তবে মিলের পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, পরস্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি অতীব গর্হিত।

"হাঁ. তাহাই বটে ; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এই সম্বন্ধে পাশবতা ছিল কি না সন্দেহ ; intellectual fascination অত্যন্ত প্রবল ছিল। গ্রোটিন্‌ডি ও কোম্‌ৎ ঠিক ঐ রকম ভাবেই কতকটা স্তাবক্‌ই হইয়াছিল। মিষ্টার টেলর উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীকে দান করিয়া যায়েন। বিধবা হইবার প্রায় আড়াই বৎসর পরে মিসেস্ টেলর মিল্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিবাহের পর বেশি দিন মিসেস্ টেলর জীবিতা ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা হেলেন টেলর মিলের মৃত্যু পর্য্যন্ত কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। হেলেন সেই জন্য আজীবন কুমারীব্রত পালন করিলেন। অ্যাভিনিয়নের (Avignon) নিকটবর্ত্তী যে স্থানে মিসেস্ টেলরের সমাধি হইয়াছিল, মিল্ তাহারই অতি নিকটে একটি বাগানবাড়ীতে শেষজীবন অতিবাহিত করিলেন ; যেস্থানে বসিয়া তিনি চিঠিপত্র লেখা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, ঠিক সেস্থান হইতে তাঁহার স্ত্রীর গোর দেখা যাইত। হেলেনও বিদুষী ছিলেন ; মিলের অনেক চিঠি পত্র তিনি লিখিয়া দিতেন, মিল্ কেবল দেখিয়া দিতেন এবং স্বহস্তে নকল করিয়া স্বাক্ষর করিতেন।

"এক একবার আমার সন্দেহ হয় যে, পিতাপুত্রের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক, জেম্‌স্ মিলের না জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের? কেমন করিয়া যে তিনি তিন বৎসরের শিশুকে গ্রীক্ শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। তুমি যে অক্সফোর্ডে গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন polite education এর প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, তাহার সহিত জেম্‌স্ মিলের এ শিশু পুত্রের অধ্যাপনার কোনও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতেছি না। বিশেষতঃ জেম্‌স্ মিল্ নিজে একজন মুচির ছেলে; সেই মুচী কিন্তু নিজের ছেলেটিকে নিজের ব্যবসায় হইতে দূরে রাখিয়া ভদ্রলোকের ছেলের মত তাহার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও জেম্‌স্‌কে অনেকদিন অর্থকষ্ট ভোগ করিতেই হইয়াছিল। বেন্থামের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তবুও তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না; পরে যখন তাঁহার India House চাকরি হইল, সেই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝা গেল।

"এত কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের দুইটি বড় কায করিয়া ফেলিয়াছিলেন;—ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনাকার্য্য শেষ করিলেন। দেখ, আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল; আমার বিশ্বাস ছিল যে, জেমস্ মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করার পর তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র দেখিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। এখন আমার সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে; এখন দেখিতেছি যে, ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইতিহাস-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ছেলেটিকে লইয়া যখন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, তখন মুখে মুখে তাহাকে অর্থশাস্ত্র (Economics) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন; বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বালক পিতার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিতাকে দেখাইত; মনের মত না হইলে বালকের উপর আবার লিখিবার আদেশ হইত। এমনই করিয়া তিনি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ মিলের মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রকে ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ পর্য্যন্ত মিল্ চাকরি করিয়া বাৎসরিক পনের শত পাউণ্ড পেন্সন্ লইয়া কার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ করেন।

"পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য যখন মিল্‌কে অনুরোধ করা হয়, তিনি

বলিলেন আমি candidate হইতে রাজি আছি, কিন্তু এক পয়সা ও খরচ করিব না। কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। একবার তিনি মেম্বর হইয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারের সময় লোকে সন্দেহ করিল যে, তিনি Bradlaugh কে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। মিল্ কিন্তু নিজে বলিতেন যে, ব্র্যাডল-ঘটিত ব্যাপারে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের Organisation ভাল ছিল না। তাই তিনি হটিয়া গেলেন।

"কার্লাইলের সম্বন্ধে মিলের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তবু ও তিনি লিখিয়াছেন যে, মানবের মানোবিকাশের খানিক দূর পর্য্যন্ত কার্লাইলকে পাঠ করিলে উপকার হইতে পারে; একটু উপরে উঠিলে আর চলিবে না। তবে তখনও কার্লাইলের রচনা পাঠে অনেক আনন্দ অনুভব করা যায়। যখন তিনি কার্লাইলের হস্তলিখিত পুথি French Revolution খানি হারাইয়া ফেলিলেন, তখন তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া কার্লাইল্‌কে পুনশ্চ ঐ গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কার্লাইলের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে জোর করিয়া টাকা দিলেন। কার্লাইল্ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সম্বন্ধে মিল্ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি তিনি যথার্থই বড় লোক হইতেন তাহা হইলে কখনই Franco-Prussian যুদ্ধ হইতে দিতেন না; তিনি যদি বলিতেন যে, ফরাসি ও প্রুসিয়ার মধ্যে যে প্রথমে সৈন্য-চালনা পূর্ব্বক বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে, তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সমস্ত নৌবাহিনীর অভিযান হইবে, তাহা হইলে কি ঐ যুদ্ধ বাধিতে পারিত?

"দেখ কার্লাইলের স্ত্রীর সহিত যে মতের অনৈক্য ও বিরোধের কথা কত প্রচার করিয়াছেন, সেটা না কি ঠিক নয়। দম্পতীর মধ্যে না কি প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। মিলের পত্রে কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

"তাঁহার কয়েকখানা পত্রে হার্বার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক মত লইয়া অনেক তীব্র সমালোচনা আছে; পাঠ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। স্পেন্সরের Relativity ও Conservation of Energy এ দুটির কোনটিই তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার Universal Postulate মিলের একবারেই অসহ্য।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদপ্রার্থী Dr. Mertineau তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি;

কিন্তু আপনার পক্ষ সমর্থন করিলে আর এক জনকে ত্যাগ করিতে হয় তিনি অনেকটা আমার দার্শনিক মতের পরিপোষক। আমার মতাবলম্বী লোক অল্প; আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।"

বীডন্ উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে লক্ষ্য করি নাই যে, একে একে প্রায় সকল ভদ্রলোকই উদ্যান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান পণ্ডিত মহাশয়কে সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজি, বহুৎ রাৎ হুয়া।"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। একটু দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন—"যে পত্রিকায় বিজেন্দ্র বাবুর চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সে পত্রিকাখানা আমাকে একবার দেখাইও। আমার মনে হয়, ভগবানকে লইয়া তর্ক হইয়াছিল; আমি বোধ হয় বলিয়াছিলাম, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ (omnipotent) ও সর্ব্বজ্ঞ (omniscient) তাঁহাকে all meciful বলা কিছুতেই যায় না; এই কথাতেই বোধ হয় বিজেন্দ্র বাবু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমার ঐকমত্য দেখিতে পাইবে। মিল্ বলিতেন, ঐ তিনটি attributes একত্র করিয়া এক পরমপুরুষ কল্পনা করা যাইতেই পারে না; জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা ভালর দিকে ঝোঁক—a tendecy towards the good—কল্পনা করা যাইতে পারে; তেমনই একটা মন্দের দিকে ঝোঁক ও কি কল্পনা করা যাইতে পারে না? কোম্‌ৎ বলেন যে, ভগবানকে একবারে বাদ দিতে হইবে; যাহা বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় তাহাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া জ্ঞানের পথ রোধ করিও না। অবশ্যই Theology জগতের কতকটা উপকার-সাধন করিয়াছে,—সমাজের কল্যাণ-কার্য্যে অনেকটা পুলিশপ্রহরীর মত কাজ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু Theologyর দিন চলিয়া গিয়াছে।

গৃহে ফিরিবার সময় 'সুপ্রভাতে' মুদ্রিত শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রের একটি ছত্র আমার মনে হইতে লাগিল" "he can write, and he can fight, and he can slight all things divine."

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

গ্রন্থ-পরিচয়।

রাজা রামকৃষ্ণ। *

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন প্রৌঢ় সাহিত্যরসিক একজন নবীন সাহিত্য-সেবককে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জীবন বৈচিত্র্যবর্জ্জিত, তাহাতে বহু উপন্যাসের উপাদানের অভাব। দুর্গাদাস বাবু তাঁহার 'রাণী ভবানী' ও 'রাজা রামকৃষ্ণ' উপন্যাস-দ্বয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর ঘরে উপন্যাসের উপাদানের অভাব নাই; পরন্তু বাঙ্গালায় যে উপাদান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে ঔপন্যাসিক যে উপন্যাস রচনা করিতে পারিবেন, তাহাতে আমাদের জাতীয় ও নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা। মহারাজ রামকৃষ্ণের নাম বঙ্গে সুপরিচিত; তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে এক সময় বঙ্গের পল্লী মুখরিত ছিল। সেই রামকৃষ্ণের জীবনকথা লইয়া এই উপন্যাস বিরচিত।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "প্রায় দুই মাসের মধ্যে এই উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ—একরূপ অসমসাহসিক কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই গ্রন্থ সাধারণের কিরূপ প্রীতিপ্রদ হইবে—তাহা সহজেই বুঝা যায়। * * * * এ গ্রন্থ উপন্যাসও নহে, ইতিহাসও নহে;—আমার নির্ব্বুদ্ধিতারই এক পরিচয়-চিহ্ন।" দুর্গাদাস বাবু প্রবীণ সাহিত্যসেবক হইয়া কেন এরূপ অনাবশ্যক ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাস্তবিক এই ব্যস্ততা হেতু পুস্তকখানিতে বহু ত্রুটি রহিয়াগিয়াছে। ৩য় পৃষ্ঠায় "প্রস্তুত করিয়েছি" ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় "প্রস্তুত ক'রে রেখেছি" তে পরিণত হইয়াছে। ১২শ পৃষ্ঠায় "সড়ক" ও "সরক" উভয়ই দেখিলাম। ৩০ পৃষ্ঠায় "চতুঃপার্শে," ৬৩১ পৃষ্ঠায় "মহারাষ্ট্রগণ" পাইলাম। ৩৪ পৃষ্ঠায় "কথোপকথনে গাঢ়-নিমগ্ন" ও ৪২ পৃষ্ঠায় এবং ১৫৩ পৃষ্ঠায় "নয়নে নয়নে উজ্জ্বল হইয়া আছে"—দুর্ব্বোধ। ৪২ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, "ফৌজ-পল্টন আসিতেছে শুনিলে, এখনও অনেক গ্রামের সুন্দরী রমণীরা পোড়া হাঁড়ীতে মস্তক বাঁধিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে।"—"মস্তক বাঁধিয়া" কি "মস্তক ঢাকিবার" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে? ৪৩ পৃষ্ঠায় "সুর সুর ক'রে" ব্যবহৃত হইয়াছে। ৬৪ পৃষ্ঠায় "মার্ত্তণ্ডদেব যেন সারাদিন অগ্নি-বর্ষণ করিলেন"—"মার্ত্তণ্ড দেব সারাদিন যেন অগ্নি-বর্ষণ করিলেন"—হইবে। ৬৭ পৃষ্ঠায় "ক্রমশঃ মেঘ

* রাজা রামকৃষ্ণ। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

অপসৃত হয়"—"ক্রমশঃ মেঘ অপসৃত হইল"—হইবে। ৭৩ পৃষ্ঠায় "গোপাল"—"রঘুনাথ" হইবে। ৭৬ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, "রঘুনাথের পীড়ার বিষয় কবিরাজ মহাশয় সকলই বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণনাথ রায়ও অবস্থা কিছু কিছু বিবৃত করিলেন।" রোগীর অবস্থা না শুনিয়াই পীড়ার বিষয় সকলই বুঝিতে পারা কি সম্ভব? ১৫৭ পৃষ্ঠায় "গতকল্য" "আজ" হইবে।

১৫৩ পৃষ্ঠায় লেখক মণিবেগমকে "পূর্ণযৌবনা" বলিয়া তাঁহার গায়ে অঙ্গরাখা ও মসলিনের মসৃণ বসন থাকা সত্ত্বেও বলিয়াছেন—"বসনাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুন্দরীর রূপের জোয়ার। ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।" কিন্তু মণি তখন প্রৌঢ়া। ১৭৩ পৃষ্ঠায় "আয়ুঃ কাল" দেখিলাম, ১৯৭ পৃষ্ঠায় "চারু মনোহর" দেখিলাম। ৩২২ পৃষ্ঠায় "আজ"—"কাল" হইবে। ৪২৬ পৃষ্ঠায় "কেতকী-কুমুদ-কহ্লারের ফেনিল বাঁচিবল্লরীর" অর্থ কি? ২৭১ পৃষ্ঠায় দেখা গেল, "যে ব্রাহ্মণ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রভৃতি আত্মবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক চাকুরি বৃত্তি গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণসমাজে তিনি কখনই শ্লাঘনীয় নহেন।" ৩৪৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, রামকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন, সুতরাং পত্নীর "প্রেমপাশ ছিন্ন করিলেন।" পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন না করিলে কি পত্নীকে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করা যায় না? এ সকল ত্রুটি অনবধানতার চিহ্ন। এই সকলের জন্য লেখকের সাহস আমাদের মতান্তর হইতে পারে না। মতান্তরের অন্য কারণ আছে।

তিনি বর্ত্তমান পুস্তকেও "চক্ষে" ও "রাত্রে" ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? ইংরাজীতে cannot যেমন যুক্ত হয় তিনি তেমনই "করি-নি", করিস্-নি" "যায়-নি" প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও কথোপকথনের চলিত ভাষা মিশাইয়াছেন; যথা—"তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস। তুমি মুখামি করিয়াই চলিয়া আসিও।" (৩৩৩ পৃষ্ঠা) "একবার মনে কর দেখি,—তোমার অভাবে বৌমার আমার কি দশা হয়েছে! আহা! স্বর্ণলতিকা যে শুকাইয়া গেল।" (৩৩৯ পৃষ্ঠা) দুর্গাদাস বাবুর মত প্রবীণ লেখকও যদি ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা বিষয়ে অনবহিত রহেন, তবে ভাষার মলিনতাসঞ্চার ও আবর্জ্জনাসঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আবার তিনি স্থানে স্থানে "যখনের" পর "তখনের" ব্যবহারে ও কর্ত্তার ব্যবহারে অকারণ কার্পণ্যপ্রকাশ করিয়াছেন।

শেষ কথা, তাঁহার উপন্যাসে সাধুব্যক্তির বাহুল্য—দুইশত যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়—গ্রন্থকারের আদেশে বাধ্য হইয়া কুকর্ম্ম করে! জন ব্রাইট বলিতেন,

জগতে যথেষ্ট পাপ আছে, উপন্যাসে আবার তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক—উপন্যাস পাপীচরিত্রবর্জ্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে মত সমীচীন কি না সে তর্ক করিব না। কিন্তু গ্রন্থকার যখন সেই মতানুসারে কার্য্য করেন নাই, পরন্তু গ্রন্থমধ্যে পাপীর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তখন সে সকল চরিত্র স্বভাবানুগ হইলেই ভাল হইত।

দুর্গাদাস বাবুর নিকট আমাদের অনেক আশা—তাই এত কথা বলিলাম।

মূর্ত্তিপূজা। *

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যুক্তির সাহায্যে মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী; তিনি ইচ্ছা করিলে আরও বিশদভাবে এই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেন। বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় প্রবন্ধটি বড় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও, লেখক মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা যুক্তিপূর্ণ এবং বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট। পুস্তিকাখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, মূর্ত্তিপূজার ন্যায় এমন একটি সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনায় ও গ্রন্থকার সঙ্কীর্ণতা হইতে আপনাকে অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। হিন্দুধর্ম্মের এই সকল তত্ত্ব দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের পক্ষে শুভপ্রদ হইবে বলিয়া আশা হয়। সাম্প্রদায়িকতার জন্য এ সকল বিষয়ের আলোচনাই একরূপ নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। লেখক যুক্তির সাহায্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের অমূর্ত্ত (abstract) নিত্যতত্ত্বগুলি সকলে বুঝিতে পারে না। তাহাদের কল্পনার পক্ষে মূর্ত্ত (concrete) অবলম্বনের প্রয়োজন। এই হেতু সকল ধর্ম্মেই নিম্নাধিকারীর পক্ষে মূর্ত্তির কল্পনা অপরিহার্য্য। ধর্ম্মজীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মূর্ত্তির আবশ্যকতা কমিয়া আইসে তখনই নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় এক সমগ্র বিশ্বসত্তার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

---

* মূর্ত্তিপূজা।—শ্রীহরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, ৫৩, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ঢাকার বিবরণ।*

ঢাকা জিলার "সাধারণ ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত" লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাকে গেজেটিয়র শ্রেণীর পুস্তক বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানি একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রাকৃতিক অবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগের বিষয়, তৃতীয় অধ্যায়ে আদমসুমারীর ফল, চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার বিষয়, পঞ্চম অধ্যায়ে সাহিত্যকথা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিবরণ, সপ্তম অধ্যায়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদির ও বাণিজ্যের বিষয়, অষ্টম অধ্যায়ে ভূমিকর ও রাজস্ব সংক্রান্ত কথা, নবম অধ্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়, দশম অধ্যায়ে দেশের অবস্থা ও একাদশ অধ্যায়ে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তকের উপযোগিতা যথেষ্ট। কিন্তু 'ময়মনসিংহের ইতিহাসলেখকের নিকট' আমরা উৎকৃষ্টতর পুস্তক রচনার আশা করি। সে আশা পূর্ণ করিবার সম্বল যে তাঁহার আছে, তাহা আলোচ্য পুস্তকের পঞ্চম, অষ্টম ও দশম অধ্যায়ত্রয়ে দেখা যাইবে। আশা করি, তিনি এখনও অসমাপ্ত 'ঢাকার ইতিহাসে' আমাদিগের সে আশা পূর্ণ করিবেন। ঢাকার ইতিহাস স্মরণযোগ্য-ঘটনা-বিরল নহে। একদিন পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তি-নিবারণের জন্য ঢাকার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হইয়াছিল। ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। এক সময় ঢাকার কার্পাসবস্ত্র য়ুরোপে নৃপতিদিগের পরিধেয় রূপে সমাদরপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার স্বর্ণ রৌপ্যের কার্য্যে ও শঙ্খের দ্রব্যে বিশেষত্ব বর্ত্তমান। আজও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ঢাকার স্বর্ণরৌপ্যের দ্রব্যের আদর আছে। আজও বাঙ্গালার কুললক্ষ্মীরা ঢাকার শঙ্খ সাদরে পরিধান করিয়া থাকেন। বহুদিনের পর—ভাগ্যবিপর্য্যয়ান্তে ঢাকা আবার পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী। আশা করি 'ঢাকার ইতিহাসে' এই সকল কথার সম্যক আলোচনা দেখিতে পাইব। আলোচ্য গ্রন্থে যে মানচিত্রখানি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* ঢাকার বিবরণ—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ রিসার্চ্চ হাউস হইতে শ্রীযতেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

স্মৃতি-সাথী।

'স্মৃতি-সাথী' কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থকার তরুণবয়স্ক। আলোচ্য পুস্তক তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা। কবিতাগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবসূত্র সংরক্ষের চেষ্টা আছে। তাহা প্রশংসনীয়। কারণ, তাহাতে ভাব-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে নাই। স্থানে স্থানে ভাবের দামিনীদীপ্তি দৃষ্ট হইবে। তরুণ লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আমরা আশা করি, নবীন কবি ভারতীর সেবায় রত থাকিয়া যশ অর্জ্জন করিবেন। পুস্তকের ছাপা অত্যন্ত সুন্দর।

কবিতা ও কবিপ্রিয়া।

(১)

অতিক্রান্ত অর্দ্ধ রাতি, নিবাইনি তবু বাতি,
লিখিতেছি,—কবিতা মিলায়ে ;
পিছু হ'তে কে ফুৎকারে, মূঢ় করি' অন্ধকারে,
দিল মোর দীপটি নিবায়ে !
না বলিতে কোন কথা, কা'র ছুটি বাহুলতা,
কণ্ঠ মোর করিল বেষ্টন ;
তার পর উচ্চ হাসি সব রোষ গেল ভাসি',
বরষিল অজস্র চুম্বন।

(২)

"বসিয়া নির্জ্জনে, একা, পাই কবিতার দেখা,
এ কেমন তব ব্যবহার ?
উদ্দাম অনিল মত, তুমি এলে, কাব্য গত,
আর তা'রে খুঁজে পাওয়া ভার !"

(৩)

কহিল কবির প্রিয়া,— "শুধু কবিতারে নিয়া
চাহ তুমি যাপিতে জীবন ?
ল'য়ে ভাব, ভাষা, মিল, অবসর নাহি তিল,
চাহ না ত আমার মিলন !"

---

* স্মৃতি-সাথী শ্রীমনাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ১২, কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৪)

কহিলাম—"সে কি কথা, কানু বিনা গীত কোথা ?
যা' লিখি, তা' তব প্রতিধ্বনি ;
তুমি কায়া, সে ত ছায়া, তুমি প্রেম, সে ত মায়া,
সে তটিনী, তুমি যে তরণী।"

(৫)

উত্তরিল হাসি প্রিয়া— কণ্ঠে মোর লতাইয়া—
"তোমরা যে স্বাবকের জাতি !
তোমরা পাতিলে ফাঁদ, পড়ে আকাশের চাঁদ,
রবি উঠে না পোহা'তে রাতি।
"ছোটয়ে করিতে বড় কবির কল্পনা দড়,
তৃণ তরু করেছ সমান ;
শিশিরে মুক্তার তুল, তোমাদের কি না ভুল,
তাই বুঝি বাড়াইলে মান ?
দিনরাত মাথা কুটি', কবিতার পায়ে লুটি',
দেখা তাঁ'র পাও কি না পাও ;
কিসে তবে আমি উচ্চ, সে আমার কাছে তুচ্ছ
বুঝি না ত বুঝাইয়া দাও।"

(৬)

কহিনু কাতরে পড়ি', "বুঝাব কেমন করি',
চিত্তপটে তুমি দীপ্ত ছবি :
তোমার প্রেমের মূর্ত্তি দিয়েছে কল্পনা-স্ফূর্ত্তি,
প্রিয়তমে, তাই আমি কবি।"

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক রবার্ট ক।

P. Works.—Calcutta.

পুরাতন প্রসঙ্গ।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৭।

আজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম, "রামেন্দ্র বাবুর বিশেষ অনুরোধ যে, আমি আপনার পুরাতন কাহিনী শুনিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি। আপনি স্বয়ং লিখিতে পারিবেন না; আপনার নিকট শুনিয়া আমি আপনার কথাগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাকে শুনাইব; পরে আপনার কথামত আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিব। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় Men I have seen প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতেছেন; আপনার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা ছিল; আমরা মনে করি, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিতে পারিবেন যে অন্যে তাহা পারিবেন না। ৺জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেক দিন অনেক কথা শুনিয়াছি; আজ সেই গুলি ভাল করিয়া শুনিয়া কাগজে প্রকাশ করিয়া আরও দশ জনকে শুনাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমি ঠিক ধারাবাহিক একটানা বলিতে পারিব কি? কথাবার্ত্তার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'টা কথা বলিয়া যাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কিরূপে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর। বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না, কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কোনও প্রতিবন্ধক হইল না।

"তখনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, একটা Council of Education ছিল। সেই কাউন্সিলের অধীনতায় সংস্কৃত কলেজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন,—তাঁহার নাম, রসময় দত্ত। রসময় বাবু Small Cause Court এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানেক সব কাগজ-পত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়; তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময় বাবুর মাসিক বেতন ছিল—এক শত টাকা; বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইতেন --পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

"ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ পণ্ডিতের পিতৃব্য। তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল। ইস্কুলে যাইবার সময় ও ইস্কুল হইতে আসিবার সময় পথে দাদার কাছে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতাম।

"ইতোমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরী ত্যাগ করিলেন। রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেক দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে-একটা কথা শুনিয়াছিলাম;—রসময় বাবু যখন শুনিলেন যে, তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন না কি বলিয়াছিলেন,— ঈশ্বর ত চাকরী ছেড়ে দিলে,— এখন খা'বে কি করে?' কথাটা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন—'বোলো, মুদির দোকান কোরে খাবে।"'

"সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চাকরী পাইলেন। মাসিক বেতন,—আশী টাকা। এই সময়ে তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বহিখানা লিখেন। এই বহি তাঁহার প্রথম রচনা।

"কিছুদিনের মধ্যে বীটন্ সাহেবের (J. Drinkwater Bethune) সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় হইল। বীটন্ সাহেব তখন কাউন্সিল অভ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিচালনের নূতন ব্যবস্থা

করিলেন; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে একজন প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করাই স্থির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হইলেন; মাসিক বেতন তিন শত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও পাঁচ ছয় বৎসর আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলাম।

"এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। মোটামুটি এই কয়টা কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে:—

১। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন, বর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুর ছেলেমাত্রই কলেজে পড়িতে পারিবে।

২। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।

৩। ব্যাকরণ পড়ানর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; 'মুগ্ধবোধ' উঠাইয়া দিয়া 'উপক্রমণিকা' পড়ান আরম্ভ হইল।

৪। অধিক ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এত দিন ছাত্রেরা ইচ্ছামত ইংরাজি মাষ্টারের কাছে অধ্যয়ন করিত। দুইজন ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন; ছেলেদের ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের কাছে অধ্যয়ন করিত। এখন হইতে ইংরাজি পড়া কয়েক ক্লাস উপর হইতে Compulsory হইল।

৫। সংস্কৃত গণিতশাস্ত্র—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল; ইংরাজিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়া আরম্ভ হইল। অঙ্কের অধ্যাপক হইলেন—শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক—প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।

"এই সকল পরিবর্ত্তন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং করিলেন, ইহাতে তাঁহার উপরওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না।

"নূতন নিয়মে পড়ান হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch এর ফলে, গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের ভাঙ্গা গড়া হইল। শিক্ষাবিভাগের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অনেক বাঙ্গালা ইস্কুল স্থাপিত হইল, ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্টরও নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রহিলেন, এবং ইস্কুলের পরিদর্শক হইলেন। এখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল, পাঁচ শত টাকা। সেই সময় সংস্কৃত কলেজে একজন সহকারী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন।

"এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্ন বাবু বাঙ্গালায় পাটিগণিত লিখিলেন।—আমার দাদা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র পড়া ছিল না, তাই তাঁহার পাটিগণিতের সমস্ত terminology (যথা,—বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, করণী, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক ইত্যাদি) আমার দাদা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাটিগণিতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্যের নাম এই জন্য সবিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তারিণীকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালায় ভূগোল লিখিলেন; আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই termino-logy প্রচলিত। সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়,—

(১) জীবন চরিত—Chamber's Biographyর অনুবাদ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—Marshmanএর অনুবাদ।

(৩) মহাভারতের উপক্রমণিকা।

(৪) বোধোদয়।

(৫) ব্যাকরণকৌমুদী।

(৬) ঋজুপাঠ।

(৭) Expurgated রঘু, কুমার, ভারবী, মাঘ।

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই আমি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন, যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি; তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্চ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমায় আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দোবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম। এই রকম একগুঁয়েপনা আমার বরাবর রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে এমন অনেক বার আমি শুধু যে তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছি তাহাই নহে, তাঁহার উপর

অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া তাঁহাকে অনেক কড়া কথা লিখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার 'বিচিত্রবীর্য্যে'র প্রশংসা করিয়াছিলেন; তাই আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমার বহিখানি পড়িতে অনুরোধ করি। মাস তিনেক পরে বহিখানি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—'ওহে, আমার এমন সময় হচ্ছে না যে, তোমার বইখানা পড়ি।' আমার বড় রাগ হইল। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া একেবারে Byronএর English Bards and Scotch Reviewersএর মত চারি পাঁচ শত লাইন পয়ার লিখিয়া ফেলিলাম। রাগ হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর, কিন্তু আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকৃতি অনেককে জড়াইয়া ফেলিলাম। একটু একটু এখনও মনে আছে—বায়রণকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—

তাদৃশ ক্ষমতা-বল যদিও না ধরি।
তথাপি, রাজেন্দ্র, তুমি মম যোগ্য অরি॥
কখনও মাছের মত মারহ ঠোক্কর।
দু' এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর॥
গাধারে পিটিলে কভু হয় নাকি ঘোড়া।
লুই কি ধোয়ালে হয় গঙ্গাজলে জোড়া॥
হাজার সাধনা কিম্বা করিলে প্রয়াস।
মূর্খ কভু নাহি পায় লিখিয়া সাবাস॥

"ঐ পয়ারটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আরও কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় কিন্তু প্রকাশ করি নাই।

"আমি সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার বৎসর খানেক পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরী ত্যাগ করিলেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও হইল না। কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন।

"এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম। পরে ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ দিলাম। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সুতরাং আমাকে চাকরী করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন; তাঁহার স্ত্রীও বিদুষী ছিলেন। ফরাসী ভাষায় লেখা বহি আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি আমার উচ্চারণের বড়

প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে কখনও মাথা হেঁট করিতাম না; সেটা যে চাকরীর পক্ষে ভাল, তাহা বলিতেছি না; অনেক সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম। এই যে ভাব, এটা আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত নিবিড় ভাবে ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হইয়াছিল। উড্রো সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন,—'এস আমার গাড়ীতে এস। তোমার বাড়ি অনেক দূর, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি যাব।' আমি বলিলাম,—'No, thank you I shall walk home' তিনি আমাকে তাঁহার নিজের খরচে বিলেত পাঠাইবার মৎলব করিয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা পাশ করিয়া আসি; কিন্তু তাহা হয় নাই,—গ্রহের দোষ।

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের Junior Professor of Vernacular পদে নিযুক্ত হইলাম। ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadon কে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন, আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে Junior Professor করাইয়া দিলেন। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল—অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়দর্শন,' হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রভৃতি ধরাইলাম। হেমবাবুকে জনসাধারণের কাছে, বোধ হয়, আমিই পরিচিত করি। একখানা পত্রিকায় আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' সমালোচনা করিয়া—তাহার ভাল মন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম। Byronএর Don Juan হইতে যে অংশ তিনি ছাঁকা তর্জ্জমা করিয়াছেন, অনুবাদ হিসাবে তাহা মন্দ হয় নাই। আমার দাদার 'বেকনের সন্দর্ভ'ও কলেজে পড়ান হইত। রাসবিহারী (Dr. Ghose) শুধু এই বইখানা পড়িয়া বি. এ. পাস হইয়াছিলেন। অনেক দিন পরে একদিন রাসবিহারী আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—'কেমন আপনাকে ঠকিয়েছিলুম, রামকমল বাবুর 'বেকনের সন্দর্ভ' খানি আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছিলুম, আপনি টের পান নি, আমায় পাস করে দিয়েছিলেন।' আমি উত্তর দিয়াছিলাম, –'তা' নয়, তোমার মত মেধাবী ছেলে কি একখানা বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে?'

"শুধু বাঙ্গালা পড়াইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। কাউয়েল্ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটু একটু সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, একবারেই 'কাদম্বরী' আরম্ভ করি; সাহেব বলিলেন, 'ওটা too ambitious' কাযেই শব্দপাঠ তৃতীয় ভাগ লইয়া সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ হইল। ক্রমে 'কুমার' 'বেণীসংহার' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত হইল।

"বাঙ্গালা পড়ুয়ার শেষ দলের মধ্যে ছিলেন, রাসবিহারী; সংস্কৃত পড়ুয়ার প্রথম দলের মধ্যে ছিলেন, সারদাচরণ মিত্র।

"সারদা খুব ভাল সংস্কৃত শিখিয়াছিল; ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেই প্রায় পলাইত, সারদার পড়ার আগ্রহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম। যেমন ইংরাজি সাহিত্যে, তেমনই সংস্কৃতে।

"আমার ছাত্রদিগের আমি পরীক্ষক হই, এটা ভাল নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি স্বেচ্ছায় পরীক্ষক হইলাম না। সেইবার হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমার ছাত্রেরা খুব উচ্চস্থান অধিকার করিত; সারদা সকলের অপেক্ষা ভাল ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা পারিয়া উঠিত না।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

জন্ম ও মৃত্যু।

কহে মৃত্যু—ওগো জন্ম জীবন-মঙ্গল
তুমি আমি আছি দুয়ে মাঝে ব্যবধান;
তুমি এলে হাসে জীব, মোরে করে ভয়,
বল দেখি, উভয়ের মাঝে কে প্রধান?
জন্ম কহে, উচ্চ নীচ করহ বিচার;
দুজনার আত্মকথা শুন বলি তাই,—
মম আগমনে মৃত্যু তব আগমন;
আছি বলে আছ তুমি, না থাকিলে নাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

অধ্যাপক কবার্ট ক।

'আর্য্যাবর্ত্তের' কয়েক সংখ্যায় কীটাণুতত্ত্বের যে ইতিহাসের আলোচনা করা গিয়াছে, সেই সম্পর্কে অধ্যাপক কএর আবিষ্কার ও জীবন-কথা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করিলে কীটাণুতত্ত্বের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই জন্য আজ 'আর্য্যাবর্ত্তের' পাঠকগণকে অধ্যাপক কএর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত উপহার দিতেছি।

এই অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কীটাণুতত্ত্বের নূতন নূতন আবিষ্কারফলে চিকিৎসাশাস্ত্র উচ্চতর ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গত ২৭শে মে বেডেন বেডেনে হৃদরোগে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জীরকাউ-এর মৃত্যুর পরে আর কাহারও মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতে এরূপ ক্ষতি হয় নাই। কীটাণুতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার জন্যই যেন তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হার্জ পর্ব্বতের সান্নিধ্যে ক্ল্যানথালে কবার্ট ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বহুপরিবারভুক্ত ও সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৬২-৬৬ খৃঃ অঃ কবার্ট ক গটিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে উপাধি-লাভ করিয়া কিছুকালের জন্য হামবার্গ জেনারল হাঁসপাতালে হাউস সার্জে-নের কার্য্য করেন ও তৎপরে হানোভরের সান্নিধ্যে ল্যান্‌জেন হেগেন গ্রামে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পোশেন প্রদেশে গমন করেন।

পরে সরকারী চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিয়া তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পোশেন প্রদেশস্থ ওয়ালিষ্টিন নামক স্থানের প্রধান স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। এই স্থানে তিনি প্রায় ৮ বৎসর কাল ছিলেন। এই ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে—বৈজ্ঞানিক জগতের বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও, কীটাণুতত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়া তিনি এক নবযুগের সূচনা করেন। তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না—এমন কি অর্থাভাবহেতু তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিনিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মিতব্যয়ে সংসার চালাইয়া স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে একটি অণুবীক্ষণ উপহার দিয়াছিলেন। এই স্থানেই

তিনি অদ্বিতীয় ফরাসী কীটাণুবিদ্ পাস্তরের পথাবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কীটাণুর উৎপাদনের জন্য "Solid Media" প্রস্তুত করিয়া তিনি এই বিজ্ঞান-চর্চ্চার পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত করিয়া দেন। ঐ সময়ে পাস্তর Anthrax নামক সংক্রামক ব্যাধির পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। পাস্তর অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই ব্যাধি কীটাণুকর্তৃক উৎপাদিত,—অধ্যাপক ক পরীক্ষা দ্বারা উহা সপ্রমাণ করেন। এই সময়েই তিনি কীটাণু-তত্ত্বে চারিটি স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ করেন। * অধ্যাপক ক তাঁহার গবেষণা শেষ করিয়া ব্রেসলাউ নগরে বিখ্যাত অধ্যাপক ফার্ডিনাণ্ড কোনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়েন। অধ্যাপক কোন এই অপরিচিত চিকিৎসকের আবিক্রিয়ার ও গবেষণার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেন। তিনি স্থানীয় নিদানের অধ্যাপককে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে অনুরোধ করেন এবং তৎসঙ্গে বলিয়া পাঠান যে, পোশেন প্রদেশ হইতে একজন চিকিৎসক আসিয়াছেন, তাঁহার আবিষ্কার প্রাণি-তত্ত্বে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। অধ্যাপক কোনের পরিচালিত প্রাণি-তত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকায় অধ্যাপক কএর প্রথম গবেষণার ফল বাহির হয়। ইহাতে তিনি কৃত্রিম Media তে কীটাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত করেন এবং সপ্রমাণ করেন যে, কীটাণু অপেক্ষা তাহার বীজদকল অধিক ক্ষমতাশালী। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'Wound Infection' নামক এক পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত লিষ্টারের "Antiseptic" অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালীর সমর্থন করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। তিনি বার্লিনে Imperial Health Office এ সদস্য পদের জন্য আহূত হইলেন। Disinfection এর গবেষণা করা তাঁহার কার্য্যের মধ্যে নিরূপিত হইল। এই স্থানে তিনি অনুবীক্ষণে Abbe condenser ব্যবহার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে উপদেশ দেন। এই স্থানেই তিনি যক্ষ্মা রোগের মৃত্যু-তালিকা দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কএর প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। তিনি যক্ষ্মারোগের নিদান ও কীটাণু আবিষ্কৃত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন, এবং চারিটি স্বতঃসিদ্ধদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

* 'আর্য্যাবর্ত্ত'—ভাদ্র, ৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে, তিনি তাঁহার প্রথম গবেষণার ফল একখানি প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়িণী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু এখনও তিনি তাঁহার অসাধারণ আবিষ্কারের কথা কোন চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ না করিয়া বার্লিনের বিখ্যাত প্রাণি-শরীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রেমণ্ড পরিচালিত এক বৈজ্ঞানিক সভায় তৎসম্বন্ধে এক সন্দর্ভ পাঠ করেন। ইহাতে জর্ম্মাণী কেন সমস্ত সভ্যজগতে তাঁহার যশঃসৌরভ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। Anthrax এর কীটাণুর গবেষণা কেবল ব্যবসায়ীর উপকার করিয়াছিল। এখন মনুষ্যের এইরূপ সংক্রামক ব্যাধির কীটাণু আবিষ্কার করিয়া তিনি সমগ্র মানবজাতির উপকার সাধন করিলেন। তিনি এই সময়ে প্রিভি কাউন্সেলারের পদে উন্নীত হয়েন। কিন্তু এই উচ্চ পদ লাভ করিয়াও তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় বিরত হইলেন না।

১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি বিসূচি-কার কারণ নির্ণয়ের জন্য মিসরে ও ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তাঁহার দুইজন সহকারী Dr. Gaffry Dr. Fischer সমভিব্যাহারে মিসরে উক্ত সংক্রামক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে মনোযোগী হয়েন। তথায় কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া তিনি এই রোগের আদিস্থান ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ভারত গভর্মেণ্ট তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য-প্রদান করেন। কলিকাতায় কিছুদিন কার্য্য করিয়া তিনি সপ্রমাণ করেন যে, এই ব্যাধি—"কমা" র মত আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুর দ্বারা উৎপাদিত। কলিকাতার এক পুষ্করিণীর পানীয় জলে ও বিসূচিকা রোগগ্রস্ত কিংবা বিসূচিকায় মৃত ব্যক্তির অন্ত্রে এই সকল কীটাণু লক্ষিত হয়। তাঁহার এই আবিষ্কারের জন্য জর্ম্মাণ গভর্মেণ্ট তাঁহাকে ১৫০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। এই আবিষ্কারের পর বার্লিনে সংক্রা-মক ব্যাধির নিবারণ-কল্পে এক মহাসভার অধিবেশন হয়। কয়েক বৎসর পরে অধ্যাপক ক হামবার্গে এই ব্যাধির প্রকোপকালে তাঁহার পূর্ব্বের মত সপ্রমাণ করেন।

তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর জর্ম্মাণ গভর্মেণ্ট অধ্যাপক ককে তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য প্রচুর সাহায্য করেন। Imperial Health Office এ সদস্যের কার্য্যে তাঁহাকে অনেক সময় লিখন পঠনে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ইহাতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার অসুবিধা হইত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের Hygenic Institute

এর অধ্যক্ষ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের অধ্যাপক হয়েন। কিন্তু শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান কার্য্যে অত্যধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইত বলিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া Royal Institute for Infectious Diseases এ যোগদান করেন। ইহার সংলগ্ন একটি উত্তম গবেষণা গৃহ ও হাঁসপাতাল ছিল। এই স্থানেই তিনি যক্ষ্মারোগের কীটাণু বিনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অদম্য উদ্যম সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি Berlin Medical Congress এ যক্ষ্মারোগের তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত Tuberculin নামক ঔষধ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা তখনও শেষ হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুবর্গের ও অনেক স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের অনুরোধে তিনি যাহাতে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইতে পারে সেইরূপ উপায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ কোন জর্ম্মাণ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইহাতে সমস্ত বিজ্ঞান জগতে আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার ঔষধ কোন কোন হাঁসপাতালে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভীরকাউ প্রথম হইতে ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রমে সমস্ত হাঁসপাতালে চিকিৎসকগণ গ্রহণ করাতে ঐ ঔষধ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে দলে দলে যক্ষ্মারোগী বার্লিনে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু অনেককেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। কোন্ কোন ক্ষেত্রে রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কাহারও কোন উপকার হইল না। কোন কোন হতভাগ্য ইহলীলা সংবরণ করিল। ইহাতে অনেক চিকিৎসকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সম্বন্ধে Berlin Medical Society তে ভীরকাউ কএর ঔষধে চিকিৎসিত একটি যক্ষ্মারোগীর ফুস ফুস প্রদর্শিত করেন এবং বলেন যে, এই ঔষধে কোন উপকার হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার Tuberculin প্রস্তুত করেন। ইহাই এখন যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা ও রোগ-নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাপারে অধ্যাপক কএর যশের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি গোবসন্তের তত্ত্বানুসন্ধানজন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। তথায় তিনি সপ্রমাণ করেন, গোবসন্ত হইতে যে পশু আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহার রক্ত অন্য গরুর রক্তে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে সেই গরু উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে এবং ব্যাধিও বিশেষ সংক্রামক হইতে পারে না। ইহাতে গোজাতির রক্ষা হইতে পারে। সেই বৎসরই তিনি প্লেগের তত্ত্বানুসন্ধানজন্য—দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট অধ্যাপক কএর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার অনুসৃত গোবসন্তের প্রতিষেধক চিকিৎসা-প্রণালী এই দেশে প্রচলিত করিবার জন্য যত্নবান হইলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কীটাণুবিদ্‌গণকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন করিলেন। অধ্যাপক ক তাঁহার সহকারী ডাক্তার পিকারের সমভিব্যাহারে ডাক্তার লিংগার্ড পরিচালিত মুক্তেশ্বর শৈলে Imperial Bactriological Laboratoryতে তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী প্রদর্শিত করেন। সে সভায় নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকগণের সমাগম হইয়াছিল—ডাক্তার লিংগার্ড, ডাক্তার হ্যাঁকেন্‌, কর্ণেল পিস, কর্ণেল রেমণ্ড, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এভান্স ও মেজর ব্যালড্রি। বাবু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় সে সময় কর্ণেল রেমণ্ডের সহকারিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইটালীতে ম্যালেরিয়ার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ক পুনরায় জর্ম্মাণী পরিত্যাগ করিয়া ইটালীতে গমন করেন এবং সেই বৎসরেই জর্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে পুনরায় আফ্রিকায় গমন করিয়া তথায় এই ব্যাধির গবেষণায় নিযুক্ত হয়েন। তিনি এই গবেষণায় কোনও নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কীটাণুবিদ্‌গণের মত প্রমাণিত করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ক British Tuberculosis Congressএ মনুষ্য এবং গোজাতির যক্ষ্মাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাধি উল্লেখ করিয়া এক সন্দর্ভ পাঠ করেন। বহু চিকিৎসক তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি যক্ষ্মা-নিদান সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধে মনুষ্য ও গো-যক্ষ্মা একই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। Tuberculin সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কালেও তিনি উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। International Tuberculosis Congress এ গো-যক্ষ্মা ও মনুষ্য-যক্ষ্মা পৃথক ব্যাধি বলিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব মতেরই প্রতিবাদ করিলেন। উক্ত সভার সভাপতি লর্ড লিষ্টার অধ্যাপক কএর অসাধারণ প্রতিভার প্রশংসা করিয়া পরে বলেন যে, মনুষ্য ও গো-যক্ষ্মার কীটাণুর কোন পার্থক্য নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে প্রবেশ করিয়া তাহারা কেবল কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত

হইতে পারে। এই মত প্রমাণের নিমিত্ত একটি নূতন Royal Commission on Tuberculosis এর সৃষ্টি হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এই সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে উক্ত Commissionএ মত প্রেরিত হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, উভয় প্রকার যক্ষ্মা একই কীটাণু হইতে উৎপাদিত; তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে কীটাণুর রূপান্তর হয়। British Commission এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে,মনুষ্য-যক্ষ্মার কীটাণু অত্যন্ত বিষাক্ত, কিন্তু উহা গোজাতির দেহে প্রবিষ্ট করাইলে রোগ জন্মিতে অনেক সময় লাগে এবং জন্মিলেও ব্যাধি মারাত্মক হয় না—পরন্তু আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু গো-যক্ষ্মার কীটাণু মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে না।

মনুষ্য-যক্ষ্মাতে কোন কোন ক্ষেত্রে গো-যক্ষ্মার অনুরূপ কীটাণু পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এখনও মতবাদ চলিতেছে এবং কোনরূপ সিদ্ধান্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক এর একটু ভ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ ভ্রমের জন্য তাঁহাকে নিন্দা করা যায় না; কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কীটাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়।

অধ্যাপক ক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহল্‌মে How to fight against Tuberculosis নামক বক্তৃতা পাঠ করেন এবং ঐ বৎসরেই Nobel Paize প্রাপ্ত হয়েন। অধ্যাপক ক কখনও সহজে মত পরিবর্ত্তন করিতেন না। এমন কি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটনের Congress এ তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিলেন। তবে দুই এক স্থানে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কীটাণু বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবনব্যাপী চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। গত বৎসর শীত ঋতুতে তাঁহার হৃদ্‌রোগের লক্ষণ দেখা যায়। অধ্যাপক ক্রান্স তাঁহাকে বিজ্ঞানচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তিনি সমুদায় কার্য্য বন্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শেষে বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বেডেনবেডেনে যাইয়া তথায় গত ২৭শে মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিকের Anthrax, বিসূচিকা, যক্ষ্মা, গো-বসন্ত, Sleeping Sickness, Black-water Fever, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি

সম্বন্ধীয় গবেষণা বিজ্ঞান জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিজ্ঞান জগত তাঁহার নাম চিরকাল স্মরণ রাখিবে।

কএর অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা অতি অসাধারণ ছিল। তিনি আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার জন্য কখনও লালায়িত ছিলেন না। তিনি দুই বার বিবাহ করেন। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটি কন্যা বর্ত্তমান। সমগ্র শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক জগত আজ এই শোকসন্তপ্ত, বিয়োগ-কাতর ক্ষুদ্র পরিবারের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

হরিদ্বার।

স্বভাবের শোভাতীর্থ তুমি হরিদ্বার,
বিরাজ কি স্নিগ্ধরূপে হিমাদ্রি-তোরণে!
নিবিড় বনানী ঘিরে আছে চারিধার;
খেলে শোভা-সৌদামিনী ভূতলে গগনে!
ঊর্দ্ধে শৈল শিবালিক শত শৃঙ্গ তুলি',
কি বাহু বেষ্টনে তোমা রেখেছে বেড়িয়া;
অতুল সৌন্দর্য্য হেরি 'স্বর্গরাজ্য ভুলি',
দেবতা নিবসে তোমা প্রেমেতে মজিয়া।
চিররম্য হিমাদ্রির তুষার-মুকুটে,
বিচিত্র মেঘের লীলা বিচিত্র বরণ;
কি মহা মহিমা হেরি' চিত্ত পড়ে লুটে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সংযোগের সেতু সুশোভন!
অপূর্ব্ব গঙ্গার দৃশ্য! আজি হিমাচলে,
বহে পুণ্য প্রবাহিনী প্রখর হিল্লোলে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

---

* এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলনে আমি Lancet পত্রিকা হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কএর প্রতিকৃতিটি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মণ্ডল কর্ত্তৃক British Medical Journalএ প্রকাশিত চিত্র হইতে গৃহীত।

মৃত্যু-মিলন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দম্পতী।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। ত্রয়োদশীর অসম্পূর্ণ চন্দ্রগোলক গগনে সমুদিত। চন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া অগণিত তারকা মেঘহীন গগনে প্রদীপ্ত।

শক্র সিংহের গৃহ সুপ্তিশান্ত। নিদ্রিত গৃহের উপর চন্দ্রকর লুটাইয়া পড়িয়াছে। গৃহসংলগ্ন উদ্যানে রজনীগন্ধার ও বেলার বিকশিত শ্বেত শোভা হরিতের রাজ্যে বৈচিত্র্য দান করিতেছে। পবনে ঘন সৌরভ যেন পবনকে ভারাক্রান্ত—অলস করিয়া তুলিয়াছে। দিবসের দারুণ তাপের হ্রাস হইয়াছে।

গৃহের পার্শ্বস্থ একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। কক্ষ হইতে দুইজন লোক নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানে উপনীত হইলেন। উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনের মুখে চন্দ্রকর পতিত হইল;—একজন সৈনিক যুবক—আর একজন রেবা। সৈনিকের বাহু রেবার ক্ষীণ মধ্যদেশ বেষ্টিত করিয়া আছে; উভয়েই যেন একই স্বপ্নে বিভোর।

রেবার নয়নে যে প্রেমদীপ্তি তাহার তুলনায় আলোকসম্পাতসমুদ্ভূত হীরকের দীপ্ত দীপ্তি তুচ্ছ। রেবা অনিমেষ নয়নে বাঞ্ছিতের মুখপানে চাহিয়া ছিল। তাহার হৃদয় ঐ গগনেরই মত দীপ্তদীপ্তি-সমুজ্জ্বল। তথায় মেঘান্ধকারলেশ নাই। সে বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়াছে, তাই সে আপনাকে সকল সুখে সুখী মনে করিতেছে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাকে আপনার সুখে সম্পূর্ণ সুখী করে—ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম।

দুই জনেরই মুখ প্রফুল্ল—যেন আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

দুইজনে আসিয়া উদ্যান-সীমায় সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিলেন। সৈনিক বলিলেন, "এই স্থানে আমাদের প্রথম পরিচয়।"

রেবা বলিল, "সেই প্রথম পরিচয় হইতে এ স্থান আমার নিকট পুণ্য তীর্থ।"

"সে কথা আমার পক্ষেই সত্য। আমি এই পুণ্যতীর্থে জীবনসাধনধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।"

"ও কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার জন্ম কত নারী যুগে যুগে সাধনা করিতে উৎসুক হইবে।"

সৈনিক হাসিয়া রেবার ক্ষুদ্র অধরে আবেগভরা চুম্বন দান করিলেন,—বলিলেন, "তবে বলিতে হয়, আমি এই স্থানে চোরের মত অমূল্য রত্ন চুরি করিয়াছি।"

"ছিঃ! আমার হৃদয় কি অমূল্য রত্ন? তুমি সেই অসার বস্তু গ্রহণ করিয়াই তাহাকে ধন্য করিয়াছ।"

রেবা দুই বাহু দিয়া সৈনিকের গলদেশ বেষ্টিত করিয়া উৎক্ষিপ্ত আননে—মুগ্ধ নয়নে সৈনিককে দেখিতে লাগিল; তাহার পিপাসিত দৃষ্টি যেন অমৃতপানে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল।

সৈনিক তাঁহার নিকট সকল সৌন্দর্য্যের সার সেই কনককমলকান্তি আনন চুম্বন করিলেন। রেবার তৃষিত অধর সৈনিকের অধর স্পর্শ করিল,—সে যেন দীর্ঘ চুম্বনে প্রেমসুখ-তৃষ্ণা মিটাইয়া লইল।

যুবক রেবাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কালিদাস কখনও রেবা দেখেন নাই।"

রেবা সহসা এই প্রসঙ্গে বিস্মিতা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"দেখিলে তিনি রেবার অন্যরূপ বর্ণনা করিতেন।"

রেবা তখনও কিছু বুঝিতে পারিল না; বরং তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সৈনিক বলিলেন, "কালিদাস মেঘকে বলিয়াছেন,—'রেরাংভ্রূকন্যুপল-বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাঃ।' রেবা কি কখনও বিশীর্ণা হইতে পারে?" সৈনিকের অধর রেবার বিম্বোৎপলপ্রভ কপোল স্পর্শ করিল।

রেবা হাসিয়া বলিল, "কেন? বিরাটবপু বিন্ধ্যের চরণতলে তুচ্ছ রেবা তুচ্ছতরা। পুরুষের সবল সম্পূর্ণতার নিকট রমণীর ক্ষীণতা—দীনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন।"

সৈনিক বলিলেন, "বরং বল, বিন্ধ্যের উপলবিষম চরণে পড়িয়াই রেবার

দুর্দ্দশা। শিলাসার পুরুষ রমণীর আদর কি বুঝিবে? সে আপনার উদ্ধত গর্ব্বে আপনি অন্ধ—আত্মসুখেই তাহার তৃপ্তি। তাই কবি বলিয়াছেন,—"অস্থানে পততামতীব—"

"তাহা নহে। রেবা দীনা—ক্ষীণা—শীর্ণা। তবু বিন্ধ্য তাহাকে চরণ-চ্যুত করে নাই, বরং সাদরে প্রেমধারাদানে তাহার দীনতা দূর করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট।"

"বিন্ধ্যের সে কার্য্য স্বার্থসঙ্গত। রেবা নহিলে কে তাহার নীরসতা সরস করিবে; শুষ্ক, কঠোর, ধূসর শিলাদেহ শ্রিয়শ্যামে সুশোভিত করিবে?"

"রেবাকে সেই অধিকার দানেই বিন্ধ্যের দয়ার পরিচয়।"

"না। কালিদাস পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহা বুঝাইয়াছেন। যে পূর্ণতা গৌরব-জনক—যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে মেঘকে অনিলও বিচলিত করিতে পারে না—সে পূর্ণতা রেবার দান। নারীই পুরুষের সম্পূর্ণতার কারণ। যত দিন সে সম্পূর্ণতালাভ না ঘটে, তত দিন তুচ্ছ ঘটনার আঘাতে পুরুষের হৃদয় চঞ্চল ও ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হয়। রমণী পুরুষকে সম্পূর্ণ করে—তাহাকে গৌরব-গর্ব্বলাভে সমর্থ করে।"

প্রেমিকপ্রেমিকার প্রণয়পূর্ণ—প্রণয়োদ্ভূত কথোপকথন; কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়। যখন এ উদার বাক্যসুধাপান-পিয়াসী তখন কি কথার শেষ হয়? তখন দেখিতে দেখিতে সময় কাটিয়া যায়, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না।

দম্পতীরও তাহাই হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে যে সময় যাইতেছিল, সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও ছিল না। উভয়ে উভয়ের সংসর্গ-সুখে তন্ময়। হায়—প্রেম জগতে যদি তুমি ব্যতীত আর কিছু না থাকিত, তবে জগৎ কি সুখেরই হইত!

রেবা জিজ্ঞাসা করিল. "কবে আমাকে তোমার গৃহে লইয়া যাইবে?"

সৈনিক হাসিয়া বলিলেন, "আমার গৃহ বুঝি তোমার গৃহ নহে?"

রেবা লজ্জিতা হইল,—বলিল, "কবে আমাদের গৃহে যাইব?"

রেবা স্বামীর গৃহ ও স্বামীর স্বজনগণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল। সে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছে. তাই সে সেই জীবনে যাহারা সঙ্গী তাহাদের সন্ধান করিতেছিল।

সৈনিক বলিলেন, "আমি অবসর পাইলেই তোমাকে লইয়া যাইব।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, কবে অবসর পাইবে?"

"তাহা ত বলিতে পারি না।"

"সৈনিকের কার্য্যে কি অবসর নাই?"

"আছে; কিন্তু অল্প। রাজ্য-রক্ষার কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা যাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের অধিক অবসরলাভ ঘটে না।"

"তুমি সৈনিকের কার্য্য ছাড়িয়া দাও না কেন?"

"তাহাতে কি লাভ হইবে?"

"আমরা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিতে পারিব।"

"কিন্তু সকল সৈনিক যদি কার্য্য-ত্যাগ করিয়া আইসে, তবে কে রাজ্য রক্ষা করিবে?"

"সকলে আসিবে কেন?"

"আর সকলেও ত বিবাহ করিতে পারে।"

রেবা লজ্জিতা হইল। এ কথা ত সে ভাবিয়া দেখে নাই! সে কেবল আপনার কথাই ভাবিয়াছে। তাহার লজ্জারক্তগণ্ডযুগ লোধ্রপুষ্পযুগলের শোভা ধারণ করিল। সেই শোভা দেখিতে দেখিতে সৈনিক বাহুপাশবদ্ধা প্রণয়িণীকে আরও নিকটে টানিয়া লইলেন; তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আর আমি যদি সৈনিকের কার্য্য-ত্যাগ করিয়া আসি, তবে তুমি আর আমাকে ভাল বাসিবে না।"

রেবা যেন চমকিয়া উঠিল। সে যে তাহার পতিকে ভালবাসিবে না, এ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসহনীয়। সে বলিল, "কেন?"

সৈনিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তখন তুমি আমাকে অকর্ম্মণ্য জীব মনে করিবে; মনে করিবে,—আমি অসার, তাই অলস জীবন যাপন করিতেছি। কর্ম্মই মানবজীবনের লক্ষণ, কর্ম্মহীনতা জড়ের প্রকৃতি। তাই আমি কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিলে তুমি বিরক্ত হইবে।"

রেবা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "কখনও না। তুমি যাহাই কর, আমি তোমাকে ভালবাসিব। বরং তোমার কর্ম্মই তোমাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়।"

"অর্থাৎ আমার কর্ম্মই তোমার সপত্নী।"—সৈনিক হাসিতে লাগিলেন, আবার রেবার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি থাকিলেই আমার যথেষ্ট কর্ম্ম। কিন্তু এখন বিরল-প্রাপ্ত মিলনে আনন্দ পাইতেছ; মিলন চিরস্থায়ী হইলে তাহাতে বিরক্ত হইবে না ত?"

"তোমার কি তাহাই হইবে?"

অভিমানে রেবার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সৈনিক ব্যস্ত হইয়া সে অশ্রু মুছাইয়া দিলেন; বলিলেন, "রহস্যে ব্যথিতা হইতে আছে?"

তাহার পর সৈনিক বলিলেন, "আমি যত সত্বর পারি অবকাশ লইয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

"তুমি রাজার নিকট অবকাশ প্রার্থনা কর না কেন?"

"তাহাই করিব।"

"রাজা কি অবকাশ দিবেন না? তিনি কি নিষ্ঠুর?"

"তিনি পরম দয়ালু। তিনি অবশ্যই অবকাশ দিবেন।"

"গৃহে কে কে আছেন?"

"আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া আছেন।"

"আমি তাঁহাদিগকে কত ভক্তি করিব। তাঁহারা আমাকে স্নেহ করিবেন?"

সৈনিক বলিলেন, "হাঁ।" কিন্তু তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইলেন। রেবার প্রশ্নে তাঁহার মনে যে প্রশ্ন উঠিল, তিনি কয়দিন চেষ্টা করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ এ বিবাহের কথা শুনিলে কি বলিবেন? তিনি সাহস করিয়া ভ্রাতাকে এ কথা বলেন নাই। সে জন্য তিনি অনুতপ্ত; কারণ, তিনি জানিতেন, জ্যেষ্ঠের সৌভ্রাত্র অতুলনীয়। তিনি, অসম্ভব না হইলে, কখনও ভ্রাতার সুখে বাধা দিবেন না। আর—যদি অসম্ভব হয়?—তাহা হইলে—তাহা হইলে তিনি কি ভ্রাতার জন্য আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারিতেন না? কিন্তু—রেবা! রেবা ব্যতীত জীবন যে ব্যর্থ হইত! আর যদি ভ্রাতার জন্য হইত, তিনি সব করিতে পারিতেন,—নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এ ত তাঁহার জন্য নহে। এ যে কেবল অসার—অর্থশূন্য—যাতনার কারণ—শূন্যগর্ভ সম্মানের জন্য। সম্ভ্রম কিসে? ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম বিদ্যায়, ক্ষত্রিয়ের সম্ভ্রম বীরত্বে, বৈশ্যের সম্ভ্রম ব্যবসায়-নিপুণতায়, সকলেরই সম্ভ্রম কর্ত্তব্যপালনে। তিনি ত সে কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ নহেন। তবে কি জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে এ বিবাহ হইতে বিরত করিতেন? বোধ হয় না। তবে কেন তিনি তাঁহাকে এ কথা বলেন নাই?

সৈনিক এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে কলনাদিনী তরঙ্গিনীর অবিরাম কলনাদের মত রেবা বলিতে লাগিল, "আমি তাঁহাদের সন্তানদিগকে কত ভালবাসিব! তাহারা আমাকে পাইয়া কি করিবেন?"

সৈনিক চাহিয়া দেখিলেন, রজনীর শেষ প্রহর। তিনি রেবাকে বলিলেন, "চল গৃহে যাই।"

সেই সময় পশ্চাতে তমাল তরুর অন্তরাল হইতে যেন কে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। এখনও মহী প্রচণ্ড সূর্য্যতাপতাপিতা। কিন্তু কয়দিন বৃষ্টিতে পবন ধূলিমুক্ত,—ধরাতল সরস; তাই পবনোদ্গত-রেণুমণ্ডল আর পথিককে ক্লিষ্ট করিতেছে না। রাজা কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিলেন—সম্মুখে উদ্যান। উদ্যানে তরুলতা তপনতাপে মলিনশ্রী;—কেবল উদ্যানসরসীকূলে কয়টি পাটল তরু পুষ্পশোভাসম্পন্ন—দুই চারিটি করিয়া পুষ্পদল বৃক্ষশাখা হইতে বৃক্ষ-মূলে পতিত হইতেছে। সরসী-সলিলে কয়টি রাজহংস বিচরণ করিতেছে; তাহাদের অমল ধবল দেহ রবিকরে সুন্দরতর দেখাইতেছে। সরসীসলিল জলচরসঞ্চারচঞ্চলিত। দূরে গগনে অদৃশ্যপ্রায়দেহ বৃষ্টিবিন্দুগ্রহণ-চতুর চাতক থাকিয়া থাকিয়া মেঘের নিকট বারি-প্রার্থনা করিতেছে। আর-রাজপথে মধ্যে মধ্যে সারমেয়ের ভষণ শ্রুত হইতেছে। অলিন্দে রাজার পালিত পক্ষীরা নীরব।

রাজা বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

সেদিন বিশ্রাম বাটিকায় তিনি যে কথা মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, এ কয়দিন তিনি সে কথা ভুলিতে পারেন নাই। ইচ্ছায় হউক—অনিচ্ছায় হউক, তিনি সেই কথাই ভাবিয়াছেন। মেঘান্ধকার অমাবস্যা রজনীতে সহসা বিদ্যুদ্বিকাশ যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য ও অদৃষ্ট, ছায়ালোকচিত্রিত প্রকৃতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দেয়—সে দিন তেমনই তাঁহার চিন্তালোকে সহসা তাঁহার হৃদয়ের অদৃশ্য ও অদৃষ্ট ভাব দেখা দিয়াছিল। তাই তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন; যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি তন্ন তন্ন করিয়া হৃদয় সন্ধান করিয়াছেন;—কিন্তু আশঙ্কার কারণ নাই—এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই তিনি আপনার নিকট হইতে আপনাকে দূরে লইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন—মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এ কি নূতন অনুভূতি!

তিনি স্বয়ং ইহার দুর্ব্বল প্রারম্ভ লক্ষ্যও করিতে পারেন নাই। এখন তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত—শঙ্কিত। হায় কর্ত্তব্য, তুমি কত সময় মানুষকে তাহার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট—অপ্রত্যাশিত পথের পথিক কর! হায় দয়া, তুমিও কত সময় মানুষকে অজানিত অকূলে আনিয়া বিপন্ন কর! তিনি কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রণোদনে পুরোহিতের গৃহে শোকাতুরা বালিকাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; দয়ার প্রণোদনে অসহায়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সেই সংযমের প্রতিমাকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেমন কোরক একবার-মাত্র বিকশিত হয় ও বিকশিত কুসুম একবারমাত্র—মুহূর্ত্ত-মাত্রের জন্য সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা লাভ করে, তেমনই মানুষও বুঝি একবার—মুহূর্ত্তের জন্য মানসিক সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল আভায় দিব্য লাবণ্য লাভ করে। সে মানসিক সৌন্দর্য্য কাহারও পক্ষে প্রেমপ্রসূত, কাহারও পক্ষে সংযমসম্ভূত, কাহারও পক্ষে স্নেহসঞ্জাত। বুঝি সেইরূপ সৌন্দর্য্যসম্পূর্ণ অবস্থায় তিনি বালিকাকে দেখিয়াছিলেন। তাই তাহার সেই সংযমস্নিগ্ধ—কোমল মূর্ত্তি তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই।

তাহার পর তিনি তাহাকে যতই জানিয়াছেন, ততই তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি শোকাতুরার শোকপ্রশমনকল্পে কিছু করিতে চাহিলে সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছে। সে আপনার কথা মনেও করে নাই; আপনার জন্য কিছুই চাহে নাই। সে রাজ্যের রুগ্ন, অনাথ, নিরাশ্রয়—ইহা-দিগের জন্য আশ্রমসংস্থাপনের ইচ্ছামাত্র জানাইয়াছে,—রাজাকে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। সে পিতার আদেশ দেববাক্যবৎ জ্ঞান করে, তাই ভ্রাতৃশোকশেল হৃদয়ে লইয়াও পিতার অনুমতি ব্যতীত শূন্য গৃহ ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাহার সংযমের সৌন্দর্য্য! তেমন সংযম—তেমন চিত্তবৃত্তিদমনক্ষমতা পুরুষের কোথায়? তাই রাজা তাহার গুণপরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কিন্তু—তাহাই কি সব? বিরামবাটিকার নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আকর্ষণ সে কি কেবল তাহার অসম্পূর্ণ কল্পনার সম্পূর্ণকরণাভিলাষের ফল? সে কি সেই পূর্ব্বমোহ আবার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে? হৃদয়ের নিভৃত নিভৃতে—বহু আপাতরম্য কারণের অন্তরালে কি আর কোন কারণ বিদ্যমান নাই? অন্তঃসলিলা ফল্গুর অদৃশ্য প্রবাহের মত আর কোন বাসনার উত্তেজনা কি তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল না?

তিনি কি অসাধারণ যত্নে সে গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য—সে উদ্যানের রচনাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—কার্য্যের নির্দ্দেশ করিতেছিলেন! সে কি কেবল তাঁহার আপনার সৌন্দর্য্য-কল্পনা চরিতার্থ করণাভিপ্রায়ে? সেই সৌধের—সেই আশ্রমের কল্পনার মধ্যে কি তিনি সেই আশ্রমবাসিনীর কল্পনা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন? যদি না পারিয়া থাকেন—তবে সেই আশ্রমবাসিনীর কল্পনা কি ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই আশ্রমের কল্পনার অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল—অধিক প্রস্ফুট—অধিক প্রবল হইয়া উঠিতেছিল না?

রাজা ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার হতাশাদাবানলদগ্ধ হৃদয়ে কি কর্ত্তব্যানুরাগ ব্যতীত আর কোন নূতন অনুভূতি অনুভূত হয় নাই? মরুভূমির মধ্যে কি সহসা কোন স্নিগ্ধসলিলোদ্গারী প্রস্রবণ দেখা দিয়াছে?

সময় সময় দীর্ঘ দিন রাজকার্য্যের অবিরত শ্রমের পর নিশীথে শ্রান্ত দেহে—ক্লান্তমনে বিশ্রামলাভজন্য শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কি মনে হয় নাই,—জীবনের সুখস্বপ্ন যদি সফল হইত—যদি প্রেম তাঁহার হৃদয় মধুর করিত তবে কঙ্করকঠোর কর্ত্তব্যপথ কোমলকুসুমাস্তৃত হইত। সেই সময়—যখন তাঁহার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস পবনে মিলাইয়াছে—তখন কি পার্ব্বতীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা কখন তাঁহার মনে পড়ে নাই; মনে হয় নাই,—সে মুকুটধারী রাজার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতে পারিত? রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সত্য সত্যই তাঁহার জীবন মরুময়। সেই তাপতপ্ত হৃদয়ে স্নিগ্ধশান্তি-সুখসাত্ত্বের কোন উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর সেই ঔদাস্যব্যঞ্জক মুখভাব—সেই শ্রান্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি মনে পড়িল। হায়, জীবনের—যৌবনের সুখস্বপ্ন! কিন্তু তখনই যেন তাঁহার মনে হইল, সেই পরিচিত—পরিস্ফুট মূর্ত্তির পশ্চাতে আর একটি মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। সে মূর্ত্তি এখনও অস্পষ্ট—অস্ফুট; কিন্তু তাহারই মধ্যে অপগতমেঘাবরোধ গগনে চন্দ্রের মত তাহার স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল দৃষ্টি লক্ষিত হইতেছে। তাহার মুখভাব দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক—কর্ত্তব্যপথ-নির্দ্দেশক।

রাজা আবার চমকিয়া উঠিলেন।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেমন পিঞ্জরমধ্যে পাদচারণ করিয়া ফিরে, রাজা উঠিয়া তেমনই কক্ষমধ্যে পাদচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের দারুণ

চাঞ্চল্য যেন শারীরিক চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—একি? এখন কি করা কর্ত্তব্য? এই বাসনাবহ্নি জলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতেই হইবে—নহিলে, সে একবার তাহার রক্তজিহ্বা সঞ্চালিত করিবার সুযোগ পাইলে, সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইবে—ধ্বংসের আর বিলম্ব হইবে না। তিনি আপনার মন আপনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহুবার পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সে আকর্ষণ কখন্ আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেও পারেন নাই! আশ্রমের বিষয়ে পরামর্শ, সে কি তবে কেবল আবরণমাত্র? না। তিনি ত কখনও তাহা মনে করেন নাই। তবে কি তিনি মনের গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই?

কিন্তু অতীত কথায় আর কায কি? এখন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণই প্রয়োজন। তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সে কার্য্যে উভয়ের সাক্ষাৎ,—ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য্য; আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ না হইলে সে ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, এখনই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। সংযমবন্ধন যাহাতে বিন্দুমাত্র শিথিল হইতে না পারে সেই জন্য তাহাকে দৃঢ়তর করা আবশ্যক। তিনি তাহাই করিবেন—যদি প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারেন, তবে তাঁহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি?

রাজা এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ঘনগর্জ্জনে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অপরাহ্ণ উপস্থিত; পশ্চিম গগনে মেঘ-সঞ্চার হইয়াছে—বিদ্যুদ্বিকাশ হইতেছে। সহসা প্রবল বেগে পবন প্রবাহিত হইল। পবনবেগোৎক্ষিপ্ত কয়টি শুষ্ক পত্র তাঁহার কক্ষ মধ্যে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বর্দ্ধনশীল মেঘমালা আসন্ন বারিপাত সূচিত করিতে লাগিল।

রাজা কক্ষ হইতে অলিন্দে আসিলেন। প্রহরী এক পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি তাহাকে অজয় সিংহকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই অজয়সিংহ ভ্রাতৃসমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে ডাকিয়াছেন?" রাজা মুক্তগবাক্ষপথে চাহিয়া ছিলেন; সেই ভাবে থাকিয়াই বলিলেন, "হাঁ। যে দিন প্রভাতে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর আরও এক রাত্রি তুমি প্রাসাদে অনুপস্থিত ছিলে।" অজয়সিংহের নতদৃষ্টি চরণসংলগ্ন হইল; তিনি কোন কথা বলিলেন না।

রাজা আবার বলিলেন, "একদিনও তুমি মৃগয়ান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাধ্য হইয়া শক্তসিংহের আতিথ্য গ্রহণ কর নাই; তাহা তোমার ইচ্ছাকৃত।"

অজয়সিংহ নির্ব্বাক।

রাজা বলিলেন, "তুমি শক্তসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ। তুমি কি এ কথা অস্বীকার করিবে?" অজয় সিংহ সলজ্জভাবে বলিলেন, "না।"

অজয়সিংহ আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রাজা বলিলেন, "আমি সে সংবাদ অবগত হইয়াছি। একথা অধিক দিন গোপন থাকিবে না। তাহার পূর্ব্বেই আমি এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে চাহি। সে জন্য শক্তসিংহের কন্যার প্রাসাদে আগমন প্রয়োজন। আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি, আগামী পরশ্ব মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনের প্রশস্ত সময়। সেই সময়ের মধ্যে তুমি যাইয়া তাঁহাকে প্রাসাদে আনিবে।"

অজয়সিংহ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "তুমি এখন যাইতে পার।"

অজয়সিংহ প্রস্থান করিলেন।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। তিনি যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা দূর হইয়া গেল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন.—অজয় সিংহের অপরাধ কি? সে যে পরিবারে বিবাহ করিয়াছে সে পরিবারে বিবাহে সামাজিক কলঙ্ক নাই। সে রাজপরিবারে বিবাহ করিতে পারিত, সত্য; কিন্তু রাজপরিবারে বিবাহ কি সর্ব্বদা সুখের? তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় আজ বেদনার আগার হইত না।

রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—অজয় তাঁহাকে একবার জানাইল না কেন? সে চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। কিন্তু স্নেহ স্নেহাস্পদের অপরাধ লইতে চাহে না। তাই তিনি ভাবিলেন,—অজয় যাহাই করুক, তাহার সুখই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। সে যদি এ বিবাহে সুখী হয়, তবে তাহাই তাঁহার পরম সুখ।

তিনি স্থির করিলেন,—একবার ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর মনোভাব জানিয়া দেখিবেন। তিনি এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

হুঅন্-চুয়ং বা হিউয়েন্-সিয়াং।*

(১)

যে প্রসিদ্ধ চিন পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং নামে এতদিন ঐতিহাসিক জগতে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম হুঅন্-চুয়ং। চীনভাষাভিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা এতদিন তাঁহার নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অবগত ছিলেন না বলিয়া প্রকৃত হুঅন-চুয়ং নাম ক্রমক্রমে হিউয়েন-সিয়াঙ্গে পরিণত হইয়াছিল।

হুঅন-চুয়ঙ্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার বর্ণিত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করাই, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা অগ্রে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

চীন সম্রাজ্যের অন্তর্গত হো-নান্ উপবিভাগের চিনলিউ নামক নগরে ৬০৩ খৃঃ অব্দে হুঅন-চুয়ং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সামান্য রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে হুঅন-চুয়ং সর্ব্বকনিষ্ঠ। স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার মানসে, হুঅন-চুয়ঙ্গের পিতা কিছু-দিন পরে চাকরী ছাড়িয়া দেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় সন্তান-গণকে শিক্ষাদান করিতে অতিবাহিত করেন।

হুঅন-চুয়ং প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা একজন বৌদ্ধ যতি ছিলেন। তিনি বালক হুঅন-চুয়ংকে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী লো-য়াং নগরে লইয়া যায়েন। তথায় ত্রয়োদশবর্ষ বয়ক্রম কালে হুঅন-চুয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শ্রমণ বা যতি শ্রেণীভুক্ত হয়েন। এই সময়ে, সুই রাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে চীন সাম্রাজ্যে অন্ত-র্বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া দেশে যুদ্ধবিগ্রহজনিত অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। ঐ সকল অশান্তি প্রযুক্ত হুঅন-চুয়ং ও তাঁহার ভ্রাতা লো-য়াং নগর পরিত্যাগ করিয়া সিয়-টু নামক নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই নগরেই হুঅন-চুয়ং বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা পুরোহিতের পদে আরূঢ় হয়েন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র। অতঃপর বিবিধ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিবার মানসে তিনি ছয় বৎসর কাল সাম্রাজ্যের বহুতর

* চুঁচুড়া হিন্দু সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

শাস্ত্রালোচনার স্থানে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে চঙ্গে-অননগরে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপে স্বদেশীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সকল সন্দেহ বিদূরিত হইল না। যে সকল কূট প্রশ্ন অহোরাত্র তাঁহার মনে জাগরূক ছিল, সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিতগণ অসমর্থ হইলেন। ফা-হিয়ান্ প্রমুখ যে সকল বৌদ্ধ পর্য্যটকগণ তৎপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের লিখিত ও সংগৃহীত পুস্তকাবলী এই সময়ে য়ুয়ন-চুয়ঙ্গের নয়নগোচর হইল। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিতে তাঁহারও বাসনা হইল। তথায় গমনপূর্ব্বক মূল ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে এবং বুদ্ধদেবের লীলাস্থলগুলি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ভক্তের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, য়ুয়ন-চুয়ং ৬২৯ খৃঃ অব্দে, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে চঙ্গে-অন নগর পরিত্যাগ করিয়া বিদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থলপথে আসিতে হইলে বহু তৃণলতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষারমণ্ডিত দুর্গম পর্ব্বত, জীবন-সঙ্কট সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট, হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী প্রতি মুহূর্ত্তে পথিকের পদে পদে বাধা প্রদান করে। অদম্য-অধ্যবসায়-সম্পন্ন, ধর্ম্মোন্মত্ত, বুদ্ধচিন্তায় বিভোর, নবীন সন্ন্যাসী য়ুয়ন-চুয়ং কিরূপে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতে শুভাগমন করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করিব না,—তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহাকে পথিমধ্যে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।—তখন চীন সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত। তজ্জন্য সীমান্ত-প্রদেশের রক্ষকগণ কাহাকেও সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইতে দিতেছেন না,—সুতরাং রক্ষকগণের অজ্ঞাতসারে কোন পতিকে ঘাটি হইতে নিষ্ক্রমণ, পথিমধ্যে বন্ধুগণের মৃত্যু, সময়ে সময়ে পথ-প্রদর্শক-বিহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে প্রতিদিন প্রপীড়িত করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত, তৃণশূন্য মরুদেশে পথভ্রষ্ট, অনশনে ক্লিষ্ট, তৃষ্ণায় তৃষিত ইত্যাদি নানারূপে বিপদগ্রস্ত হইয়া, অশেষ যমযন্ত্রণা সহ্য করিয়া য়ুয়ন-চুয়ং তাঁহার উপাস্য দেবতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-যাত্রার এই ভয়াবহ দুঃখ-কষ্টপূর্ণ

ঘটনাবলী পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই এই নবীন ধর্ম্মবীরের অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ এবং অসীম ধর্ম্মপ্রাণতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, দুই বিন্দু ভক্তিভরা আনন্দাশ্রু অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে নয়ন হইতে পতিত হয়।

হুয়েন-চুয়ং মধ্য এসিয়ার নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কাবুল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। অতঃপর তিনি একে একে ভারতের সমুদায় প্রধান জনপদই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্থানের বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিয়া এবং অসংখ্য সংস্কৃত ও বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়া অশেষ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা-লাভ করিয়াছিলেন।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—বিদ্যানের গৌরব সকল দেশেই। ভারতবর্ষবাসী তখনও গুণের গৌরব করিতে ভুলেন নাই। তাই, হুয়েন-চুয়ং যখন বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় নালন্দার * প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে নালন্দা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিদ্যামন্দির, তখন নানা দিগ্‌দেশে উহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হইতেছিল। নানাশাস্ত্রজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রবীণ শীলভদ্র সেই সময়ে নালন্দার প্রধান অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া, উহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। হুয়েন্-চুয়ং তাঁহার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন; মহা সমারোহে নালন্দার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক শিক্ষাগুরু আচার্য্য শীলভদ্রের পদপ্রান্তে বসিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক এবং হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি দ্বিতীয় শিলাদিত্য দানশৌণ্ড মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন গুণের গৌরব বুঝিতেন,—নালন্দায় অবস্থান কালে হুয়েন্-চুয়ঙ্গের সকল ব্যয়ভার তিনি বহন করিলেন। শুধু নালন্দা নহে, সকল সুধিসমাজই হুয়েন্-চুয়ংকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের অধিবাসীরাই তাঁহার সম্যকরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

* প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের মতে, বর্ত্তমান রাজগিরের সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত বড়গাওঁ নামক গ্রামে পূর্ব্বে নালন্দা নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানেই নালন্দার সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অনন্তর পঞ্জাব, কাবুল, তুর্কীস্থান, কাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক, ষোল বৎসর কাল বিদেশভ্রমণ করিয়া, ৬৪৫ খৃঃ অব্দে য়ুআন্-চুয়ং স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশকালে, তথায় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল; সম্রাট স্বয়ং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ধর্ম্মবীর য়ুআন্-চুয়ং তাঁহার সাধু সঙ্কল্পে বিনীতভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিনম্রবচনে নিবেদন করিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ বুদ্ধের পবিত্র জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্রাট তাঁহার সদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রীত হইলেন। অতঃপর সম্রাট য়ুআন্-চুয়ঙ্গের বাসস্থানের নিমিত্ত একটি সুরম্য মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহারই আদেশানুসারে য়ুআন্-চুয়ং আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধদেবের কয়েকটি স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দন-কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি, বুদ্ধের কিঞ্চিৎ শরীর-ধাতু, বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকসূত্র সম্বন্ধে ১২৪ খানি গ্রন্থ এবং ২২টি অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া ৫২০ খানি অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ২৩ বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি ধর্ম্মচিন্তায় এবং গ্রন্থাদির প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রচার কার্য্যে সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। কথিত আছে, এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার সহকারিগণের সাহায্যে ৭৫০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া, ৬৬৮ খৃঃ অব্দে, ৬৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক বৌদ্ধ-ভিক্ষু-লিখিত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর অনুবাদ এইবার পাঠক-বর্গকে উপহার দিব।

১। ভারতবর্ষের বিভিন্ন নাম।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ভারতবর্ষের (টিয়েন্-চু) অনেকগুলি নাম আছে এবং সেগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে

বড়ই গোলমাল। পুরাকালে ইহাকে সিন্-টু (সিন্ধু) ও হিয়েন্-টউ (হিন্দু) বলা হইত, কিন্তু এক্ষণে বিশুদ্ধ উচ্চারণানুসারে ইহাকে ইন্-টু বলা হইয়া থাকে। ইন্-টুর অধিবাসিগণ বিভিন্ন প্রাদেশিক রীতি অনুসারে তাহাদের দেশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের রীতি-নীতি বিভিন্ন। যে নামটি বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সম্মত সেইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই দেশকে ইন্-টু নামেই উল্লেখ করিব। চীন ভাষায় এই নামের অর্থ ইন্দু বা চন্দ্র। চন্দ্রের বহুতর নাম আছে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। এইরূপ কথিত আছে যে, পরিচালক-নক্ষত্রবিহীন জীবগণ দীর্ঘ অজ্ঞানতা-রজনী মধ্যে (জন্মমৃত্যু) চক্রে যখন অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগের অবস্থা, সূর্য্য অস্ত যাইলে পৃথিবীর অবস্থার ন্যায়; তৎকালে নক্ষত্রালোক বিদ্যমান থাকিলেও উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্র যেমন তাঁহার সংযত কিরণ পৃথিবীতে বিতরণ করেন, সেইরূপ পবিত্র ব্যক্তি ও জ্ঞানিগণের উজ্জ্বল সংযত ধর্ম্মজ্যোতিঃ ইন্দু-কিরণের ন্যায় পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছে বলিয়া এই দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য ইহার নাম ইন্-টু *।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ নানাজাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ পবিত্রতা ও ভদ্রতার জন্য বিশেষরূপ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর নাম এতাদৃশ পবিত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে যে, সকল স্থানের লোকেই বলিয়া থাকে—ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণগণের (পোলো-মেন) দেশ।

২। ভূপরিমাণ, জলবায়ু প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ বলিলে যে সকল দেশকে বুঝায়, সেই সকল দেশ সাধারণতঃ পঞ্চভারত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই দেশ চক্রকারে ৯০,০০০ লি বিস্তৃত। ইহার তিনদিক সমুদ্র-বেষ্টিত এবং উত্তরে তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত বিরাজিত। ইহার উত্তরাংশ প্রশস্ত এবং দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। সমগ্র ভূখণ্ড কমবেশী ৭০টি রাজ্যে বিভক্ত। ঋতুগুলি বিশেষরূপে উষ্ণ। জমি বেশ জল-সম্পোষ্য এবং আর্দ্র। উত্তরে ক্রমাগত

* ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, য়ুঅন্-চুয়ঙ্গের ধারণা ছিল, ইন্দু হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। সেই জন্য তিনি ভারতবর্ষকে হিন্দু নামে উল্লেখ না করিয়া, তাঁহার মতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সঙ্গত ইন্দু নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক হিন্দু শব্দের অর্থ বড়ই জটিল।

পর্ব্বত ও ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, এবং জমি শুষ্ক ও লবণপূর্ণ। পূর্ব্বদিকে উপত্যকাসকল ও সমতল ভূমি বর্ত্তমান; এই জমিগুলি জল-সম্পোষ্য ও কর্ষিত বলিয়া উর্ব্বর এবং সুজলা। দক্ষিণ প্রদেশসকল বন ও বৃক্ষ-লতাদিতে পূর্ণ; পশ্চিমাংশ প্রস্তরময় এবং অনুর্ব্বর। ইহাই এই দেশের সাধারণ পরিচয়।

৩। দৈর্ঘ্য-পরিমাণ।

এই বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে যোজন সর্ব্বপ্রথম। একদল সৈন্যের দৈনিক অভিযান এক যোজন বলিয়া, পুরাকালের পবিত্র ব্রাহ্মণগণের সময় হইতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিসাবে ইহা ৪০ লির সমান। ভারতবর্ষের সাধারণ গণনানুসারে ইহা ৩০ লি; কিন্তু পবিত্র (বৌদ্ধ) গ্রন্থে যোজন ১৬ লি পরিমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দূরত্বের বিভাগানুসারে এক যোজনে আট ক্রোশ (কেউ-লু-সে); যতদূর হইতে একটি গোরুর রব শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এক ক্রোশ। একটি ক্রোশ আবার ৫০০ ধনুতে বিভক্ত; চারি হস্তে এক ধনু; ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত; ৭ যবে এক অঙ্গুলি, তৎপরে এইরূপ ভাবে ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া যুক, যুক-ডিম্ব (লিক্ষা) ধূলি, গোলোম, শশলোম, তাম্রজল (ছিদ্র)* প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম-পরিমাণ-জ্ঞাপক। এইরূপে পরিমাণ-তালিকা ধূলিকণাতে উপনীত হইয়াছে। ইহাও পুনরায় ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা বা অণুতে পরিণত হয়; অতঃপর শূন্যে উপনীত না হইয়া এই অণুকে আর অধিক ভাগে বিভক্ত করা যায় না,—সেই জন্য ইহাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অথবা পরমাণু বলে।

৪। জ্যোতিষ, পঞ্জিকা প্রভৃতি।

যদিও ঋিং ও যঙ্গ নিয়মের আবর্ত্তন এবং চন্দ্রসূর্য্যের গৃহগণকে আমরা যে নামে অভিহিত করিয়া থাকি, ভারতে তাহারা সেই নামে কথিত হয় না, তথাপি ঋতুগুলি ঠিক একরূপ। চন্দ্র (পূর্ণ) যে মাসে যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, সেই নক্ষত্রের নামানুসারে সেই মাসের নামকরণ হইয়া থাকে।

সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অংশকে ক্ষণ (ত' স-ন) বলে। ১২০ ক্ষণে এক

* সময়-নির্দ্দেশক জলপূর্ণ ক্ষুদ্রছিদ্রযুক্ত তাম্র পাত্রকে তাম্রঘটী বলে। তাম্রঘটীর যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া জল পাত্রমধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে তাম্রজল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তক্ষণ হয়। এই রূপ ৬০ তক্ষণে এক লব (ল-ফো)। ৩০ লবে এক মুহূর্ত (মৌ-হু-লি-তো)। ৫ মুহূর্তে সময়ের একাংশ বা কাল; ৬ কালে এক দিবারাত্র বা অহোরাত্র; কিন্তু সাধারণতঃ দিবারাত্র ৮ কালে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কে শ্বেত ভাগ (শুক্লপক্ষ) এবং পূর্ণিমা হইতে চন্দ্র অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ অমাবস্যা পর্য্যন্ত কালকে কৃষ্ণ ভাগ (কৃষ্ণপক্ষ) বলে। ১৪ অথবা ১৫ দিনে কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে, কারণ মাসগুলি কখন বড় এবং কখন ছোট হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকার ভাগ এবং পরবর্ত্তী আলোকভাগ লইয়া একটি মাস। ছয়মাসে একটি হিং বা অয়ণ হয়। সূর্য্য যখন (বিষুবরেখার) মধ্যে * ভ্রমণ করেন, তখন ইহা তাঁহার উত্তর ভ্রমণ (উত্তরায়ণ) এবং যখন (বিষুবরেখার) বাহিরে ভ্রমণ করেন, তখন ইহা তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণ (দক্ষিণায়ণ)। এই দুই কালের সমষ্টি একটি বৎসর।

প্রত্যেক বৎসর আবার ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ১) ১৬ তারিখ হইতে তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ক্রমশঃই গরম বাড়িতে থাকে। তৃতীয় মাসের ১৬ তারিখ হইতে পঞ্চম মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্ম। পঞ্চম মাসের ১৬ তারিখ হইতে সপ্তম মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত বর্ষা ঋতু। সপ্তম মাসের ১৬ তারিখ হইতে নবম মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত কাল, শস্যোৎপাদনের সময়। নবম মাসের ১৬ তারিখ হইতে একাদশ মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত শীত ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং একাদশ মাসের ১৬শ দিবস হইতে প্রথম মাসের ১৫শ দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীত।

তথাগতের পবিত্র মতানুসারে প্রতি বৎসর তিনটি ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ১৬শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম; পঞ্চম মাসের

* অর্থাৎ বিষুব রেখা ও উত্তর মেরুর মধ্যে। য়ুঅন্-চুয়ন্ ভূমণ্ডলের উত্তরাংশবাসী বলিয়া লিখিয়াছেন যে, যখন সূর্য্য বিষুবরেখার মধ্যে অর্থাৎ ঐ রেখা ছাড়াইয়া তাঁহার স্বদেশের দিকে ভ্রমণ করেন, তখনই উত্তরায়ণ এবং যখন সূর্য্য ঐ রেখার বাহিরে অর্থাৎ ঐ রেখা ছাড়াইয়া তাঁহার স্বদেশের বিপরীতদিকে দক্ষিণ-মেরু অভিমুখে ভ্রমণ করেন, তখনই দক্ষিণায়ণ।

(১) চীন দেশের মাস অনুসারে লিখিত হইয়াছে। সেই স্থানের, প্রথম মাসের ১৬ তারিখ ভারতবর্ষের চৈত্র মাসের প্রথম দিন।

১৬শ দিবস হইতে নবম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষা; নবম মাসের ১৬শ দিন হইতে প্রথম মাসের ১৫শ দিন পর্য্যন্ত শীত ঋতু। আবার বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত—এই চারি ঋতুও কথিত হইয়া থাকে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—বসন্ত ঋতু অর্থাৎ প্রথম মাসের ১৬ই হইতে চতুর্থ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত বসন্ত ঋতু। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—এই তিনটি গ্রীষ্ম ঋতুর মাস অর্থাৎ চতুর্থ মাসের ১৬ই হইতে সপ্তম মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত—গ্রীষ্ম। অশ্বযুজ, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ—তিনটি শরৎকালের মাস, অর্থাৎ সপ্তম মাসের ১৬ই হইতে দশম মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত শরৎকাল এবং পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিন মাস শীত ঋতু—অর্থাৎ চীনদেশের দশম মাসের ১৬শ দিবস হইতে প্রথম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত শীতকাল। পুরাকালে ভারতবর্ষের যাজক সম্প্রদায় বুদ্ধের পবিত্র উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া, বর্ষাঋতু সময়ে পুরোহিতগণের গৃহবাসের দুইটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন,—হয় প্রথমোক্ত তিন মাসের, নতুবা শেষোক্ত তিন মাসের মধ্যে, পঞ্চম মাসের ১৬শ দিবস হইতে অষ্টম মাসের ১৫শ দিবস অথবা ষষ্ঠ মাসের ১৬শ দিবস হইতে নবম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত সময়।

সূত্র ও বিনয়ের অনুবাদকগণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া 'তোহিয়' ও 'তোলহিয়'—এই দুই শব্দ বর্ষাকালে গৃহবাস অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। হয় সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ লোক মধ্যদেশের (ভারতবর্ষের) ভাষার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিত না, অথবা স্থানীয় বাক্যের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা অনুবাদ করিয়াছিলেন—ইহাই এই ভ্রমের কারণ। এবং সেই একই কারণে তথাগতের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ, ভূমণ্ডলে আবির্ভাব, গৃহ-নিষ্ক্রমণ, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি এবং নির্ব্বাণের কাল সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়াছে। *

৫। নগর ও বাসগৃহ।

নগর ও পল্লীগ্রাম সকলের ভিতর-বার আছে; চারিদিকের প্রাচীর প্রশস্ত ও উচ্চ। রাস্তা ও গলিগুলি আঁকা বাঁকা এবং রাজপথ সকল ঘূর্ণিত। দীর্ঘ পথগুলি অপরিষ্কার এবং ইহাদিগের দুই পার্শ্বে যথোপযুক্ত চিহ্নসংলগ্ন বিপণি-শ্রেণী সজ্জিত। কসাই, মৎস্য বিক্রেতা, নর্ত্তক, ঘাতক ও ঝাড়ুদার-

* ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও নির্ব্বাণকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এমন কি উত্তর সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যেই ১৪টি বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

দিগের বাসস্থান সহরের বাহিরে। গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনকালে ইহারা রাস্তার বামপার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য। ইহাদিগের বাসভবনগুলি অনুচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত এবং সেইগুলিই নগরের বহির্ভাগস্থ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। মাটি সচরাচর কোমল ও কর্দ্দমাক্ত বলিয়া, নগরের প্রাচীর সকল প্রায়ই ইট অথবা টালি দিয়া নির্ম্মিত। প্রাচীরের উপরিস্থ পঙ্ক্তিগুলি কাষ্ঠ কিম্বা বংশ দিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অট্টালিকা-সমূহের সম্মুখে বারান্দা এবং প্রমোদগৃহ বিদ্যমান। সেগুলি চূণ কিম্বা সুরকি দিয়া আবৃত, কাষ্ঠদ্বারা গঠিত এবং টালিদ্বারা আচ্ছাদিত। অন্য প্রকারের বাড়ীগুলির আকার চীন দেশের বাড়ীর ন্যায়। এই সকল বাড়ীর আচ্ছাদনার্থ শুষ্ক ডালপালা, টালি অথবা তক্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং দেওয়ালগুলির পবিত্রতা রক্ষার জন্য গোময় মিশ্রিত চূর্ণ ও কর্দ্দম দ্বারা লেপিত। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে তাহারা চারিকে ফুল ছড়াইয়া রাখে। ইহাই তাহাদিগের কতিপয় বিভিন্ন রীতি।

সঙ্ঘারামসকল অসাধারণ নিপুণতাসহকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চারিকোণের প্রত্যেকটিতে এক একটি তিনতালা প্রকোষ্ঠ গঠিত আছে। কড়িকাঠ এবং বহির্গত কাষ্ঠফলক সকল নিপুণ হস্তে বিভিন্ন আকৃতিতে ক্ষোদিত হইয়া থাকে। দ্বার, গবাক্ষ এবং অনুচ্চ প্রাচীর সকল আগাগোড়া চিত্রিত। যতিগণের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সকল ভিতর দিকে সুসজ্জিত কিন্তু বহির্দ্দেশে সজ্জাবিহীন। অট্টালিকার ঠিক মধ্যস্থলে একটি উচ্চ ও প্রশস্ত (উপাসনা) প্রকোষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাযুক্ত ভূমি বহুতর গৃহ ও চূড়া সঙ্ঘারামে বিদ্যমান থাকে। দ্বারগুলি পূর্ব্বদিকে উন্মুক্ত হয়; রাজসিংহাসনও পূর্ব্বমুখে বসান থাকে।

৬। আসন প্রভৃতি।

তাহারা উপবেশন অথবা বিশ্রাম করিবার জন্য মাদুর ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজপরিবারবর্গ, ধনী ব্যক্তি এবং কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ চিত্রপূর্ণ মাদুর ব্যবহার করেন কিন্তু সেগুলি আকারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার। রাজার আসনখানি বৃহৎ ও উচ্চ এবং বহুমূল্যরত্নবিভূষিত। ইহাকে সিংহাসন বলে। ইহা অতি সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত এবং ইহার পা-দানখানিও রত্নখচিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের রুচি অনুসারে সুচিত্রিত মূল্যবান আসন ব্যবহার করেন।

৭। পোষাক-পরিচ্ছদ।

তাহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের আড়ম্বর নাই; তাহারা প্রধানতঃ শ্বেতবর্ণ পোষাক পরিধান করিতে ভালবাসে; মিশ্রবর্ণের অথবা কারুকার্য্যপূর্ণ পরিচ্ছদ বড় একটা পসন্দ করে না। পুরুষগণ কোমরের চারিদিকে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া, সেই বস্ত্রের দুই প্রান্ত বগলের ভিতর দিয়া লইয়া দেহের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে ফেলিয়া রাখে। স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র মাটি স্পর্শ করে এবং তাহারা স্কন্ধদেশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। তাহারা মস্তকের মধ্যস্থলের চুলে একটি গ্রন্থি দেয় এবং অপর কেশগুলি আলুলায়িত রাখে। (পুরুষদিগের মধ্যে) কতক লোক গোঁফ কামাইয়া ফেলে এবং তাহাদিগের মধ্যে অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোক মস্তকোপরি রত্নমালা-যুক্ত মুকুট ধারণ করে। তাহাদের বস্ত্রসকল কৌষেয় ও কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। বন্য গুটিপোকা হইতে কৌষেয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা ক্ষৌম বস্ত্রও পরিধান করে; ক্ষৌম এক প্রকার গাছের ছাল। ছাগের সূক্ষ্ম লোম লইয়া যে কম্বল তৈয়ার হয়, তাহারও পোষাক হইয়া থাকে। হো-ল-লি (করাল) হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহা এক প্রকার আরণ্য পশুর সূক্ষ্ম লোম হইতে তৈয়ার হয়। কদাচিৎ এই বস্ত্র বয়ন হয় বলিয়া ইহা অতি মূল্যবান এবং সূক্ষ্মবস্ত্র রূপে পরিচিত।

উত্তর ভারতে, যে স্থানের বায়ু শীতল, সেই স্থানের লোকেরা হু-দিগের ন্যায় ছোট আঁটা পোষাক পরিধান করে। অপধর্ম্মিগণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার বহুবিধ। কতক লোক ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করে, কতকলোক অলঙ্কার স্বরূপ কপাল-মালা কণ্ঠে ধারণ করে (কপালধারী); কেহ বা বৃক্ষপত্র বা ত্বকের পরিচ্ছদ পরিধান করে; অনেকে চুল উপড়াইয়া ফেলে এবং গোঁফ কামাইয়া থাকে। আবার কাহার কাহার ঘন গোঁফ থাকে এবং তাহারা মাথার উপর খোঁপা বাঁধে। সকলের পরিচ্ছদ সমান নহে এবং তাহাদের বর্ণও বিভিন্ন—কখন লাল, কখন বা সাদা।

শ্রমণগণের পরিচ্ছদ তিন * প্রকার,—সং-কিও-কি (সঙ্ঘিকা), ও নি-কো-সি-ন (নিবাসন)। এই তিন প্রকার পরিচ্ছদের কাট-ছাঁট একরূপ নহে,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পোষাকের কাট-ছাঁট বিভিন্ন। অনেক

* প্রথম প্রকার পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় নামোল্লেখ হয় নাই।

গুলির পাড় প্রশস্ত অথবা সঙ্কীর্ণ, আবার অনেক পোষাকের উপরের লম্বমান অংশসকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ। সঙ্ঘাটিকা পোষাক বাম স্কন্ধ ও কক্ষদ্বয় আবৃত করে এবং ইহার বামদিক উন্মুক্ত ও দক্ষিণদিক বন্ধ করিয়া পরিধান করা হয়। এই পরিচ্ছদ লম্বে কোমর ছাড়াইয়া যায়। নিবাসনের কটিবন্ধ ও থোব্না নাই। পরিধানকালে, ইহাকে পাটে পাটে ভাঁজ করিয়া কোমরের চারিদিকে জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং এক গাছি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুসারে পরিচ্ছদের বর্ণ—বিভিন্ন। হরিদ্রা ও লাল—উভয় বর্ণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তাঁহারা সাদাসিদা ধরণে এবং মিতব্যয়িতাসহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দেশের রাজা ও প্রধান সচিবগণ বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করেন। তাঁহারা কেশসজ্জার জন্য রত্নবিভূষিত মুকুট ও পুষ্পসকল ব্যবহার করেন এবং বলয় ও কণ্ঠমালা দ্বারা আপনাদিগের শরীর ভূষিত করেন।

ধনী ব্যবসায়িগণ কেবলমাত্র সুবর্ণময় ক্ষুদ্র অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নগ্নপদে গমনাগমন করিয়া থাকে; অতি অল্প লোকই খড়ম ব্যবহার করে। তাহারা দাঁত লাল অথবা কাল বর্ণে রঞ্জিত করে; চুল বাঁধে এবং কর্ণভেদ করিয়া থাকে। তাহাদিগের নাসিকা সুশ্রী এবং চক্ষু বৃহৎ।

৮। পরিচ্ছন্নতা, স্নান প্রভৃতি।

তাহারা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ যত্নবান, এবং এই বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি হইতে দেয় না। সকলেই আহারের পূর্ব্বে স্নান করে। ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য তাহারা পুনরায় কখন ভোজন করে না এবং (ভোজনকালে) খাদ্যপূর্ণ পাত্রসকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তরময় পাত্র (ভোজনার্থ) ব্যবহৃত হইলে, সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়; প্রত্যেক ভোজনের পর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহের পাত্র সকল নিশ্চয়ই মাজিয়া চক্‌চকে করিতে হইবে। আহারান্তে তাহারা এক প্রকার গাছের ডাল দিয়া † দাঁত পরিষ্কার করিয়া, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া থাকে।

† তৎকালে প্রধানতঃ খদির বৃক্ষের ডালেই দাঁতন প্রস্তুত হইত।

এই সকল ধৌতকার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তাহারা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া প্রতিবার শরীর ধৌত করে এবং সুগন্ধ দ্রব্যস্বরূপ চন্দন অথবা হরিদ্রা ব্যবহার করে।

যখন রাজা স্নান করেন, তখন ঢাক বাজিতে থাকে এবং বাদ্যযন্ত্রের সহিত স্তোত্র সকল আবৃত্ত হয়। পূজার্চ্চনা করিবার পূর্ব্বে তাহারা স্নান করিয়া থাকে।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

আক্ষেপ।

বহে মধুবাস মলয় বাতাস,
কি কথা কহিয়া ফুলের কাণে?
শিশির-অন্তে নব বসন্তে
আসে কি হরষ বিহগ-গানে?

মুকুল-আকুল বকুলে কোকিল
কহে কি ব্যাকুল সুখের বাধা।
তটিনী দু'কূলে ঢেউ তুলে তুলে
কহে কি গোপন মরম-কথা।

পূরব গগনে অরুণ-কিরণে
কি আশা জাগায় কমল-বুকে।
চন্দ্র-আলোকে বিপুল পুলকে
চকোর গাহে কি আকুল সুখে।

প্রেমে-সুখেভরা আকুলা এ ধরা,
মিলন-কাকলি, হরষ-কল।
বিরহ-শয়নে শূন্য জীবনে
আমারি কেবল নয়ন-জল।

মক্ষিকা।

মক্ষিকা জাতির বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। মানবজাতির বিরক্তিকর এমন জীব আর জগতে আছে কি না সন্দেহ। এই জীব উষ্ণ কটিবন্ধে কিছু অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নানা জাতীয় মাছির রূপবর্ণনা অনাবশ্যক। সাধারণতঃ যে সকল পক্ষযুক্ত কীটের 'ভন্‌ভনানিতে' লোক গৃহে "অতিষ্ঠ" হইয়া উঠে, আহার্য্য বস্তুর উপর বসিয়া যাহারা উহাকে অপবিত্র করিয়া তুলে, সেই সকল মক্ষিকাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও উহারা দুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম শ্রেণী-বিভাগ লইয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিব না। সকল জাতীয় মক্ষিকার সহিত আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ। যাহারা আমাদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধী, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করাতে কেবল কচ্‌কচি বৃদ্ধি পায়।

তথাপি ইহাদের কুল ও গোত্রের সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহারা কশেরুমজ্জাহীন জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের তিন যোড়া পদ ও দুই যোড়া পক্ষ আছে। তিন যোড়া চরণের বলে ইহারা ষট্‌পদত্বে দাবী রাখে। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদিগের দুই যোড়া পক্ষের অধিক সম্মান রাখিয়াছেন। ইহারা দ্বিপক্ষ পতঙ্গ (Diptera) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ভ্রমরের সহিত ইহাদের সুদূর জ্ঞাতিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই।

সকল দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের পাখা সমান নহে। এক শ্রেণীর দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের সম্মুখের ডানা যোড়াটা খুব মোটা ও কঠিন। ঐ পক্ষদ্বয়দ্বারা উড়িবার কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। উহা ঐ শ্রেণীর জীবের কোমল দেহে কঠিন বর্ম্মের কার্য্যমাত্র করিয়া থাকে। এই বর্ম্মসম কঠিন পক্ষ যোড়ার পর অতি পাত্‌লা আর এক যোড়া ডানা আছে। এই ডানা যোড়াটির সাহায্যে ইহারা উড়িয়া বেড়ায়। গুবরে পোকা এই জাতীয়। ইহাদিগকে বর্ম্মপক্ষ (Coleoptera) জাতীয় পতঙ্গ বলা হয়।

আর এক জাতীয় দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের দুই যোড়া ডানাই পাতলা ও উড়নের সাহায্যকারী। ইহাদের পাখা অতি সূক্ষ্ম আঁইসে আবৃত। সেই জন্য ইহারা আঁইসপক্ষ (Lepidoptera) শ্রেণীভুক্ত। প্রজাপতি প্রভৃতি

এই শ্রেণীভুক্ত। প্রজাপতির পালকে যে সূক্ষ্ম রেণুবৎ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই ঐ আঁইস।

আর এক শ্রেণীর পতঙ্গের সম্মুখের পক্ষদ্বয় পাতলা, কিন্তু পশ্চাদ্দিকের পক্ষ যেড়োটি কঠিন ও মুগার। ইহার দ্বারা উড্ডীন হইবার কার্য্যের কোন সাহায্যই হয় না। তবে উড়িবার সময় ইহা বায়ুমণ্ডলে এই কীটের দেহ সমান ভাবে রক্ষা করিতে অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পতঙ্গই দ্বিপক্ষ (Diptera) পতঙ্গ নামে জীবতত্ত্ববিদ্ সমাজে পরিচিত। মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইতঃপূর্ব্বে মশক সম্বন্ধে কয়েকটি আবশ্যক কথা লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে মক্ষিকা সম্বন্ধে কয়েকটি আবশ্যক কথা বলিব। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কাপ্তেন সি. এ. গুর্লে মহাশয় মক্ষিকার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে মশক কিরূপ ভাবে মানুষের স্বাস্থ্যহানি করে, তাহা তিনি বিশদ ভাবে সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি অত্যন্ত আবশ্যক। সেই জন্য আমরা সাধারণের অবগতির জন্য উহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম।

স্ত্রী মক্ষিকা বা মাছিনী একবারে এককালে প্রায় দেড়শত ডিম পাড়ে। জীবনে এক একটি মক্ষিকাভামিনী ছয়বার ডিম পাড়িয়া থাকে। সুতরাং এক একটি মক্ষিকা-মহিলার আট নয় শত ডিম হইয়া থাক। মক্ষিকা-মহিলা সরল ভাবে ডিমগুলি সজ্জিত করিয়া রাখে। ডিমগুলি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। মশকের জীবনে যেমন চারিটি বিভিন্ন অবস্থা আছে, মক্ষিকার জীবনেও ঠিক সেইরূপ চারিটি বিভিন্ন অবস্থা; আছে। যথা (১) ডিম্বাবস্থা (egg); (২) অঙ্ক বা শূক অবস্থা। (larva); (৩ কোষস্থ বা মুককীট (Pupa) অবস্থা; এবং (৪) মক্ষিকা (imago) অবস্থা। মশক নামক প্রবন্ধে আমি এই চারিটি অবস্থার কথা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। সুতরাং এস্থানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ডিম্বাবস্থায় মক্ষিকা অধিকক্ষণ থাকে না। অনুকূল অবস্থায় পড়িলে আড়াই প্রহরেই ইহারা ডিম হইতে পোকাকারে বাহির হইতে পারে। প্রতিকূল অবস্থায় ডিম ফুটিতে প্রায় আট প্রহর সময় লাগে। ডিম হইতে ইহা অতি সামান্য-পোকার আকারে (maggots) বাহির হয়। এই অবস্থায়

ইহার বুভুক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ইহা দণ্ডে দণ্ডে বৃদ্ধি পায়। ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইহার মেদ এত বৃদ্ধি পায় যে, শরীরের বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায়; ইহা তখন পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করে। ক্রমে ইহার দেহে নূতন আবরণ জন্মে; উহাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদীর্ণ হইয়া যায়। মক্ষিকার্ভক আবার খোলস ত্যাগ করে। তৃতীয়বার ইহার দেহে যে খোলস জন্মে, তাহা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও নমনীয়। এই আবরণের ভিতর ইহা তিন হইতে চারি দিন থাকে। এই চারিদিন ইহা ক্রমাগত খাইতে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সর্ব্বসমেত পাঁচ দিন ইহা এইরূপ শূক কীট larval stage) অবস্থায় থাকে। তাহার পর ইহা ইহার দেহের উপর একটি রক্তাভ আবরণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ইহাই তৃতীয় বা মূক কীট (pupal stage) অবস্থা। এই অবস্থাতেও ইহা প্রায় তিন চারি দিন থাকে। তৎপরে ইহা সেই বহিরাবরণ ভিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ মক্ষিকা রূপে বহির্গত হয়। ইহাই মক্ষিকা জীবনের চতুর্থ অবস্থা (imago stage)।

মশকের ন্যায় মক্ষিকাও মানবদেহে নানাবিধ রোগ বিসর্পিত করে। মশকদিগের ন্যায় মক্ষিকার হুল বা শুঁড় আছে। কোন কোন জাতীয় মক্ষিকা ঐ শুণ্ড দ্বারা তাহাদের আহার্য্য টানিয়া লয়। আবার কোন কোন জাতীয় মক্ষিকা উহার তীক্ষ্ণাগ্র মনুষ্যদেহে বিদ্ধ করিয়া দেয়। মশার ন্যায় মাছির কামড়ও বোধ হয় অনেককে সহিতে হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের মক্ষিকা ঠিক মশকের ন্যায় এক জনের দেহ হইতে অন্য জনের দেহে রোগ বিসর্পিত করে। আফ্রিকায় নিদ্রারোগ এক শ্রেণীর মক্ষিকা (Tse Tse fly) কর্ত্তৃকই বিসর্পিত হইয়া থাকে। শ্লীপদ, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগও এক প্রকার মক্ষিকা বা ডাঁসের দংশনদ্বারা মানব সমাজে বিসর্পিত হয়। প্লেগ বিসর্পণেও মক্ষিকার কতকটা দায়িত্ব আছে, কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন। কিন্তু তাহা এখনও অনুমানমাত্র।

গার্হস্থ্য মক্ষিকা লোককে দংশন করে না। কিন্তু উহারা রোগ-বিসর্পণে বিলক্ষণ সহায়তা করে। উহাদিগকে সহজ দৃষ্টিতে নিতান্ত "ভালমানুষ" বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু উহারা মানবসমাজের ঘোর অনিষ্টকারী। উহারা যাহার উপর ক্ষণকাল অবস্থিতি করে তাহার উপরেই ডিম পাড়ে। ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংস, মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতির উপর ইহারা ডিম পাড়িতে বিরা

বোধ করে না। আহার্য্য পদার্থের সহিত এই ডিম্ব যদি উদর-বিবরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ডিম্ব সহজে উদরমধ্যে মরিয়া যায় না। উদরের ভিতরই ঐ ডিম্ব ফুটিয়া যায়। তাহা হইলে মানুষের উদরমধ্যেই মক্ষিকার শূক কীট ও মূক কীট পর্য্যন্ত জন্মে। মূক কীট অবস্থাতেই উহা বিষ্ঠার সহিত বাহিরে আইসে; উহা কোষ ভাঙ্গিয়া পূর্ণাঙ্গ মক্ষিকারূপে বাহির হয়। মানুষের উদর মধ্যে যদি মক্ষিকার শূক কীট জন্মে, তাহা হইলে তাহার কঠিন উদরাময় পীড়া জন্মে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজে এখন অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু মক্ষিকার ডিম্ব যে মানব উদরে প্রবিষ্ট হইয়াও তথায় পর পর তিনটি অবস্থা ভোগ করে,—এ তথ্য নিসংদিগ্ধভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। কোনও আহার্য্য বস্তুর উপর মাছি বসিলে তাহা আহার করিতে নাই,—আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ একটা সংস্কার আছে; তাহাকে কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, পচা দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পদার্থেই মাছির ভন্‌ভনানি অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। ইহার কারণ গলিত জান্তব ও গলিত ঔদ্ভিদ পদার্থই মক্ষিকাদিগের প্রিয় আহার্য্য ও ডিম্ব প্রসবের স্থান। গলিত জান্তব ও ঔদ্ভিদ পদার্থে ইহাদের অর্ভকগণ (larva) দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য ইহারা মানব ও জন্তুগণের মল ও বমনে ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া থাকে; আবার তথা হইতে মানবের গাত্রে, বস্ত্রে ও আহার্য্য উড়িয়া আসিয়া বসে। ইহাতে মানবের যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা সহজে বুঝা যায় না। বিজ্ঞগণ জানেন যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণার ও অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছেন যে, অতি ক্ষুদ্র লোকচক্ষুর অগোচর জীবাণু (Microbe) ও উদ্ভিজ্জাণু (Bacteria) হইতে নানারোগের উৎপত্তি হয়। কলেরা, টাইফয়েড, আন্ত্রিক জ্বর, প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগসমূহের মূল কারণ ঐ সকল রোগবীজাণু (Germ) মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অচিরকালমধ্যে মানবকে কঠিন পীড়াগ্রস্ত করিয়া ফেলে। কলেরা রোগের বীজাণু যদি কোন রূপে কোন লোকের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা তাহার দেহমধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র সন্তান প্রসব করিতে থাকে। যখন এই বীজাণু তাহার উদর-গহ্বর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন সেই ব্যক্তি কলেরারোগগ্রস্ত হয়। প্রকৃতি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার দেহ হইতে ঐ বীজাণু

দূর করিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য তাহার ভেদ ও বমন হয়। ভেদ ও বমির সহিত লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। মক্ষিকাগণও দলে দলে ঐ সকল ভেদ ও বমির উপর বসিয়া থাকে। ভ্রমরের চরণে যেমন পুষ্পরেণু সকল সংশ্লিষ্ট হয়, মক্ষিকার চরণেও সেইরূপ শত শত রোগ-বীজাণু জড়িত হয়। তৎপরে ঐ মক্ষিকা যেমন মানুষের আহার্য্য পদার্থে, দোকানের লুচি সন্দেশ, কচুরী প্রভৃতিতে, গৃহস্থের অন্ন, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, ক্ষীর, মাখন প্রভৃতিতে উড়িয়া আসিয়া বসে, অমনই ঐ সকল রোগ বীজাণু মক্ষিকার চরণ ছাড়িয়া ঐ সকল জিনিসে আশ্রয় লয়। মানব যখন ঐ সকল খাদ্য আহার করে, তখনই অলক্ষ্যে আপনার প্রাণহারী ঐ বিষ আপনিই খাইয়া ফেলে। ঐরূপ বিষ-ভোজনের কিছুকাল পরেই সেই লোক পীড়িত হইয়া পড়ে। কলেরা, টাইফয়েড, আন্ত্রিক জ্বর, প্রভৃতি রোগ মক্ষিকা কর্ত্তৃক এইরূপে বিসর্পিত হয়।

আর এক কথা সকলেই জানেন, "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।" ঘা, পাচড়া, দুষ্টক্ষত প্রভৃতিতে মক্ষিকা বসিয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষতের উপর বসিয়া উহারা ডিম পাড়ে। ইহাতে ক্ষতের নানা উপসর্গ জন্মে; আবার তাহারা যখন সুস্থ লোকের অনাবৃত গাত্রে উড়িয়া বসে, তখন সেই ক্ষতের পূজ, রক্ত ও বীজাণু সমস্ত শেষোক্ত ব্যক্তির গাত্রে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই প্রকারে মক্ষিকারা বসন্ত প্রভৃতি রোগ বিসর্পিত করিয়া থাকে। এখন দেখুন সামান্য মাছি মানুষের কি বিষম শত্রু।

এখন উপায়? কি উপায়ে এই দুরন্ত মক্ষিকার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভবে? ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নহে। প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্য সমস্ত সূক্ষ্ম লৌহ জালুতি নির্ম্মিত ঢাকা দ্বারা আবৃত করা আবশ্যক। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি তাঁহাদের সন্তানগণের দুগ্ধ ও আহার্য্য দ্রব্য এইরূপে ঢাকিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাহারা অনেক সময় দুর্ব্বিসহ শোকের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। গৃহে ও গৃহের ত্রিসীমানায় যেন কোনওরূপ ময়লা, আবর্জ্জনা বা জঙ্গল না থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গোশালা যেন দুর্গন্ধময় গোময়ে, গোমূত্রে ও পচা খইল-বিচালিতে পূর্ণ না থাকে। মিউনিসিপালিটি যাহাতে গ্রামের বন জঙ্গল উচ্ছিন্ন করে, ও জলনিকাশের সুব্যবস্থা করে, সে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। গৃহের সান্নিধ্যে যাহাতে মলমূত্র না থাকে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, কর্পূর, ও গন্ধক পোড়াইলে মশক ও মক্ষিকার উপদ্রব অল্প হয়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতার বিনিময়।

(১)

ব্যর্থমনোরথ হইয়া চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে উকীল বন্ধুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যেমন রাজপথের জনস্রোতে পড়িলাম, অমনই একজন মান্দ্রাজ প্রদেশবাসী ভদ্রলোক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবু, আপনার জন্য আমি বহুক্ষণ এইস্থানে অপেক্ষা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমার ঐ বাসায় আসিবেন কি?" আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমাকে বলিতেছেন?" ভদ্রলোক স্মিত মুখে উত্তর করিলেন, "আপনাকেই বলিতেছি। আমার স্ত্রী একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! অপরিচিতা বিদেশিনী আমার সাক্ষাতাভিলাষিণী! কৌতূহলবশে ভদ্রলোকটির অনুসরণ করিলাম।

সদ্যসমাপ্ত সুন্দর দ্বিতল গৃহে ভদ্রলোকটির বাস। বাহিরের প্রকোষ্ঠগুলি ইংরাজী ধরণে সজ্জিত। আমাকে একখানি আসনে বসিতে বলিয়া ভদ্রলোকটি অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বৈকালে বোধ হয় চা পান করেন; তাই একটু চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিলাম।" ইংরাজী রীতিঅনুসারে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। আসন গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গের রাজনীতিক, সামাজিক এবং কৃষি বিষয়ক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি রীতিমত সংবাদপত্র পাঠ করেন, কিন্তু সংবাদপত্রে সকল সময় ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কর্ম্মব্যপদেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন; কিছু দিন পরে তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তিনি ভারত গবর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী—শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সদ্বংশোদ্ভব। পরস্পরের পরিচয়ে এবং কথোপকথনে যত সময় অতীত হইতে লাগিল আমার কৌতূহল ততই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখ-কান্তি দেখিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি আমার উৎকণ্ঠা বেশ উপভোগ করিতেছেন। এই সময় সংবাদ আসিল, চা প্রস্তুত। আমরা অন্দরে প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য মান্দ্রাজ প্রদেশে অবরোধ-প্রথা নাই এবং ব্রাহ্মণ-বিধবা ব্যতীত সকল স্ত্রীলোকই মস্তক অনাবৃত রাখেন। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে সকলের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে পারেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে অতিথি-সৎকার করেন।

বহির্ব্বাটী যেরূপ পরিপাটী, অন্দরমহলও তদ্রূপ পরিচ্ছন্ন, উচ্চবংশসম্ভূত, উচ্চশিক্ষিত ভদ্র গৃহস্থের উপযুক্ত। একখানি গোল টেব্‌লের উপর দুই পেয়ালা চা এবং প্রচুর ফল ও মিষ্টান্ন ছিল। আমরা উপবেশন করিলে, ভদ্রলোকটি তাহার স্ত্রীকে ডাকিলেন আমি এক অনির্দ্দিষ্টের উত্তেজনায় চঞ্চল হৃদয়ে গৃহকর্ত্রীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে উত্তম বসনে ভূষিতা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্কা রমণী তাঁহার পাঁচ বৎসরের শিশু কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে ইংরাজী রীতির অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়া ভদ্রলোকটি আমার হস্ত ধরিয়া বসাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, স্ত্রীলোককে সম্মান-প্রদর্শন ইংরাজদের একচোটিয়া অধিকার নহে; হিন্দু স্ত্রীলোকের যেরূপ সম্ভ্রম করিতে জানে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতি সেরূপ করিতে জানে কি না সন্দেহ। আমাদের কথোপকথন ইংরাজীতে হইতেছিল, সুতরাং আমার এই স্ত্রীভক্তি সেই সুশোভনা ললনার হৃদয়ঙ্গম হইল কি না আমি বুঝিতে পারিলাম না।

স্ত্রীকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া ভদ্রলোকটি আমার সহিত নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। চা পান করিতে করিতে তিনি আমাদের অবরোধ-প্রথা যে অপ্রশংসনীয়, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অবান্তর প্রসঙ্গের প্রশ্রয় না দিয়া, ভগবতীর রামের মুখে সীতার প্রতি উক্তি "আজ্ঞাপয়" উদ্ধৃত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলাম। ভদ্রলোক তখন তেলেগু ভাষায় আমাদের কথোপকথনের সারাংশ তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। আমি ইতোমধ্যে দুইটি সুপক্ক ফল প্রদান করিয়া তাঁহাদের কন্যার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া লইলাম।

আমি তাহাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলাম "নি পেরু আমি" অর্থাৎ "তোমার নাম কি?" অমনই গৃহকর্ত্রী তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের প্রতি ন্যস্ত করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় কি বলিলেন। তাহার মধ্যে আমি কেবল ঐ "নি পেরু আমি" টুকুই বুঝিতে পারিলাম। ভদ্রলোকটি

উচ্চহাস্য করিয়া আমার মুখপানে চাহিলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া আমার বহুদিন পূর্ব্বে সংগৃহীত তেলেগু কথা কয়টির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলাম। আমি কুণ্ঠিত ভাবে ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার প্রশ্নে কিছু প্রমাদ ঘটিয়াছে কি? আমি বহুদিন পূর্ব্বে ঐ কথা কয়টি শিখিয়াছিলাম, ভুল হওয়াই সম্ভব।" ভদ্রলোক ত হাসিয়াই আকুল। তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনিও হাসিতেছেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। আমার ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভদ্রলোকটি ব্যস্তভাবে বলিলেন—"না, না; আপনার প্রশ্ন ঠিক হইয়াছে। তবে ঐ প্রশ্ন বহুদিন পূর্ব্বে আপনি আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার ওয়ালটেয়ারে গিয়াছিলাম। সেই সময় আমি ঐরূপ অনেক কথা শিখিয়াছিলাম; সম্ভবতঃ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারি।"

"ভাল। আমার স্ত্রীকে আপনি পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছেন, মনে হয় কি?"

"না। কিন্তু, আপনার স্ত্রীকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে যেন আমি ঐরূপ মুখ কোথাও দেখিয়াছি।"

দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে আপনি এক দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন এবং এক দিন আপনি সমুদ্র-সমাধি হইতে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বালিকা সেই বালিকার কন্যা। আজ সে দেখাইতে চাহে যে, আপনি যে ঘটনা তুচ্ছ মনে করিয়া বিস্মৃত হইয়াছেন—যে উপকৃত, সে তাহা বিস্মৃত হয় নাই। আজ বার বৎসর পরে রাজপথে একবারমাত্র তাহার সেই জীবন-রক্ষককে দেখিয়া সে চিনিতে পারিয়াছে এবং তাহার চিরকৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ আজ আপনাকে আপনার কন্যার জন্য এই অকিঞ্চিৎকর উপঢৌকন প্রদান করিতেছে।"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে একটি সোণার "নেকলেস্" প্রদান করিয়া অভিবাদন করিলেন। আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

(২)

দ্বাদশ বৎসর—এক যুগ! সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমি কেবল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি।

পিতার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্প বয়সে আমাকে কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আমি আমার জননীর নিকট উচ্চাভিলাষ লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু অদৃষ্টচক্রে বাসনানুরূপ শিক্ষালাভ হয় নাই। তাই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া আমি আত্মোৎকর্ষের প্রয়াস পাইতাম। কয়েক বৎসর অনিয়মিত পরিশ্রম করিয়া আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল; অবশেষে আত্মীয় স্বজন এবং চিকিৎসকের অনুরোধে আমাকে ওয়ালটেয়ারে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যাইতে হইয়াছিল।

প্রকৃতির লীলাভূমি, মান্দ্রাজ প্রদেশান্তর্গত ওয়ালটেয়ার ভারতবর্ষের এক রমণীয় স্বাস্থ্য-তীর্থ। নীলাম্বরতলে নিলাম্বুধৌতচরণা, পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিতা, গৌরিকাম্বরা বসুধা সুন্দরী নিসর্গের নয়নতৃপ্তিকর লীলা-নিকেতন। সূর্য্যাস্তের এবং সূর্য্যোদয়ের সময় দৃশ্যের রমণীয়তা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝা যায় না। প্রভাতে এবং সায়াহ্নে সমুদ্র-সৈকতে বালুকা-স্তরের উপর শয়ন করিয়া শীকর-শীতল-বায়ুস্নাত হইয়া সেই বিরাট দৃশ্যের বিচিত্রতা উপভোগ করা যে কত আনন্দজনক এবং আরামদায়ক তাহা কল্পনায় আনয়ন যায় না। ঊর্দ্ধে সুনীল গগন, নিম্নে ক্রমোচ্চ তীরভূমির উপর বনরাজি, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়—আর সেই গম্ভীর গম্ভীর বারিরাশির অবিশ্রান্ত গর্জ্জন। ঢেউয়ের উপর ঢেউ—আর পর ঢেউ; দূরে—বহুদূরে দিগন্ত স্পর্শ করিতেছে। এক দিকে স্তব্ধ প্রকৃতি যেমন নীরব, নিস্তব্ধ; অন্য দিকে জলরাশি তেমনই উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল।

রাজপথে স্থানে স্থানে সংযোজিত অশ্বযানে বসিয়া য়ুরোপীয়া মহিলাগণ নিসর্গের বিচিত্র চিত্র চিত্রপটে রঞ্জিত করিতেছেন। সমুদ্রবক্ষে উলঙ্গপ্রায় ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় ভাসমান হইয়া মৎস্য ধরিতেছে; নৌকাগুলি সেই উত্তাল তরঙ্গে নাচিতেছে—হেলিতেছে—দুলিতেছে। এক এক বার মনে হয়, এইবার বুঝি দুঃসাহসিক ধীবর নৌকার সহিত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই আকণ্ঠস্নাত হইয়া সে জাল নিক্ষেপ করে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি জাহাজ ক্ষুদ্র কপোতের ন্যায় আকাশ এবং সলিলের সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া বন্দরাভিমুখে যাইতেছে দেখা যায়। কোথাও অস্নাতদেহ, অনাবৃত-মস্তক পল্লীবধূগণ কূপ হইতে পানীয় জল আহরণ করিতেছেন; কোথাও কৃষ্ণকান্তি বালকবালিকাগণ দৌড়াইতেছে—ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে।

বহুদিন বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের ন্যায় সেই সুরম্য দৃশ্য দ্বাদশ বর্ষ পরে আমার মানস-পটে পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি সেই কৃতজ্ঞ ললনার মুখপানে চাহিয়া আমার সেই ক্ষণস্থায়ী অতীত সুখ-জীবনের পরিচিতা বালিকার হাস্যোজ্জ্বল মুখকান্তির সৌসাদৃশ্য অনুভব করিলাম। সেই স্বজনহীন জীবনের প্রথম প্রবাসে যখন অস্তাচলগমনোন্মুখ সুবর্ণ-গোলকের রক্তিম রাগে সমুদ্র-তীর উদ্ভাসিত হইত—যখন মলয়ানিলস্পর্শে শরীর মন সুশীতল হইয়া যৌবন-প্রারম্ভের অকস্মাৎ অবসাদ আমাকে বাধিত করিত, তখন সমুদ্রগর্ভে সলিল-পরিবেষ্টিত দ্বীপবৎ শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত কথোপকথন করিয়া গৃহস্মৃতি বিস্মৃত হইবার প্রয়াস পাইতাম। আজ সেই চিত্র সুস্পষ্টরূপে মানস-পদে উদিত হইল। জীবন স্বপ্ন—সত্যও স্বপ্ন!

মনে হইল,—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভৃত্য স্থানীয় জনৈক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীলের দুইটি বালিকা কন্যা লইয়া বেড়াইতে আসিত। ভৃত্য হিন্দুস্থানী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিল, সুতরাং তাহার সহিত শীঘ্রই আমার পরিচয় হইয়া গেল। আমি তাহার নিকট হইতে দুই একটি তেলেগু বাক্য শিখিয়া বালিকাদ্বয় যখন নিকটে আসিত তখন তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতাম। বাঙ্গালীর মুখে মাতৃভাষা শুনিয়া বালিকাদ্বয়ের উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইত। যত বার আমি "নি পেরু আমি" প্রশ্ন করিতাম, তত বার তাহাদের উচ্চহাস্যে দিগন্ত মুখরিত হইত। সে কি মধুর স্মৃতি!

ভৃত্যের সহিত যখন বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল, তখন মধ্যে মধ্যে সে বালিকাদ্বয়কে আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কূপসন্নিধানে সমাগতা পল্লীললনা-গণের সহিত আলাপ করিতে যাইত। একদিন আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল; ইতোমধ্যে ভৃত্যের পরিচিতা কোন ললনা কূপপার্শ্বে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ভৃত্যের সহিষ্ণুতা আমার আগমন-প্রতীক্ষার অবসর রাখিল না—সে চলিয়া গেল। অসংযতগতি বালিকাদ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে সলিল-সন্নিধানে আসিয়া উপনীতা হইল। বয়োজ্যেষ্ঠা একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর আরোহণ করিয়া কনিষ্ঠার প্রতি ঝিনুক ছুড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শিলাখণ্ড সলিল পরিবেষ্টিত হইয়া গেল। চকিতা বালিকা ভৃত্যের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিন্তু ভৃত্য নিকটে নাই। সমুদ্র-বক্ষ ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল, বেলাভূমি ক্রমে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কনিষ্ঠা ছুটিয়া ভৃত্যের অনুসন্ধানে গেল—কিন্তু বুঝি সব ফুরাইয়া যায়! উচ্ছ্বসিত সলিলরাশি ক্রমে শিলাখণ্ডকে গ্রাস করিতে লাগিল এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহাতে প্রতিহত হইতে লাগিল। বহু সংঘর্ষে শিলামূল শিথিল হইয়া ছিল। একটি উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে মূলচ্যুত করিল। বালিকা আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

সৌভাগ্যক্রমে আমিও ঠিক সেই সন্ধি মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিমজ্জিত বালিকার আকুলায়িত কেশ লক্ষ্য করিয়া আমি এক লম্ফে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম; কিন্তু সে উন্মত্ত তরঙ্গের বেগ অতিক্রান্ত করিয়া তীরে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি সেই সংজ্ঞহীনা বালিকার দেহ ধারণ করিয়া ভাসিয়া চলিলাম—মনে হইল, সব ফুরাইল। ক্রমে হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।

যখন নিতান্ত হতাশ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে যাইতেছি, তখন দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি ধীবরের নৌকা আসিয়া আমাদিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল।

তীরে সমাগত জনতার মধ্যে একজনের ভীতিবিহ্বল সজল নেত্র আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল;—সে সেই ভৃত্য। নিমজ্জিতা বালিকার কনিষ্ঠাকে ক্রোড়ে লইয়া সে তাহার কাতর দৃষ্টিতে আমার অভিনন্দন করিল। আমি তাহার চিত্তভাব অনুভব করিয়া তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে অভয় দিলাম। জনকোলাহল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বালিকাদ্বয়ের জনকজননীর নিকট সংবাদ যাইতে বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে তাঁহারা তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইতোমধ্যে বালিকা সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। জননীকে দেখিয়াই সে মাতৃ-বক্ষে আশ্রয় লইল। বালিকার পিতা আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি ধীবরগণকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে সেই উকীল-পরিবারের সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। কতদিন তাঁহারা আমাকে বাসা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সুরম্য সৌধে আশ্রয় লইতে আগ্রহাতিশয্য জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা আতিথ্যাপেক্ষা অধিক আদরের সহিত গ্রহণ

করিয়াছিলাম। তাহার পর একদিন তাঁহাদের মায়া কাটাইয়া—যাহাদের মায়ায় আমি চির-শৃঙ্খলিত তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

আমার বিপদে এই "নেক্‌লেস্" সেই কৃতজ্ঞতার পুরস্কার!

(৩)

ওয়ালটেয়ার হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার প্রথম সন্তান—কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দুঃখ-দারিদ্রের মধ্য দিয়া সেই কন্যা অদ্য দ্বাদশ বর্ষের। আমি তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল। শৈশবে আমার এক বন্ধু ছিল। বাল্যে এবং যৌবনে আমরা উভয়ে একত্র পাঠাভ্যাস করিতাম। তাহার পর যখন আমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম—সারদাচরণ তখনও পড়া শেষ করে নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে সে উকীল হইয়া আলিপুরে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। সৌভাগ্য-সূর্য্য কেবল উদিত হইয়াছে, এইরূপ সময়ে একদিন কাল বৈশাখী রাত্রিতে সারদাচরণ পরিজনবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল।

সারদার বয়স আমার বয়স অপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। তাহার পিতা-মাতার অবস্থা ভাল ছিল; বিদ্যাভ্যাসেও তাহার বল ছিল; সুতরাং একটা পাশ দিতে না দিতেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। আর একটি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে সারদার প্রথম পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। একদিন কথায় কথায় উভয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, আমার যদি বিবাহ হয় এবং কন্যা সন্তান জন্মে তাহা হইলে সারদার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। আমাদিগের উভয়ের বড় আশা ছিল যে ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা বন্ধুত্ব কুটুম্বে পরিণত করিব—তাহা হইলে বন্ধন দৃঢ় হইবে, বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকিবে না। বিধাতাও আমাকে প্রথম কন্যা সন্তান দিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিবাহ-যোগ্যা হইবার পূর্ব্বেই সারদা চিরশান্তিলাভ করিয়াছিল।

তাহার পর সারদার পুত্র হিমাংশু যখন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং আমার কন্যা একাদশ অতিক্রান্ত করিয়া দ্বাদশে পদার্পণ করিল তখন সারদার পত্নী গরিবের ঘরে পুত্রের বিবাহ দিতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। সারদার কনিষ্ঠ বরদাচরণ হাইকোর্টের উকীল। তিনিই হিমাংশুর অভিভাবক। আমি তাঁহার শরণ লইলাম। একদিন তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে সারদার স্ত্রী আমার কন্যাকে দেখিয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মেয়ে পছন্দ হইল। কিন্তু "হরিতকী দক্ষিণা" লইয়া দরিদ্রের ঘরে পুত্রের বিবাহ —যে পুত্র তিনটি "পাশ দিয়াছে"- কখনও সম্ভাব্য নহে।

হিমাংশুর বিবাহের জন্য অন্যত্র কন্যা দেখা হইতে লাগিল। যে স্থানে অর্থ পাওয়া যায় সে স্থানে কন্যা সুরূপা হয় না; আবার যে স্থানে কন্যা সুরূপা সেস্থানে কিছুমাত্র প্রাপ্তির আশা নাই। সারদার স্ত্রী এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একদিন তিনি এ বিষয়ে হিমাংশুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হিমাংশু তাঁহাকে কোন উত্তর না দিয়া খুল্লতাতকে বলিয়াছিল, "যদি দরিদ্রের মেয়ে বিবাহ করিতে হয় তাহা হইলে পিতৃ-সত্য প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" অগত্যা সারদার স্ত্রী সম্মতা হইলেন, কিন্তু তিনি যে "ফর্দ্দ" পাঠাইলেন তাহাতে আমাকে নিরাশ হইতে হইল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর হিমাংশুর মাতা ফর্দ্দ কিছু কমাইলেন,—যাহা রহিল তাহাও আমার সাধ্যাতীত। হিমাংশু অতি সুপাত্র, আর সারদার নিকট আমার অঙ্গীকার এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি সারদার স্ত্রীর সকল অভিলাষ পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলাম, কেবল একটি নেক্‌লেসের অভাব তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া লইতে অনুরোধ করিলাম।

পুত্র-গৌরবে গৌরবান্বিতা জননীর হৃদয় তাহাতে দ্রব হইল না। কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাকুল হৃদয়ে আবার আমি বরদা বাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও বিফল হইল। তাই কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার বাটী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। কি করিয়া উৎকণ্ঠিতা জননীকে নিরাশার নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিব,—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে রাজপথের জনকোলাহলে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম এমন সময়ে মাদ্রাজী ভদ্র লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

* * * *

বিস্ময়ের বিহ্বলতা অপসৃত হইলে আমি সেই ভদ্র মহিলাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার সকল কথা বলিয়া বলিলাম—"এই 'নেকলেসের' মূল্য আমার নিকট কত তাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিয়া জানাইতে পারি না।" তাঁহাদের "অকিঞ্চিৎকর উপহারে" আমার এমন মহৎ উপকার হইবে শুনিয়া তাঁহারা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন। আমি ভাবিলাম, ইহা কৃতজ্ঞতার বিনিময়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদ কি?

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে আমাদিগের প্রাচীন দার্শনিকগণ বলেন যে বেদ অপৌরুষেয়—স্বতঃ-প্রমাণ। যেমন জড় ঘট পটাদির স্বপ্রকাশত্ব না থাকিলেও চন্দ্র সূর্য্যাদির স্বপ্রকাশকতা অবিরুদ্ধ, সেইরূপ মনুষ্যাদির স্বীয় স্বদ্ধারোহণ অসম্ভব হইলেও অকুণ্ঠিতশক্তি বেদের ইতর বস্তু প্রতিপাদকত্বের ন্যায় স্বপ্রতিপাদকত্ব হইতে পারে। অর্থাৎ বেদ অকুণ্ঠিতশক্তি তাহার যেমন ইতর বস্তু প্রতিপাদনের যোগ্যতা আছে সেইরূপ আপনাকে আপনি প্রতিপাদিত করিবার ক্ষমতাও আছে। এই অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন:—

"চোদনাহি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং
বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়মর্থং শক্নোত্যবগময়িতুং"

বেদ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তু অবগত করাইতে সক্ষম। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বেদে প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, বেদ আপনিই আপনার প্রমাণ।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বেদকে অপৌরুষের বলিয়া থাকেন। অপৌরুষেয় কি তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পুরুষ হইতে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে পৌরুষেয় বলা যায়। উহার অভাব (অর্থাৎ যাহা পুরুষসাপেক্ষ নহে) তাহাই আমরা অপৌরুষেয় বলিয়া বুঝি।

কিন্তু বেদে সেই অপৌরুষেয়ত্বের সম্ভাবনা কোথায়? বেদ ঈশ্বর-সৃষ্ট। কোন একটি বস্তু রচনা বা নির্ম্মাণ করিতে যে শরীরের প্রয়োজন তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। হস্ত-পদ-বিশিষ্ট স্বর্ণকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে, হস্ত-পদ-বিশিষ্ট কবি কবিতা রচনা করিতেছেন। বেদ বলিতেছেন, "নরূপমস্যেহ ততোপলভ্যতে" ইহার কোন রূপ আমাদিগের উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ ইনি নিরূপ।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"

অর্থাৎ যাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ব্যয় প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারা

যায়। তবে রূপবিহীন পরমেশ্বর কি করিয়া বেদ রচনা বা নির্ম্মাণ করিতে পারেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কপিল বলিয়াছেন—

"যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ
পৌরুষেয়ম্" সাংখ্যদর্শন ।৫।৪০

দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অদৃষ্ট যে পদার্থে কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহাকেই পৌরুষেয় বলা যায়। অর্থাৎ পুরুষের উচ্চারণমাত্রেই যে পৌরুষেয়ত্ব তাহা নহে, কেন না সুষুপ্তিকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসেও পৌরুষেয়ত্ব ব্যবহৃত হয় না। তবেই বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে হয়। বেদ নিঃশ্বাসের ন্যায়ই স্বয়ম্ভূ হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিল। অতএব বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

"তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য
নিঃশ্বসিত মেতদৃগ্‌বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদাথর্ব্ববেদাঃ"

এই যে ঋক সাম যজুঃ এবং অথর্ব্ববেদ, ইহা সেই পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত অর্থাৎ নিশ্বাসতুল্য।

অতএব বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক লিখিত বা রচিত হয় নাই ; এজন্য উহা অপৌরুষেয়। কিন্তু যে বস্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও রচনা-কৌশল নাই। যাহা যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক নহে, তাহার প্রামাণ্য কি করিয়া স্বীকার করা যায় ? এই সংশয় অপনোদন করিতে কপিল বলিয়াছেন—

"নিজশক্ত্যাভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং" সাংখ্যদর্শন ৫।৫১

বেদের যে স্বাভাবিক যথার্থ জ্ঞানজননী শক্তি আছে, এই শক্তির অভিব্যক্তি আদ্যবেদে উপলব্ধি হইয়া থাকে ; অতএব বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। বেদ যদি স্বতঃ-প্রমাণ হইল, তবে তন্মূলক ও তৎসংগ্রাহক স্মৃতি ও ইতিহাসাদির প্রামাণ্য ও অক্ষুণ্ণ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েই বেদ নামধেয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপনিষৎ ব্রাহ্মণেরই অন্তভাগ তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু কেহ কেহ ব্রাহ্মণ-ভাগের বেদত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণে যখন আখ্যায়িকা প্রভৃতি দেখা যায়, তখন ব্রাহ্মণভাগ পুরাণ বা ইতিহাসের মধ্যেই পরিগণিত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণও উপনিষদে বহু আখ্যায়িকা আছে। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে জনক, অজাতশত্রু, শ্বেতকেতু প্রভৃতির বহু

আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি ব্রাহ্মণ ভাগের বেদত্ব নাই? সায়ণাচার্য্য এই আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ভাগের পুরাণ বা ইতিহাস সংজ্ঞার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কম্বু ও গ্রীবাযুক্ত পদার্থ বিশেষের কলস, কুম্ভ ইত্যাদি সংজ্ঞা থাকিলেও উহার ঘট নাম হইবে না, কে বলিল? আমরা যাহাকে "শ্বা" বলি, কেহ তাহাকে "ডগ্" বলিলে, কি বস্তুর অন্যরূপতা প্রতিপাদন করা হইল? "ডগ্" বা "শ্বা" আখ্যায় আখ্যাত পদার্থ উভয় অবস্থাতেই একরূপই থাকিবে। সেই রূপ হরহ বেদের ব্যাখ্যান-ভাগ বলিয়া তাহার বেদত্ব অপনীত বা নষ্ট হইবে না। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ দেখা যায়। মহামতি পতঞ্জলি পাণিনির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য মহাভাষ্য নামে আখ্যাত। মহাভাষ্যের সর্ব্ব প্রথমেই পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

"অথ শব্দানুশাসনম্"—অথেত্যয়ং অধিকারার্থঃ
শব্দানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যং।'

অথ শব্দানুশাসনম্ এই কৃত্বা স্বয়ং বলিয়া অথেত্যয়ং ইত্যাদি দ্বারা স্বয়ংই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থানে অথেত্যয়ং ইত্যাদি ব্যাখ্যাংশেরও মহাভাষ্য সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং কাব্যপ্রকাশে কাব্যং যশসে ইত্যাদি বলিয়া নিজেই আবার তাহার বৃত্তি করিয়াছেন; এই বৃত্তিগুলিও কাব্যপ্রকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ ব্রাহ্মণ ভাগ মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইলেও তাহার বেদত্ব দূরীভূত হইল না। সূত্র প্রকৃতি রচনা করিয়া তাহার প্রতীক গ্রহণ করতঃ ব্যাখ্যা করা গ্রন্থকারদিগের প্রাচীন রীতি। বেদেও এই রীতির যথার্থ সমাবেশ দেখা যায়। ঋষি-প্রোক্তত্ব মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়াংশেই সমান। বেদেও যেমন মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষি আছেন, ব্রাহ্মণেও সেই ঋষি থাকিলে ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তির কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন, দ্রষ্টা মাত্র। তাঁহারা যেরূপ মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন সেইরূপ ব্রাহ্মণরূপ মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র-ভাগের ব্যাখ্যা, ইহা বলিলেও বেদত্ব দূরীভূত হয় না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন মন্ত্র ভাগে ঋষি আছেন বলিয়া যে মন্ত্র ভাগই বেদ, ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ নহে, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ "ঋষি র্দর্শনাৎ মন্তু কর্তৃত্বাৎ" দর্শন করিয়াছেন, বলিয়া ঋষি হইয়াছেন; কর্ত্তা বলিয়া নহে, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ঋষিত্ব সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সেই দর্শন যেমন মন্ত্রভাগে আছে

সেইরূপ ব্রাহ্মণভাগেও আছে, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে। মনু উদিতাদি হোমের বেদ-প্রোক্ততা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই উদিত হোম কেবল ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে এই হোম দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ব্রাহ্মণ ভাগের বেদত্ব তাঁহারও ইষ্ট। তাঁহার সেই উক্তিটি এই :—

উদিতে হুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইত্যয়ীং বৈদিকী শ্রুতিঃ।

মনুসংহিতা।

মহর্ষি জৈমিনিও তদীয় মীমাংসা দর্শনে বলিয়াছেন "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ" এস্থানে শেষে এই কথাটি দ্বারা স্পষ্টই ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনির আরও একটি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই :—"আয়ায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য—মতদর্থানাম্" এই সূত্রেও ব্রাহ্মণভাগের আয়ায়ত্ব অর্থাৎ বেদত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে "বাক্যবিভাগস্যাচার্থ গ্রহণাৎ" ।২।১।৬১। "বিধার্থবাদানুবাদবচন বিনিয়োগাৎ"। ৬২ সূ। "বিধি র্বিধায়কঃ।" ৬৩ সূ। "স্তুতি নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থ বাদঃ" ।৬৪। "বিধি বিহিতস্যানুবচনমর্থবাদঃ।" ৬৫ সূ। এই পাঁচটি সূত্রে শব্দ অর্থাৎ বেদপ্রমাণ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনিও ঐ ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বাৎস্যায়ণ ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বাৎস্যায়ণ পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় "প্রমাণং শব্দো যথালোকে, বিভাগশ্চ ব্রাহ্মণ বাক্যানাং ত্রিবিধঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"যথা লৌকিকে বাক্যে বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং তথাবিদুষোঽপি এবং বেদবাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং।"

যেমন বিভক্তরূপে অর্থ গৃহীত হইলেও লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যতা আছে, সেইরূপ বেদবাক্যেরও প্রামাণ্যতা হইতে পারে। কেন না বিভাগে অর্থগ্রহণ বেদেও আছে। সুতরাং ঋষিপুঙ্গব ব্যাৎসায়ণ যে ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকারের পক্ষপাতী, তাহা তাঁহার স্বীয় উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মন্ত্র ভাগের ন্যায় ব্রাহ্মণভাগেরও প্রামাণ্য আছে।

আমাদিগের প্রাচীন দার্শনিকগণ বেদের নিত্যতা স্বীকার করেন, ইঁহা-দিগের মতে সংসার অনাদি, কিন্তু অস্তবান। ফলতঃ সংসার আদি কি

অনাদি, এই বিচার পূর্ব্বে বহুস্থানে হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন দার্শনিকগণ বহু গবেষণা, বহু চিন্তা ও বিস্তর আলোচনা করিয়া, পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে সংসার অনাদি। সংসারের সাদিতা গৃহীত হইলে প্রভূত দোষের অধীন হইয়া পড়িতে হয়; এই অনাদি সংসারে বেদ চির-কালই তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনে বলিয়াছেন "অতএব নিত্যত্বং" বেদান্তদর্শন ১।৩।২৯। যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদিবিশিষ্ট জগৎ বেদশব্দ পূর্ব্বক সৃষ্ট হইয়াছে অতএব বেদও নিত্য। মন্ত্রে আছে:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাং।"

যাজ্ঞিকগণ পূর্ব্বসুকৃতিবলে বেদের যোগ্যতালাভ করিয়া ঋষিগণের মধ্যে স্থিত বেদকে পাইয়াছিলেন। "ঋষিগণের মধ্যেস্থিত" বলায় বেদের নিত্যতা সমর্থিত হইল। স্মৃতিতেও দেখা যায়।

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥"

যুগান্তকালে বেদরাশি অন্তর্হিত হইয়াছিল কিন্তু মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা স্বয়ম্ভুর অনুজ্ঞায় ইতিহাস সহিত সেই সমগ্র বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

জগৎ বেদ শব্দ পূর্ব্বক সৃষ্ট হইয়াছে শ্রুতি এবং স্মৃতিতে এ কথার ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এত ইতি বৈ প্রজাপতি দেবানসৃজত অগ্নইতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃন্ তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহান্ আসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতিশস্ত্রং অতি সৌভগা ইতি অন্যাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা এই মন্ত্রমধ্যস্থ এতেঃ অগ্নয়ং ইন্দবঃ, তিরঃ পবিত্রং, আসবঃ, বিশ্বানি, অতি-সৌভগা এই পদগুলি স্মরণ করিয়া দেবতা-দিগকে সৃজন করিয়াছেন। "এতে" এই পদটি দেবগণের স্মারক। "অগ্নক রুধিরং তৎপ্রধানে দেহে রমন্তে" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "অগ্নক"শব্দ মনুষ্যবোধক পিতৃগণ চন্দ্রলোকে থাকেন এজন্য "ইন্দবঃ" এই পদটি পিতৃগণের স্মারক। পবিত্র কোন স্থানকে যে তিরস্কার করে তাহাকেই তিরঃপবিত্র বলা যায়; অতএব "তিরঃ পবিত্র" শব্দ গ্রহগণের স্মারক। "আসবঃ" এই শব্দটি গীতি-রূপ স্তোত্রের স্মারক। এবং "বিশ্বানি" এই শব্দটি বিশ্বয়তাপন্ন শব্দের এবং "অতি-সৌভগা" শব্দ সৌভাগ্যযুক্তের স্মারক। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, "ঋচ্যধ্যূঢং সাম" ঋকে সাম গীতি অধ্যূঢ় আছে। বেদে এই সামগীতিরূপ

স্তোত্রের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। স্তোত্রের পর শাস্ত্রের উল্লেখও আছে।

স্মৃতিও বলিয়াছেন :—

অনাদি নিধনানিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যাযতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ॥

স্বয়ম্ভু আদি ও নিধনরহিত নিত্যদিব্য বেদময় বাক্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যত্রও স্মৃতিতে এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে।—

নামরূপেচ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদ শব্দস্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

মহেশ্বর সর্ব্বপ্রথম ভূত ও প্রাণিগণের নামরূপ ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন বেদ শব্দ হইতে করিয়াছিলেন। সমস্ত ভূত ও প্রাণিবৃন্দের নাম ও পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম এবং পৃথক সংস্থান-স্থিতি অথবা অবয়ব-সন্নিবেশ সেই পরমপুরুষ বিধাতা বেদ শব্দ হইতেই সর্ব্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলেন। বেদ যেমন যেমন বলিয়াছেন সেই রূপেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সৃষ্টি নূতন নহে ; এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। এই জন্যই মন্ত্র বর্ণ বলিয়াছেন "ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই কল্পেও জগৎ কল্পনা করিয়াছেন।

বেদের মন্ত্র অর্থাৎ সংহিতা-ভাগ ছন্দোনিবদ্ধ। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী এই কয়টি ছন্দঃ বেদে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। গায়ত্রী ছন্দঃ ২৪টি অক্ষরে নিবদ্ধ থাকে এবং ইহার তিনটি পাদ, অন্যান্য ছন্দের ন্যায় ৪ পাদ নহে। লৌকিক কালিদাসাদির কবিতানিচয় নানাছন্দে নিবদ্ধ থাকিলেও কোথাও কোন কবিতা তিনপাদে পূর্ণ, দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, লৌকিক কবিগণ বৃত্তরত্নাকর ছন্দো-মঞ্জরী, শ্রুত-বোধ প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থের সবিশেষ আদর করিয়াছেন। তাঁহারা বৈদিক ছন্দের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। করিলে তাহা ছুটই হইত। লৌকিক প্রয়োগে বৈদিক প্রয়োগ সন্নিবেশিত করা যেমন দুষ্ট ও দুর্ব্বোধ্যতাজনক, সেইরূপ ছন্দঃ প্রকৃতির সন্নিবেশও দোষাবহ। উষ্ণিক্ ছন্দঃ ২৮ অক্ষরে এবং অনুষ্টুপ্ ৩২ অক্ষরে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বৃহতি ৯, পংক্তি ১০, ত্রিষ্টুপ্ ১১, এবং জগতী ১২ অক্ষরে শ্লোকাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এবং মন্ত্রভাগে

প্রত্যেক মন্ত্রই দেবতার স্তবে পরিপূর্ণ। যে যে দেবতা স্তুত হইয়া থাকেন, সেই সেই মন্ত্রের সেই সেই দেবতা। কোন কোন মন্ত্র এমন দুর্ব্বোধ্য, যে তাহার দেবতা নির্দ্দেশ করা কঠিন। নিরুক্তকার যাস্ক তদীয় নিরুক্ত গ্রন্থে দৈবত কাণ্ডে ছয়টি মন্ত্রের দেবতা নিশ্চয় করিবার প্রণালী বিশেষরূপে দেখাই য়াছেন। বেদাধ্যায়িগণের নিরুক্ত একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বৃহৎ, এবং বেদের নানা রহস্যে পরিপূর্ণ। বৈদিক শব্দগুলি কি কি অর্থপ্রকাশনে সমর্থ, তাহা যাস্ক সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। নিরুক্ত পাঠ না করিলে বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকও দুর্লভ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী এই গ্রন্থ একবার মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এখন আর তাহা মূল্য দিলেও পাওয়া যায় না।

সকল বৈদিক মন্ত্রই কোন না কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত আছে, কোন মন্ত্রই নিরর্থক নহে। ইহাকেই বিনিয়োগ বলা যায়, অর্থাৎ মন্ত্রের প্রয়োজনীয় স্থানকেই বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে। মন্ত্রে যেমন ছন্দঃ, দেবতা, বিনিযোগ তেমনিই ঋষিও আছেন। অর্থাৎ যে মন্ত্র যে ঋষি দেখিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের সেই ঋষি। বেদভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন "ঋষির্দ্দর্শনাৎ", দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষিপদবাচ্য।

অধ্যাপক ও পুরোহিতগণ প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, বিনিয়োগ পরিজ্ঞাত হইয়া তবে অধ্যাপনা ও যজমানের কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্যথা তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে, "যোঽবৈ অজ্ঞাতর্ষি ছন্দোদৈবতং ব্রাহ্মনেন যাজয়ত্যধ্যাপয়তি বা স্থাণুচ্ছতি গর্ত্তং বা প্রপদ্যতে" যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ দেবতা প্রভৃতি জানেন না, এমন লোক দ্বারা যাজন বা অধ্যাপনা করাইলে স্থাণুত্ব প্রাপ্ত বা গর্ত্তে পতিত হইতে হয়। স্মৃতি বলিয়াছেন :—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেবচ
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্জায়তে তু সঃ।

ঋষি, ছন্দ্য দৈবত ও বিনিযোগ না জানিয়া যে ব্যক্তি অধ্যাপনা বা জপ করিবে, সে ব্যক্তি পাপী হইবে। এবং অন্য স্মৃতিতে আছে :—

ঋষিছন্দো দৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্মরাপ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুক্তানো মন্ত্র কণ্টক উচ্যতে॥

ঋষিছন্দো দৈবত এবং ব্রহ্মণার্থ উদাত্তাদি স্বর না জানিয়া প্রয়োগ করিলে মন্ত্র কণ্টক হয়। বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি স্বরের সন্নিবেশ আছে। উচ্চ উচ্চারণের নাম উদাত্ত। অনুচ্চ উচ্চারণের নাম অনুদাত্ত। এবং উভয়ের সমাহারকে স্বরিত কহে। কোথায় উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর হইবে পাণিনি তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। স্মৃতি আরও বলিয়াছেন যে—

স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোর্থ এবচ।
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে॥

স্বর বর্ণ অক্ষর মাত্রা বিনিয়োগ এবং অর্থ মন্ত্রজিজ্ঞাসুকে পদে পদে জানিতে হইবে। ইহাই বেদের বিধান।

শ্রীচন্দ্রধর ভট্টাচার্য্য, কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

এমনি সময়ে সখি!
প্রণয়-মধুর ভাবে
আদরে ধরিয়ে করে
ব'লেছিল, "ভালবাসে।"

সুনীল আকাশে শশী
হেসেছিল সুধাহাসি
নিশীথ ধরণী কোলে
ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি।

সেই ত চাঁদিমা শোভা,
শোভাময় চারিধার
বাড়াতে যাতনা মম
সেই শুধু নাহি আর।

একাসনে তার সনে
দেখেছি যে শোভা চাঁদে
আজিকে হেরিতে তা'রে
কেন এ পরাণ কাঁদে?

আপনা ভুলিয়ে তা'রে
কেন বেসেছিনু ভাল
এ ভালবাসার চেয়ে
না দেখা যে ছিল ভাল।

জীবন যাতনা-ভরা
নয়নে নয়ন-ধার।
আর কি আসিবে ফিরে?
চেয়ে আছি পথ তা'র।

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মজুমদার।

সমালোচনা।

খাদ্য। *

আমরা এই পুস্তকখানির প্রচারে পরম পুলকিত হইয়াছি। লেখক যথার্থই বলিয়াছেন,—"স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক ব্যাধিরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। * * * শরীররক্ষা রূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেই খাদ্য সংগ্রহ যে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতে পারে, ইহা যিনি মনে করেন, তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী। খাদ্যের সহিত সাধারণের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। যথাপরিমাণ খাদ্যের অভাবে জাতিগত দৌর্ব্বল্যের আধিক্য হয়। * * জাতিগত দৌর্ব্বল্যের দ্বারা সাধারণের মধ্যে নানাবিধ রোগের বিস্তার প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। * * কোন জাতির মধ্যে রোগের প্রাবল্য হইলে ঐ জাতি শীঘ্র দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া পড়ে। কর্ম্মক্ষম লোক রোগগ্রস্ত হইলে সমগ্র জাতির আয়ের হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং ইহা পুনরায় রোগবৃদ্ধির ও অকাল মৃত্যুর সহায়তা করে।" লেখক মহাশয় অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ; তিনি আলোচ্য পুস্তকে খাদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী গৃহস্থ ও গৃহিণীমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। পুস্তকখানি কেবল বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পূর্ণ নহে; পরন্তু অত্যাবশ্যক বিষয়ের সরল আলোচনা। লেখক মহাশয় ইহাতে আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য ও পানীয়— উভয়েরই গুণাগুণ বিচার করিয়াছেন।

এই পুস্তক পাঠে পাঠক আর একটি বিষয় জানিতে পারিবেন। আজকাল ভেজালের বাহুল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সর্ষপ তৈলে খনিজ "ব্লুমলেস অয়েল," ঘৃতে পচা চর্ব্বি,—এ সকলের সংমিশ্রণে সাধারণের স্বাস্থ্যনাশ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত 'ল্যান্‌সেট' পত্রে লিখিত হইয়াছিল, লণ্ডনে বিক্রীত দুগ্ধের দশভাগের নয় ভাগ বিশুদ্ধ নহে। কেহ দুগ্ধে জল মিশাইয়া, কেহ দুগ্ধের মাখম তুলিয়া লইয়া, কেহ দুগ্ধে রং দিয়া বিক্রয় করে। দুগ্ধ যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য দুগ্ধে কোন কোন ঔষধ

* খাদ্য—শ্রীচুণীলাল বসু, এম, বি, এফ, সি, এস প্রণীত। সাহিত্য সভার গ্রন্থপ্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রয়োগ অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাক্‌মিল্যান্‌স ম্যাগাজিনে' দুগ্ধবিষয়ক প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মিষ্টার পাক্‌স্‌লী লিখিয়াছিলেন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে মোট মৃত্যুসংখ্যা—৫৪৯৩৯৩। ইহার মধ্যে এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা—১৩৭৪৯০। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে, এই সকল শিশুর অর্দ্ধাংশ যে সকল ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—সে সকল ব্যাধির প্রতিরোধ সহজসাধ্য। এক উদরাময়েই ২৮০০০ শিশুর মৃত্যু হয়। পীত দুগ্ধের দোষই যে অধিকাংশস্থলে উদরাময়োৎপত্তির কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

চুণীবাবু আলোচ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"দুগ্ধ ভারতবাসীর জীবনস্বরূপ। ইহা শিশুদিগের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইলেও পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসী প্রত্যেকেই কোন না কোনও আকারে দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে।* * * * জীবনধারণের পক্ষে এরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কাহারও ভিন্ন মত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে এদেশে বর্ত্তমান সময়ে সহরে বা পল্লীগ্রামে কোথাও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা সহরে যে সকল গোয়ালা-বস্তি আছে, তথা হইতে প্রায় ৪০০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ সহরে সরবরাহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বাহির হইতে রেলওয়ে দ্বারা প্রায় ১০০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ কলিকাতায় আমদানি হইয়া থাকে। দমদমা, কাশীপুর প্রভৃতি কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতেও প্রায় ২০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ ভারে করিয়া বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আনীত হয়। বলা বাহুল্য যে ইহার কোনটি বিশুদ্ধ দুগ্ধ নহে। এই সকল দুগ্ধে যে শুদ্ধ ভেজাল আছে, তাহা নহে; নানাকারণে এই সকল দুগ্ধের সহিত বহুবিধ সংক্রামক রোগের বীজ মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা। কলেরা, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক উৎকট রোগ যে অনেক সময়ে দূষিত দুগ্ধ পান করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। সংক্রামক-রোগ-দুষ্ট পুষ্করিণী বা কূপের জল দুগ্ধের সহিত মিলাইয়া দুগ্ধকে এইরূপ বিষাক্ত করা হয়।" ইহা যে অত্যুক্তি নহে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। "পশ্চিম হইতে যে ঘৃতের আমদানি হয়, তাহার সহিত সচরাচর চীনের বাদামের তৈল বা মহুয়ার তৈল বা পোস্ত বীজের তৈল ভেজাল থাকে। ইহার মধ্যে চর্ব্বি ভেজাল বড় বেশী থাকে না। কলিকাতার মধ্যে ও ইহার সন্নিকটস্থ দুই

একটি স্থানে চর্ব্বি চীনের বাদামের তৈলের-সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চর্ব্বিবিক্রয় করিবার জন্ত কতকগুলি দোকান আছে। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতায় যে ঘৃতের আমদানি হয়, এই সকল স্থানে তাহার সহিত চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল মিশ্রিত করিয়া সহরে ও মফঃস্বলে ঘৃত বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কলিকাতায় বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। ১৯০৫ সালে মিউনিসিপাল পরীক্ষাগারে ৭০০টি ঘৃত পরীক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭৫টি খাঁটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, আর বাকী ৫২৫টি ঘৃতে (অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ ঘৃতে) অল্পাধিক পরিমাণে নানাপ্রকারের ভেজাল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল।"

পাঠক উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে বুঝিতে পারিবেন, খাদ্যবিষয়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগদান আবশ্যক হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে বেরিবেরি নামক যে ব্যাধির ব্যাপ্তি হইয়াছিল, অনেকের বিশ্বাস, আহার্য্যে ব্যবহৃত তৈলে ব্রুমুলেস্ অয়েল হইতেই তাহার উৎপত্তি।

সুখের বিষয়, দেশের শিক্ষিত যুবকগণ "পেটভাতা" চাকরীর আশায় নিরাশ হইয়া এখন ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিদান করিতেছেন। লেখক মহাশয় যেরূপ Dairy সংস্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন—কলিকাতার উপকণ্ঠে সেইরূপ গোশালা সংস্থাপিত হইতেছে। তবে সে সকলই ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। এরূপ অনুষ্ঠান বহুব্যয়সাধ্য; একের পক্ষে আবশ্যক মূলধন ব্যয় করা অনেক সময় সাধ্যাতীত। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় বৃহৎ বৃহৎ গোশালা সংস্থাপিত হইবে এবং সেই সকল হইতে বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ হইয়া দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে সহায়তা করিবে।

এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। "বিলাতে মাখমের সহিত মার্গারিণ (Margarine) নামক এক প্রকার চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয়, কিন্তু বিলাতী আইন অনুসারে এরূপ ভেজাল মাখমকে কেহ মাখম বলিয়া বিক্রয় করিতে পারে না, ইহা মার্গারিণ বলিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।" এদেশেও এইরূপ বিধানের প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

পুস্তকের ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠায় একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে;—"গোয়ালারা করিয়া থাকে।" ইহার অর্থ হয় না। ১৬১ পৃষ্ঠায় আছে—"মহিষ গরু

অপেক্ষা বেশী দুগ্ধ দেয়।" ইহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। কলিকাতার বাজারে যে সকল মুলতানী, হিসার, নেলোরী প্রভৃতি গাভী পাওয়া যায় যে সকল গাভী সাধারণ মহিষ অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দেয়। তবে "মহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী ঘন এবং উহাতে মাখনের পরিমাণ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক থাকে।"—তাহাতে অর্দ্ধেক পরিমাণ জল দিলেও গোদুগ্ধ অপেক্ষা পাতলা বোধ হয় না, সেইজন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা মহিষের দুগ্ধ ব্যবহার করে।

গ্রন্থমধ্যে একটি মন্তব্যে আমাদের আপত্তি আছে। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের মত সুপণ্ডিত, সর্ব্বজনপ্রিয়, অমায়িক ও বিনয়ী ব্যক্তির এই মন্তব্যে সত্যসত্যই আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি; আমিষ ও নিরামিষ আহারের গুণবিচার করিতে যাইয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"কত বকধার্ম্মিক বৈষ্ণবকে হবিষ্য ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণলীলার চূড়ান্ত অভিনয় করিতে দেখা যায়!" এই মন্তব্যে গ্রন্থকার অকারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মনে ব্যথা দিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা রূপক—ইহাই অনেকের বিশ্বাস। উইলসন তাঁহার হিন্দু-ধর্ম্মসম্প্রদায় বিষয়ক উপাদেয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, ভক্তি পঞ্চরসাত্মিকা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। লেখক যে কৃষ্ণ-লীলার কথা বলিয়াছেন, তাহা এই মাধুর্য্যরসের বিকাশ। যদি প্রচলিত বৈষ্ণব আচার কলুষকলঙ্ক-কলঙ্কিত হইয়া থাকে—তবে তাহার কারণ থাকিতে পারে। হাণ্টার এক-স্থানে বলিয়াছেন Fat maggots and creeping parasites breed in the warm comfort of a national creed" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "The religion of royalty everywhere becomes,sooner or later, a religion of luxury." বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ও নৃপতিবৃন্দ ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। সুতরাং যদি তাহাতে কদাচারের কলুষস্পর্শ হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মেও এককালে আচার-বাহুল্য ধর্ম্মমতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেই 'প্রোটেষ্টাণ্ট' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। আচারের দোষে ধর্ম্মমতকে বিদ্রূপ করা সঙ্গত নহে।

'খাদ্যের' প্রচার করিয়া চুণীবাবু বাঙ্গালীর পরম উপকার করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ পুস্তকের অত্যন্ত অভাব; সুতরাং প্রচার অত্যাবশ্যক।

আমরা আশা করি, সাহিত্য সভা এইরূপ পুস্তকের প্রচার করিয়া জন-সাধারণের হিতসাধন করিবেন।

সংগ্রহ।

সাহিত্য।

ফরাসী উপন্যাস।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'অ্যাকাডেমী' পত্রে কোন লেখক লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসই বর্ত্তমান কালের সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত। বাস্তবিক উপন্যাসের আদর এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, উপন্যাসকে অবলম্বন করিয়া অনেক লেখক বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে, সমাজ-সংস্কারে শিক্ষা সংস্কারে আপনাদের বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতেই উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের সৃষ্টি। গ্রাণ্ট অ্যালেন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠক উদ্দেশ্যহীন উপন্যাসের অস্তিত্ব সহ্য করিয়াছেন। বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞ পাঠক সহ্য করিবেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে পুরুষের সহিত সমান অধিকারপ্রার্থিনী রমণীরাও উপন্যাসে আপনাদের আকাঙ্ক্ষার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সংপ্রতি 'পেলমেল গেজেটে' প্রকাশ, ফ্রান্সে উপন্যাসের আদরের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডেও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকদিগের তিরোভাব হইয়াছে। এক সময় স্কটের বিস্ময়কর-ঘটনাবহুল-উপন্যাসমুগ্ধ পাঠক সম্প্রদায়কে প্রফুল্ল করিয়া বিদ্রূপে ও রহস্যে সমুজ্জ্বল ডিকেন্সের উপন্যাস ও পরিহাস-রসিক থ্যাকারের উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের স্থানে এখন রাইচার্ড হ্যাগার্ডের ও রাডিয়ার্ড কিপলিংএর প্রাধান্য।—

ফরাসী উপন্যাস।

ভীম, দ্রোণ, কর্ণ গেল। শল্য হ'ল রথী
চন্দ্র, সূর্য্য অস্ত গেল—জোনাকী জ্বালে বাতি।

ফ্রান্সেও সেই অবস্থা। ফরাসী উপন্যাসের বিশেষত্ব চরিত্র-বিশ্লেষণে—চিত্রের সূক্ষ্ম রেখাপাতে—বর্ণের বাস্তবত্বে। ফ্লবা, সু, হুগো প্রভৃতি যে সকল লেখক সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, যাঁহারা চিত্রিত চিত্রে মানব হৃদয়ের প্রবল প্রবৃত্তির লীলা-চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য অক্ষয় সুধা সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ডডে, গনকুর, জোলা, মোপাঁসা, অনেট—উপন্যাস-ক্ষেত্রে ইহাদিগের সমকক্ষ কোথায়? যে দেশে উপন্যাসের এত উন্নতি ও আদর হইয়াছিল, সে দেশে উপন্যাসের অনাদরের কারণ কি?

কারণ।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান ব্যস্ততাই উপন্যাসের অনাদরের প্রধান কারণ। এখন পাঠকগণ উপন্যাস ছাড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। সংবাদ-পত্রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপন্যাস লিখিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক কারণ তাহা নহে। উপন্যাস-বাহুল্যই উপন্যাসের অনাদরের কারণ। এত উপন্যাস রচিত হইয়াছে ও পাঠকগণ এত উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিশ্বাস মানব চরিত্রের কোন দিক অনুক্ত বা অনৃষ্ট নাই। এখন পাঠকগণ অবকাশরঞ্জনের জন্য জীবনী, ইতিহাস বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছেন। ফ্রান্সে এখন জীবনীর আদর হইয়াছে। যে ঔপন্যাসিক সময়োপযোগী উপন্যাস রচিত করিতে পারিবেন, তিনি সফলকাম হইবেন। জুল ভার্ণে যে সকল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—এখন সে সকল ব্যাপার অসম্ভবের রাজ্য হইতে সম্ভবের রাজ্যে নীত হইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাযেই ভার্ণের উপন্যাসের আদর কমিয়াছে। এখন যে সকল ঔপন্যাসিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিষয় বুঝিয়া—আবিষ্কারের সম্ভাবনার ভিত্তির উপর উপন্যাস গঠিত করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে যশোলাভ অনিবার্য্য।

ফ্রান্সে উপন্যাসের অনাদরের আরও দুইটি কারণ আছে। ফরাসী সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রকাশিত হয় না। সুতরাং উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইলে পাঠকদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া—প্রতিভাবান তরুণ ঔপন্যাসিকের পক্ষে পাঠক-সমাজে পরিচিত হওয়া দুঃসাধ্য। আবার ফরাসী প্রকাশকগণের ব্যবসায়-বুদ্ধির শোচনীয় অভাব। এই দুইটি ত্রুটি সংশোধিত হইলে ফ্রান্সে উপন্যাসের পূর্ব্ব সমাদর পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

বিবিধ।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ।

গ্রন্থ-পরিচয়।

সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানাচার্য্য সার রোনাল্ড রস Prevention of Malaria অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিলাতের বিখ্যাত 'টাইম্‌স্' পত্র সেই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া একটি সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। এক খণ্ডে ম্যালেরিয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, নিদান ও প্রতিষেধের উপায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য খণ্ডে লেখকের হৃদয়ের আশার ও নৈরাশ্যের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি ব্যাপার কবিতার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এই খণ্ডের মুখবন্ধে লেখক যাহা লিখিয়াছেন,—তাহা অতীব সুন্দর। এই খণ্ডে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভারতবাসীর দুঃখ কাহার মর্ম্মন্তুদ বেদনার অভিব্যক্তি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখজালায় নিত্য তাড়নায় ভারতবাসী,—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর—নিকট তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সেই জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক ভাগের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিয়া নিরস্ত হইলাম।

'টাইমস্' পত্র লিখিয়াছেন,—ম্যালেরিয়া জ্বরের তিনটি বিভিন্ন রূপ বা মূর্ত্তি আছে, তাহা এখন সাধারণে জানিতে পারিয়াছেন। প্রথম সাম্প্রাতিক জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বর নামে অভিহিত। দ্বিতীয় তৃতীয়ক জ্বর,—যে জ্বর একদিন অন্তর হয়; তৃতীয় চতুর্থক জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর দুই দিন অন্তর হয়। সাধারণ জ্বরের আবার প্রকার ভেদ আছে; যথা সান্তত (Remittant) জ্বর অর্থাৎ যে জ্বরের কিছুদিন পর্য্যন্ত বিরাম হয় না; অন্যেদ্যুষ্ক, (Quotidian) বা যে জ্বর প্রতিদিন একবার করিয়া আইসে। সন্ততক (Double Quotidion) বা দৌকালীন জ্বর। যাহা হউক এই শ্রেণীর জ্বরের শ্রেণী-বিভাগ লইয়া বিশেষ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণতঃ সাধারণ জ্বর, তৃতীয়ক জ্বর ও চতুর্থক জ্বরই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অনতিপূর্ব্বকালে এই ত্রিবিধ জ্বরই জলাকীর্ণ ভূমি হইতে উত্থিত দূষিত-বায়ুসঞ্জাত বলিয়া সাধারণের ও বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস ছিল। তাহা হইতে ম্যালেরিয়া নামেই সপ্রকাশ। ইতালীয় ভাষায় mala মন্দ এবং aria বাতাস এই দুই কথার সংযোগে ম্যালেরিয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ডাক্তার রোনাল্ড রস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, শোণিতে এক জাতীয় পরভূকের (Parasite) আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে ম্যালেরিয়া নামক জনপদ-বিধ্বংসী ব্যাধি জন্মে। এই পরভূক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পরভূক দুই দিন অন্তর আপনার দেহ হইতে বীজ (Spores) নিঃসৃত করে। উহারা চতুর্থক বা দুই দিন অন্তর পালা জ্বরের জনক। আর এক শ্রেণীর পরভূক এক দিন অন্তর বীজ (Spores) নিঃসৃত করে—ইহারা তৃতীয়ক বা এক দিন অন্তর জ্বরের জনক। আর এক শ্রেণীর পরভূক সাম্প্রাতিক জ্বরের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পরভূকের পার্থক্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ঐ সকল পরভূক শোণিতের লোহিত কণিকার আশ্রয় লইয়া ক্রমে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই পরভূক এনোফিলিস্ জাতীয় মশক কর্ত্তৃক রোগীর দেহ হইতে সুস্থ মানবের দেহে বিসর্পিত হইয়া থাকে। * এই পরভূক শোণিতের লোহিত কণিকা ধ্বংস করিতে থাকিলে দেহে এক প্রকার বিষের উদ্ভব হয়, তাহার ফলে দেহে শৈত্য, পরে উত্তাপ ও শেষে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইয়া থাকে। এই সকল উপসর্গের দ্বারা পরভূকগণের বীজ-নিঃসরণ সূচিত হয়।

জ্বরের বিভিন্ন রূপ ও পরভূক।

শোণিতে দুই দশটি পরভূক জন্মিলে বা আশ্রয় লইলে মানুষ ও অন্যান্য জীব পীড়াক্রান্ত হয় না। দেহকে পীড়িত করিতে হইলে অন্ততঃ শোণিতে লক্ষ পরভূকের আবির্ভাব আবশ্যক। এই পরভূকের আক্রমণে মানব শমনসদনে নীত হইতে পারে—আবার অনেকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া জীবন ক্ষীণ করিয়া—শেষে কতকটা "সামলাইয়া" উঠে। তখন আর তাহারা সহসা জ্বরাক্রান্ত হয় না। কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে অনেকে বাল্যে রোগাক্রান্ত হইয়া এই

অনভিব্যক্ত অবস্থা

* কার্ত্তিক সংখ্যায় মশক নামক সন্দর্ভ দেখ।

প্রকার অরপ্রতিষেধশক্তি অর্জ্জন করে এবং যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াও জীবিত থাকে, ইহাদের শোণিতে পরদ্রুহের যথাক্রমে উৎপত্তি, পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে,—কিন্তু অরের লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতির সংরক্ষিণী-শক্তি-প্রভাবে ইহাদের দেহে এক প্রকার প্রতিষেধক বিষ (Antitoxin) জন্মে। তাহার প্রভাবে ইহারা অরের হস্ত হইতে নিস্তার পায়। কিন্তু ইহাদের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ ও নিস্তেজ এবং অনেক স্থলে প্লীহা ও যকৃত বিকৃত হইয়া থাকে। এই সকল আপাততঃ সুস্থ ব্যক্তিকে যদি কোন এনোফিলিস জাতীয় মশক দংশন করতঃ বিষ-সংগ্রহ করে এবং সেই বিষ নিজ দেহে পরিণত করিয়া অন্য এক সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে—তাহা হইলে সেই সুস্থ ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবেন। সেই আক্রমণে পেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে কৃষকার লোকদিগের রক্ত পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য

এনোফিলিস নামক এক জাতীয় মশক দ্বারা ম্যালেরিয়ার বীজাণু মানবদেহে বিসর্পিত হইয়া থাকে। * ডাক্তার রস বলিয়াছেন, মানব জাতির রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কলেরা প্লেগ ও আমাশয় রোগে এতদূর তত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অন্যান্য জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির ন্যায় ইহা সাময়িক ভাবে আবির্ভূত হয় না। যে অঞ্চলে ইহার প্রাদুর্ভাব, সে অঞ্চলে ইহা চিরস্থায়ী হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর দেশে, কৃষিকার্য্যের প্রকৃষ্ট সময়ে, ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশ কখনও সমৃদ্ধি-লাভ করিতে পারে না। ঐ স্থান ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। যাহারা ঐ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহারা ক্ষীণ জীবনী লইয়া কঠোর পরিশ্রমে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর মানবের বিষম শত্রু। মানবের এমন শত্রু আর নাই। ইহা উষ্ণ কোটিবন্ধের অন্তর্ভূত দেশ-সমূহকে সভ্যতাধিকারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং মানব জাতির ইতিহাসকে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। স্বাস্থ্যই বাস্তু ও সম্বন্ধভাবে মানবের সমৃদ্ধি-লাভের কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং ইহার উচ্ছেদসাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কুইনাইন

ম্যালেরিয়া ব্যাধির প্রতিষেধ সম্বন্ধে ডাক্তার রস্ লিখিয়াছেন, বহুদিন যাবৎ কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছে। পরদ্রুহ হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়ার প্রতিকার হইয়া থাকে তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার পরদ্রুহ বিনষ্ট করে। বহুদিন ধরিয়া অত্যন্ত অধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ না করিলে রক্ত-কণিকার সমূদায় পরদ্রুহের বিনাশসাধন সম্ভবে না। সুতরাং অর আরোগ্য হইবার পরও বহুদিন ধরিয়া রোগীকে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করান আবশ্যক। শোণিতের একটী লোহিত কণিকায় যদি একটিমাত্র সজীব ম্যালেরিয়া পরদ্রুহ বর্ত্তমান থাকে,—তাহা হইলে সেই সজীব পরদ্রুহ হইতে ভূপতিত রক্ত

* এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হইতে উত্থিত রক্তকীটদের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে পরস্পর প্রস্তুত হইয়া আবার সমস্ত লোহিত কণিকা বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করে। রোগী আবার জ্বরগ্রস্ত হয়। কুইনাইন-প্রয়োগে বিতাড়িত হইলেও ম্যালেরিয়ার পৌনঃপুনিক আক্রমণের ইহাই একটি প্রধান কারণ। ইহা ভিন্ন উহার অন্য কারণও আছে। কিন্তু যে স্থানে জল-নিকাশের সুব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য-রক্ষাসম্পর্কিত অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হয়, সে স্থানে কুইনাইন সহকারী ঔষধ (Adjuvant) রূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। জমি হইতে প্রকৃষ্টরূপে জল-নিকাশের ব্যবস্থা, মশক-বিনাশ, আবাদা ও দরজায় লৌহ জালুতির আবরণ নির্ম্মাণ, মশারীর ব্যবহার, বন-জঙ্গল-নাশ প্রভৃতি কার্য্যকেই ডাক্তার রস ম্যালেরিয়াপ্রতিষেধের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

অন্যান্য প্রতিষেধ ব্যবস্থা।

কুইনাইনের রীতিমত প্রয়োগে ম্যালেরিয়া দমিত হইতে পারে ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনেও মানবদেহে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহাতেও স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে। পুনশ্চ কুইনাইন সেবনে যে রোগী একবার আরোগ্য হইল, সে যদি আবার ম্যালেরিয়াসঙ্কুল স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাঁহার পুনরায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইবার আশঙ্কা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, একথা নিতান্ত নির্ব্বোধের নিকটও দুর্ব্বোধ নহে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দেশের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত অবস্থার উন্নতিবিধানে সকলেরই যত্নশীল হওয়া উচিত।

ইতিহাস।

বারীচ।

পশ্চিম ভারতে ঐতিহাসিক ঘটনাস্মৃতিসমাকুল স্থান বিদ্যমান। এখন স্থানগুলি যেমন সমৃদ্ধিশ্রীহীন—তাহাদের ইতিহাসও তেমনই বিস্মৃতপ্রায়। বারীচ ইহাদিগের অন্যতম। সম্প্রতি বারীচের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন।

অবস্থান।

নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে বারীচ অবস্থিত। নদীকূলে শিলানির্ম্মিত প্রাচীর—যেন পরিখার পর দুর্গ প্রাচীর। প্রাচীর জলকূলে দণ্ডায়মান। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আমেদাবাদের সুলতান বাহাদুরের শাসন-সময়ে পুরস্কার ব্যবস্থা হয়। পুরপ্রাচীরে পাঁচটি দ্বার। ইহা এককালে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরাজ বণিকের কুঠী সংস্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে বারীচ হইবার পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে শক্তাবীর মারহাট্টা সেনাদল তাণ্ডী ও নর্ম্মদা পার হইয়া বারীচ আক্রমণ করে। শাসনকর্ত্তা নিহত হইলে পুরবাসীরা অস্ত্রত্যাগ করিয়া অধীনতা স্বীকার করে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের নবাবের ৭০০ সৈনিককে সঙ্গে লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদল বারীচ আক্রমণ ও অধিকার করে। পর বৎসর বোম্বাই হইতে জেনারল ওয়েডারবর্ণ একদল সৈন্য লইয়া বারীচ আক্রমণ করেন। পুরপ্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত গোলায় তাঁহার মৃত্যু হইলে কর্ণেল গর্ডন সেনাদলের কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন ও জয়ী হয়েন। ইহার পর ১৮০৩খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বারীচের পুরপ্রাচীরতলে ইংরাজের রণভেরীনাদ শ্রুত হয়। সেবারও যুদ্ধে একজন ইংরাজ সেনাপতি নিহত হয়েন। এইবার জলপথে ও স্থলপথে আক্রমণের আয়োজন হয়। এই বারের যুদ্ধের তুলনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের যুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয়। বলা বাহুল্য, তখনও ইংরাজ বণিক।

এখন ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বারীচ শান্তিসুপ্ত। তাহার ভগ্ন পুরপ্রাচীর হইতে শোণিতচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তদুপরি তৃণগুল্ম জন্মাইতেছে। কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ।

আশীর্ব্বাদ।

কৈশোর স্বপন ভঙ্গে নব লাজে অবনতা,
অয়ি পিতৃ-গৃহশোভা সুহৃদ্বারী বনলতা!
আজি এ সোণার সাঁঝে, সাজিয়া সোণার সাজে,
সংসার উদ্যান মাঝে এস, বালা, এস ধীরে,
বরষিতে শুভস্নিগ্ধ কল্যাণ-কিরণ শিরে!
সুকোমল কর ধরে, বেষ্টি নব দিয়তরে,
মঙ্গলের মহোৎসবে হও আজি অগ্রসর
নবীন জীবন পথে, সাথে চির-সহচর।
সব সাধ সব মতি রাখিও পতির প্রতি
পতিরূপে নারায়ণ নারী-লোকে দেন দেখা।
ডুবে গেলে পতি-প্রেমে তাঁর প্রেম হয় শেখা॥
রমণীর কর্ম্মব্রত, হোক্ না কঠিন যত,
পতিহিত মনে রাখি' পালন করিও সুখে,
ফলিবে সকল আশা পতির প্রফুল্ল মুখে!
স্নিগ্ধ প্রেমলতাগায়, প্রীতি-পুষ্প সুষমায়
ছাইয়া পতির বক্ষ, লভ তুমি অনুদিন
চির সুখ বসন্তের শ্রীসম্পদ অমলিন!

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

বর কুমার ব্রত।

এই ব্রত শনিবারে করিতে হয়। সন্তান-কামনায় রমণীগণ এই ব্রত করিয়া থাকেন। অপুত্রবতী পুত্র-কামনায় ও পুত্রবতী সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাঙ্গণে একটা স্থান বেশ পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সাদা ওঁড়া দিয়া 'বরকুমারের' মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হয়। একখানি কদলীর "আগপাতে" চিড়া, কলা, সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি নানা উপচারে বরকুমারের ভোগ ও আতপ চাউলের নৈবেদ্য দিতে হয়। পুরোহিত আসিয়া পূজা সমাপন করিলে ব্রত কথা বলিয়া ব্রত শেষ করিতে হয়। ব্রতিনীকে সেদিন ভোগের প্রসাদ খাইয়া দিন কাটাইতে হয়।

ব্রত কথা।

এক মস্ত বড় রাজা। তাহার সম্পত্তির বেশ দুপয়সা আয় ছিল; রাজার আজলা ধন দৌলৎ, উজীর নাজীর পাত্র মিত্র সব ছিল। ঘরে দাস দাসী ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, হাতিশালে হাতী ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল—ধনে মানে গুণে রাজার রাজপাট অটুট ছিল। তবে রাজা ও রাণী মরিলে বংশে বাতি দিতে তাঁহাদের কেউ ছিল না। রাজা ও রাণী ব্যতীত পরিবারে আর আপনার বলিতে একটি প্রাণীও ছিল না, এই ছিল তাঁদের দুঃখ। রাজা ও রাণী সেই জন্য বড়ই বিমর্ষ ছিলেন। কাহারো সঙ্গে বড় একটা আলাপ পরিচয় করিতেন না। লোকে তাঁহাদিগকে আঁটকুড়ো বলিয়া ডাকিত। এইরূপ দিন যায়; আসে, থাকে, যায়। একদিন ভোর বেলা বাড়ীর মালী আসিয়া বাড়ী ঝাড়ু দিতেছে এমন সময় রাজা দুয়ার খুলে ঘর হ'তে বাহির হলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মালী বলিতে লাগিল "হায় অদৃষ্ট, আজ না জানি কপালে কি আছে। এই আঁট্‌কুড়ো রাজার মুখ সকাল বেলায় দেখ্‌লাম।" কথাটা রাজার কাণে গেল। রাজা ক্ষোভে জ্বলে গেলেন। রাজা তখনই রাণীকে সব জানাইলেন। রাণী ক্ষোভে দুঃখে রাজাকে বলিলেন—"আর সংসারে থেকে কায নাই, চল আমরা বনে যাই; ছোট লোক ভুঁইমালী সেও বলে আঁটকুড়ো রাজা! এ পোড়া মুখ আর লোক-সমাজে দেখাব না।" যেই কথা

সেই কাষ। রাজা ও রাণী বনে যেতে—যেতে—লাগ্‌লেন; এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর এক রাজার দেশে গেলেন; প্রখর রৌদ্রের তাপে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এক কদম্ব গাছের তলায় শীতল ছায়ায় বস্‌লেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। ঝির ঝির করে বাতাস বইতেছে। পথশ্রমে রাণী বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাজার ক্রোড়ে হেলে পড়্‌লেন—তাঁহার ঘুমের আবেশ হইল। তিনি দেখ্‌লেন কদম গাছের উপর একটি সুন্দর যুবক—কি কমনীয় তার রং যেন স্বর্গীয় ভাবে চল চল করিতেছে—বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। রাণীকে দেখিয়া সে যুবকটির প্রাণে যেন বড় কষ্ট হ'ল। সে অমনি নেমে এসে বল্‌লে—"মা! তুমি বড় ঘরের মেয়ে, এমন বিমর্ষ কেন? তোমার যে অভাব আমি দূর করিয়া দেব। তুমি গৃহে যাও। গৃহে গিয়া ভক্তিভরে বরকুমার ব্রত কর, তোমার আঁটকুড়ো নাম ঘুচে যাবে।" সহসা রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি চকিতে চেয়ে দেখ্‌লেন। তিনি গাছের নীচে পতি-ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু সেই সুকুমার কে—যে তাঁকে এই অযাচিত ভাবে উপদেশ দিল? রাণী রাজাকে আনুপূর্ব্বিক সব বল্‌লেন। রাজাও একটু বিস্মিত হলেন। তখন উভয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হ'লেন। বাড়ী আসিয়া রাণী ব্রাহ্মণ ডাকাইলেন এবং যথারীতি ভক্তিভরে ব্রতের অনুষ্ঠান কর্‌লেন। এইরূপে প্রতি মাসে ব্রত কর্‌তে লাগিলেন। দিন যেতে লাগিল। কতদিন পরে রাণী গর্ভবতী হলেন—দেখতে দেখ্‌তে দশ মাস পূর্ণ হল। রাণী একটি সুন্দর ছেলে প্রসব কর্‌লেন। রাজা পুত্র মুখ দর্শনে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন। রাজ্যময় হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাদ্যকরের বাদ্যরোলে রাজ-বাড়ী মাতিয়ে তুলিল। চতুর্দ্দিকে আমোদ আহ্লাদের ঘটা পড়ে গেল। ভগবানের কি ইচ্ছা—এই আমোদ আহ্লাদের মধ্যে রাণী আর বর-কুমারের ব্রত করিবার অবকাশ পাইলেন না, সুতরাং ভুলিয়া গেলেন। ছেলে বাড়িতে লাগিল—ক্রমে ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। আমোদ চলিতে লাগিল। আজ এটা—কাল সেটা লেগেই আছে—আমোদের বিরাম নেই।

আজ অন্নপ্রাশনের দিন। সহসা রাজবাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। রাজকুমার ঢলিয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে আমোদ প্রমোদ থামিয়া গেল। কোথায় বাদ্যভাণ্ড—সব বিদায়! লোকজন সব পলাইল। রাজপুরী নীরব! রাজা অন্দরে; রাণী মূর্চ্ছিতা!

রাজা ছেলে হাঁড়িতে পুরিয়া কোদাল কাঁধে করিয়া ছেলেটিকে পুতিবার জন্য বাহির হইলেন। রাণীও কাঁদিতে কাঁদিতে পিছু পিছু ছুটিলেন। রাজা শ্মশানে আসিয়া গর্ত্ত করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাণী দেখেন, সেই সুন্দর যুবক আবার তাহার নিকট দাঁড়াইয়াছে। কোনও কথা কহিতেছে না। রাণী সাহসে ভর করিয়া ঐ যুবার পায় পড়িলেন। তখন সকলে অবাক্! একি, এই সুন্দর যুবক কে?

রাজা আনুপূর্ব্বিক যুবককে সমস্ত কথা বলিলে তখন যুবক বলিল—"তোমরা ছেলে পেয়ে আহ্লাদে বিভোর ছিলে এবং তোমার স্ত্রী বরকুমার ব্রত ছেড়ে দিয়েছেন। তিন মাস ব্রতের ধান ভিজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বিড়ালে মাছের কাঁটা ফেলিয়া রাখিয়াছে। সেই পাপে ছেলে মারা গিয়াছে। যদি ছেলে বাঁচাইতে ইচ্ছা থাকে তবে বাড়ী গিয়া সত্বর ধানগুলি গঙ্গাজলে ধুইয়া চিড়া তৈয়ার করিয়া বরকুমার ব্রত করিতে আপনার স্ত্রীকে বলুন।" এই বলিয়া যুবক অদৃশ্য হইল। রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। তখন রাণীর চৈতন্য হইল। তিনি যে ধান ভিজাইয়াছেন তাহাও স্মরণ হইল। তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী গিয়া তিনি ষোড়শ উপচারে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ব্রতের তুলসী দূর্ব্বা লইয়া সেই মৃত ছেলের গায়ে দিয়া সাতবার "জীয়ঃ, জীয়ঃ" বলিয়া ডাক দিলেন। অমনই ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। রাণী জীবনে আর ব্রত ভুলিলেন না।

এই ব্রত করিলে অপুত্রের পুত্র হয়; ছেলে মেয়ে সুস্থ হয়। ইহাই পুরনারীগণের ধারণা। ময়মনসিংহ জিলায় এই ব্রত প্রচলিত আছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অবহেলন।

সাগর বলিছে—"ওরে ক্ষুদ্র জলকণা,
তোর চেয়ে বড় মোর ছোট ছোট ফেনা।"
জলবিন্দু বলে,—"শুন যা' বলিছ ভাই,
আমারি সমাই কিন্তু জেনো তুমি, ভাই।"

শ্রীহরিপদ মজুমদার।

গ্রন্থ-পরিচয়।

সারস্বত কুঞ্জ।*

কেদার বাবুর ঐতিহাসিক খ্যাতিই বাঙ্গালী পাঠকের পরিচিত। তিনি যে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া যশস্বী হইবার উপযুক্ত তাহা অনেকে অবগত ছিলেন না। তাঁহার 'সারস্বত কুঞ্জ' পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে সেই সাহিত্যের, বিস্তৃত না হউক, মনোজ্ঞ বিবরণ উপহার দিতে পারেন। দিনেশ বাবুর পুস্তক বৃহৎ। বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ইতিহাস—সাহিত্যের প্রধান প্রধান স্তরের সাধারণ বিবরণ আদৃত হইবার সম্ভাবনা। দীনেশবাবু স্তরনির্ণয় ক্রিয়ার সকল ভাগ দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন; তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদনের ক্ষমতা সকলের নাও থাকিতে পারে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, সুখের বিষয়। আমাদের আশা আছে, কেদার বাবুও অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস উপহার দিবেন। তাঁহার 'সারস্বত কুঞ্জ' বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহাতে তিনি পুরাতন বাঙ্গালার যে সকল নমুনা দিয়াছেন, সেগুলি সাহিত্যের উন্নতির পথে চিহ্নরূপে পরিগণিত হইবে। সেইগুলিতে পুস্তকখানির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মরণ-রহস্য।*

এক কার্য্যে জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইয়া—অবকাশকালে অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল নহে। ঔপন্যাসিক স্কট স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস ও ঔপন্যাসিক ডিকেন্স ইংলণ্ডের ইতিহাস রচিত করিয়া

* সারস্বত কুঞ্জ—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ। মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

গিয়াছেন ; উভয় পুস্তকই উপাদেয়। উভয় পুস্তকই প্রতিভার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকপাতে মনোরম। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূল্য অধিক কি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রাদি গ্রন্থের মূল্য অধিক, ভবিষ্যতে ঐতিহাসিককে তাহার বিচার করিতে হইবে। নিখিলবাবু বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এবার তিনি মরণ-রহস্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তিনি এই পুস্তকে মৃত্যুর মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন—মরিতে ভয় হয় না, আনন্দ হয়। কারণ, মরণ আমাদের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করে না—মুক্ত করে।

ভারতবাসী মরিতে ভয় পায়—এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া নিখিলবাবু বলিয়াছেন,—"একদিন ভারতবর্ষে সকলেই এই মরণ-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাই ভারতে মরণের ভয় ছিল না।" বাস্তবিক ভারতবাসী মৃত্যুকে যেরূপ অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল, এমন আর কেহই শিখে নাই। স্বামীর শবের সহিত পত্নীর চিতারোহণ আর কোন দেশে সম্ভব হইত কি ? ভারতে গৃহী মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি করিলে সজ্ঞানে দেবতার নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে "গঙ্গা-যাত্রা" করিত। গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

যে দার্শনিক আত্মদর্শনের ফলে—যে তত্ত্বজ্ঞানুশীলনহেতু ভারতবাসী বুঝিয়াছিল—

"Thine are these orbs of light and shade ;
Thou madest Life in man and brute ;
Thou madest Death ; and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made"

—এই গ্রন্থে নিখিলবাবু সেই আত্মদর্শন সেই তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

---

* মরণ-রহস্য—শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা, ২৮।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ইষ্টারন্যাশনাল পব্লিশিং কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৷৹ আনা।

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার।

প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা।

বহুদিন হইল 'বঙ্গদর্শনে' ও বিশ্বকোষ অভিধানে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকবর্দ্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কএকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকায়, তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের বৈদ্যকাণ্ডে তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে তাহারই সারসংগ্রহ প্রদত্ত হইল।*

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ আলেক্সান্দরের সমসাময়িক যে প্রাচ্যভূপতি চন্দ্রমসের Xandrames পরিচয় দিয়াছেন, কেহ কেহ তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ৯ জন নন্দ রাজত্ব করেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে যেরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, তাহার কোথাও শেষ নন্দকে নাপিতপুত্র বলা হয় নাই। বরং 'মুদ্রারাক্ষসের' টীকাকার ঢুণ্ঢিরাজ শেষ নন্দকে শেষ ক্ষত্রিয়নৃপতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং Xandrames নামদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দরাজকে বুঝাইতে পারে না। এদিকে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ Sandrocottus (চন্দ্রগুপ্ত)এর যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থবর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের নানা আখ্যায়িকার মধ্যে কাহারও সহিত তাহার মিল নাই। এমন কি চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায় চাণক্যের নাম বা তাঁহার আভাস পর্য্যন্ত কেহ দিয়া যান নাই, এরূপস্থলেও গ্রীকবর্ণিত সান্দ্রোকোত্তস্‌কে আমরা প্রথম মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

তবে আলেক্সান্দরের সমসাময়িক উক্ত সান্দ্রোকোত্তস্ কে?

সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ অশোকাবদানে বিবৃত হইয়াছে,—

"চম্পা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। এক দৈবজ্ঞ সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই কুমারী রাজরাণী ও রাজমাতা হইবে। ধনের লোভ বড় লোভ। ব্রাহ্মণ লোভে পড়িলেন, কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া পাটলিপুত্রে আসিলেন এবং রাজা বিন্দুসারকে প্রদান করিলেন। বিন্দুসার ব্রাহ্মণকন্যাকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পুরমহিলাগণ সেই রূপসীকে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈদ্যকাণ্ড ১ম ভাগ যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

দেখিয়া ভাবিলেন, এরূপ সুন্দরীকে পাইলে আর কি রাজা আমাদিগকে চাহিবেন? সকলে পরামর্শ করিয়া সেই ব্রাহ্মণবালাকে নাপিতানী করিয়া রাখিলেন ও তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুদিন যায়, সেই ব্রাহ্মণকন্যা রাজা বিন্দুসারের দাড়ি চুল কামাইতে থাকেন। এক দিন রাজা অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি তোমার বড় উপর প্রীত হইয়াছি, তুমি কি চাহ, বল। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।' তখন ব্রাহ্মণবালা মুখ হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি আপনাকে চাই।' রাজা কহিলেন, 'সে কি, আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, আর তুমি নাপিতানী, তোমাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিব?' ব্রাহ্মণকুমারী কহিলেন, 'আমি নাপিতানী নহি। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার পত্নী হইবার জন্যই পিতা দিয়া গিয়াছেন। পুরমহিলারাই আমাকে এ কায শিখাইয়াছে।' তখন রাজা ব্রাহ্মণকন্যার কামনা পূর্ণ করিলেন। এখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাই পাটেশ্বরী হইলেন। তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মিল—১ম অশোক, ২য় বিগতশোক বা বীতশোক।

"অশোকের পূর্ব্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অশোকের আচরণে বিন্দুসার তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তক্ষশিলানগরবাসীরা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, বিন্দুসার সেইস্থানেই অশোককে বিসর্জ্জন করেন। পথে অশোক বহু দলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন। নগরবাসিগণ তাঁহার সাজসজ্জা দেখিয়া বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল।

"এদিকে বিন্দুসারের প্রধান মন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকেই তক্ষশিলায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই রাজধানীতে আনাইয়া রাখিলেন।

"বিন্দুসারের আয়ু শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সম্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত সুসীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিন্দুসার বড়ই কষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতিবিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত বাহির হইয়া প্রাণবায়ু চলিয়া গেল।

"এখন অশোক সম্রাট্‌রূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসিলেন। রাধগুপ্ত

তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তক্ষশিলায় সংবাদ গেল। সুসীম শুনিলেন, পিতা মরিয়াছেন এবং অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকৃত করিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সসৈন্যে পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অশোকও প্রস্তুত ছিলেন। নগরের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে এক একজন নর, তৃতীয় দ্বারে রাধগুপ্ত, চতুর্থ দ্বারে স্বয়ং অশোক উপস্থিত রহিলেন। দ্বারের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া খদির ও অঙ্গার পূরিয়া তদুপরি এক অশোকমূর্ত্তি রক্ষিত হইল।

"সুসীম অশোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই অঙ্গারপূর্ণ পরিখায় পতিত হইলেন। এই সঙ্গে সুসীমের লীলাখেলা শেষ হইল।"

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের বাল্যজীবন পাঠ করিলে সহজেই মনে হইবে যে, তিনি যৌবনারম্ভে উদ্ধত-স্বভাবহেতু সুদূর পঞ্জাবসীমান্ত তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনিই সেই সময়ে আলেক্সান্দরের শিবিরে সাহায্যলাভার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আলেক্সান্দর সেই উদ্ধত যুবকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আলেক্সান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে অশোক পঞ্জাবের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্সান্দরের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র দেশীয় সামন্তরাজগণ গ্রীকদিগকে ভারত হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে তক্ষশিলারাজের মৃত্যু হয় এবং অশোক বহু দলবলসংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলা অধিকৃত করেন। অল্পকাল মধ্যেই সম্রাট্ বিন্দুসারের পীড়ার সংবাদ পঞ্চনদে পৌঁছিল। অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকৃত করিবার জন্য সসৈন্যে পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহার প্রভাবের ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুসীমকে রাজধানী হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিলেন, তাই বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক সহজে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকৃত করিয়াছিলেন। এই অশোকই নানা শিলানুশাসনে প্রিয়দর্শী নামে ও গ্রীকদিগের গ্রন্থে Sandrocottus (চন্দ্রগুপ্ত) নামে পরিচিত হইয়াছেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারত ছাড়িয়া গ্রীক বীরগণ যখন গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, সেই সুযোগে তিনি দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারতপ্রান্ত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও সমগ্র পঞ্জাব অধিকৃত করেন। অল্পদিন মধ্যেই নিজ সৌর্য্যবীর্য্য ও সহায়সম্পত্তিতে

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই সেলিউকস্ পুনরায় যবন (গ্রীক্)-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পঞ্জাবে আসেন। কিন্তু তিনি মহাবল অশোকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ অশোক যবনরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং যবনরাজের মর্য্যাদাস্বরূপ ৫০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সেলিউকস্ পাটলিপুত্রের সভায় মেগেস্থেনিস্‌কে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। সেই যবনদূত পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ যে মৌর্য্যসম্রাটের বিরুদ বা উপনাম 'পাটলিপুত্রক' ও একটি নাম 'চন্দ্রগুপ্তক।' * কেবল অশোক বলিয়া নহে, যিনি মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট্‌গণের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত এবং পৌত্রের নাম বা বিরুদ চন্দ্রগুপ্ত এরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান। মৌর্য্যসম্রাট্ ১ম

* "The king, in addition to his family name, must adopt the surname of Palibothros. Sandrokottos, for instance, did, to whom Megasthenes was sent upon embassy."

Mc Crindle's Ancient India as described by Megasthenes, p. 67.

যেমন অশোক-চন্দ্রগুপ্ত নিজ রাজধানী 'পাটলিপুত্র' নামেও অভিহিত হইতেন, সেইরূপ আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক বহু নৃপতিকে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজধানীর নামানুসারেই প্রথিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে তক্ষশিলা (Taxilus) ও পুরুষ (Porus) নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ উক্ত উভয়কেই মূল নাম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত দুইটি নামই স্থানবাচক ও সেই স্থানের রাজার বিরুদ বা উপনাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তক্ষশিলা রাজধানীর বর্ত্তমান অবস্থান শাহ্‌ধেরী। (Cunningham's Ancient Geography of India, pp. 104.) চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও য়ুয়ন্-চুয়ঙ্গ্ এস্থানে প্রভূত বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া গিয়াছেন। (Watters On Yuan-Chuang, Vol. I. p. 241-248)। উক্ত উভয় চীনপরিব্রাজকই পুরুষরাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই স্থান পুরুষক বা পরুষক নামে বিবৃত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়ঙ্গ্ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দিতে এই পুরুষ রাজ্যের রাজধানী "পুরুষপুরে" আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে মুসলমান ঐতিহাসিক অল-বেরুণি "পুরুষাবর" ও পরবর্ত্তী মুসলমান লেখকগণ "পরিষাবর" নামে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানই এক্ষণে 'পেশাবর বা পেশোয়ার নামে প্রসিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক পুরুষ (Porus) রাজাকে ভ্রমক্রমে সাধারণে 'পুরুরাজ' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত বৈন্যকন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অগ্নিসম তেজস্বী চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা বিবাহ করিয়াছেন, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ কোন আভাস নাই, তাঁহার সহিত যবন সম্বন্ধ থাকিলে কোন না কোন ভারতীয় প্রাচীন লেখক অবশ্যই তাহা প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু সম্রাট্ অশোক যে যবনরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যে সুপ্রাচীন শিলাফলকে মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্তের বৈন্যস্থালক পুষ্যগুপ্তের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই লিপি-মধ্যেই সম্রাট্ অশোকের শ্যালক যবনরাজ তুষাস্পের নামোল্লেখও রহিয়াছে। † হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে অশোক নাম থাকিলেও যেমন ভারতের সকল প্রধান জনপদ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার প্রসিদ্ধ অনুশাসনসমূহে তাঁহার 'অশোক' নাম পর্য্যন্ত আদৌ প্রকাশ নাই, ঐ সকল শিলালিপিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার একমাত্র 'প্রিয়দর্শী' নামে তিনি নিজে পরিচিত হইয়াছেন, অথচ অধিকাংশ প্রাচীনগ্রন্থে তাঁহার এই প্রিয়দর্শী নামটি পাওয়া যাইতেছে না, সেইরূপ এদেশের কোন প্রাচীন লিপি বা গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধ বা নাম 'চন্দ্রগুপ্ত' বা 'পাটলিপুত্রক' অধুনা দৃষ্ট না হইলেও তাঁহার সভাস্থ যবনদূত মৌর্য্যবংশের সর্ব্বজনপ্রিয় 'চন্দ্রগুপ্ত' নামটিই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং পরবর্ত্তী গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, অশোক রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত 'চন্দ্রগুপ্ত' নামও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বহুপরবর্ত্তী লেখক বিশাখদত্ত ১ম চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া থাকিবেন, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে। অশোক সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তিনি নাপিতানী-কার্য্যনিপুণা (দাসীর, পরে) রাণীর গর্ভজাত, প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন,—সুতরাং হিন্দু গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে তিনি অবৈধ-সন্তান 'বৃষল' বলিয়া অভিহিত! তাই মুদ্রারাক্ষসকার এই অশোকরূপী চন্দ্রগুপ্তকে দাসীপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশের সহিত নন্দবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। নন্দবংশ আদিতে ক্ষত্রিয়, * কিন্তু মৌর্য্যবংশ আদিতে বৈশ্য।

অশোক-চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদ অধিকৃত করিয়া শক-যবন-কাম্বোজাদি সীমান্ত

† "মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রিয়েণ বৈন্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তেন যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতং"। Indian Antiquary, (Vol. VII. p. 260.)

* "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলমিতি পৌরাণশাসনাৎ"। চুণ্ডিরাজকৃত মুদ্রারাক্ষসটীকা।

প্রদেশবাসী † বীরগণকে সঙ্গে লইয়া পিতার জীবদ্দশায় পাটলিপুত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন, সেই সময়ে মৌর্য্যমন্ত্রী খল্লাটক তাঁহাকে সাহায্য করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন এবং মনে হয় যে, উভয়ের কূট নীতিবলে বিন্দুসার 'মুক্ত বমন করিয়া'ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। সেই ঘটনাই পরবর্ত্তীকালে রূপান্তরিত হইয়া মুদ্রারাক্ষসনাটকে চাণক্য ও ১ম চন্দ্রগুপ্তের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকিবে। পরে যখন বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য কুলূত, কাশ্মীর ও পারসিক প্রভৃতি সীমান্ত রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কুসুমপুরের উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে অশোক-চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া কূটনীতি-অবলম্বন করেন।‡ অশোকাবদান হইতে তাহার আভাস দিয়াছি। অশোকের অনুশাসন ও মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজ্যলাভের পর চারি বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। অধিক সম্ভব, এ চারি বর্ষ তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, মুদ্রারাক্ষসকার সেই দূরপ্রসৃত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। গৃহশত্রু ও বাহ্যশত্রু সকল সমূলে বিনষ্ট ও সিংহাসন নিরাপদ করিয়া ৫ম বর্ষে অশোক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং সেই অভিষেক বর্ষ হইতে তাঁহার রাজাঙ্ক গণিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সুপ্রাচীন বহু জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সবিস্তার পরিচয় থাকিলেও কোথাও তিনি 'বৃষল' বা 'শূদ্র'বলিয়া পরিচিত হন নাই। এমন কি তাঁহার জন্য চাণক্য যে 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন, তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের বৃষলত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না, বরং চাণক্য তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কখনই 'বৃষল' বলিয়া গণ্য করা যায় না। অশোকের প্রতিলোমক্রমে নাপিতানীরূপিণী

---

† "অস্তি তাষদ্ভূকযবনকিরাতকাম্বোজপারসীকবাহ্লীকপ্রভৃতিভিশ্চাণক্যানতিপরিগৃহীতৈশ্চন্দ্রগুপ্তপর্ব্বতেশ্বরবলৈরুদধিভিরিব প্রলয়োচ্ছলিতসলিলৈঃ সমন্তাদুপরুদ্ধং কুসুমপুরম্"।

মুদ্রারাক্ষস ২য় অঙ্ক।

‡ "কৌলূতশ্চিত্রবর্ম্মা মলয়নরপতিঃ সিংহনাদো নৃসিংহঃ
কাম্বরঃ পুষ্করাক্ষঃ কতরিপুবহিনা সৈন্ধবঃ সিন্ধুষেণঃ।
মেঘাখ্যঃ পঞ্চমোঽস্মিন্ পৃথুতুরগবলঃ পারসীকাধিরাজো
যামাস্তেষাং নিধাসি ধ্রুবমহমধুনা চিত্রগুপ্তঃ প্রমাষ্টি"। ২০।

(মুদ্রারাক্ষস ১ম অঙ্ক)

দাসী গর্ভে জন্ম, পিতৃবৈরিতা ও তাঁহার যবনসম্বন্ধহেতু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'বৃষল' বলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি নাপিতানীর গর্ভজাত এই প্রচলিত কিম্বদন্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার পিতার স্কন্ধে আরোপিত করিয়া Chandromesকে নাপিতপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এখানে আর এক আপত্তি উঠিতে পারে, সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনে অন্তিওক, অন্তিকিনি, মক, তুরময় ও অলিকসুদর এই কয় জন গ্রীক নরপতির নামোল্লেখ আছে। অধ্যাপক লাসেন গ্রীক ইতিহাস হইতে উক্ত পঞ্চ নৃপতির এইরূপ সম্বন্ধ ও কাল নিরূপণ করিয়াছেন—

অন্তিওক = Antiochus Theos, সিরীয়রাজ Antiochus Soter এর পুত্র রাজ্যকাল ২৬১-২৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

তুরময় = Ptolemy Philadelphus ইজিপ্টের রাজা (ঐ ২৮৫-২৪৭ ঐ)

অন্তিকিনি = Antigonus Gonatus, মকিদনের রাজা (২৭৮-২৪২ঐ)

মগ = Magas of Cyrene, টলেমি ফিলদেলফাসের বৈমাত্রেয়ভ্রাতা, ২৫৮ খৃঃ পূঃ মৃত্যু।

অলিকসুদর = Alexander, এপিরাসরাজ, রাজ্যকাল ২৬২-২৫৮ খৃঃ পূঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—পাঁচজন নৃপতি ২৬০ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক সেনার্ট প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ অঙ্কে* যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন ঐ পাঁচজনের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ লিপিখানিও ২৬০-২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপস্থলে ২৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাহার চারিবর্ষ পূর্ব্বে ২৭৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্যলাভ ঘটে।" এই মতটি সকল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলি চরিতের প্রমাণ অনুসারে ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ১ম মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক, কিন্তু পরবর্ত্তী মত স্বীকার করিলে চন্দ্রগুপ্তের এক শত বর্ষ পরে অশোকের রাজ্যলাভ ধরিতে হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের ১০০ বর্ষ পরে তৎপৌত্র অশোকের রাজ্যলাভ সম্ভবপর বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। মহাবংশে লিখিত আছে বুদ্ধনির্ব্বাণের (৪৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের) ২১৮ বর্ষ পরে অশোকের রাজ্যলাভ ঘটে। এদিকে ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত

* কিন্তু মূল অনুশাসনে এরূপ অঙ্কনির্দ্দেশ নাই।

২৪ বর্ষ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া উভয়ের রাজ্যকাল মোটামুটি ৪৮ বর্ষ এবং ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের সময় অশোকের রাজ্যারম্ভ ধরিতে হয়; এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ সময়ের পরে অর্থাৎ অশোকের রাজ্য সময়ে উক্ত নামধেয় পঞ্চ যবন নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন কি না?

দিগ্বিজয়ী মকিদোনবীর আলেক্‌সান্দরের সমকালীন ও তাঁহার দেহাত্যয়ের পরবর্ত্তী কালের গ্রীক্ ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অশোকের অনুশাসনে যে পঞ্চ যবন নাম গৃহীত হইয়াছে, মকিদোন, ইজিপ্ট সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে সেই সেই নামে একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিতেন। এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতের উপর নির্ভর না করিয়া ঠিক সেই সময়ে তত্তৎ নামে পরিচিত পঞ্চ যবনরাজের অস্তিত্ব পাইতে পারি কি না?

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে সাধারণতঃ রাজন্যবর্গ স্ব স্ব জনপদ বা রাজধানীর নামেই পরিচিত ছিলেন, তক্ষশিলারাজ ও পুরুষরাজ নামদ্বয় দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। মগধাধিপ (অশোক) চন্দ্রগুপ্ত নিজ রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে 'পাটলিপুত্রক' নামেও পরিচিত ছিলেন, সে কথাও মেগেস্থেনিসের বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সম্রাট্ অশোকের (শাহবাজগড়ীর) ১৩শ শিলানুশাসনেও ভারতীয় বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গে তাঁহাদের স্ব স্ব জনপদনামই উক্ত হইয়াছে, এ অবস্থায় তাঁহার উক্ত ১৩শ অনুশাসনে যে পঞ্চ যোন বা যবনরাজের উল্লেখ আছে, তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানী নামেই মৌর্য্যসম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, বলিয়া মনে করি। এখন দেখা যাউক, উক্ত পঞ্চ রাজধানী কোথায়?

আলেক্‌সান্দরের মৃত্যু ও তাঁহার উপার্জ্জিত সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইলে ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার সেনাপতিগণ যেস্থানে যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা রাজোপাধিগ্রহণ করেন। এই সময়ে অন্তিগোনস্ (Antigonus) এসিয়া-মাইনরে নিজনামে 'অন্তিগোনীয়' (Antigonia), তলেমি (Ptolemy) মধ্যইজিপ্টে 'তোলময় হর্ম্ম' (Ptolemais Hermii) এবং তাহার কএকবর্ষ পরে সেলিউকস্ সিরীয়ায় নিজ পিতৃনামে 'অন্তিওক' (Antioch) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মকিদোন (Makedon) নামক গ্রীসের প্রাচীন নগরীতে কাসন্দর (Cassander) ও আলেক্‌সান্দরের প্রতিষ্ঠিত মিসরের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র আলেক্‌সান্দরীয় (Alexandria)

নানক স্থানে তলেমি আধিপত্য করিতেছিলেন। বাস্তবিক ৩১৭ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক (যবন)-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে, তৎকালে ইজিপ্ট, গ্রীস ও এসিয়াস্থ গ্রীক্ অধিকারে আলেক্সান্দরের সেনাপতি-গণের মধ্যে পরস্পর প্রাধান্য লইয়া ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল স্থানের নিকট উক্ত সময়মধ্যে কোন যবনপতি স্থায়ী বা নিরাপদভাবে আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ কোন দূরদেশে সংবাদ পাঠাইতে হইলে সাধারণতঃ "অমুক দেশের রাজার কাছে" বা কেবল অমুক দেশে লোক পাঠান হইল, এইরূপ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সম্রাট্ অশোকও তাঁহার উক্ত অনুশাসনে সেইরূপ চোল, পাণ্ড্য, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের বিশ্বাস, অনুশাসনে যে অন্তিওক (Antioch), অন্তিকিনি (Antigonia), তুরময় (Ptolemais), মক (Makedon), ও অলিকসুন্দর (Alexandria) এই পঞ্চ নামের উল্লেখ আছে, এ গুলি গ্রীক ঐতিহাসিকবর্ণিত তক্ষশিলা

* অন্তিওক, অন্তিকিনি, তুরময়, মক ও অলিকসুন্দর এই পাঁচটিকে যদি প্রকৃত ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আমাদের উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ, আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থানুসারে অশোকের যে কাল পাইতেছি, অর্থাৎ ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ মধ্যেই উক্ত নামে পঞ্চ যবনরাজের নাম পাইতেছি। যথা—

১ম—অন্তিওক (Antiochus) সেলিউকসের পিতা, ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। তাঁহারই নামানুসারে তৎপুত্র সেলিউকস্ অন্তিওক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই অন্তিওকের সমৃদ্ধির সহিত অন্তিকিনির গৌরব নষ্ট হয়। (Encyclo. Britannica, Vol. II. p. 131.)

২য়—অন্তিকিনি (Antigonus) সেলিউকস্ ইঁহাকে পরাজয় করিয়া ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার রাজধানী অন্তিগোনীয় অধিকার করেন।

৩য়—তুরময় (Ptolemy Soter) আলেকসান্দরের একজন প্রধান সেনাপতি, আলেক্-সান্দরের মৃত্যুর পর ইহারই অংশে ইজিপ্ট, লিবিয় ও আরবের কতকাংশ পড়িয়াছিল। ইজিপ্টের দক্ষিণ ও আরবশাসনের সুবিধার জন্য ইনি থেবইস্ প্রদেশে তুরময় (Ptolemais) নামে রাজধানী স্থাপিত করেন। এ সময়ে উত্তর ইজিপ্টে আলেক্সান্দ্রিয়াও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল।

৪র্থ—মক (Magus of Cyrene) রাজ্যকাল ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত।

৫ম—অলিকসুন্দর (Alexander of Epirus) ওলিম্পিয়ার ভ্রাতা, আলেক্সান্দরের মাতুল। রাজ্যকাল ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৩১৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

(Taxilus) ও পুরুষ (Porus) প্রভৃতি শব্দের ন্যায় জনপদ ও তজ্জনপদের অধিপতি-জ্ঞাপক।

অশোকের অনুশাসনে যে অন্তিওকরাজের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে, তাঁহাকেই আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অন্তিওক-পতি সেলিউকস নিকেটর বলিয়া মনে করি। তিনি আপনাকে সমস্ত এসিয়ার সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সিরীয়াস্থ অন্তিওক নগরেই তাঁহার এসিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি অশোকের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া অশোকের অনুশাসনে যবনরাজগণের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

গিরনারের গিরিলিপিতে অশোকমৌর্য্যের শ্যালকের 'তুষাস্প' নাম দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পারসিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তখনকার গ্রীকগণের পরিচয় আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, আলেকসান্দরের ন্যায় তাঁহার সেনানীবৃন্দও পারসিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যবনসেনাপতির ঔরসে ঐরূপ কোন পারসিক মহিলার গর্ভে যবনরাজ তুষাস্পের জন্ম। সেলিউকসের উপার্জ্জিত এসিয়াস্থ গ্রীকসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে কোন কোন গ্রীক রাজকুমার ভারতে আসিয়া সম্রাট্ অশোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যবনরাজ তুষাস্প তন্মধ্যে একজন। অশোকের অনুগ্রহে তিনি সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ-পদ লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মৌর্য্যাধিপ ১ম চন্দ্রগুপ্ত, এবং তৎপৌত্র অশোক বা ২য় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ঘটনাবলি আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি যে, জৈনশাস্ত্রমতে ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক এবং সিংহলের পালি-মহাবংশ-মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে* অর্থাৎ ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। অধিক সম্ভব, আলেকসান্দরের ভারত পরিত্যাগ করিবার পরই অশোক পঞ্জাবের কোন পার্ব্বত্যজনপদ অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। তৎপরবর্ষে পঞ্জাবে মকিদোনবীরের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিবামাত্র যখন গ্রীকসেনাপতিগণ স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সুযোগে অশোক জাতীয় বিজয়কেতন উড়াইয়া দেশীয় সামন্তবর্গের সাহায্যে সমগ্র পঞ্চনদ অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিপুল শক্তির সাহায্যেই তিনি পাটলীপুত্রের

* Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, or 1909, p. 27

সিংহাসন অধিকারে সফলতালাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অশোকের ৩৭ বর্ষ মাত্র রাজ্যকাল অবধারণ করিয়াছেন। এরূপস্থলে ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান স্বীকার করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, অশোকের বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবর্ণগিরি হইতে বৃদ্ধ বৌদ্ধরূপে তাঁহার যে অনুশাসন লিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এই অঙ্ককে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ † ও তাঁহার রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধরিয়া লইলেও তাঁহার রাজ্যকাল ৩৭ বর্ষই হয়। এস্থানেও আমরা ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার 'বিবাস' বা সংসারত্যাগেরই আভাস পাইতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

† প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্মিটও সম্প্রতি ২৭৩ অঙ্ককে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ ও উক্ত লিপিকে অশোকের রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী লিপি বলিয়াই প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। (Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 130) সিংহল ও শ্যামের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে ৪৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ-অব্দ আরব্ধ। মোক্ষমূলরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহা হইতে আরও ৮৬ বর্ষ বাদ দিয়া ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ স্থির করিয়াছেন। এদিকে সকলেই বলিতেছেন যে, শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ সমসাময়িক, সুপ্রাচীন বহু বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায় বহুকাল হইতে যখন একবাক্যে ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীরের মোক্ষাব্দ ধরিয়া আসিতেছেন, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটি প্রধান বৌদ্ধ জনপদে বহুকাল হইতেই (উক্ত বর্ষের ১৩ বর্ষ পরে অর্থাৎ) ৪৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দকে আমরা নির্ব্বাণাব্দ বলা সমীচীন মনে করি না। নির্ব্বাণাব্দকে ৮৬ বর্ষ পরবর্ত্তী স্বীকার করিয়া লইলে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজ্যকাল সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে যে অঙ্ক ধরা হইয়াছে, তাহার সহিত কিছুই সামঞ্জস্য থাকে না এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক সম্বন্ধে যে অভিনব কালনির্ণয় করিতেছেন, তাহার সহিত অসামঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে। এ কারণ সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতই গৃহীত হইল।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

—:০:—

(৩)

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আজ প্রথমেই বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলাম, "দেখুন তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের উদারতা দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগর ত দয়ার সাগর বটেই; কিন্তু তাঁহার intellect এর দিক হইতে তিনি আপনার নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, আজ সেই কথা আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তাঁহার সাধারণ কথা—বার্ত্তা কিরূপ ছিল?"

তিনি বলিলেন—"কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ডাঃ জন্‌সন্ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে; যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথার ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—; 'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া' (to be confounded) 'দহরম মহরম,' 'বনিবনাও' 'বিদ্‌ঘুটে' 'বাহবা লওয়া'—এই সকলের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত,—যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি এই বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও

সেই অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন ; অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি 'সমারোহ' ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—ও কথায় ও অর্থ হইতেই পারে না ; উহা একেবারে ভুল।

"একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপ যোগ্যতা।' এই শব্দটি ন্যায়-শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পরিভাষিক শব্দ ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness *per se*। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই ; —একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমরা এক দেশের লোক, এক জাত, এই সহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা কর্‌লেই পারতেন। সাহেবরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি ; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।'—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যাবেন নাই।

"আজ কাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন এক এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—'এ দিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্ছে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে নীলাম্বরের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই হিন্দুস্থানী পণ্ডিতটির কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

"তিনি বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লিখা অসম্ভব, যাহা লিখা যায় সবই গোঁজামিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—; তিনি 'উত্তরচরিত,' 'শকুন্তলা' ও 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন। তাহা অতি সুন্দর, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হয়।

"একদিন কালিদাস ও সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও

অপেক্ষা হীন এ কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেম বাবুর 'ভারতের কালীদাস জগতের তুমি' এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'হেম বাবুর এ কথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না।' আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে, হেম বাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ব্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই শাস্ত্রচর্চ্চায়ও উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে।—কথাটা তাঁর মনে লাগিল। তিনি আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—'বটেই ত, খেতে, বস্‌তে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।'

"বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা-সাহিত্য-গঠনে কিপ্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎসংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে; নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা—যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের,—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের, এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত, তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন; একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

"শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; ল্যাটিন ও গ্রীক্ জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ' কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—'অষ্টাদশভাষা-বারবিলাসিনী-ভুজঙ্গঃ' (the fancyman of eighteen courtezans of languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিক লাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় এক খানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম।

শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না। ইহার পরে Hindu Law সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য হাইকোর্টের জজরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জ্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন। Encyclopaediaতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাশাপাশি লিখিয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না; কেবল বলিতেন—'লোকটার রকম দেখেছ? কথায় কথায় ভট্টি Quote করে'

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন—'ও ইংরাজী বেশ লেখে। কিন্তু সাহেবদের কাছে ইংরাজী লেখার সুখ্যাতি শুনে ও তাদের বলে—ইংরাজী আমি কিছুই জানি না, আমি সংস্কৃতই খুব ভাল জানি।' রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থসংগ্রহ' কোথায় ভাসিয়া গেল!

"ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর ইংরাজী লেখাপড়া জানা লোককে পণ্ডিত বলিয়া মোটেই স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। ইহারা যে ভাল বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনে সহায়তা করিতে পারেন এ ধারণা তাঁহার ছিল না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত; কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখ্‌তে টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে—সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের Style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চা করিলেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তার' প্রণেতা, তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন শিশু

না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে? তিনি 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

"কুক্ষণে মদনমোহন বীটন সাহেবের মেয়ে স্কুলে (Bethune College) নিজের মেয়েকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে মেয়ে এই প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হইল দেখিয়া সাহেবরা অত্যন্ত খুসী হইল; মদনমোহন স্কুল ছাড়িয়া 'জজের পণ্ডিত' হইলেন, মাসিক বেতন দেড়শত টাকা। তখনকার এই 'জজের পণ্ডিত' একজন Law officer, জজদিগকে Hindu Law ব্যাখ্যা করিয়া দিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। কিছু কাল পরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর তাঁহার অনুরাগ রহিল না।

"বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ রহিল। দুজনে একসঙ্গে ছাপাখানা করিয়াছিলেন; ডেপুটি হইবার পর আর তাঁহাদের সাহিত্যক্ষেত্রে মিলিত হইবার অবসর হয় নাই।

"মদনমোহন প্রবাস হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিলে সংস্কৃত কলেজে বেড়াইতে আসিতেন। বহরমপুর হইতে আসিয়া একদিন তিনি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তর্কবাগীশ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও দেশ কেমন?' মদনমোহন উত্তর করিলেন 'শাঠ্য, কাপট্য, লাম্পট্য ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটিমাত্র নাই।'

"বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল; সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।

এই সময়ে তারাশঙ্কর 'কাদম্বরীর' বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া, এবং হরিনাথ শর্ম্মা 'মুদ্রারাক্ষসের' ও 'রত্নাবলীর' বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বিচিত্র পিতৃকুলানুরাগ।

—:০:—

নারীজাতি স্বভাবতঃ পিতৃকুলের প্রতিই সমধিক আসক্তিসম্পন্না। পতিপুত্রাদির শ্রীবৃদ্ধি-দর্শনে তাঁহাদিগের মনে প্রীতির সঞ্চার হয় সত্য; কিন্তু তাঁহারা পতিকুল অপেক্ষাও পিতৃকুলের অনুরাগিণী—শ্বশুর ও স্বামী প্রভৃতি হইতে পিতা, পিতামহাদির গৌরবেই অধিকতর গরবিণী। পতিকুলের নিন্দার কথা বরং কোনও প্রকারে তাঁহাদিগের সহনীয় হইতে পারে, কিন্তু পিতৃকুলের নিন্দাবাদ একেবারেই অসহ্য। রাজপুত রমণীর নিকট পিতৃকুলনিন্দকের ক্ষমা নাই; শ্বশুর কি স্বামী হইলেও, তাঁহার নিগ্রহ কি দণ্ডভোগ অনিবার্য্য। এই অনন্যসাধারণ পিতৃকুলানুরাগ বশতঃ রাজপুত জাতির মধ্যে কত যে শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমরা এই প্রবন্ধে জনৈকা রাজপুত রাজ্ঞীর বিচিত্র পিতৃকুলানুরক্তির ও তাহার ভীষণ পরিণাম-কাহিনীর আলোচনা করিব।

একসময়ে একজন পরমার বংশীয় রাজপুত, মিবার রাণার আশ্রয়ে, ভঁইসরোর প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। তিনি তাঁহার প্রতিবাসী মেঘাবত-বংশ-সম্ভূত বেই ও সামন্তের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তদীয় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ, আলোকের পর আঁধারের ন্যায়, বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয়, অখণ্ডনীয় বিধান। আজীবন অবিচ্ছিন্ন সুখভোগের অধিকারী থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। পরমার সামন্তের ভাগ্যও সুতরাং অধিক দিন প্রসন্ন রহিল না। অকস্মাৎ তাঁহার সুখের সাগরে দুঃখের তুফান উঠিল—মিলনের অমল আকাশে বিচ্ছেদের কাল মেঘ দেখা দিল।

একদা 'পচিশী'-ক্রীড়া উপলক্ষে, রাণীর সহিত সামন্তরাজের তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল এবং সেই তর্ক বিতর্ক ক্রমে বচসায় ও পরিশেষে বিষম বিবাদে পরিণত হইয়া পড়িল। পরমারপতি ক্রোধ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া মেঘাবত-নন্দিনীর পিতৃবংশের নিন্দা করিলেন—তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদির উদ্দেশ্যে গ্লানিসূচক বাক্য উচ্চারণ করিলেন। সামন্ত-পত্নী এতক্ষণ স্বামীর কঠোর বাক্য

সঙ্কুচিতে ছিলেন—যথাসম্ভব তাঁহার তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু পিতৃকুলের নিন্দা শ্রবণে তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইল। সহসা তাঁহার নয়নযুগল ওড়কলিকার ন্যায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল এবং সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তিনি নারীসুলভ সহিষ্ণুতা পরিহার করিলেন না। বিজাতীয় ক্রোধে ও নিদারুণ প্রতিহিংসানলে দেহ মন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেও তিনি বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তিনি বহুকষ্টে উত্থিত হৃদয়বেগ দমন করিয়া, ত্বরিতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সীমন্তভামিনী স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং স্বামীর তথাবিধ দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য উপায়-উদ্ভাবনে প্রবৃত্তা হইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই কর্ত্তব্য অবধারিত হইল। রাজ-মহিষী পত্রের দ্বারা পিতাকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার দ্বারাই কুলনিন্দক স্বামীর শাস্তিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে মসীপাত্র, লেখনী ও কাগজ আনীত হইল। রমণী পত্রলেখা শেষ করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই একজন বিশ্বস্ত দূতের দ্বারা পত্রখানি গোপনে বেইওরাজ্যে আপনার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে সীমন্তপত্নী জলন্ত ভাষায় স্বামীর অসদাচরণের কথা বিবৃত করিয়া পিতার ক্রোধ বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং স্বামীর শাস্তিবিধান-দ্বারা কুলমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বেইওরাজ দুহিতার পত্রপাঠে ঘৃতস্পৃষ্ট অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং জামাতার দণ্ডবিধানজন্য, নিজ কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রভূত সেনাসহ তৎক্ষণাৎ ভঁইসরোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অষ্টীপ্রদেশের অভ্যন্তর দিয়া ভঁইসরোর রাজ্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, তিনি আপন সেনাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং একভাগের ভার পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া ও স্বয়ং অন্যভাগের নেতৃত্ব লইয়া যামুনানদীর তীরপথে ধাবিত হইলেন। সামন্তকুমার পিতৃনির্দ্দেশে সরলপথ অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার বহুপূর্ব্বে ভঁইসরোর দুর্গের সম্মুখীন হইয়া ভগিনীপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন।

সহসা এতদূর ঘটিবে পরমার-পতি তাহা আশা করেন নাই এবং তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতেও পারেন নাই। অধুনা শ্যালককে সসৈন্যে সমাগত ও শত্রুতা-চরণে সমুদ্যত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না, রাজপুত-সুলভ সাহসে নির্ভর করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজ সেনাদল

লইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইদলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে বহু সেনা হত ও আহত হইয়া পড়িল; শোণিততরঙ্গে রণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু প্রথমতঃ কোনও পক্ষেরই জয়পরাজয় নির্ণীত হইল না। অবশেষে মেঘাবৎবংশের ভাগ্য প্রসন্ন হইল—বিজয়লক্ষ্মী পরমারকুলের প্রতি বিরূপ হইয়া বেইগুসম্প্রদায়ের অঙ্কশায়িনী হইলেন। বেইগুরাজকুমার সম্মুখযুদ্ধে ভগিনীপতির শিরশ্ছেদ করিয়া পিতৃকুলের সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। পরমার সেনাদল প্রভুর মৃত্যুদর্শনে সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বেইগু-সামন্ত সদলবলে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের দ্বারাই স্ববংশের কলঙ্ক বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি সত্বর একজন অনুচরের দ্বারা সেই সুসংবাদ অন্তঃপুরে স্বীয় কন্যার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মেঘাবৎ-নন্দিনী তাহাতে বিচলিত হইলেন না—তথাবিধ হৃদয়-বিদারক শোক-সংবাদেও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন না। পরন্তু স্বামীর জীবন-বিনিময়ে পিতৃকুলের মর্য্যাদা রক্ষিত পাইয়াছে শুনিয়া তিনি প্রীতির চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন—সীমান্তে সিন্দূর, ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ও কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ করিয়া সতীবেশে সজ্জিত হইলেন এবং অনুচরী সহচরীদিগের সহিত দ্রুতগতি দুর্গপ্রাঙ্গণে পিতৃ-সমীপে আসিয়া দর্শন দিলেন। বেইগুরাজ, দুহিতার সেই সহমরণের বেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত বা দুঃখিত হইলেন না অথবা তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনও বিষাদের লক্ষণও প্রকাশ পাইল না। তিনি জানিতেন, রাজপুতরমণীরা যেরূপ পিতৃকুলানুরাগিনী, সেইরূপ পতিপরায়ণা পতিগতপ্রাণা। পিতৃবংশের অপমাননা যেমন তাঁহাদিগের অসহ্য, পতির বিয়োগ-যাতনাও তেমনই অসহনীয়। স্বামীর অবিদ্যমানে কখনও কোনও রাজপুতনারীই জীবনধারণে সমর্থা নহেন। অতএব জামাতার মৃত্যুদর্শনে তাঁহার কন্যাও যে সেই পথাবলম্বিনী হইবেন—পতির শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া অনলচিতায় প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সামন্তরাজ দুহিতার সতীবেশে ও স্বামী আত্মত্যাগ-সঙ্কল্পে বিষণ্ণ হইবার কোনও কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রফুল্লমুখে তাঁহার সেই সহমরণ কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই সামন্ত-পত্নীর ইচ্ছানুসারে চম্বল ও যামুনা নদীর সঙ্গম-স্থলে প্রভূত চন্দনকাষ্ঠ, কার্পাস, ঘৃত ও ধূপ, ধুনা, ওগ্‌গুলাদি গন্ধদ্রব্য আনীত ও তদ্দ্বারা এক প্রকাণ্ড চিতা রচিত হইল। সতী-শিরোমণি পরমার-মহিষী সহচরী-

দিগের সাহায্যে সহমরণের সমস্ত বিধি কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন ও শাস্ত্রীয়-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন করিলেন এবং পরম-ভক্তিসহকারে পতিদেহ বক্ষে লইয়া ধীর অচঞ্চল-ভাবে চিতার উপরে উঠিয়া বসিলেন। অমনই শঙ্খঘণ্টাদির মঙ্গলবাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, চারিদিক হইতে অজস্রধারে চিতার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সমাগত নরনারীর জয়নাদে আকাশ-মেদিনী-প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সামন্তরাজ্ঞী, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আপনার শেষ বক্তব্য শেষ করিয়া, ভৃত্য-দিগকে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন।

সামন্তপত্নীর আদেশ প্রতিপালিত হইল, অগ্নি, ঘৃতাদি দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে সহসা প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল এবং সহস্রজনলোলজিহ্বা বিস্তারে, দেখিতে দেখিতে সেই পতিদেহ-ধারিণী রাজপুত-সতীকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই রাজপুত-ললনার পিতৃকুলানুরাগ-ব্রত উদ্‌যাপিত হইল!

শ্রীঅঘোরনাথ বসু-কবিশেখর।

বিকাশ।

—:০:—

সরসীর বক্ষে সুপ্তা নলিনী সুন্দরী,
ফুল্লাননে জাগে যথা প্রভাত কিরণে,
কবিতা মানব হৃদে থাকে ঘুম ঘোরে,
জাগে সে মঙ্গলময় প্রেমের মিলনে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হীরক।

—:০:—

সকল প্রকার রত্নের মধ্যে হীরকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রূপে ও গুণে হীরক সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রত্ন-প্রসূ ভারতমাতার ক্রোড়ে পূর্ব্বে বহুতর রত্নের আকর বিদ্যমান্ ছিল। সেই সকল বহুবিধ বিভিন্ন রত্নের উল্লেখ এখনও আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে বহুবিধ রত্ন উল্লিখিত হইলেও, ইহাদিগের মধ্যে নয়টি রত্নই সর্ব্বপ্রধান। তন্ত্রসারে এই নবরত্ন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্যং গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।
পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ॥"

মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র বা হীরক, বিদ্রুম, পুষ্পরাগ, মরকত ও নীল এই নয়টি নবরত্ন। আবার নবরত্নের মধ্যে হীরকই সর্ব্বপ্রধান রত্ন। এই শ্রেষ্ঠ রত্নই সৌভাগ্যশালী নৃপতিগণের ধনভাণ্ডার উজ্জ্বল করিতেছে। হৃত-সর্ব্বস্ব ভারত-মাতার ধন-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠরত্ন কোহিনূরের জন্য বহুবিধ নৃপতির ধনাগার লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির জন্য হীরক রত্নশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। নক্ষত্রমণ্ডল বিভূষিত চন্দ্রের ন্যায় মণি-মুক্তা-বেষ্টিত হীরকখণ্ড ভূষণে বিরাজ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। হীরকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানতঃ তিনটি গুণের উপর নির্ভর করে ; প্রথম—আয়তন ; দ্বিতীয়—দীপ্তি ; তৃতীয় বর্ণ। হীরক আয়তনে যত বৃহৎ হইবে, ইহার মূল্যও তত অধিক হইবে। কিন্তু আয়তনের সহিত দীপ্তি সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনূর আয়তনে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হীরকের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, ঔজ্জ্বল্যে এখনও ইহা অদ্বিতীয়। হীরকের মূল্য ইহার স্বাভাবিক বর্ণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ হীরকের বর্ণ স্বচ্ছ, তবে লাল, সবুজ ও নীলবর্ণের হীরকও দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নীলবর্ণের হীরক অতীব দুষ্প্রাপ্য।

আমরা সচরাচর যে অবস্থায় হীরকখণ্ড দেখিতে পাই, কর্ত্তন ও সান পাওয়ার পর হীরক সেই আকার প্রাপ্ত হয়। ভূগর্ভমধ্যে অবস্থানকালে ইহা গলিত

লৌহ ও অন্যান্য ধাতু বেষ্টিত অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক উপায়ে বায়ু ও বৃষ্টি দ্বারা চালিত (acted) হইয়া হীরকখণ্ড সেই গলিত জনাট স্তরের উপরিভাগে উত্থিত হয়। অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডগুলি জলে ধৌত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে সেইগুলি সমুদ্র-গর্ভ পর্য্যন্ত নীত হয়। ধাতু-পিণ্ডের মধ্য হইতে পিণ্ডের উপরে হীরকের আগমন এবং পরে সমুদ্র পর্য্যন্ত আনয়ন—দুই এক বৎসরে সম্পন্ন হয় না, বহু শতাব্দীতে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

হীরক খনিজ পদার্থ। ইহাকে খনি হইতে ধাতবপিণ্ড মিশ্রিত অবস্থায় উত্তোলন করা হয়। হীরকের খনির সহিত অন্যান্য খনির কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। হীরকের খনিগুলি আকারে মোচাগ্রভাগের ন্যায় (conical)। খনির উপরিভাগ বিস্তৃত, কিন্তু ইহার পরিসর ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া তলদেশে আসিয়াছে। সময়ে সময়ে খনির চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার উচ্চ স্তূপ দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় এই খনির পার্শ্বস্থ মাটি এরূপ সমতল দেখা যায় যে, তদ্দর্শনে কেহ অনুমান করিতে পারেন না যে, খনির ভিতর দিয়া কখনও গলিত ধাতু প্রবেশ করিয়াছিল অথবা সেইস্থানে অন্য কোনরূপ ভূস্ফোটন (erruptoin) সংঘটিত হইয়াছিল।

হীরক যে অবস্থায় খনি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে অবস্থায় তাহাতে কোন সমতল স্থান লক্ষ্য হয় না। অধিকাংশ সময়েই সেইগুলি অসমান টুক্‌রাভাবে পাওয়া যায়। কাযেই এইগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া লইতে হয়। এই ছাঁট-কাটের উপর হীরকের মূল্য নির্ভর করে। সময় সময় একই প্রকারের হীরক কর্ত্তনের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রীত হয়। ভারতবর্ষের একটি গৌরবের কথা এইস্থলে না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে হীরক-কর্ত্তনের প্রথা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে হীরক স্বাভাবিক অসমান অবস্থায় য়ুরোপে ব্যবহৃত হইত। য়ুরোপবাসীরা হীরক যে মূল্যবান পদার্থ তাহা বুঝিয়াছিলেন কিন্তু যে কারুকার্য্যের উপর ইহার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে এবং যদ্ভিন্ন হীরক দীপ্তিহীন হইয়া থাকে, সেই কারুকার্য্যটিই তাঁহাদিগের অজ্ঞাত ছিল। রত্ন-প্রসবিনী ভারতে এই কারুকার্য্য বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। আমাদের গৌরবের কোহিনূরই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হীরককে সাধারণতঃ তিনপ্রকার আকারে কর্ত্তন করা হইয়া থাকে। খনি হইতে প্রাপ্ত হীরকখণ্ডের আকারের উপর ইহার কর্ত্তন নির্ভর করে। এই তিন প্রকার আকারের ইংরাজি নাম,—**Brilliant, Rose** এবং **Table.** খনি

হইতে তুলিবার পর কর্ত্তনকারী বিচার করিয়া দেখে যে, কোন্ আকারে কর্ত্তন করিলে হীরকের আয়তনক্ষয় সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। বিচার সমাপ্ত হইলে, যে আকারে হীরক কর্ত্তিত হইবে, সেই আকারের একটি সীসাখণ্ড প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে এই সীসার আদর্শ গঠনটি সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তনকারী হীরকখণ্ডকে একটি দণ্ডের (dam) উপর আঁটিয়া দেয় এবং তাহার একটি ধার অপর একখণ্ড হীরকদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মার্জ্জিত করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর দণ্ডসংলগ্ন হীরকখণ্ডের সেই পার্শ্ব, সীসার নমুনার সহিত সমান্তর হইলে, কর্ত্তনকারী অন্য ধার কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ধার সীসাখণ্ডের সমধারের সহিত সমকোণে রাখিতে হইবে ; কারণ হীরকের দীপ্তি এই কোণের উপর নির্ভর করে। হীরকের কোন ধার (edge) যদি ঘর্ষণ করিতে করিতে নমুনার সমধারের অপেক্ষা অধিক লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। এই কর্ত্তনকার্য্য কেবল সাধারণ অস্ত্র-সাহায্যে সম্পন্ন হয় না। একটি ইস্পাতের তারে হীরক-চূর্ণ মাখাইয়া হীরকের উপর টানিতে হয় ; হীরক-চূর্ণ তার হইতে ঝরিয়া পড়িলে পুনরায় মাখাইয়া দেওয়া হয় এবং বহুবার এইভাবে টানিলে হীরক কাটিয়া যায়। সময় সময় হীরকের উপরিস্থিত স্বাভাবিক ফাট বা জোড়ের দাগ লক্ষ্য করিয়া হাতুড়ি দিয়া হীরক ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু এই প্রণালী সুবিধাজনক নহে, কারণ হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিবামাত্র অনেক উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এইরূপভাবে একখণ্ড হীরক কর্ত্তন করিতে এক মাস এবং বৃহৎ হইলে দুই মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে। পিট ডায়েমণ্ড (Pitt diamond) কর্ত্তন করিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইরূপে হীরক কর্ত্তিত হইলে, ইহাকে পালিস করিতে হয়। হীরক কর্ত্তন করিবার সময় যে টুকরা বা গুঁড়া পড়ে সেইগুলিকে অতিসাবধানে কুড়াইয়া রাখা হয় এবং পরে এই গুলিকে ইস্পাতের হামানদিস্তায় গুঁড়াইয়া এরূপ সূক্ষ্ম করা হয় যে, ইহাদিগের কণাপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্ম গুঁড়া দিয়াই হীরক পালিস করা হইয়া থাকে।

হীরক অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। একখণ্ড লৌহের উপর হীরক রাখিয়া একটি হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিলে হাতুড়ী টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হীরক লৌহখণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। হীরকদ্বারা সকল প্রকার ধাতু ক্ষোদিত ও কর্ত্তিত হইয়া থাকে, কেবল টেণ্টালাম (Tantalum)-ধাতু হীরকদ্বারা

কৌদিত হয় না। টেণ্টালাম ধাতুর উপর হীরক-যন্ত্র (drill) বহুক্ষণ কার্য্য করিয়াও কোন ছিদ্র করিতে পারে নাই, অধিকন্তু হীরকের অগ্রভাগ সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হীরক তড়িত ও উত্তাপের অপরিচালক। সুতরাং ইহার একাংশ কোনরূপ উত্তপ্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, অপর অংশের কোন অনিষ্ট হয় না। জগদ্বিখ্যাত রাসায়নিক ল্যাভোসিয়র (Lavoisiar) প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, হীরক পুড়িতে পারে এবং পুড়িয়া গিয়া দ্বায়-অঙ্গারক গ্যাসে (Carbonic acid gas) পরিণত হয়। তৎপরে ডেভি (Davy) দেখাইয়াছিলেন যে, হীরক পুড়িলে দ্বায়-অঙ্গারক গ্যাস ভিন্ন অপর কোন পদার্থ প্রস্তুত হয় না। সুতরাং হীরক অঙ্গারের (Carbon) প্রাকৃতিক প্রকারভেদমাত্র। ইহাতে কয়লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই।

অঙ্গাভরণ বা মুকুট-সজ্জায় হীরকের ব্যবহার আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই; নৃপতিগণের উষ্ণীষের উপর মণিমুক্তাবেষ্টিত হীরকখণ্ড বিরাজ করিয়া তাঁহাদিগকে সুশোভিত করে। এইরূপ আভরণে হীরকের ব্যবহার ব্যতীত সমস্ত প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে গ্রহগণের প্রীতি ও শান্তির নিমিত্ত হীরক-ধারণ প্রচলিত ছিল। হীরক প্রভৃতি নবরত্ন সূর্য্যাদি নবগ্রহের প্রীতির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শুক্রগ্রহের প্রীত্যর্থে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া হীরক ধারণ করিতে হয়। হীরকের বহুবিধ গুণ জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সারকত্ব, শীতত্ব, চক্ষুর্হিতত্ব ও শুক্রকারিত্ব গুণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে হীরক ষষ্ঠ বা অষ্ট কোণ বিশিষ্ট, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সমপার্শ্ব, বৃহত্তর অথচ লঘু, স্নিগ্ধ ও তীক্ষ্ণধার, তাহাই জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে উৎকৃষ্ট ও ধারণে শুভকর।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, হীরক-চূর্ণ পালিসকার্য্যে ব্যবহৃত হয়; তদ্ভিন্ন হীরকদ্বারা নানাবিধ ছিদ্র করিবার যন্ত্র (Boring machine) প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাচ কাটিবার নিমিত্ত এবং ইস্পাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবার জন্য হীরক-যন্ত্র প্রচলিত আছে।

মহামূল্যরত্নশ্রেষ্ঠ হীরকের ক্ষয় নাই। ইহা একবার সৃষ্ট হইলে, গণনাতীত কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া জগদ্বাসীকে বিমোহিত করে। জগতের অধিকাংশ পদার্থই বায়ু ও বৃষ্টিদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু ইহারা হীরককে কোনরূপে বিনষ্ট করিতে পারে না। সাধারণ অগ্নিসংযোগে অনেক বস্তু বিনাশ

প্রাপ্ত হয়, কোনটি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, কোনটি বা রূপান্তরিত হইয়া এরূপ অবস্থায় পরিণত হয় যে, পূর্ব্বাবস্থার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই লক্ষিত হয় না। কিন্তু হীরক সাধারণ অগ্নি-প্রয়োগেও অক্ষুণ্ণ থাকে, এমন কি বাঁক নল দিয়া ইহার উপর অগ্নিশিখা প্রয়োগ করিলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না। জগতের অনেক দ্রব্য অম্লজান গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া (Oxidised) নষ্ট হয় এবং কেহ বা ভিন্ন আকার, ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া নূতন পদার্থে পরিণত হয়, কিন্তু হীরক সম্বন্ধে আমাদের সে আশঙ্কাও নাই; কারণ, ইহাকে কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অম্লজান গ্যাসের সহিত মিশ্রিত করিতে পারা যায় নাই। এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র-উপকরণ-সংযোগেও এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। হীরকের কাঠিন্য ও অক্ষয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীকেরা ইহাকে এডামাস (Adamas) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হিন্দুরাও এই কারণে হীরকের বজ্র নাম দিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হীরক অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রময় (porous) কয়লা কিরূপে এইরূপ নির্ম্মল উজ্জ্বল দানাবিশিষ্ট স্ফটিকে (crystal) পরিণত হয়, তাহাই এক্ষণে দেখিতে হইবে। প্রকৃতিই এই বহুমূল্য রত্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ভূ-গর্ভের উত্তাপ এত অধিক যে, তথায় লৌহ পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকে। এইরূপ তরল লৌহের সহিত কয়লা মিশ্রিত হইলে গলিয়া যায়। স্বাভাবিক উপায়ে কয়লামিশ্রিত তরল লৌহের উপর ক্রমাগত অত্যুগ্র চাপ পড়িলে, কয়লা হীরকরূপ ধারণ করে। পরে কখন ভূ-গর্ভ হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইলে হীরকখণ্ড লৌহ, অন্যান্য ধাতু ও কর্দ্দম মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর উপরিভাগে উপনীত হয়।

হীরক কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি না, এ বিষয়ে বহুদিন হইতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে। অনেক রাসায়নিক এ বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেবল ফরাসী রসায়নবিদ্ পণ্ডিত মৈসন (Moissan) কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। স্বভাবিক যে উপায়ে হীরক প্রস্তুত হয়, আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই পন্থা অবলম্বন করি, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা; তবে কৃত্রিম হীরক প্রকৃতিজাত হীরকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে।

মৈসনের হীরক প্রস্তুত প্রণালী এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইল। তিনি বিশুদ্ধ লৌহকে, যাহাতে বালি (Silica) বা অন্য কোন আবর্জ্জনা (Impurities)

গ্রাফাইট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর এক প্রকার বৈদ্যুতিক (Arc of light) প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের উত্তাপ সেণ্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এইরূপ প্রচণ্ড উত্তাপে লৌহ গলিয়া তরল সোনের আকার ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর মৈসন এই তরল লৌহের উপর পরিষ্কার শোধিত কয়লা ছাড়িয়া দেন এবং কয়লাগুলি লৌহের সহিত গুলিয়া যায়। এইরূপে কয়লা ও লৌহ মিশ্রিত হইলে, তিনি অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ কমাইয়া দিয়াছিলেন। লৌহ তরল অবস্থা হইতে কঠিন (Solid) অবস্থায় পরিণত হইবার সময় আকারে বড় হয়। উত্তাপ কমাইয়া লৌহপূর্ণ পাত্রটি জলের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে লৌহ ক্রমে শীতল হইতে থাকিলে, শক্ত হইতে আরম্ভ করে; এবং কিছুক্ষণ পরে উপরের তরল অংশ জমিয়া পাত্রের উপরে কঠিন সরের মত একটি আচ্ছাদন পড়ে। কিন্তু ভিতরে তখনও লৌহ তরল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় লৌহের উপর অত্যন্ত চাপ দেওয়া হয়। তাহাতে ভিতরের তরল লৌহ হইতে কয়লা দানা বাঁধিয়া স্ফটিকাকার (Crystal) ধারণ করিয়া বাহির হয়। এই স্ফটিক উগ্র লবণদ্রাবক (Con. Hydrochloric Acid) দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া মৈসন অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, কয়লাগুলি দানাবিশিষ্ট স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণরহিত হয় নাই। এই হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব (sp. gravity) ৩·৩ হইতে ৩·৫ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। স্বাভাবিক হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্বও ৩·৫। এইরূপ উপায়ে কতকগুলি কাল বর্ণের স্ফটিকও পাওয়া গিয়াছিল।

হীরকের উৎপত্তিস্থান কোথায়, এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভূ-গর্ভে হীরক প্রস্তুত হয় এবং অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর উপরিভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ভিন্ন হীরকের আর একটি জন্মস্থান আছে। "The diamond is a gift from Heaven and it is conveyed to the earth in meteoric showers." উল্কাপাতের সহিত লৌহ ও অন্যান্য ধাতুমিশ্রিত হীরকখণ্ড ভূতলে পতিত হইয়া থাকে—যদি এই কথাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি যে, যে স্থানে হীরক পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে বিবিধ ধাতুমিশ্রিত একটি উল্কাপিণ্ডও পাওয়া যাইবে এবং এই পিণ্ডের-মধ্যে স্থানে স্থানে হীরকাংশও দেখিতে পাইব। যদি আকাশই হীরকের জন্মস্থান হয় এবং উল্কাবৃষ্টিই পৃথিবীতে ইহার প্রেরণকর্ত্রী হয়, তাহা

হইলে পৃথিবীর উপরিভাগেই হীরক পাইবার সম্ভাবনা অধিক এবং হীরকের খনি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মেডেনডানার (Mayden-daner) এই তর্কের মীমাংসা নিম্নলিখিত ভাবে করিয়াছেন। তিনি বলেন, হীরকের উৎপত্তি স্বর্গে (Cosmic origin)। পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পর উল্কার সহিত হীরক পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। যে স্থলে হীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় আমরা যে উল্কাপিণ্ড দেখিতে পাই না, তাহার কারণ এই যে, বহুকাল-পূর্ব্বে, এমন কি ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বে, এইসকল উল্কা পৃথিবীর উপরে পড়িয়াছিল এবং কালক্রমে মাটিতে প্রোথিত হইয়াছিল। তাহার পর বায়ু ও বৃষ্টির দ্বারা চালিত (acted) হইয়া লৌহ ও অন্যান্য ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং হীরক জলে ধৌত হইয়া সমুদ্রগর্ভ পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে। আমরা যে সকল হীরকের খনি দেখিতে পাই, তাহা বড় বড় উল্কাপতনে সম্পন্ন হইয়াছিল। উল্কাপিণ্ডগুলি অতিশয় বেগে আসিয়া পৃথিবীর উপরে পড়িয়াছিল এবং যে স্থলে নরম মাটি পাইয়াছিল, সেই স্থলে গভীর গর্ত্ত করিয়াছিল এবং অন্য স্থানে শক্ত মাটির উপর পতিত উল্কাপিণ্ডগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আমেরিকার আরিজোনা নামক স্থানের একটি সমতল ভূখণ্ডের উপর এক সময়ে উল্কাপাত হইয়াছিল। চারিদিকে বড় বড় লৌহখণ্ড পড়িয়া আছে এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উচ্চ মৃত্তিকাবেষ্টিত চারিশত হস্ত গভীর গহ্বর (crater) দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই গহ্বরটির উপরিভাগ অতি বৃহৎ; ইহার ব্যাস পৌনে এক মাইল। এই গর্ত্তটি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত সমতল ভূমি একটি বৃহৎ লৌহস্তূপের আঘাতে এইরূপ বৃহৎ গর্ত্তে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, উল্কাপাত হইতে হীরকের খনির উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

উল্কার সহিত যে হীরকখণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, এই বিষয়ে ডাক্তার ফুটের (Foot) রাসায়নিক অনুসন্ধান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। একদা তিনি একটি উল্কাপিণ্ড কর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণপরে সেই পিণ্ডটি আর কাটিতে পারিলেন না এবং দেখিলেন যে, তাঁহার কাটিবার যন্ত্রও খারাপ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি পিণ্ডটি রসায়নবিদ্ মৈসনের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। মৈসন পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, সেই পিণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড হীরক আছে। তজ্জন্য ফুট উহা কর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন নাই; হয়

হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ হীরকখণ্ডটি উষার সহিত পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

হীরকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাবতীয় কথাই বিবৃত হইল। পূর্ব্বে ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে হীরক পাওয়া যাইত, তাহাই এক্ষণে লিখিত হইবে।

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল পুণ্যস্থান ভারতবর্ষেই হীরক পাওয়া যাইত। আধুনিক সভ্যজগৎ যখন সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয় নাই, পাশ্চাত্য প্রদেশ যখন বিজ্ঞানদেবীর পূজা করিতে শিখে নাই, বিংশ শতাব্দীর প্রভূত পরাক্রমশালী জাতিদিগের নামও যখন কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই,—তখন আমাদের ভারতে নৃপতিদিগের উষ্ণীষে হীরকখণ্ড বিরাজ করিত; জনসাধারণের মধ্যেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভারতমাতা এখন দীন-হীনা—তাই বুঝি রত্নপ্রসবিনী মাতা আর রত্নপ্রসব করেন না! পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের পানেয়ার নদী হইতে যুক্তপ্রদেশের শোন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে হীরক পাওয়া যাইত। কৃষ্ণানদীতীরবর্ত্তী কাদাপা, কার্ণুল ও ইলোর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নাগপুর ও সম্বলপুর অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া যাইত। এই সকল স্থানে এখন আর হীরক দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। ভারতের হীরক এক্ষণে সমগ্র জগৎকে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। রুশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বরগণ ভারতের হীরকে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

পরিশেষে ভারতের আর একটি অতীত গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জগৎ যখন অসভ্যতার অন্ধকারে নিমগ্ন, বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ যখন তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই,—সেই সুদূরবর্ত্তী কাল হইতে ভারতে হীরকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ভারতবাসীরা তখন হইতেই হীরককে কাটিতে ও পালিস করিতে পারিতেন। সুতরাং হীরক কাটিবার, পালিস করিবার ও চূর্ণ করিবার যন্ত্রও এদেশে প্রচলিত ছিল। এই হীরক কাটিবার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে অন্যান্য অনেক প্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হয়। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কে অস্বীকার করিবেন যে, সেই সুদূর অতীতে ভারতে যন্ত্রাদির প্রচলন ছিল না, ভারতবাসীরা যন্ত্রের ব্যবহার জানিতেন। যাঁহাদের সূক্ষ্ম-কার্য্যে এরূপ পারদর্শিতা দর্শনে এক্ষণে আধুনিক জগৎ মুগ্ধ, তাঁহারা যে অন্যপ্রকার কারুকার্য্যে নিপুণ ছিলেন না—এ কথা বিশ্বাস করা

দূরে থাকুক, মনোমধ্যে কল্পনা করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই কথার সমর্থন প্রসঙ্গে Encyclopædic Dictionary হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"Until 1476, when De Berghem of Drughes first discovered this art (the art of cutting diamond) the diamond of Europe was worn uncut ? the four great stones in the mantle of Charlemagne furnishing an example. But the art was practised long before in India, the facing of the Kahinoor dating back into uncertain time."

অধুনা সমগ্র সভ্যজাতিমণ্ডলী মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড বিদ্যমান্, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে নীত হীরকখণ্ডগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ডগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত Encyclopaedic Dictionary হইতে উদ্ধৃত হইল ;—

"Among the celebrated diamonds in this world may be mentioned the following :—

(*i*) Great Moghul—found in 1550 in Golconda and seen by Tavernier ; weighed 134 carats.

(*ii*) Russian—taken from a Brahmanical idol by a French soldier, sold to the Empress Catharine for £ 90,000 and an annuity of £4,000, weighed 194 carats.

(*iii*) Pitt—brought from India by Mr. Pitt, the grand-father of the Earl of Chatham, sold to the regent Duke of Orleans in 1717 for £ 135,000, weighed, when rough, 400 carats. Napoleon placed it on the hilt of his sword.

(*iv*) Kahinoor—seen by Tavernier in 1665 in the possession of the Great Moghul.

কোহিনূর আয়তনে কম হইলেও দীপ্তিতে এখনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং রুষীয় (Russian) হীরক আয়তনে বৃহত্তম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অভিলাষার্থ-চিন্তামণি।

—:০:—

'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ-চিন্তামণি' সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি ইংরাজী 'সাইক্লোপিডিয়া' বা বিশ্বকোষ-জাতীয়। অভিলষিত সমস্ত বিষয়েরই বিবরণ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অভিলষার্থ-চিন্তামণি এই নামকরণ হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে একমাত্র অগ্নিপুরাণে এইরূপ নানাবিষয়ের একত্র সঙ্কলন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থ-চিন্তামণিতে অগ্নিপুরাণে অনুক্ত বহু বিষয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে সংস্কৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সারসংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমানকালের সাইক্লোপিডিয়া-সমূহের ন্যায় গ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদিগের কল্পনার অতীত ছিল, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি-অপনোদনের জন্য এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল।

এই গ্রন্থ ১০৫১ শকাব্দে বা ১১২৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পুণার ডেক্কান কলেজের প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহালয়ে এই গ্রন্থের তালপত্রে লিখিত দুইখানি অনুলিপি আছে। তন্মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ—অপরখানি অসম্পূর্ণ। তাঞ্জোরের সরস্বতী-মহাল নামক পুস্তকাগারেও মানসোল্লাসের কয়েকখানি হস্তলিপি আছে। মহারাষ্ট্রপতি চালুক্যবংশীয় "ভুলোকমল্ল"-উপাধিধারী তৃতীয় সোমেশ্বর মহারাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। সোমেশ্বর ১০৪৮ শকাব্দ হইতে ১০৪৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি একাদশ-বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্পকালের মধ্যে তিনি এক দিকে দক্ষিণে আন্ধ্র, দ্রাবিড় ও উত্তরে মগধ ও নেপাল রাজ্য জয় করিয়া "ভুলোকমল্ল" উপাধি-ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অন্য দিকে অভিলাষার্থ-চিন্তামণির ন্যায় গ্রন্থ-রচনাদ্বারা বিদ্বৎসমাজের নিকট "সর্ব্বজ্ঞ ভূপ"—এই গৌরবকর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ সোমেশ্বর স্বীয় গ্রন্থখানি সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচনা-পূর্ব্বক উহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক খণ্ড আবার ২০টি করিয়া অধ্যায়ে বা উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমখণ্ডে, যে সকল গুণে রাজ্যলাভ করা যায়, তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে অনৃত-ত্যাগ, পরপীড়ন-প্রভৃতির

বর্জ্জন, জিতেন্দ্রিয়তা, মহানুভবতা, সৌজন্য, ঈশ্বরে ভক্তি, পরোপকার, অনাথ, পশু, ছন্ন ব্যক্তিদিগকে ও স্বপক্ষীয়দিগকে অন্ন-দান ও আশ্রয়-দান প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রশংসাপূর্ব্বক রাজ্যলাভ-ব্যাপারে ঐ সকলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে লব্ধরাজ্যের রক্ষা বা দৃঢ়তাসম্পাদনের উপায়াবলী বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নীতিশাস্ত্র-কথিত রাজ্যের সপ্তাঙ্গের বর্ণনা বা আদর্শ নরপতি, তাঁহার মন্ত্রিসমাজ, পুরোহিত, জ্যোতির্ব্বিদ্, কোষ, ধনাহরণের উপায়, সৈন্য-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের পর, নরপতিগণ যে সকল সুখোপভোগের অবসর লাভ করিয়া থাকেন, তৃতীয়খণ্ডে তাহার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। তদুপলক্ষে মনোহর রাজপ্রাসাদ, জলক্রীড়া, অভ্যঞ্জন, বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার-ভূষণাদির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। চতুর্থখণ্ডে চিত্তের প্রফুল্লতাসাধক ও মানব আনন্দ-বিধায়ক নানাপ্রকার ক্রীড়ার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে সামরিক ব্যূহ-ন্যাস, অশ্বারোহণ, গজশিক্ষা, মল্লবিদ্যা, কুক্কুটযুদ্ধ, শ্বানশিক্ষা, কবিতা-রচনা, সঙ্গীত-শিক্ষা, বিবিধ নৃত্য-কৌশল ও বহুপ্রকার ললিত কলার বর্ণনা প্রভৃতিই প্রধান। শেষ বা পঞ্চমখণ্ডে উদ্যান-বিহার, প্রান্তর-ক্রীড়া, বনবিহার, পর্ব্বত-ক্রীড়া, পুলিনবিহার, রতিশাস্ত্র ও অন্য নানাপ্রকার ক্রীড়ার বর্ণনা করা হইয়াছে। কল কথা, রাজনীতি, জ্যোতিষ (সিদ্ধান্ত ও ফলিত), ন্যায়, অলঙ্কার, ছন্দঃ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, চিত্রকলা, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ অশ্বশিক্ষা, গজশিক্ষা, শ্বানশিক্ষা, মৃগয়া, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়েরই মূলতত্ত্বগুলি আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। পঞ্জিকা-গণনা-ক্রম-সম্বন্ধে উপদেশ-কালে, ১০৫১ শকাব্দের চৈত্র শুক্লাপ্রতিপৎ শুক্রবার দিবসে গ্রহ-নক্ষত্রাদির যেরূপ সংস্থান ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে ঐ অব্দকেই আমরা এই গ্রন্থের রচনার কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

রাজনীতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল দেশের ও স্থানের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

১। সিংহল।
২। বারবাটক।
৩। কলিঙ্গ।
৪। কোশল।
৫। হিমালয়।
৬। বিন্ধ্যপর্ব্বত।
৭। তাপ্তীতট।
৮। যবন দেশ।
৯। কম্বোজ।
পোক্কালপুর।

১১। মতাঙ্গাদ্রি।
১২। পৌণ্ড্রাক।
১৩। সুরাষ্ট্র।
১৪। বেরাগদ।
১৫। সোপার।
১৬। পারসীক।
১৭। বর্ব্বর। (*Barbary ?*)
১৮। কালপুর।
১৯। আন্ধ্র।
২০। তুম্বরু।
২১। রাবণগঙ্গা।
২২। সিন্ধুদেশ।
২৩। চীর পল্লী।
২৪। নাগপত্তন।
২৫। চোলদেশ।
২৬। অম্বিকাপুর।
২৭। অনিলাবাড়।
২৮। মূলস্থান।
২৯। তোণ্ডীদেশ।
৩০। পঞ্চপট্টন।
৩১। চীন।
৩২। বেঙ্গীদেশ।
৩৩। ভাবাপট্টন।
৩৪। অপরান্ত।

গ্রন্থকার অষ্টপ্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—১। জলদুর্গ, ২। গিরিদুর্গ, ৩। পাষাণদুর্গ, ৪। ইষ্টকাদুর্গ, ৫। মৃত্তিকাদুর্গ ৬। বনদুর্গ, ৭। নরদুর্গ, ৮। নরদুর্গ। এই সকল দুর্গের বিস্তৃত বিবরণ অন্যান্য নীতিগ্রন্থেও আমরা দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় ষড়্‌বিধ মাত্র দুর্গের উল্লেখ আছে।

সৈন্যদিগেরও অষ্টপ্রকার বিভেদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—মৌলসেনা (পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ভূমি-বৃত্তি-ভোগকারী সৈন্য) ভৃতসেনা (Standing army) মৈত্র সেনা (মিত্ররাজার সৈন্য) শ্রেণিসেনা (Garrison) আটবিক সেনা (বন্য নিষাদ ও ম্লেচ্ছজাতীয় সৈন্য) অমিত্র বা দ্বিষৎ সেনা (উৎকোচাদির দ্বারা ও ভেদ-নীতির বলে আনীত শত্রুপক্ষীয় সৈন্য) অর্থাধীন সেনা (ভাড়াটিয়া Mercinary) ফল্গু সেনা (Camp followers)। ইহার মধ্যে শেষোক্ত চারিপ্রকার সৈন্যকে নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ-পূর্ব্বক শত্রুমুখে স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে!

অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনায় গ্রন্থকার প্রায় বিংশতি প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—খচর্ম্ম (ঢাল) কুন্ত, (বল্লম) সেরুচক্র (?), ছুরিকা, যন্ত্রমুক্তায়ুধ, পাষাণপাতি-(ক্ষেপক) যন্ত্র, খড়্‌গ, ধনুর্ব্বাণ, শক্তি, তোমর, নিঃস্ত্রিংশ, মুদ্গর, প্রাস, পট্টিশ, অগ্নিতৈলসিক্ত বাণ, চক্র, পাশ, পরশু, গদা শূল, লগুড়। যন্ত্রমুক্তায়ুধ বলিলে যন্ত্র-সাহায্যে মুক্তি বা নিক্ষিপ্ত হয় যে আয়ুধ, তাহাকেই বুঝায়, কিন্তু সে আয়ুধ কি প্রকার? সে যন্ত্রই বা কি প্রকার তাহার বিশদ বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, "যন্ত্রমুক্তায়ুধ" বন্দুক হওয়াই সম্ভবপর। পাষাণপাতি

যন্ত্র প্রাচীন রোমানদিগের ক্যাটাপুল্ট যন্ত্রের অনুরূপ হইতে পারে। প্লিনিউসের উল্লেখ গ্রীকবীর সেকান্দরের সমকাল ও পরকালবর্ত্তী য়ুনানী লেখকগণের ভারতবর্ষ বিষয়ক বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

Ctisias, Elian and Philastratus, all speak of an oil manufactured by the Hindus and used by them in warfare in destroying the walls and battlements of towns that no battering rams or other poliostic machines can resist it, and that "It is inexting uishable and nsatiable burning both arms and fighting.—The Hindu superiority p. 363.

এই তৈলই কি অভিলাষার্থ-চিন্তামণির অগ্নি-তৈল? তৎকাল-প্রচলিত বিবিধ বাদ্য যন্ত্রেরও নাম এই গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়; যথা :—

১। ভেরী (ঢোল)।	১১। হুড়ুক্কা।	২১। অশ্বঘড়স।
২। তূর্য্য।	১২। ঢক্কা।	২২। টেবুলী।
৩। কালহা।	১৩। ঘড়স।	২৩। ঢক্কাড়স।
৪। শঙ্খ।	১৪। করডা।	২৪। নিঃসাণ।
৫। মহাভেরী।	১৫। মর্দ্দলা।	২৫। তবকা।
৬। পটহ।	১৬। ত্রিবলি।	২৬। তাল।
৭। দুন্দুভি (দামামা।)	১৭। ডমরু।	২৭। ঘণ্টা।
৮। ডিম।	১৮। ভুঙ্গা।	২৮। জয়ঘণ্টিকা।
৯। জয়তূর্য্য।	১৯। কুড়ুকা।	২৯। বীণা।
১০। বহুটকা।	২০। সেকুকা।	৩০। তন্ত্রী।
		৩১। কাংস্যতাল।

রাজ্যব্যবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজার অষ্টজন সচিবের উল্লেখ আছে। সামন্তরাজা ও তদধীন মহামণ্ডলেশ্বর, দশগ্রামাধিপতি ও গ্রামাধিপতিগণ প্রাচীনকালেরই মত সেকালেও ছিলেন, দেখা যায়। প্রজার নিকট হইতে রাজা করস্বরূপে আয়ের দশমাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পালন করিবেন, বলা হইয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে আমরা ষষ্ঠাংশ করের উল্লেখ দেখিতে পাই। অভিলাষার্থ-চিন্তামণির নির্দ্দেশানুসারে, মহারাজ সোমেশ্বরের সময়ে অন্ততঃ মহারাষ্ট্র দেশে দশমাংশ-মাত্র কর গৃহীত হইত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অশ্বের নামাবলীর মধ্যে—"তেজী" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শব্দটি পারসী

ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, মুসলমানেরা দেশাক্রমণকারি-রূপে ভারতে আসিবার পূর্ব্বে অশ্ব-ব্যবসায়িরূপে এদেশের লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কুস্তীর আখড়াকে "আখাড়ক," হাতীর মাহুতকে "মহামাত্রক" বলা হইয়াছে।

রাগরাগিণীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে কানাড়ী, হিন্দী, বাঙ্গালা, মারাঠী, ও লাটী প্রভৃতি বিবিধ দেশীয় ভাষায় রচিত পদাবলীর অংশবিশেষ উদাহরণস্বরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্গীয় পদাংশের একটি নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"যে ব্রাহ্মণের কুলে তুপজীব্যা কাত্তবীর্য্যা জেণে—বাহু ফরসে খাণ্ডিয়া পরসরাম্ দেউ তো মহামঙ্গল করউ।

মহারাজ সোমেশ্বরের সময়ে বা খ্রীষ্টীয় ১১২৯ অব্দে বঙ্গভাষায় রচিত পদাবলী মহারাষ্ট্রদেশে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, এ সংবাদ অনেকের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু সেকালে এক্ষনকার মত রেলপথের সদ্ভাব না থাকিলেও ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, 'অভিলাষার্থ'-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত বঙ্গীয় পদ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ বল্লাল সেন সমিথিল বঙ্গভূমি শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের অন্যূন শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরব্ধ হইয়াছিল ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ধরবেগে হ্রাস পাইতেছিল। উদ্ধৃত বঙ্গীয় পদাংশে পরশুরামের কীর্ত্তি যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, যে, উহা দশাবতার-স্তোত্রের একাংশ হইতে পারে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জয়দেব গোস্বামীই দশাবতার-স্তোত্র-রচনার প্রথম পথিপ্রদর্শক নহেন—তাঁহার পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় রচিত দশাবতার-স্তোত্র প্রচলিত ছিল।*

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

* সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর 'প্রাচীন-দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' (The History of the Deccan down to the Mohomedan Conquest) নামক গ্রন্থের ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে বি এ মহোদয় লিখিত ও মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে এই প্রবন্ধটি রচিত হইল। বোম্বাই-প্রবাসী কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি পুণার ডেক্কান কলেজের পুস্তকাগারে গমন-পূর্ব্বক অভিলাষার্থ-চিন্তামণির হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত অন্যান্য বঙ্গীয় পদাবলী-সমূহ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ তাঁহার নিকট চির ঋণী থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু-মিলন।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কুঞ্জগৃহে।

—:০:—

রাজার ভাবনার উপর আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল—তিনি ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি এই চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যার পর মন্ত্রী দর্শন-প্রার্থী হইলেন। রাজা যেন সুস্থ বোধ করিলেন; এই চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। মন্ত্রী কয়টি আবশ্যক কার্য্যে রাজার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার আগমনের কারণ জানাইলেন—মূল কথা বিবৃত করিলেন।

রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র আনিয়াছেন কি?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "অনেক কাগজ দেখিতে হইবে। আপনার কখন দেখিবার সুবিধা হইবে? আমি কি সে সব রাখিয়া যাইব?"

"কায শেষ করাই ভাল। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তবে এখনই কায আরম্ভ করা যায়।"

মন্ত্রী রাজার কার্য্য-নিষ্ঠায় বিস্মিত হইলেন। তিনি যাইয়া আবশ্যক কাগজ-পত্র আনাইলেন।

তাহার পর দুইজনে সেইসকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া মন্ত্রী দুই একবার বলিলেন, "আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইতেছি। যদি অনুমতি হয়, আমি আবার আগামী কল্য আসিব।" উত্তরে রাজা বলিলেন, "না। কায শেষ করা যাউক।" অগত্যা মন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না। রাজার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল;—ভৃত্যগণ দুই একবার আসিয়া ফিরিয়া গেল। রাজা নিবিষ্টচিত্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যখন কার্য্য শেষ হইয়া গেল, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। কার্য্য শেষ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "আপনাকে আজ বড় কষ্ট দিলাম। কখন অবসর হয় না হয়—সেই জন্য আজই কায শেষ করিয়া দিলাম।"

মন্ত্রী বিদায় লইলেন।

সে দিন অতিরিক্ত শ্রান্তিপ্রযুক্ত রাজা অল্পক্ষণেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—তিনি যে ব্যবস্থা স্থির করিলেন, তাহারই বা কি করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে তিনি অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। অশ্ব সজ্জিত হইলে তিনি বিশ্রাম-বাটিকা পরিদর্শনে গমন করিলেন।

চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে গেল।

শেষে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তিনি স্থির করিলেন, রাণীকে এ কথা বলিতেই হইবে। সেই কার্য্যেই তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার কোন কার্য্যে, ভাবে বা অভাবে রাণীর কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না। তাহা তিনি জানিতেন। সেই জন্যই তিনি দুই দিন ভাবিতেছিলেন, কিরূপে রাণীকে এ বিষয়ের জন্য বিরক্ত না করিয়া কার্য্য শেষ করিতে পারেন। তিনি রাণীর ভাব জানিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব আপনার কার্য্যে নির্লিপ্ত রাখিতে সচেষ্ট হইতেন। এখনও তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন—কিরূপে সেই চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। রাণী কি ভাবিবেন? তিনি হয় ত বিরক্ত হইবেন। এইরূপ নানা চিন্তায় রাজা চিন্তিত ছিলেন।

আশ্রম-গৃহসংলগ্ন ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা বহুক্ষণ উপায়-চিন্তা করিলেন। কিন্তু কোনরূপ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা রাণীকে একবার বলিয়া দেখিবেন, স্থির করিয়া রাজা প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রাসাদে ফিরিতে ফিরিতে আবার ভাবনা হইল,—রাণী প্রকাশ্য অসম্মতি নাও জানাইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহার কথায় বা ভাবে অসম্মতির চিহ্ন প্রকাশ পায়, তখন কি করা কর্ত্তব্য হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই দিন রাজা তাঁহার বিশ্রামগৃহ ও শুদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তী উদ্যান অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুই দ্বার অতিক্রম করিয়া তিনি বেত্র-ধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী কোথায়?"

বেত্রধারিণী জানাইল, রাণী উপবনে গিয়াছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রাণী উদ্যানে—একাকিনী; উমা ভ্রাতৃ-গৃহে—শঙ্করসিংহের অনুপস্থিতিতে উমা প্রায়ই পিত্রালয়ে যায়।

উপবনে প্রবেশ করিয়া রাজা ইতস্ততঃ রাণীর সন্ধান করিলেন তাঁহাকে না পাইয়া তিনি ক্রমে উদ্যান-প্রান্তস্থিত কুঞ্জগৃহে উপনীত হইলেন।

সেই কুঞ্জগৃহের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত আধারে একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রস্রবণ স্বচ্ছ সলিল উদ্গীর্ণ করিতেছিল—জল বহুধারায় উঠিয়া আধারে পড়িতে-ছিল। তাহারই পার্শ্বে দুইজনের উপবেশনজন্য দীর্ঘ মর্ম্মরের আসনে রাণী বসিয়া ছিলেন। আধারের জলে তাঁহার বেষ্টন-সংস্থাপিত—নিতান্তলাক্ষারসরাগ-লোহিত চরণের প্রতিবিম্ব কম্পিত হইতেছিল। চারিপার্শ্বে মন্দানিলাকুলিত-চারুশাখ গুল্ম। কুঞ্জমধ্যে পবন স্নিগ্ধস্পর্শ—সুখদ; রবিকর সযত্নে অপসারিত।

রাজা প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রাণীর আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধলাবণ্যসঞ্চার লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন, সে স্নিগ্ধ লাবণ্য কোমল আলোকপাতের ফল। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সহসা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া রাণীর নয়নে যে উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

আজ সহসা অন্তঃপুরে সম্মুখে রাজাকে দেখিয়া রাণী হৃদয়ে যে পুলক-কম্পন অনুভব করিলেন—কই প্রথম প্রিয়সমাগমকালের পর আর ত তিনি তাহা অনুভব করেন নাই।

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "উপবেশন কর। আমি একটু আবশ্যক কার্য্যে আসিয়াছি।"

রাণী বসিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রাজাও বসিবেন। হায়—আশা কি সামান্য ভিত্তির উপর বিরাট প্রাসাদ রচিত করে! কিন্তু রাণীর হিসাবে ভুল হইয়াছিল।

রাজা দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাণীর একবার ইচ্ছা হইল, রাজাকে বসিতে বলেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিল না। আজ কত দিন—হায় কত কাল—স্বামী-স্ত্রীর সেরূপ ঘনিষ্ঠভাব গিয়াছে! এত দিনের অভ্যাস এক দিনে যায় না। রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—উভয়ের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, অথচ—! রাজা বলিলেন, "আমি

তোমাকে একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। অন্য উপায় থাকিলে আমি তোমাকে বিরক্ত করিতাম না।"

রাণী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজার এই কথায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

রাজা বলিলেন, "অজয় বিবাহ করিয়াছে।"

রাণী বিস্মিতভাবে রাজার মুখে চাহিলেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলেই রাণীর দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "অজয় আমাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু আমি এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কারণ, অজয় স্বয়ং দেখিয়া—ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে।"

রাণীর হৃদয়ে যেন বেদনার হিল্লোল বহিয়া গেল। ভালবাসা! ভালবাসার সুখলাভ যাহার ভাগ্যে ঘটে না—দুঃখলাভমাত্র সার হয়; যে কুসুম চয়ন করিতে পারে না—কেবল কণ্টকাঘাত ভোগ করে, তাহার মত দুঃখী কে? যে বহুদিন পরে আপনার সে দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার দুঃখের অন্ত নাই।

রাজা বলিলেন, "বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমি উভয়ের প্রকৃত মনোভাব অবগত হইতে ইচ্ছা করি। সেই জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। আগামী কল্য তোমার কোন আবশ্যক কার্য্য আছে কি?"

রাণী শিরঃসঞ্চালনে জানাইলেন,—না। তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, স্বামীর চরণে পতিত হইয়া বলেন,—তোমার নির্দ্দিষ্ট—তোমার অভিপ্সিত কার্য্য অপেক্ষা আমার আর কোন কার্য্য বড়?

কতকগুলি ভূমিচম্পক-গুল্ম প্রস্রবণাধার বেষ্টিত করিয়া ছিল। তাহাদের একটি অসময়ে কুসুমশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—প্রস্ফুটোন্মুখ কোরক কেবল লজ্জারক্ত হইতেছিল। রাজা সেইটিকে নাড়িতে নাড়িতে আপনার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাণী নিবিষ্টচিত্তে—মুগ্ধভাবে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

সে কথা শেষ করিয়া রাজা বলিলেন,"বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে পারিয়াছি, এ কার্য্য তোমার সাহায্য ব্যতীত নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব; তাই অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করিলাম। তোমার সুবিধা হইবে কি?"

রাণী বলিলেন "হাঁ।" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনের ভাব যদি তিনি কথায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তবে তিনি বলিতেন,—

তোমার কার্য্যে আমার অসুবিধা! আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব, তোমার আদেশপালন করিতে পাইলেই আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি,? হে বাঞ্ছিত—হে ঈপ্সিত—হে প্রিয়,—আমি কোন্ উপায়ে তোমার হৃদয়ে স্থান পাইব? তুমি বলিয়া দাও, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে আমার পূর্ব্বপাপের ক্ষয় হইবে।

রাজা ফিরিয়া যাইলেন। রাণী এতক্ষণে কেবল একবার একটি ক্ষুদ্র কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যে কথার পথ রুদ্ধ করিতেছিল, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, রাণীর এই বাক্ কার্পণ্য তাঁহার সেই পরিচিত ভাবের বিকাশমাত্র। তাঁহার কার্য্যে রাণীর ইচ্ছা বা আপত্তি কিছুই নাই—অনুরাগ বা বিরাগ নাই। তবে যে তিনি আজ এ কার্য্য করিতে সম্মতা হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় রূঢ়তা পরিহারের জন্য।

রাজা চলিয়া যাইলেন;—রাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

রাজা কুঞ্জগৃহের বাহিরে গমন করিলে রাণী রাজার অঙ্গুলিপৃষ্ট উন্মেদোন্মুখ ভূমিচম্পক কোরকটি তুলিয়া লইলেন,—অসীম আবেগে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সে-ও তাঁহার অপেক্ষা ভাগ্যবান; সে রাজার আদর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আর তিনি—? তাঁহার জীবন বৃথা।

তাহার পর তিনি বিহ্বল ভাবে রাজার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কেন আমাকে তোমার কার্য্য করিতে আদেশ দিলে না? তোমার আদেশ-পালনে আমার কত সুখ! যেখায় তুমি প্রভু, তুমি স্বামী—সব তোমার সেখায় তুমি কুণ্ঠিতভাবে আসিলে কেন? সে স্থানে তুমি আদেশকর্ত্তা না হইয়া অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিরূপে দেখা দিলে কেন? কেন আমার কাতর হৃদয়ে এ শেল বিদ্ধ করিলে? আমার এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না! আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি দয়াময়, তুমি কি ক্ষমা করিবে না? আজ এ রাজ্যের দীন প্রজাও তোমার দয়ায় বঞ্চিত নহে—কেবল কি আমি সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব না? আমার অপরাধ পদে পদে। সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা না করিলে আর কে করিবে?"

রাণীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহিল।

সন্ধ্যার সময় উমা ভ্রাতৃগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিল;—আসিয়া শুনিল, রাণী উপবনে। সে কুঞ্জগৃহে আসিয়া দেখিল, গৃহ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—রাণী নির্ঝরকূলে শিলাসনে উপবিষ্টা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আত্ম-পরিচয়।

—:০:—

রাজার নিকট হইতে অজয় সিংহ ভাবিতে ভাবিতে প্রাসাদের তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে ফিরিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, শক্তসিংহকে কি বলিবেন? রেবার নিকট কিরূপে আত্ম-পরিচয় দিবেন? রাজা কি জন্য রেবাকে আনিতে বলিলেন?

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় অজয় সিংহের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অজয় সিংহ কখনও এরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েন নাই। তিনি চিন্তা-সাগরে কূল পাইতে ছিলেন না।

পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; অপরাহ্নে অশ্ব সজ্জিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে শক্ত সিংহের গৃহে চলিলেন। পথ হইতে দূরে সমীরান্দোলিত, পরিচিত ক্রমশীর্ষ দেখিয়া সে ভাবনা দূর হইয়া গেল—হৃদয় প্রিয়দর্শনলালসায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রেম অন্ধকারকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলে; নিরসকে সরস করে, চিন্তার যাতনা দূর করে; বিষাদের বিষদন্ত উৎপাটিত করে। তিনি যতই সেই গৃহের নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি শক্ত সিংহকে বলিলেন, রাজধানীতে তাঁহার কোন আত্মীয়গৃহে কর্ম্মোপলক্ষে পরদিন রেবার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। পরদিন সেই গৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন। তিনি সেই কথা বলিতে আসিয়াছেন।

শক্ত সিংহ কন্যাকে প্রেরণপক্ষে কোন আপত্তি করিলেন না। অজয় সিংহ নিশ্চিন্ত হইলেন।

অজয় সিংহ সেই দিনই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, মনে করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শক্ত সিংহের গৃহের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সে রাত্রিও তিনি প্রসাদে অনুপস্থিত রহিলেন।

সেই রাত্রিতে রেবা তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। কোথায় যাইতে হইবে? যাঁহাদিগের গৃহে যাইতে হইবে, তাঁহারা কে? সে গৃহে কে কে

আছেন? তাঁহারা না জানি কি বলিবেন? রেবা স্থির করিয়াছিল, তাঁহারা অতি উত্তম লোক; কেন না, তাঁহারা তাহার স্বামীর আত্মীয়। তাঁহাদিগের দর্শনাশায় রেবা উৎফুল্লা হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রেবার সেই নিশ্চিন্ত প্রফুল্লতা তাহার স্বামীর হৃদয়ে সংক্রমিত হইল। তাঁহার হৃদয় হইতে অনিশ্চিত আশঙ্কার ছায়া দূর হইয়া গেল।

তাহার পর দুইজনে কত কথা হইতে লাগিল! প্রেমিকপ্রেমিকার কথা;—সে কথা কি ফুরায়! দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইয়া উঠিল। এ উহার অনিদ্রায় শঙ্কিত; এ উহাকে ঘুমাইতে অনুরোধ করে। কিন্তু আবার কথা আসিতে লাগিল, ফলে কাহারও নিদ্রা হইল না; কিন্তু কাহারও নিদ্রার প্রয়োজন অনুভূত হইল না!

প্রভাতে অজয় সিংহ বিদায় লইলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "নিমন্ত্রণগৃহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ত?"

"হইবে"—বলিয়া অজয় সিংহ পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি সে গৃহ হইতে যত দূরে যাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে আবার আশঙ্কার ছায়াপাত হইতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে প্রাসাদ হইতে দুইখানি শিবিকা শক্ত সিংহের গৃহে আসিল। উমা রেবাকে লইতে আসিল, উপদেশানুসারে উমা অজয় সিংহের প্রকৃত পরিচয় দিল না। রাণী এ বিষয়ে তাহার সহিত বিশেষরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। তিনি একার্য্যে যেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছিলেন, উমা বহুদিন কোন কার্য্যে তাঁহার সেরূপ উৎসাহ লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সে ইহার কারণ জানিত না। রাজা তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, সে কার্য্য করিতে রাণী এখন পরম আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

অন্তঃপুরের যে পথে আমরা একদিন ছদ্মবেশধারী রাজাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই পথে অপরাহ্নে দুইখানি শিবিকা শুকান্তের উপবনে প্রবেশ করিল। রেবা পতিগৃহে আসিল। পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, সেইজন্য সাধারণ শিবিকা ব্যবহৃত হইয়াছিল; বাহকগণও অতি সাধারণ বেশে সজ্জিত ছিল। বাহকগণ চলিয়া যাইলে উমা বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিল, তাহার পর রেবাকে বাহির হইতে বলিল।

রেবা বাহির হইয়া দেখিল, সে অতি রমণীয় উপবনে উপস্থিত; উপবন মধ্যে অট্টালিকা—অতি উচ্চ—নয়নারাম। রাজার পিতা অন্তঃপুরের একাংশে আবশ্যক

কক্ষাদি নির্ম্মিত করাইয়া সেই অংশ কনিষ্ঠপুত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সে অংশও সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু সে অংশ ব্যবহৃত হয় নাই। অকৃতদার অজয় সিংহের অন্তঃপুরে কি প্রয়োজন? রাণী সেই সকল বদ্ধ কক্ষের দ্বার মুক্ত করাইয়া গৃহসজ্জা পরিষ্কৃত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উমা রেবাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের সেই অংশে গমন করিল।

অজয় সিংহ জীবনে এই প্রথম অন্তঃপুরে কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া রেবা গৃহ-সজ্জা দেখিয়া বিস্মিতা হইল—সকল দ্রব্যই কারুকার্য্যবহুল—সকল দ্রব্যই বহুমূল্য। কিন্তু গৃহ যেন জনশূন্য! কই কেহই ত তাহার অভ্যর্থনা করিল না! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রেবা উমার অনুসরণ করিয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিল। তথায় অজয় সিংহ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উমা চলিয়া গেল।

রেবা মৃদুস্বরে অজয় সিংহকে জিজ্ঞাসা করিল, "গৃহের সকলে কোথায়?

অজয় সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এই স্থানে।"

রেবা বিস্ময়বিহ্বল ভাবে পতির দিকে চাহিল।

অজয় সিংহ হাসিতে লাগিলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে যাঁহাদিগের গৃহে আনিলে, তাঁহাদিগকে ত দেখিতেছি না! তাঁহারা কোথায়?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "তাঁহারা পার্শ্বস্থ গৃহে আছেন।"

রেবা মুগ্ধনেত্রে গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে বলিল, "এ গৃহের সবই বহুমূল্য দেখিতেছি। এ গৃহ কাহার?

অজয় সিংহ বলিলেন, "তোমার।"

এবার রেবা হাসিল—সে হাসি অবিশ্বাসের। সে ভাবিল, তাহার স্বামী তাহার সহিত রহস্য করিতেছেন;

রেবা হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্য বল,—এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ আবার বলিলেন, "সত্য বলিতেছি,—তোমার।"

রেবা তখনও ভাবিল, তাহার স্বামী রহস্য করিতেছেন। সে আবার বলিল, "রহস্য রাখ। সত্য বল, এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমার গৃহ কি তোমার গৃহ নহে?"

রেবা বহুমূল্য গৃহসজ্জার দিকে চাহিল, বাহিরে মনোরম উদ্যান দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন কোন মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। একি স্বপ্ন! সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর সে বলিল, "এ গৃহ কি তোমার?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "হাঁ।"

"এযে প্রাসাদ! এই তোমার গৃহ?"

অজয় সিংহ হাসিতে লাগিলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি সৈনিক নহ?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন, "আমি সৈনিক।"

"তবে এ প্রাসাদ কাহার?"

"আমার।"

রেবা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ক্রমেই অধিক বিস্মিতা হইতে লাগিল। তাহার নয়ন-যুগল জলে ভরিয়া আসিল। সে বলিল, "তুমি কি আমাকে সত্য কথা বলিবে না?"

সৈনিক তাহার সেই অশ্রুসজল নয়ন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "প্রাসাদের এই অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। আমি রাজার ভ্রাতা—অজয় সিংহ।"

অজয় সিংহ! যিনি প্রেমলাভ ঘটিবে কি না, সন্দেহ করিয়া বহু রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই আদর্শ-পুরুষ—সেই বীর—সেই কবি অজয়সিংহ তাহার জীবন সার্থক—ধন্য করিয়াছেন! মুহূর্ত্তের জন্য রেবা চেতনাহীন মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে পতির বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অজয় সিংহ সেই কোমলা কনকলতাকে বক্ষে ধরিয়া ধরার অমরার সুখ অনুভব করিলেন।

তাহার পর—আনন্দের প্রথম প্লাবন প্রশমিত হইলে অজয় সিংহ পত্নীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি যে রাজাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছেন; রাজা যে এ কথা জানিতে পারিয়াছেন, দুই ভ্রাতার যে কথোপকথন হইয়াছে; রাজা যে আদেশ করিয়াছেন, অজয় সিংহ একে একে রেবাকে সে সকল কথা বলিলেন।

অজয় সিংহ বলিলেন, "রাজা আজ কি জন্য তোমাকে আনিতে বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নহি। সম্ভবতঃ তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রেবা বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করিবেন?"

"তাহা ত আমি জানি না। সেই কথাই ভাবিতেছি।"

"সে জন্য ভাবনা কেন? তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহাই বলিব।"

—যিনি স্বামীর ভ্রাতা—যাঁহার যশ আজ রাজ্যের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত—যাঁহার দয়ার কথা আজ লোকপ্রসিদ্ধ—তাঁহার প্রশ্নে ভয় কি? তিনি কি কঠোর হইতে পারেন? রেবা সরলা—প্রেমবিহ্বলা—সে কথা কল্পনাও করিতে পারিল না।

অজয় সিংহ ভাবিলেন, সত্য সত্যই ভাবনা কেন? ভাবিয়া যখন কিছু স্থির জানা অসম্ভব, তখন ভাবনা অনাবশ্যক। বিশেষ রেবাকে তিনি কি শিখাইবেন? রেবার বুদ্ধির ও বিবেচনার পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, রাজা যাহাই জিজ্ঞাসা করুন, রেবাকে তাহার উত্তর শিখাইতে হইবে না। এইরূপে বিশ্বাসই প্রেমের ফল—প্রেম প্রেমিকজনকে পরস্পরের সম্বন্ধে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে শিখায়।

কাযেই সে কথা আর আবশ্যক বোধ হইল না।

তখন রেবা বলিল, "তুমি এত দিন আত্মপরিচয় দাও নাই কেন?"

অজয় সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি তুমি আমাকে অধিক ভালবাসিতে?"

রেবা উত্তর করিতে পারিল না। অজয় সিংহকে সামান্য সৈনিক জানিয়া সে তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিয়াছে, তিনি রাজাধিরাজ জানিলে কি সে তাঁহাকে তাহার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিত? সে যে হৃদয়ের পূর্ণ প্রেম সেই সৈনিককে দিয়াছে—আর ত কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই! সে তাঁহাকে তাহার হৃদয়েশ্বরের আসনে বসাইয়াছে—কোন্ রাজরাজেশ্বরের আসন তদপেক্ষা আদরণীয়; আজ অজয় সিংহ তাহার সমগ্র হৃদয় ব্যাপিয়া বিদ্যমান—তাহা তিনি সৈনিক বলিয়া নহেন—রাজভ্রাতা বলিয়া নহেন; তাহার পতি—তাহার জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া। রেবা তাহা বুঝিতে পারিল। সে আর কি উত্তর দিবে?

পাষাণের কথা

—:০:—

(৬)

পরদিন প্রভাতে অধিকাংশ নগরবাসী অর্চ্চনা করিবার জন্য স্তূপে আসিল। হিমকণ-ধৌত হেমন্ত প্রভাতে নবজাতসূর্য্যকরস্নাত হইয়া দলে দলে কৌষেয়বস্ত্র পরিহিত নগরবাসী স্তূপ দর্শন, প্রদক্ষিণ ও অর্চ্চন করিয়া গেল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, নবনির্ম্মিত স্তূপের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; নানা দেশ হইতে জনসঙ্ঘ স্তূপদর্শন করিতে আসিল। এইরূপে নবাগতের কোলাহলে কিছুকাল কাটিয়া গেল। কাল-নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমার যদি থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত স্তূপের ইতিবৃত্ত বলিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমার জন্মের প্রথম দিবস হইতে চিত্রশালায় আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিতে পারি, কিন্তু কোনও ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিছুকাল গত হইলে যখন স্তূপ পুরাতন হইল, তখন দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিত সংখ্যক স্থবির ও স্থবিরা স্তূপদর্শন করিতে আসিতেন। ক্বচিৎ কখনও দূরদেশাগত তীর্থযাত্রী তথাগতের শরীর-দর্শন-মানসে নগরে আসিতেন; সেই দিন বৃদ্ধ মহাস্থবির মহোল্লাসে গর্ভগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে আসিতেন। তিনি স্তূপবেষ্টনীর বহির্ভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিত সঙ্ঘারামে বাস করিতেন। একদিন দেখিলাম, পুষ্পচন্দনশোভিত মহাবৃদ্ধ মহাস্থবিরের শবদেহ ভিক্ষুসঙ্ঘ নগরাভিমুখে লইয়া গেল। নগরে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। প্রান্তরমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র নদীতীরে প্রাচীন মহাস্থবিরের দেহ ভস্মীভূত হইল। একদিন শুনিলাম, সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুকগণ রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়াছেন, রাজা অগরাজুর অন্তিমকাল উপস্থিত। অগরাজুর মৃত্যু হইল। তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল, তক্ষশিলা হইতে সিংহদত্তের নির্ব্বাণ লাভের সংবাদ আসিল। তাহার পরই প্রলয় ঝটিকা উত্থিত হইল।

পতনোন্মুখ যবনজাতিকে, বোধ হয়, সিংহদত্তই দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বভাষাচ্যুত যবনজাতির মধ্যে একতার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল।

সিংহদত্তই বন্ধনরজ্জুর ন্যায় কাষ্ঠ খণ্ডগুলি একত্র রাখিয়া ছিলেন। সেই রজ্জুর প্রভাবেই যবনগণ শকজাতির প্রথম আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শকদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় শকজাতি দলে দলে মহানদী পার হইতেছে, মহানদী আর শকযবনাধিকারের সীমা নাই। কপিশায় শকরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। গান্ধার, উদ্যান, উরসা ও টক্কদেশে যবনরাজগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও সিংহদত্তের জন্য—সিংহদত্তের প্রভাবে। সিংহদত্তের অবর্ত্তমানে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে, সে চিন্তা মধ্যদেশের রাজগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। প্রাচীন পৌরবরাজ্যের অধঃপতনে তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন, স্বধর্ম্মত্যাগী সিংহদত্তের প্রভাববৃদ্ধিতে তাঁহারা ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহদত্ত তাঁহাদিগের জন্য কি করিতেছেন, সিংহদত্তের অভাবে তাঁহাদিগের কি উপায় হইবে, কুরুক্ষেত্র হইতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত কোন রাজাই সে বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। সিংহদত্তের অভাব হইলে মথুরার অধিকার বঞ্চিত হইয়া রামদত্ত সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, আজ বর্ষীয়ান পৌরব মহাবীর জীবিত থাকিলে শকগণকে সুরম্য নদী পার করিয়া রাখিয়া আসিতাম।

প্রতিদিন পূর্ব্ব তোরণের নিম্নে বসিয়া স্তূপসংলগ্ন সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ আর্য্যাবর্ত্তের বর্ত্তমান অবস্থার কথার আলোচনা করিতেন। তাঁহাদিগের নিকটই শুনিতাম যে, মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মিরাশির ন্যায় শক জাতি আর্য্যাবর্ত্ত আচ্ছন্ন করিতে আসিতেছে; সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে আর আর্য্যাধিকার নাই। বাহ্লীকের যবনরাজ্য ধ্বংস হইলে পারদরাজগণ শকপ্লাবনস্রোত রোধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুদূর যোনদ্বীপে ও মিস্রাইমে আন্তীয়ক ও তুরময় বংশীয় রাজগণ শকজাতির আক্রমণভয়ে কম্পিত হইতেছেন, শকজাতির গতিরোধের চেষ্টায় চারিজন পারদরাজ জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, পঞ্চমের জীবন সঙ্কটাপন্ন। শকস্রোত ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। উপনগরবাসী জনৈক ব্যক্তি জালন্ধরে শকসৈন্য দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট হইতে শকজাতির বিবরণ শুনিবার জন্য কৌশাম্বি হইতে রাজদূত আসিয়াছে। ক্রমশঃ শ্রুত হইল, মথুরায় রামদত্ত ও ত্রিগর্ত্তে উত্তমদত্তের অধঃপতন হইয়াছে; অতি প্রাচীন চেদীরাজবংশ মৎস্যদেশের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। একদিন সংবাদ আসিল যে, শকসৈন্য নগর অধিকার করিতে আসিতেছে। নগরের কথা বলি নাই! অগ্রাজুর শিশু পুত্র যথাসময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত, জরাগ্রস্ত ও কালকবলিত হইয়াছেন। তাঁহার পর তদ্বংশের

অপর রাজবংশ সিংহাসন অধিরোহণ করিয়াছিলেন। শক আক্রমণ কালে যিনি নগরাধিপতি ছিলেন, তাঁহার সন্ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। তখন আর্য্যাবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যবাসী অন্ধ্রজাতির অধিকার। সদ্ধর্ম্মদ্বেষী সুঙ্গবংশের অধঃপতন হইয়াছে। তৎপদানুবর্ত্তী অহিচ্ছত্রবাসী বিশ্বাসঘাতক কাণ্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণও নির্ম্মূল হইয়াছে; আর্য্যাবর্ত্তের রাজচক্রে শিথিলতা প্রবেশ করিয়াছে। পাটলী-পুত্রে অন্ধ্ররাজের জনৈক কর্ম্মচারী বাস করেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা মগধের বহির্দ্দেশে লক্ষিত হয় না। যে দিন সংবাদ আসিল, শকরাজের বিপুলবাহিনী নগর হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে শিবিরস্থাপন করিয়াছে, সে দিন নগরাধিপতির সত্য সত্যই ঘোর দুর্দ্দিন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর সুঙ্গরাজগণ কিয়ৎ পরি-মানে করদরাজগণকে সম্রাটের প্রভাব অনুভব করাইতে পারিতেন; কিন্তু পরবর্ত্তী রাজগণ এককালীন ক্ষমতাহীন ছিলেন, নামে মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত অন্ধ্রসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। অধিকাংশ আর্য্যাবর্ত্তবাসী অন্ধ্র কি তাহা জানিত না; কেহ কেহ বলিত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতীয়, কেহ বা বলিত, তাহারা দস্যু। দাক্ষিণাত্যের কোন নিভৃত উপত্যকায় অন্ধ্ররাজের রাজধানী অবস্থিত ছিল, আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ নগরে, তাহা অনেকেই অবগত ছিলেন না। যে দিন শ্রুত হইল যে, পঞ্চাশৎসহস্র শক অশ্বারোহী নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে, সে দিন নগরাধিপতিকে সাহায্য করে এমন ব্যক্তি কেহই ছিল না। আসন্ন বিপদশঙ্কায় ব্যাকুল নরনারী দলে দলে নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিল, সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুগণ উজ্জয়িনীর পথে প্রস্থান করিলেন, নগরে এমন লোক রহিল না যে, নগর-প্রাকার রক্ষা করে। শক সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া শুক্লবসন পরিহিতা রাজমাতা বুদ্ধের শরীরনিধান সম্মুখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন; মুষ্টি-মেয় শরীররক্ষী লইয়া তরুণ রাজা শক সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহারা নগর ত্যাগ করিয়া যায় নাই তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সুশিক্ষিত রণদক্ষ সৈন্য, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা এত সামান্য যে, পঞ্চাশৎসহস্র অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে তাহারা একপদ তিষ্ঠিতে পারিত কি না সন্দেহ।

পর দিন প্রভাতে নগর নিস্তব্ধ, জনশূন্য। প্রান্তরে কৃষক হলকর্ষণ করিতে বা মেষপাল চারণ করিতে আসে নাই। প্রতিদিন প্রত্যূষে সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ তথাগতের শরীর অর্চ্চনা করিতে আসিতেন, কিন্তু সে দিন বেষ্টনী, স্তূপ, গর্ভগৃহ জনশূন্য, গর্ভগৃহ মধ্যে মৃতপ্রায়া রাজমাতা শরীর-নিধানের সম্মুখে ধূলিতে লুটাইতেছেন। বহুদূরে বহু অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল, ক্রমে উত্তরে ঘন কৃষ্ণবর্ণ

মেঘের ন্যায় শকসৈন্যের পুরোভাগ দৃষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রান্তরস্থিত নদীতীরে আসিয়া উপনীত হইল। তখন নবোদিত সূর্য্যের কিরণমালা আসিয়া স্তূপের উচ্চ চূড়া কেবল স্পর্শ করিয়াছে। রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুগঠিত স্তূপ ও বেষ্টনী দেখিয়া একবার যেন তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সুশিক্ষিত বলবান অশ্বগণ এক এক লম্ফে ক্ষীণকায়া নদী পার হইয়া আসিল। তাহাদিগের উজ্জ্বল লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ প্রভাত সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই কৃষ্ণবর্ণ মেষচর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, অদৃষ্টপূর্ব্ব আয়ুধসমূহ ও ঘোর রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভয়াবহ। সমান্তরালে পংক্তির পর পংক্তি অশ্বারোহী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল, দ্বিগুণ অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিতে প্রান্তর অন্ধকার হইয়া গেল, সর্ব্বশেষ পংক্তি শত্রুর সন্ধানে স্তূপবেষ্টনী অভিমুখে আসিল। বেষ্টনী ও সঙ্ঘারাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী তোরণপথে প্রদক্ষিণের মধ্যে প্রবেশ করিল, অশ্বপদশব্দে ত্রস্তা রাজমাতা যেমন গর্ভগৃহ হইতে বহির্গতা হইতে যাইবেন, অমনই জনৈক অশ্বারোহীনিক্ষিপ্ত অষ্টহস্ত পরিমিত শূল তাঁহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিল। তাঁহার মৃতদেহ গর্ভগৃহ মধ্যে পতিত হইল। স্তূপ খননকালে সুবর্ণখচিত বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রজড়িত রাজমাতার অস্থিনিচয় তোমরা পাইয়াছিলে; অবজ্ঞা করিয়া তাহা সংগ্রহশালায় উঠাইয়া আন নাই, পলিতকেশ শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের উপদেশ অবহেলা করিয়াছিলে। তখন যদি উহার কাহিনী জানিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা সাদরে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতে। শকসৈনিক নিক্ষিপ্ত শূল রাজমাতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মেরুদণ্ডে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, শূলের ফলক ও তৎসংলগ্ন অস্থিখণ্ড এখন বর্ব্বরগ্রামে উপাসনার সামগ্রী হইয়াছে, অবশিষ্ট অস্থিখণ্ড ও বহুমূল্য বস্ত্রের অবশেষ ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছে। নগরধ্বংসের পরদিন সঙ্ঘারামের জনৈক প্রাচীন পরিচারক অতি সন্তর্পণে আসিয়া স্তূপ, বেষ্টনী ও সঙ্ঘারাম সন্ধান করিতে লাগিল; গর্ভগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল যে, শূলের কাষ্ঠদণ্ডের অর্দ্ধভাগ দ্বারের বাহিরে রহিয়াছে, দ্বারদেশে ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রাণশূন্য দেহ পতিত রহিয়াছে। বহু যত্নেও সে দেহ হইতে শূল মোচন করিতে পারিল না; তাহার জীর্ণ দেহে, ক্ষীণ হস্তে এমন বল ছিল না যে, মেরুদণ্ডে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত বৃহৎ শূল টানিয়া বাহির করে। সে ধীরে ধীরে মৃতদেহ উঠাইয়া গর্ভগৃহের এক কোণে স্থাপিত করিল ও সঙ্ঘারাম হইতে কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ আনিয়া মৃতদেহের জন্য আধার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। আধার প্রায় নির্ম্মিত হইয়াছে, এমন সময় দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল; কাষ্ঠ ও

অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরিচারক পলায়নোদ্যত হইল, স্তূপের বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, একজনমাত্র অশ্বারোহী স্তূপাভিমুখে আসিতেছে ও তাহার উষ্ণীষ ভারতবাসীর ন্যায়। তখন সে আশ্বস্ত হইয়া প্রতীক্ষায় তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান হইল; অশ্বারোহী নিকটে আসিলে পরিচারক তাহাকে চিনিতে পারিল, সে নগররক্ষী জনৈক সৈনিক, তাহার সহিত নগরের পতন সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। অবশেষে তাহার সাহায্যে রাজ্ঞীর দেহ বৃহৎ কাষ্ঠাধারে আবৃত করিয়া উভয়ে কাষ্ঠাধার গর্ভগৃহের এক কোণে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। গর্ভগৃহের দ্বার কিয়ৎকালের জন্য রুদ্ধ হইল। সৈনিক কহিয়াছিল, ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় শকসৈন্য নগর প্রাচীরের উপর পতিত হইয়াছিল, অবলীলাক্রমে পরিখা ও প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। নগররক্ষীরা কেহই জীবিত নাই, একজন চলচ্ছক্তি বিহীন বৃদ্ধ ভিক্ষু দক্ষিণ নগর তোরণের আকাশকক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছেন। কয়েকজন নগরবাসী নগরধ্বংসের পর আসিয়া মৃতদেহের সৎকার করিয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই পার্ব্বত্য-ভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। শকগণের অত্যাচারের আশঙ্কায় কেহই সমতল ভূমিতে আসিতে চাহে না।

দিনের পর দিন যায়, আমাদিগের নিকটে আর মানবসমাগম হয় না। ক্রমে প্রদক্ষিণের পথ তৃণসঙ্কুল হইয়া উঠিল, বেষ্টনীর মধ্যে ও প্রান্তরে নির্ভয়ে মৃগযূথ বিচরণ করিতে আসিত, কিছুকাল পরে দৃষ্ট হইল, নগরে ও নগর-প্রাকারে মহাকায় বৃক্ষসকল জন্মিয়াছে, পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত নগর দেখিলে বোধ হইত যেন উহা কোন শ্রেষ্ঠীর সুরক্ষিত উদ্যান। ক্রমে প্রান্তরেও বৃক্ষ জন্মিতে লাগিল। কিয়ৎকালপরে নগর আর নয়নগোচর হইত না। আমার পার্শ্বে একটি লতা জন্মিয়াছিল, দারুণ নিদাঘ উত্তাপেও আমার ছায়া পাইয়া সে জীবিতা ছিল, সে অনেক কথা কহিত; কিন্তু তাহার ক্ষীণস্বর আমার কর্ণ পর্য্যন্ত আসিত না। সেই জন্যই বোধ হয় সে বেষ্টনীর স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আমার নিকটে উঠিয়া আসিল। সে আসিয়া আমার পরুষ দেহ বেষ্টিত করিয়া রহিল। সে যতদিন ছিল ততদিন তাহাকে অতীতের কথা বলিতাম, সে শুনিয়া বিস্মিতা হইত। তাহার জীবনে সে কখন মনুষ্য দেখে নাই, সুতরাং শ্বেত, কৃষ্ণ, ও মিশ্রবর্ণের কথা শুনিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইত। একটি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ স্তূপ-শীর্ষস্থ ছত্রের উপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষ মহাকায় মহীরুহে পরিণত হইল। তাহার ভারে এক বর্ষা রজনীতে সশব্দে সপ্তছত্র সমন্বিত

স্তূপশীর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন মৃগযূথ আসিয়া আমার সঙ্গিনী লতিকার অধোদেশ ভক্ষণ করিয়া গেল, সে দারুণ মৃত্যু-যাতনায় কাঁদিয়া উঠিল। মৃগযূথ নিঃশঙ্কে তৃণবংশধ্বংস করিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না। ধরাশায়ী অশ্বত্থের শাখাপ্রশাখাগুলি কম্পিত হইয়া সমবেদনা জানাইল ও কহিল, আমরাও অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। দুই তিন দিন সূর্য্যতাপে লতিকাও শুকাইয়া গেল, পরে সংস্কারকালে মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের পরিচারক আসিয়া তাহার অবশেষ দূরে নিক্ষিপ্ত করিল।

একদিন মধ্যাহ্নে বহুদূরে হস্তিপদশব্দ শ্রুত হইল। অতীতকালে যে দিকে নগরোপকণ্ঠ ছিল সেই দিক হইতে ক্রমাগত মহাবৃক্ষসমূহের পতন শব্দ, শুষ্ক পত্রসমূহের মর্ম্মরধ্বনি ও বেতস-লতার উৎপাটন শব্দ আসিতে লাগিল। ভয়ে বনবাসী জীবজন্তু-সমূহ স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। বেলা তৃতীয়প্রহরে বনমধ্য হইতে চারিটি হস্তী কতিপয় মনুষ্যকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ক্রমে হস্তিচতুষ্টয় আসিয়া তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলে সকলে অবতরণ করিলেন; দেখা গেল তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত, দুইজন মলিনকাষায় পরিহিত ভিক্ষু ও একজন উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক হস্তীর স্কন্ধদেশে এক একজন হস্তিপক উপবিষ্ট ছিল। বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা অধিকদূর আসিতে পারিলেন না, কারণ পদে পদে বেতস-লতা তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহাদিগের কথোপকথনে বুঝিলাম, মেষচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ নগরে বাস করিতেন, শক আক্রমণে তাঁহারা পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহাদিগের বংশধরেরা কেহই উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয়েন নাই। শকজাতি আর ভ্রমণশীল নাই। তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, নবাগত কুষণ বা ওষণ বংশ সমস্ত শকজাতিকে একত্র করিয়া অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। কণিষ্ক কুরুবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্যের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের অধিকারী। আরও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ শকজাতি সদ্ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছে। দেবতাদিগের প্রিয় মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শীর ন্যায় কণিষ্ক সদ্ধর্ম্মের পোষণকর্ত্তা হইয়াছেন। আবার জম্বুদ্বীপ হইতে চীন, কিরাত, মরু, ঐরাণ প্রভৃতি দেশে ভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন। সদ্ধর্ম্মের প্রাচীন তীর্থগুলির উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। কপিলবস্তুতে, মহা-

বোধিতে, বারাণসীতে, কুশীনারে, শ্রাবস্তীতে, বৈশালিতে, কৌশাম্বীতে, সঙ্কাশ্যে, বিদিশায়, মথুরায়, জালন্ধরে, তক্ষশিলায়, নগরহারে, পুরুষপুরে, কপিশায় ও বাহ্লীকে সদ্ধর্ম্মের সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে! কত পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল! উৎসবের দিন কপিলবস্তু হইতে লুম্বিনি গ্রামের মৃত্তিকা লইয়া একজন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন, পাটলিপুত্রবাসী কোন মহাপুরুষ স্তূপ নির্ম্মাণকালে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, মহাবোধী হইতে একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষু বোধীদ্রুম বংশজ ক্ষুদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ আনিয়া স্তূপবেষ্টনীর বহির্ভাগে রোপিত করিয়াছিলেন। বিদিশা-নগর হইতে বহুদূরে নহে, যাঁহারা বিদিশায় সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নের শরীর নির্ব্বাণ-বিহারে রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন উৎসবের দিন আসিয়াছিলেন। মথুরায় অগরাজুর পিতা স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচীদানে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছিলেন। তক্ষশিলা হইতে সিংহদত্ত আসিয়াছিলেন। সিংহদত্ত ও মহাস্থবিরের কথা মনে পড়িয়া গেল। তক্ষশিলার মহাবিহারের তখন কি অবস্থা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার ভাষা বুঝিবার শক্তি থাকিলে তাহারা নিশ্চয়ই উত্তর দিত, কারণ আমি এখন যে ভাবে কথা বলিতেছি চিরকালই সে ভাবে বলিয়া আসিয়াছি, আমার কথা কখনও ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর হয় নাই।

শুনিলাম স্তূপের ও বেষ্টনীর সংস্কার হইবে, তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য মহাবনের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইবে, সেইপথে রাজাধিরাজ দেবপুত্র বাহিষ্কণিক স্তূপ দর্শনে আসিবেন। ক্রমে দিবাবসান সময় আগত দেখিয়া আগন্তুকগণ প্রস্থান করিলেন। মলিন কাষায় পরিহিত ভিক্ষুকগণ এখন উপত্যকাবাসী জনপদের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন, মেষচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিদ্বয় নগরবাসিগণের বংশজাত, কিন্তু বর্ম্মাবৃত পুরুষ বিদেশীয়; তিনি শকসাম্রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত রাজ-পুরুষ, রাজাদেশে ও তথাগতের শরীর স্তূপের অন্বেষণে আসিয়াছিলেন। পর-দিবস প্রাতে বনের মধ্যে মহাকায় প্রাচীন বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইতে লাগিল. সে পথ তোমরা দেখিয়াছ। বর্ব্বর রমণীগণ এখনও শুষ্ক করিবার জন্য সেই সকল পাষাণে গোময় লেপন করিয়া থাকে। পথ নির্ম্মিত হইলে স্তূপ ও বেষ্টনী পরি-স্কৃত হইল, ক্রমে বনের একাংশে শ্রমজীবিগণের একটি গ্রাম বসিয়া গেল; স্তূপ-সংস্কার আরম্ভ হইল। অশ্বাচ্ছাদিত নবনির্ম্মিত পথে একদিন মধ্যাহ্নে চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শ্রুত হইল। আমরা শকটের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় রাজা আসিতেছেন। কিন্তু দুই প্রহরকাল অতীত হইলে দুই

হইল বৃহদাকার শকটে স্থাপিত রক্তবর্ণ প্রস্তর স্তূপাভিমুখে আসিতেছে, হস্তিদ্বয় প্রত্যেক শকট লইয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম. দূর হইতে তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারিলাম ; তাহারাও আমাদিগের ন্যায় রক্তবর্ণ পাষাণ। সমুদ্রগর্ভে একদিনে একসময়ে উৎপন্ন, বহুকাল একত্র পর্ব্বতের সানুদেশে বাস করিয়াছি, তাহারা আমাদিগেরই, নূতন নহে। তাহারা বলিল যে, আমরা চলিয়া আসিবার পর বিদীর্ণবক্ষ অল্পসময়ের মধ্যেই বনরাজীতে আচ্ছাদিত হইয়া-গিয়াছিল, বহুকাল আর কেহ তাহাদিগের অঙ্গে আঘাত করে নাই। কখনও কখনও দুই চারিজন মনুষ্য আসিয়া তাহাদিগের অঙ্গভেদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা অধিক আঘাত করে নাই। কেহ কেহ আঘাত করিয়া পাষাণলাভে সফল-কাম হইত, কেহ বা হতাশমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। অল্পদিন পূর্ব্বে মেষ-চর্ম্মাবৃত কয়েকজন মনুষ্য পর্ব্বতশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া পাষাণের অবস্থা নির্ণয় করিয়া গিয়াছিল, ইহার কয়েকদিবস পরে মনুষ্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যগণ আমাদিগকে যে ভাবে ছেদন করিয়াছিল, যে নগরে আনয়ন করিয়াছিল ও যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিল, ইহাদিগকেও তদ্রূপ করিয়াছিল, তবে ইহারা ব্রাহ্মণগণ বা সদ্ধর্ম্মের অপর কোনও শত্রুর নিকট হইতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। আমরা অনুমান করিলাম, সদ্ধর্ম্মের চিরশত্রু ব্রাহ্মণগণ মহাকোশল হইতে দূরীভূত হইয়াছে। নূতন পাষাণে স্তূপের ও বেষ্টনীর সংস্কার আরব্ধ হইল, সপ্তচ্ছত্র-মণ্ডিত স্তূপশীর্ষ আবার গগন স্পর্শ করিল, ভগ্ন বা বিদীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তর যোজিত হইল, স্বস্থান-চ্যুত পাষাণ যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত হইল, স্তূপের ও বেষ্টনীর শোভা আবার যেন ফিরিয়া আসিল। জীর্ণ সংস্কারকার্য্য কত দূর অগ্রসর হইল তাহা জানিবার জন্য সুদূর মথুরা হইতে শকসম্রাট চর প্রেরণ করিতেন, উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত সকোণ শির-স্ত্রাণ পরিহিত স্বল্পশ্মশ্রু শকজাতীয় অশ্বারোহিগণ ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য অশ্বে আরো-হণ করিয়া সংস্কার কার্য্য দেখিতে আসিত। অশ্বপদশব্দ শ্রবণমাত্রই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, শকরাজার দূত আসিতেছে।

স্তূপ, বেষ্টনী, প্রদক্ষিণের পথ ও সঙ্ঘারাম সংস্কৃত হইল। ক্রমে সঙ্ঘারামে ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নানাদেশ হইতে ভিক্ষুগণ রাজানুগ্রহলাভেচ্ছায় বনমধ্যে সঙ্ঘারামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম ক্রমে বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইল। অপরাহ্নে ভিক্ষুগণ আসিয়া স্তূপের ছায়ায় বসিয়া কথোপকথন করিতেন, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তায় পৃথিবীর সংবাদ পাইতাম।

শুনিলাম, হুবিষ্ক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কারণ সম্রাট চীন দেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন। সম্রাট চীনরাজের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী চীনরাজ অবজ্ঞাভরে তাঁহার দূতের অবমাননা করিয়াছেন। প্রতিশোধগ্রহণমানসে কণিষ্ক চীনসাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন, আর্য্যাবর্ত্তে হুবিষ্ক পিতার জীবিতকালে রাজোপাধি ধারণ করিবেন।

বহু অর্থ ব্যয়ে স্তূপ ও বেষ্টনী সংস্কৃত হইয়াছে; কিন্তু শরীরগর্ভ স্তূপে তথাগতের শরীর আবিষ্কৃত হয় নাই, গর্ভগৃহের দ্বার কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা কেহই অবগত নহে। যক্ষগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, রাজা না আসিলে গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না ও তথাগতের শরীর মনুষ্যের নয়নগোচর হইবে না। যক্ষগণের কথা সম্রাট শুনিয়াছেন, চীনযুদ্ধের আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও তিনি আসিবেন। তিনি তথাগতের শরীর দর্শন করিয়া চীনযুদ্ধে যাত্রা করিবেন. ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে এই কথাই বার বার আলোচিত হইত।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্তিমে।

—:•:—

ভিন্ন ভিন্ন শত পথ ধরি' নদীমালা
সিন্ধুর উদ্দেশে ধায় লভিতে বিরাম;
বিভিন্ন জীবন পথে চলিয়াছে নর
অন্তিমে মৃত্যুর ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য।

—:০:—

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার অতীতের বিষয়ে একটু মনোযোগ না দিলে সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না ; কারণ বুঝিতে হইবে, কোন্ শক্তির প্রভাবে ও কোন্ মন্ত্রগুণে সেই সুদূর বিস্মৃত অতীতের গভীর অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া পুরাতন কবিগণের গীতি-সমুচ্ছ্বাস আজিও অবিরত আমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। সে গীতি শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে বদ্ধ নহে। বুঝিতে হইবে, কেন বর্ত্তমান্ যুগের রূপকসমাস-অলঙ্কারসমলঙ্কৃতা ও নবভাবে অনুপ্রাণিতা শুদ্ধ সংস্কৃত বাগ্বিবন্ধা "কোমল মধুর কান্ত" ভাবপটীয়সী কাব্যকবিতা অথবা অঘটনসংঘটনপটীয়সী কুহকজাল-সমাকীর্ণ লোমহর্ষবিধায়িনী নাটক উপন্যাসাবলী ঐরূপ মর্ম্মতল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। তাহার উত্তর এক কথায়, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য শব্দ-ভাব-রূপক-অলঙ্কার গৌরবে যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, তাহার মূলভিত্তি নাই ; ও যদিও কোন কাব্যে থাকে তবে সে কাব্য প্রসাদের তুলনায় অতি সামান্য। কলিকাতায় চৌতল পঞ্চতল মহতী অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়াছ, বহিঃসৌন্দর্য্য-মনোমুগ্ধকর, কিন্তু তাহার ভিত্তি অতি স্বল্প, তাহাদের পতন যেন একটি ভূকম্পনের আশায় অপেক্ষিত—আমাদের সাহিত্যের অবস্থাও যেন সেইরূপ হইয়াছে! সুতরাং এ সাহিত্য স্থায়ী হইবে অথবা এই বর্ত্তমান সাহিত্য বঙ্গভাষায় স্থায়ী সম্পৎরূপে পরিগণিত হইবে কি না সন্দেহ।

সনাতন ধর্ম্মই জাতীয় সাহিত্যের মেরুদণ্ড। জাতীয় ধর্ম্ম নীতি ও বিশ্বাসের সনাতন সাক্ষী জাতীয় সাহিত্য। যে জাতির যে ধর্ম্ম, যে বিশ্বাস ও যে নীতি, সেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীতির প্রসারকল্পে সাহিত্য কল্পিত ও ব্যবহৃত, সাহিত্যের ইহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলেই সাহিত্য নগণ্য হইয়া পড়ে। সাহিত শুধু এই ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি শিক্ষা দেয়। সাহিত্য লোকশিক্ষক ; প্রেম-ভক্তি ও ন্যায়ান্যায়ের বিশ্লেষণ করে বলিয়া সে অমৃতময়। সাহিত্য জাতীয় মনের ও ধারণার পরিপোষ্টা। সেই হেতুই সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন—এই ধর্ম্মই সাহিত্যের ভিত্তি। সে ভিত্তি দেশকাল পাত্রভেদে চিরদিন নিত্য সত্যবস্তু, তাহাই ভিত্তিরূপে গঠিত হওয়া উচিত। স্বদেশীয় সমাজ বা অন্য কোন নীতির

উপর যদি কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে সাহিত্যও স্বল্পবিস্তারী এবং যুগ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল। এ যুগে যাহা সুনীতি বলিয়া গণ্য হইতেছে অন্যযুগে তাহা গভীর দুর্নীতিদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং সে যুগে এই পূর্ব্বকালের সাহিত্য অপাঠ্য হইয়া পড়িবে—সঙ্গে সঙ্গে কবির যশঃ-সৌরভেরও পর্য্যাবসান হইবে।

ভারতের ধর্ম্মই প্রাণ—ভারত ধর্ম্মের জন্য সব দিয়াছে, দিতেও পারে। তখন সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্ম হওয়াই উচিত। এই ধর্ম্ম যেন আবার সাম্প্রদায়িক না হয়। কারণ সাহিত্য সম্প্রদায়-বিশেষের নহে। এ ধর্ম্ম বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্ম। যে সাহিত্যের এই ধর্ম্মই ভিত্তি সে সাহিত্যের বিনাশ নাই। কারণ, ধর্ম্মের বিনাশ, বা পরিবর্ত্তন ততদূর সম্ভব নহে। যদি সম্ভব হইত তবে দ্বিসহস্র বৎসর অজস্র অত্যাচারের ঝঞ্ঝা শির পাতিয়া সহ্য করিয়া আজও হিন্দু-ধর্ম্ম মেঘোন্মুক্ত শারদশশধরের মত পূর্ণভাববিশিষ্ট হইয়া বিরাজিত থাকিতে পারিত না। অনার্য্যের সহিত সংঘাতে বৌদ্ধের সহিত সংঘাতে, মুসলমানের সহিত সংঘাতে সমস্ত সংঘাতেই হিন্দুধর্ম্ম বিজয়ী। স্থিতিস্থাপক হিন্দুধর্ম্ম আজও অক্ষুণ্ণ।

আমরা ভারতের নর নারী। ভারতের জল, বায়ু, বিশ্বাস, ধর্ম্ম আমাদের মেদ-মজ্জায় সংগ্রহিত। অন্য ভাব বা নীতি আমাদের সহ্য হইবে না। আজ যে আমরা য়ুরোপীয় আদর্শে কাব্য নাটকাদি রচনা করিতেছি, ইহা আমাদের আজ কালই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু পরে এই প্রণালী কি আমাদের বংশধরদের ভাল লগিবে? মুসলমান্ আদর্শে রচিত বাঙ্গালা রচনাগুলি কি এখন আমাদের ভাল লাগে? তাই বলিতেছি, সাহিত্য শাশ্বত, ক্ষণিক নহে। সাহিত্যের যে ধাতু, তাহাও একটি শাশ্বত বস্তুতে সংবদ্ধ থাকাই প্রয়োজনীয়। এই জন্যই আজও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, ও সুরদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির গীত গাথা, কালীদাস, ভারবী, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃত কবির কাব্য গাথা, হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়া আপামরসাধারণকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। সাহিত্যের এই ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে কবি ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' কেও ধর্ম্মের মেরুদণ্ড দিয়াছেন।

ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সামান্য আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হয়। ধর্ম্মের বিপ্লবেই ভাষার বিপ্লব সাধিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের দিনে সংস্কৃত ভাষারই বহুল প্রচলন ছিল; ও সেই সময়েই সংস্কৃত ভাষার [illegible] সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার দিন

পড়িল। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন তাঁহার উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় না অনুবাদ করে; করিলে সে অপরাধী হইবে। মুসলমান্ শাসনের দিনে উর্দ্দু ও ফারসী ভাষার দিন হইল। আবার ইংরাজের আমলে ইংরাজীরই প্রচলন। মুসলমানের ভাষা ইংরাজের ভাষা ও পূর্ব্বের সংস্কৃত আসিয়া বাঙ্গালা ভাষার পরুরুহ হইল। য়ুরোপেও দেখা যায়, রোমান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রভুত্বকালে ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল। রোমান যাজকদের আধিপত্য শেষ হইল, ল্যাটিন ভাষাও বিলুপ্ত হইল। এখন আমাদের ধর্ম্মেও যেরূপ স্বেচ্ছাচার, ভাষাতেও সেইরূপ স্বেচ্ছাচার পরিদৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তাই সমস্ত প্রাচীন কবিদিগের কাব্যের আখ্যান বস্তু ছিল পৌরাণিক। তাঁহাদের স্বীয় অসাধারণ মনস্বিতার ও কৌশল-কলাময়ী উদ্ভাবনশক্তির বৈচিত্র্যগুণে স্ব স্ব কাব্যকে তাঁহারা অভিনব-সুন্দর করিয়াছেন। এই অভিনবতা ও সৌন্দর্য্যকেই কবির মৌলিকতা বলে। এই মৌলিকতার জন্য কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ঘনরাম, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র যেন অদ্যাপি জীবিত;—কিন্তু সে দিনের রঙ্গলাল ও বিহারীলাল আজ সাম্র বিস্মৃতিতে অন্তর্হিত।

এই ধর্ম্মবিহীন, ধাতুবিহীন ও ভক্তিবিহীন সাহিত্যই এখন আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য। পূর্ব্বের মত কবি ও লেখক এখন আর কয়েকজনমাত্রে সীমাবদ্ধ নহে। সকলেই এখন ন্যূনাধিক সাহিত্যিক। সকলেই ইংরাজী শিক্ষার বিচিত্র কুহকে মন্ত্রমুগ্ধ। ইংরাজী ধরণে লেখা না হইলে কেহ পড়িবেন না। এই জন্য লেখকগণও রচনা কাটাইতে ও যশোলাভ করিতে—স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—ইংরাজী ধরণেরই পক্ষপাতী। কাযেই এতদিনের সে সনাতন ধাতু ও সাহিত্যের মর্ম্মস্পর্শিনী ক্ষমতা তিরোহিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা যে শুধু বর্ত্তমানের জন্যই লিখিত, এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। বাঙ্গালার কোন কাব্য বা রচনা নূতন প্রকাশিত হইলেই আমরা তাহাকে সেই শ্রেণীর ইংরাজী লেখার সঙ্গে এমন কি বাঙ্গালা কবিকেও ইংরাজ কবির সহিত তুলিত করি। এই অতুলন তুলনাশক্তির বিচিত্র উর্ব্বরতার ফলেই আমরা মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রে স্কটকে পাইয়াছি; নবীনচন্দ্রে বায়রণকে পাইয়াছি; হেমচন্দ্রে টেনিসনের ও ডাণ্টের আভাস পাইয়াছি; মধুসূদনে মিল্‌টন পাইয়াছি; ও রবীন্দ্রনাথে শেলীকে পাইয়াছি। আমরা মেঘনাদ বধে 'প্যারাডাইস' লষ্টের গন্ধ পাই, দুর্গেশনন্দিনীতে 'মাইভানহোর' ছায়া পাই—বৃত্রসংহারে 'ইন্‌ফার্ণোর' নমুনা পাই।

সম্পূর্ণ না পাইলেও জোর করিয়া যেন কতকটা পাইতেই হইবে। এই "ভ্রান্তি"ই যেন আমাদের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক। বিলাতের ওকবৃক্ষ ও ভারতের বটবৃক্ষ যথাক্রমে বিলাতে ও ভারতেই সম্ভব। ভারতের পারিজাত ও বিলাতের লিলি কখনই এক নহে, হইতেও পারে না। তবুও বিলাতী বিদ্যা বিপুলতায় আমরা এমনই "সমদর্শী" ও বিলাতী সভ্যতার উদ্দাম 'বিদ্যুৎস্ফুরণের তেজে এমনই অন্ধ যে আমরা লোণার পাথরবাটী গড়িয়া বসিয়া আছি। হায় অনুচিকীর্ষা! এই অনুচিকীর্ষাই ভারতের কাল। যতদিন সাহিত্যে এইরূপ "যেচে মান" লইতে হইবে, ততদিন এ নকলনবীস সাহিত্যের ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে।

বঙ্গদেশের বরেণ্য সন্তান স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—

"আমি ইংরাজী বহি পড়িতাম ও ইংরাজীতে অনেক সময় বাধ্য হইয়া পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন কাহারও সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজীতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত' কখনই চেষ্টা করি নাই। প্রত্যুতঃ যদি কখনও চিন্তাকালীন পাপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজী শব্দ মনে হইতেছে বুঝিতে পারিতাম, তৎক্ষণাৎ তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিতাম ভাবগুলি যথার্থ কি না?" —পারিষ্কারিক প্রবন্ধ, ৪৩ পৃষ্ঠা।

বঙ্গভাষার স্রোত একণে অন্যদিকে প্রবাহিত। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে একটি কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নাই। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়া লইতেছেন। এ ভাষা রাজভাষা নহে, সুতরাং রাজদরবারে ও আইন আদালতে এ ভাষা চলে না; শিক্ষিত সমাজ এ ভাষায় কথা বার্ত্তা চিঠিপত্রাদি লিখিতে সঙ্কুচিত হয়েন; দোকানদার ব্যবসায়ীরা এ ভাষার অন্যরূপ সংস্করণ করিয়া লইয়াছেন, ভদ্রের সমাজে অন্য একরূপ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এ ভাষার অন্যবিধ রূপের উপাসনা করেন। সুতরাং ইহা যে নৃপ-শাসন দুরন্ত বালকের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আধুনিক শিক্ষিত সমাজ কাব্যামোদের জন্য মিল্টন, বায়রণ, সেক্‌স্‌পিয়র, শেলীর কাব্য গ্রন্থের শরণাগত হয়েন; শিশুদিগকেও 'বর্ণবোধের' পূর্ব্বে First Book পড়ান; রচনায় বিদেশীয় কবিগণের প্রবচন প্রচুর পরিমাণে তুলিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদিগের বঙ্গ বা সংস্কৃত সাহিত্যরূপ-রত্নাকর হইতে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র বালুকণা ও তুলিতে পারিবেন না। এমন কি একদিন বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন মধুসূদনই বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" কিন্তু তিনিই শেষে খেদোক্তি করিয়াছিলেন "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" এ খেদোক্তিটি আমাদের অনুশীলনের যোগ্য। তাই

বলিতেছি, বাঙ্গালা ভাষার কে আদর করে? নব্য শিক্ষিতের দল ইহা পড়েন না; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন; বাঙ্গালী মুসলমানগণ সাদী হাফেজ লইয়া থাকেন। বঙ্গভাষা এক্ষণে একটি নব্য শিক্ষিত দলেরই একমাত্র ক্রীড়নক। ভাষারও সঙ্করত্ব আছে। বঙ্গভাষাতেও সঙ্করত্ব পৌঁছিয়াছে। "সঙ্করোনরকা-য়ৈব।" ভাষা জননীর এখন ফার্সী-হিন্দি-ইংরাজী-সংস্কৃত বিমিশ্রিত এক অভি-নব মূর্ত্তি।

বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি গৌড়ীয় যুগেই হইয়াছিল। হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। তখন স্বাধীন নৃপতিগণ ও দেশের ধনিগণ সাহিত্যের মর্ম্ম বুঝিতেন। এক একজন মহাত্মা এক বা ততোধিক কবির পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যেমন কৃত্তিবাসের তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ, কবীন্দ্রের নসরৎ খাঁ, বিদ্যাপতির শিবসিংহ, বিজয়গুপ্তের হোসেন শাহ, ষষ্ঠীবরের জগদানন্দ, মুকুন্দরামের রঘুনাথ দেব, রামেশ্বরের যশোমন্ত সিংহ, অনন্তরামের বিশারদ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্র, কবি আলোয়ালের মাগন ঠাকুর, ভবানীদাসের জয়চন্দ্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। আর সে দিন নাই, সাহিত্যের সে উন্নতিও নাই।

সাহিত্যের বিকাশ দুই দিকে,—এক গদ্যে ও অন্য পদ্যে। পূর্ব্বে গদ্য একরূপ ছিল না বলিলেও হয়। যাহা রচিত হইত, তৎসমুদায় পদ্যেই হইত। প্রাতঃ-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রমুখ জনকয়েক মহাত্মার যত্নেই প্রথম সুমার্জ্জিত গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সেই গদ্য আজও পঠিত এবং পাঠিত হইতেছে। সেই গদ্যই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃকও গ্রাহ্য হইয়াছিল।

কিন্তু আজ কাল আর সে দিন নাই। আজ কাল বিজ্ঞানের দিন, প্রত্নতত্ত্বের দিন, মৌলিক অনুসন্ধানের দিন। এক্ষণে বিশুদ্ধ সাহিত্যিকের অভাব হইতেছে। মৌলিক ভাষা নাই, ভাষার রীতিও নাই। মৌলিক অনুসন্ধান ও মেধাবী পণ্ডিতগণের অপূর্ব্ব ধীশক্তি বলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বেশ শিখি-য়াছি:—পলাসীযুদ্ধের পর জন কয়েক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ কূটরাজনীতি চরিতার্থ করিতে এই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল (Dugald Stewart); ঋগ্বেদ চাষার গান; "গৌড়ীয় ভাষাগুলি কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে; বুদ্ধ কোন লোক বিশেষের নাম নহে; কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি।"—('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে

উদ্ধৃত কোন লোক বিশেষের মত।) ইত্যাদি। প্রত্নতত্ত্ব এইরূপ। বঙ্কিম-চন্দ্রের "স্পেশালের পত্র" ও "রামায়ণের সমালোচনা" তবে কল্পনা-সম্ভূত বলি কি রূপে? আমার বিবেচনায় প্রত্নতত্ত্বে যে তথ্য বাহির হয় হউক কিন্তু তৎসঙ্গে লিখিত ভাষার একটি শৃঙ্খলা ও নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। কথিত ভাষা দেশকালভেদে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও হয়ও; কিন্তু কথিত ভাষাকে সাহিত্যে স্থায়ী স্থান দান করা কি যুক্তিসঙ্গত?

কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে চিরন্তন প্রভেদ সকল দেশেই আছে। সাহিত্যের ভাষাই ভাষা শিক্ষার একটা উপায়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে ও চিরকালই থাকিবে।" শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "এক শ্রেণীর লেখক কেবলমাত্র প্রচলিত কথায় রচনার পক্ষপাতী; সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা প্রয়াসী। সত্যকে সত্যি, এবং মিথ্যাকে মিথ্যে, সূর্য্যকে সুয্যি এবং রৌদ্রকে রুদ্দুর লেখা তাঁহাদের অভিপ্রায়! লিখিত ভাষায় এরূপ পরিবর্ত্তনের কোনই আবশ্যক আমরা বুঝিতে পারি না। কথোপকথনের ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য জনপদের ভাষাতেও এইরূপ পার্থক্য সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।" —প্রবাহ, মাঘ, ১৩১১।

এ কথা নিশ্চিত সত্য, কারণ দেখা যাইতেছে, কালিদাস লিখিবার সময় লিখিয়াছেন, "বালেন্দুবক্র পলাশপর্ণ" কিন্তু কথিত ভাষাতেও কি ঐরূপ প্রয়োগ করিতেন? জয়দেব কেশর ফুলকে কেশর ফুলই বলিতেন; কিন্তু লিখিয়াছেন, "মদন মহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশর কুসুম।" মধুসূদন মর্ত্ত্যকে মর্ত্ত্যই বলিতেন; কিন্তু লিখিয়াছেন, "উর্ব্বীধাম।" ইহা সম্পূর্ণ রুচিসঙ্গত। তাই বলিয়া Beamesএর মতে কথনের ভাষা সাহিত্যের অঙ্গে শোভা পায়, ইহা কি সঙ্গত? যদি তাহা হয়, তবে শুধু রাজধানীর কথাই চলিবে কেন? আমাদের উভয় বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে; সেগুলিও চলিতে পারে। যদি নব্য মতে "কোনো," "মতো," "যাচ্ছি," "গেলুম" চলে, তবে ঢাকার "ক্যান্" শ্রীহট্টের "গ্যাছলাম," "যাইবাম্" যশোহরের "খাতি পাল্লাম না," বর্দ্ধমানের "ক্যানে গেইচি," নদীয়ার "ইন্‌ছিল" বীরভূম, মানভূম অঞ্চলের চন্দ্রবিন্দু বহুল ভাষা না চলিবে কেন? তবেই বঙ্গভাষা বহুরূপিণী হইবেন; ও যে প্রদেশীয় লোকের রচনা, সে রচনা শুধু সেই প্রদেশেই বিচরণ করিবে। অন্য প্রদেশের

লোক যে অন্য প্রদেশের চলিত কথাই বুঝিবেন, তাহা মনে করাও অযৌক্তিক। সুতরাং তখন সাহিত্যও প্রত্যেক জিলায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্য দেশের নানা অংশের বিভিন্ন কথিত ভাষার প্রণালীর একীকরণ ও সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহিত্যের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু অতীব প্রয়োজনীয়। এই স্বাতন্ত্র্য আভিধানিক বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগেই সম্ভব।

এ বিশুদ্ধি রক্ষা দূরের কথা, 'শব্দতত্ত্বে' প্রতিপন্ন হইয়াছে—"কাঁকুড়" হইতে "কাঁক্‌রোল" শব্দ উৎপন্ন! ঠাকুর মহাশয়কে বলিয়া দিই—"কাঁকুড়" ও "কাক্‌রোল" দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। ইহাদের বীজ, আকার, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠনও সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাকৃত ভাষায় "পাঅন" ও "উলান" "অন্" ও "আন" প্রত্যয়ে সিদ্ধ! "আতর দান্," "কলম দান্" প্রভৃতি "দান্" প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ইহারা যে ফার্সী কথা, এ কথা বোধ হয় তাঁহার জানা নাই। আরও আছে যথা—"আক্কেলমন্ত" হইল "চালাকীমন্ত" হইল না কেন? "খাতাকি" "চি" প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ফার্সী কথাগুলিকে এরূপ ভাবে সিদ্ধ করিতে গিয়া দগ্ধ না করিলেই ভাল হইত। কথাটি "আক্কেলমন্ত" নহে, আসল কথা "আক্কেল মন্দ" যেমন "দৌলৎ মন্দ" "দানেশ মন্দ।" এ গুলি ফার্সী কথা। যাহাই হউক, এরূপ ব্যাকরণে ভাষার কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে? আমি বুঝিতেছি, এরূপ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইলে প্রভূত অনিষ্টই সাধিত হইবে। কারণ এইরূপ এক একটি বৈদেশিক কথা আসিয়া বঙ্গভাষা হইতে এক একটি কথা চুরি করিয়া লইলে ক্রমে ক্রমে বঙ্গভাষার মধ্যে আর বাঙ্গলা শব্দই থাকিবে না। অতএব এখন হইতেই এ প্রথার যাহাতে প্রসাররোধ হয় সেই চেষ্টা করা উচিত। 'শব্দতত্ত্ব' ভাষার কোনই উপকার করিবে না; বরং ভবিষ্যতে ছাত্রদিগকে আর সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র, সন্ধি, তদ্ধিত বা ধাতুরূপ মুখস্থ হয় নাই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে পলাইতে হইবে না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দুঃখ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ নাটক (Parody) লিখেন নাই। কিন্তু তিনি ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্য এইবার আর্য্য ব্যাকরণ প্রণীত হইল। ক্রমশঃ

——:০:——

সমালোচনা।

—:০:—

ছড়া ও গল্প।*

—:০:—

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই ছেলে-ভুলান বহি লিখিতে দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আশান্বিত হইয়াছি। ললিত বাবুর পরিহাস-রসিকতায় সাহিত্যের সমুচ্চ প্রাঙ্গণ মুখরিত। সাহিত্য-সম্মিলনে, পূর্ণিমা-মিলনে এবং অন্যান্য সাহিত্য-মজলিশে ললিত বাবুর বিশুদ্ধ উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ কৌতুকের তুফানে সভাস্থল কত সময়ে উদ্বেল ও বিপ্লুত হইয়াছে। শুনিয়াছি, ছাত্রসমাজও তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ চাপল্যবিবর্জ্জিত হাস্যরসে বঞ্চিত নহে। তিনি যে এই সকল উচ্চ আসর ছাড়িয়া শিশুদিগের নিম্ন সমতলে অবতরণ করিবেন, ইহাতে আমরা ভূমিকালেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত বিস্ময়প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে ললিত বাবুর মত কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে শিশুদিগের মনোরঞ্জনের জন্য লেখনীগ্রহণ করিবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। যে দেশে হাক্সলির মত বৈজ্ঞানিকও বালকশিক্ষার জন্য পুস্তক রচনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, সে দেশের কথা স্বতন্ত্র। সে দেশে শিশুদিগের শিক্ষাই জটিল শিক্ষাসমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাযেই শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তিও বালকবালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় ভাবিতে বাধ্য হয়েন। সরল ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া সরলমতি শিশুদিগের শিক্ষার ভিত্তি প্রোথিত করা তাঁহাদিগেরই সাজে।

আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা প্রথমতঃ ঠা'নদিদির হাল্কা রূপকথা ও গুরুমহাশয়ের কঠোর বেত্র মাহাত্ম্যের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় "বর্ণপরিচয়"ছলে যখন বানানের দুর্ভর চাপ বঙ্গীয় শিশুগণের কোমল স্কন্ধে অনেকস্থলে ন্যস্ত করিলেন, তখন সে গুরু ভারে যে তাহাদের দুর্ব্বল কুসুম-পেলব স্কন্ধ অনেকস্থলে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তাহা কে বলিবে? প্রতি বানানের সঙ্গে যখন শিক্ষার্থীর দেহ বেত্রচিহ্নাঙ্কিত হইয়া উঠিত, তখন কত ছাত্র

* ছড়া ও গল্প—শ্রীললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

যে বর্ণপরিচয়মাত্রের সঙ্গে পাঠশালার পরিচয় শেষ করিয়াছে এবং কত ভরসার পাত্র যে পাঠশালাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া পরশুরামের ন্যায় কুঠার বা হলধরের ন্যায় লাঙ্গল গ্রহণ করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া শিশুশিক্ষার সম্বন্ধে সমাজের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহার প্রতি লোকের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন। শিশুদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এখন অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কাযেই নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে শিশুদিগকে শুধু বানান শিখাইয়া এবং বানান শিক্ষান্তে গম্ভীররসাত্মক উপদেশ গলাধঃকরণ করাইয়া শিক্ষাকার্য্যের পরিসমাপ্তি হইত, এক্ষণে সে স্থানে সমঞ্জসীভূত, সমগ্র একটি মানসিক পরিণতি লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখা দিয়াছে। যে সকল বিচিত্র উপাদানে শিশুর মন গঠিত, সে গুলির সম্যক্ অনুশীলনে যাহাতে মনের স্বাভাবিক এবং সুস্থ অভিব্যক্তি হইতে পারে, সেইরূপ, নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। মনস্তত্ত্বের আলোচনার ফলে এই নূতন দায়িত্বের উপলব্ধি শিশুশিক্ষা জগতে এক নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছে। পূর্ণ মানব প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ণ শিশু প্রস্তুত করিতে হয়। যে শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের মন সমগ্রভাবে ও স্বচ্ছন্দে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তাহাই আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ধারণার ফলে বালকদিগের প্রবৃত্তিগুলিকে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করিয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিনষ্ট করা হইত, এখন সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিরোধের স্থলে পোষণ, বিরোধের স্থলে মিলন, শাসনের স্থলে স্নেহ, কঠোরতার স্থলে আমোদ—শিশুশিক্ষার মূল নীতিকে আশ্রয় করিয়াছে।

যদিও এখন সুদূর গণ্ডগ্রামে গুরুমহাশয়কে তাঁহার বেত্রের মহিমাপ্রচারে এখনও বিশেষ আলস্য করিতে দেখা যায় না, তাহা হইলেও সহরে ও সহরোপান্তে সুসংস্কৃত উপায়গুলি ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

উপদেশাত্মক গল্পই যে শিশুশিক্ষার একমাত্র প্রথম সোপান, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। নীতিকথা শিখাইয়া বালকের চরিত্রগঠনের ভিত্তিপত্তন করা অনেকের নিকট প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মন যখন স্বভাবতঃই পাপস্পর্শকলুষিত নহে, তখন কেবলই পাপ ও তাহার শাস্তি সম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলি বালকদিগের সমক্ষে ধারণ করিলেই যে ভবিষ্যতে পাপের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ

আছে। শিশুপাঠ্য পুস্তক হইতে নীতিকথাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, এমন কথা বলিতেছি না। নীতিকথার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক রূপে বাড়াইয়া তুলিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়স্কেরা যখন শিশুদিগের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন সে কথোপকথন নীতিগর্ভ বক্তৃতার মতই হইয়া যায়। আমরা ইহা কদাচ ভুলিতে পারি না যে, শিশুগণ সকল সময়েই উপদেশ্য। শিশুগণের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদাই উপদেষ্টার আসন লইয়া বসিয়া আছি। কবে কোন্ রাজপুত্রের জন্য কাক-শৃগাল-মূষিকের কথাচ্ছলে 'হিতোপদেশ' রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে আজিও নরশিশুর চরিত্রনীতির বর্ণপরিচয় হইতেছে। বস্তুর সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আজীবন মানবজ্ঞানের সহচর, সে বস্তুজ্ঞান-লাভ করিবার সম্যক্ সুযোগ শিশুগণকে প্রদান করা হয় না! যে সকল অনুভূতি ও প্রবৃত্তি পরিণামে চরিত্রসম্পূর্ণতার মুখ্য সাধন হয় সে সকল অনুভূতির ও প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি সম্পাদনের জন্য সবিশেষ যত্ন করা হয় না। শিশুশিক্ষা-প্রণালীতে এই ত্রুটিগুলি নিরাকরণের প্রয়োজনীয়তা এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। ইতোমধ্যেই ছেলে-ভুলান ভাষায় অনেক ছেলে-ভুলান কথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে! এতদ্ভিন্ন রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাঞ্জল সংস্করণ প্রকাশে শিশু-সাহিত্যের সমৃদ্ধি অশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ললিত বাবুর পুস্তকখানি শিশুসাহিত্যের মধ্যে যে, একটি উচ্চস্থান অধিকার করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরল ও তরল ভাষায় যাহাদের হস্তে দিবার জন্য ললিত বাবু এই সুন্দর সুদৃশ্য পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারা যে ইহা দেখিয়া ভুলিবে, তাহা স্বাভাবিক; তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠেরাও যে পুস্তকখানি প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই বিচিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের উপকরণগুলি সম্পূর্ণ স্বদেশজাত; ইহাই আলোচ্য পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। যে সকল রূপকথা চিরকাল আমাদের নিতান্ত ঘরের সামগ্রীর মত বাল্যজীবনকে সোহাগে আদরে বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে চিরকাল যাহা আমাদের সুকুমার শিশুগণের কোমল অধরে হাসির অমল শুভ্রজ্যোতিঃ ফুটাইয়া আমাদের চিরপ্রিয় গৃহপ্রাঙ্গণকে আলোক-পুলকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া কয়েকটি ছড়া ও গল্প এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়া ললিত বাবু শিশু ও বয়োবৃদ্ধদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পুস্তকখানির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উপদেশাত্মক গল্পগুলিকে হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া শিশুদিগকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। হাস্যরস শিশুদিগের উপভোগযোগ্য করিয়া উপস্থিত করা অতি কঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ চেষ্টা করিয়া থাকিলেও এ বিষয় অতি অল্পলেখককেই কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছি। ললিতবাবু এ বিষয়ে যশস্বী। তাঁহার কৃতকার্য্যতা শিশু-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার হাস্যরসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হাস্যরস শুভ্র। শারদ কৌমুদীর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শৈশবে শুভ্র হাস্যরসের জ্যোতি অতি রমণীয় ও স্নিগ্ধ। গম্ভীরভাবে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু হাস্যরসের সহিত মিশাইয়া সে উপদেশ গুলিকে মনে চিরস্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে ললিত বাবুকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পরিহাস-রসিকতা ললিত কলার (Fine Arts) স্থায়ীন অভিব্যক্তি। সুস্থ সবল হাস্যকৌতুকে বাহ্যান-বাহুল্য-নিপীড়িত ও অতি সাধারণ উপদেশাবলি-কণ্টকিত শিশুজীবনে সহজে প্রফুল্ল স্ফুরণ অনুভব করিতে পারা শিশু শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। সে হিসাবে ললিত বাবুর পুস্তকখানি শিশু-সাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিবে।

—:•:—

সন্ধ্যা।

—:•:—

এল সন্ধ্যা শান্তিময়ী, ধূসর অঞ্চল
ছড়াইয়া নীলাকাশে জুড়া'রে ধরায়
ডুবাইয়া ধরণীর কল কোলাহল
দিবসের রেখা মুছি' আকাশের গায়।
কি পবিত্র কি মহান্ কি স্নিগ্ধ পরশ!
এমনি প্রশান্ত পদে মরণের তীরে
মুছাইয়া পরাণের দুখের হতাশ;
জীবনের শ্যাম সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে।

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

সংগ্রহ।

—:০:—

সাহিত্য।

—:০:—

উপন্যাসের ভবিষ্যত।

—:০:—

গত পৌষমাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' ফরাসী উপন্যাসের আলোচনায় দেখা যায়, লেখক এই মত প্রচারিত করিয়াছেন যে, উপন্যাসের অবনতিই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। সংপ্রতি 'ফিল্‌ডুয়ান রিভিউ' পত্রে উপন্যাসের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আর্য্যাবর্ত্ত সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাসের বিলোপসম্ভাবনা যে সুদূর-পরিহিত ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক প্রবন্ধারম্ভে জুল ভার্ণের বিরুদ্ধ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।—ভার্ণে বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বা শত বৎসর পরে উপন্যাস থাকিবে না। সংবাদপত্র সে স্থান অধিকৃত করিবে। এখনই উপন্যাসের অনাদর আরম্ভ হইয়াছে। পাঠকসমাজ সংবাদপত্রই পাঠ করিবেন। সংবাদ-পত্র-লেখকগণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পাঠক সমাজে উপস্থিত করিবেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক গিদে মোপাসা ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ছোট গল্প-গুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন।

ভ্রম। লেখকের মতে ভার্ণের ভুল এই যে, তিনি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে প্রভেদ বুঝেন নাই। এই দুইটির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। ছোট গল্প আর যাহাই হউক না কেন, উপন্যাস নহে। সুসম্বদ্ধ আখ্যানবস্তু ব্যতীত উপন্যাস হয় না; ছোট গল্পে আখ্যানবস্তু থাকে ভাল, না থাকিলেও কিছু আইসে যায় না। ঔপন্যাসিক অভিনেতা ও অভিনেত্রী সুশোভিত রঙ্গমঞ্চ চিত্রিত করেন। ছোটগল্প-লেখক একটিমাত্র ঘটনার উপর আলোকপাত করিয়া তাহারই প্রাধান্য প্রতিপন্ন করেন। যে ঘটনায় ছোট গল্পের যেরূপস্থ রচিত হয়, উপন্যাসের হিসাবে তাহা হয় ত অকিঞ্চিৎকর। মহাকাব্য ও গীতি কবিতা এক নহে; এক হইতে পারে না।

ছোট গল্প। ছোট গল্পে মৌলিকতার প্রয়োজন; সংক্ষিপ্ততা তাহার সর্ব্ব প্রধান গুণ। ছোট গল্পে বাহুল্য বর্জ্জনীয়; সেই জন্যই বহু প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ছোট গল্প রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যই স্থায়িত্বের উপাদান। উপন্যাসে মানব চরিত্রের যথার্থ বর্ণনায় সেই সৌন্দর্য্য। কেবল উপমায় ভরা যেমন কবিতা হয় না; কেবল বর্ণনায় বা ঘটনায় তেমনই উপন্যাস হয় না। মানবচরিত্রচিত্রণে সাফল্যই ঔপন্যাসিকের রচনার স্থায়িত্বের কারণ। যত দিন মানুষ সৌন্দর্য্যের আদর করিবে তত দিন উপন্যাসের

বিলোপ-সম্ভাবনা নাই। মেকলে এক কালে বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। সে ভবিষ্যদ্বাণী ফলে নাই। বরং দেখা গিয়াছে, টেনিসন প্রভৃতি প্রতিভবান কবিরা বৈজ্ঞানিক সত্যে কবিতার প্রসাধন করিয়াছেন।

অসার যুক্তি। যাঁহারা বলেন, ভবিষ্যতে পাঠকগণ উপন্যাস ছাড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিবেন, তাঁহারা বলেন, ভবিষ্যতে লোকের আর অধিক অবসর থাকিবে না। বরং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞানের কৃপায় দুঃসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হইতেছে—মানবের অবসর বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে আর তাঁহাদের যুক্তির সার্থকতা কোথায়? উপন্যাস শিল্পকীর্ত্তি। তাহা

নিত্য সত্য। মানব চরিত্রের নিত্য সত্য বস্তু লইয়া ব্যাপৃত। ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপন্যাস স্থায়ী হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট উপন্যাসে মানব চরিত্রের কোন না কোন নিত্য সত্য সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়। প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকগণ মানব জীবনের বিদ্যুৎপ্রবাহের চিত্রই চিত্রিত করেন—অন্যান্য বিষয় তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষণীয়।

মতামত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সমালোচক ফ্রেডরিক হ্যারিসনও বলিয়াছিলেন, উপন্যাসের বিলোপ অনিবার্য্য। মানব জীবন দিন দিন রহস্যহীন, বর্ণ-বৈচিত্র্যবর্জ্জিত হইতেছে। আমাদের মনে হয়, সমাজের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবন দিন দিন অধিকতর রহস্যময় ও বিচিত্রবর্ণবিহ্বল হইতেছে। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন—এ সকলের আবির্ভাবে ঔপন্যাসিকের পক্ষে অনেক অপূর্ব্ব নূতন ঘটনার সমাবেশ-সম্ভাবনা ঘটিতেছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ক্রকোর্ড বলিয়াছিলেন, প্রেমই উপন্যাসের মেরুদণ্ড। প্রেমের মত সর্ব্বজয়ী সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বশ্রিয়স্তুতি আর নাই। এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু প্রেম ব্যতীতও যে গল্প চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, বলজাক তাঁহার Atheist's Mass তাহা দেখাইয়াছেন। প্রকৃত ক্ষমতাশালী লেখকের হস্তে উপন্যাস শাণিত অস্ত্রের মত প্রতীয়মান হয়। ডিকেন্স উপন্যাসের সাহায্যে বহু অনাচারের সংস্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। মেরী করেলীর চেষ্টাও সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয় নাই। মিষ্টার গার্লাণ্ডের মত আমরাও বলি, কোন সংবাদ-পত্রের প্রচার-বাহুল্যে উপন্যাসের অনাদর হওয়া দূরে থাকুক, বরং, বোধ হয় উপন্যাসের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। হয় ত কোন কোন দেশে বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাসের অবনতি লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে উপন্যাসের বিলোপ সূচিত হয় না। এক কালে গ্রীসে নাট্যসাহিত্যে অবনতি লক্ষিত হইয়াছেন। এক কালে ইটালীতে ইতিহাসের ও ফ্রান্সে সুখান্তক নাটকের অবনতি লক্ষিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বহুবার উপন্যাসের অবনতি লক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অবনতি স্থায়ী হয় নাই। সুতরাং উপন্যাসের বিলোপ-সম্ভাবনা নাই।

বিবিধ।

সংক্রামক কলেরা।

গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনে মেজর লিওনার্ড রজার্স "সংক্রামক কলেরা" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটিতে সাধারণের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আলোচিত হইয়াছিল, সেই জন্য আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি আবশ্যক কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ইদানীং কলেরা রোগ বার বার য়ুরোপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে: সেই জন্য ইহার ইতিহাস জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতেছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে এবং হিপোক্রিটেসের গ্রন্থে এই রোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১০০৩ এবং ১৮১৭-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছে;—ইহা ম্যাক্‌ফার্সনের লিখিত বিবরণে সপ্রকাশ। কিন্তু ঐ সময়ের শেষ ২৩ বৎসর ঐ রোগের বিশেষ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কালমধ্যে এই রোগ সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এবার দক্ষিণ বঙ্গেই (জিলা যশোহরে) এই রোগ প্রথম দেখা দেয়। তখন উহা নূতন রোগ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে এই রোগ সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান আরম্ভ হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলের ভাড়িত অবস্থার বিপর্য্যয় বলে এই রোগ আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং উহা বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হয়, তখনকার লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। ডাক্তার রজার্স প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রে উল্লিখিত "বিসূচিকা" রোগকেই কলেরা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রসিদ্ধ 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানেও বিসূচিকা শব্দের অর্থ ওলাউঠাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কলেরা বাস্তবিকই বিসূচিকা কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমরা অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহার আলোচনা করিব না।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আর একবার ওলাউঠা রোগ বিধ্বংসিনী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আফ্‌গান রাজ্যে, পারস্যে এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব রুসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইবারকার ওলাউঠার সংক্রামক প্রবাহ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত য়ুরোপের গ্রেটব্রটেন পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্কটলণ্ডের এডিনবরা সহরে ভীষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ঐ সময় তথায় শিরার মধ্যে "স্যালাইন সলিউসন" প্রবিষ্ট করণের উপকারিতা পরীক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলোপধায়ী হয় নাই। ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে এই দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে আমেরিকার কানেডা ও মার্কিণ রাজ্য প্রপীড়িত হইয়াছিল। য়ুরোপের এই সংক্রামক ব্যাধির বিসর্পণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক বিশেষ তথ্য অবগত হইয়াছিলেন। অশীতিবর্ষপূর্ব্বে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না। সেই জন্য এই ব্যাধি ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে পারে নাই। এবার এই ব্যাধির বিস্তার সম্বন্ধে কোনও নূতন তথ্যই আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ।

বঙ্গে আবির্ভাব।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওলাউঠা রোগ দ্বিতীয়বার ধ্বংসিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার ইহার বিসর্পণে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছিল। কলিকাতা হইতে কতকগুলি সিপাহী সিঙ্গাপুরে ও চীনে প্রেরিত হয়। ইহারাই ঐ স্থানে ঐ রোগ বিসর্পিত করে। চীন হইতে ঐ ব্যাধি ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে সংক্রমণ করিয়া চাইনিজ তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান, পারস্য, য়ুরোপ এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিসর্পিত হয়। আবার পথে বক্র গতিতে ব্রহ্ম হইতে ভারতে এবং আফগান রাজ্য হইতে পঞ্চনদে প্রবেশ করে। সেবার এই সাংঘাতিক ব্যাধিতে কেবলমাত্র রুস রাজ্যেই দশ লক্ষ লোক, ইংলণ্ডে ৫৩ হাজার ২ শত ৯৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময় গ্রো এবং বাড্ নামক দুইজন চিকিৎসক বহু গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, বারি কর্ত্তৃকই এই বিষম ব্যাধি জনসমাজে বিসর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ প্রামাণ্য চিকিৎসক তখন এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এই রোগকে বারিবাহিত মনে না করিয়া বায়ুবাহিত মনে করিতেন। লোকের মনে একবার একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইলে তাহা সহজে উৎপাটিত হইতে চাহে না।

দ্বিতীয় মহামারীর বৈচিত্র্য।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক ওলাউঠা বোম্বাই হইতে পারস্য উপসাগরে বিসর্পিত হয়। পর বৎসর উহা পারস্যেই লোকসংহার করিয়া তৎপর বৎসর অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়ায় প্রবেশ করে। ঐ বৎসরই ঐ রোগ আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। কলেরা রোগীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিবার ও কলেরা প্রপীড়িত স্থান হইতে ঘনোদির গতায়াত রুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা এই সময়েই অনুভূত হইয়াছিল। ডাক্তার সিম্‌সন্ এই সময় লণ্ডনে "কোয়ারাণ্টাইন" * বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রড ষ্ট্রীটস্থ কলের জলাধার সম্পর্কিত ব্যাপারের অনুসন্ধানে কলেরা যে বারিবাহিত, তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হয়। এই জলাধারের সান্নিধ্যে মরলা আবর্জ্জনাময় জলপূর্ণ একটি গহ্বর ছিল। উহা হইতে দূষিত জল কলজলাধারের জলে মিশ্রিত ও সাধারণের পানীয় জলকে দূষিত করিত। সেই জলাধারসংশ্লিষ্ট নলের জল যাহারা পান করিত, তাহাদের মধ্যে এই রোগ বিকট মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু কুসংস্কারের এমনই প্রভাব যে, এই সম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও উহা বায়ুবাহিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এইবার লণ্ডনে ও মিউকাসেলে প্রাপ্ত অনেক তথ্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, এই রোগ বারিদ্বারা বিসর্পিত হয়। এই উপলক্ষে সহরের জল সরবরাহ সম্পর্কে নূতন বিধি প্রণীত হয় এবং তাহার ফলে লণ্ডন সহরের স্বাস্থ্য বিশেষরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

নিদানানুসন্ধান ও প্রতিষেধ ব্যবস্থা।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ আবার এই রোগ জনপদ বিধ্বংসী রূপে দেখা দিয়াছিল। এইবার এই রোগ বোম্বাই হইতে মক্কায় যায়। এ আক্রমণে ৯০ হাজার মক্কা যাত্রীর মধ্যে ৩০ হাজার,

* রোগাক্রান্ত স্থান হইতে জাহাজাদি বন্দরে উপস্থিত হইলে উহা কিছু দিন আবদ্ধ রাখা হইত। যাত্রীরাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে আটক থাকিত।

নিদান নির্ণয়।

এই রোগে মরে। সে বার এই রোগ আরব হইতে মিশরে এবং মিশর হইতে ভূমধ্যসাগরের উপকূল উৎসন্ন করিয়া আমেরিকায় পঁহুছে। প্রবাগ ও মক্কা যাত্রিগণ কর্ত্তৃক এই রোগ দ্রুতভাবে বিসর্পিত হইয়া থাকে। লণ্ডন সহরে এইবার একটি বিষয় বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়াছিল। যে নদী হইতে যাহাদিগকে অপরিষ্কৃত জল সরবরাহ করা হইত, তাহাদিগের মধ্যে হাজার করা ৭২ জন এই রোগে মরিয়াছিল। কিন্তু অন্যস্থান হইতে যাহাদের জল সরবরাহ হইত, তাহাদের মধ্যে হাজার করা ৩ হইতে ৮ জনের অধিক লোক এই রোগে মরে নাই। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার এই সাঙ্ঘাতিক রোগ আফ্‌গানিস্থান ও পারস্য হইয়া রুসিয়ায় প্রবেশ করে এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকসংহার করিতে থাকে। তাহার পর কিছুদিন এই রোগ কতকটা শান্ত ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চল হইতে ইহা আবার মক্কায় ও মিশরে বিসর্পিত হয়। এইবার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ক এই রোগের বর্ত্তমান নিদান নির্ণীত করেন। তিনিই সিদ্ধান্ত করেন যে, কমার (,) মত আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার জীবাণুই কলেরা রোগের উৎপাদক। ইহার ফলে এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধের উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার ডাক্তার কে. সি. মাক্‌নামারা রোগবীজানুসন্ধানে এই রোগের নিদানানুসন্ধান করিতে বলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় তখন কেহই কর্ণপাত করে নাই। সুতরাং অন্য দেশীয় লোক এই আবিষ্কারের খ্যাতিলাভ করিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বার হইতে আফ্‌গানিস্থানে ও পারস্যে লোক ক্ষয় করিয়া এই রোগ আবার রুসিয়া ও জর্ম্মানীর হাম্বার্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। পাঁচমাসকালমধ্যে এই রোগ এই বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। যাতায়াতের সুবিধাই এই রোগ বিসর্পণের ক্ষিপ্রতার কারণ। এই বৎসর ইংলণ্ডের কয়েকটি সহরেও কয়েকটি কলেরা রোগ আবদানী হইয়াছিল, কিন্তু তথায় তত্ত্বাবধানগুণে ঐ রোগ কোথাও বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে।

বিংশ শতাব্দীর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপে কলেরার প্রকোপ হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ রুসিয়ায় আবার এই রোগ আবির্ভূত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাহাতে এই রোগ প্রবল মূর্ত্তি ধরে এবং অল্পকালেই রুসরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। ঐ সময় এক সেণ্টপিটার্সবর্গ সহরেই ৬ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও রুসিয়ায় এই রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসের মধ্যেই তথায় ৬ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ বৎসর হলণ্ডেও ঐ রোগ দেখা দিয়াছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ আবার রুসিয়ায় সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোক ক্ষয় করিতে থাকে। এবার তথায় ২ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত ও ৯০ হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মেজর লিওনার্ড রজার্স বলিয়াছেন, এ বৎসর তথায় যত লোক যমালয়ে গিয়াছে, ভারতে কয়েক বৎসরে তত লোক শমনসদনে নীত হয় না। এ হিসাব কিরূপ তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কমিশনারের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, অর্দ্ধ বঙ্গেই প্রতিবৎসর প্রায় দুই লক্ষ লোক কলেরায় মরিয়া থাকে। ঐ বৎসর ইটালীতেও এই রোগ সংক্রামক মূর্ত্তি ও

আত্মপ্রকাশ করে এবং বিগত সেপ্টেম্বর মাসেই নেপল্‌স জিলায় সহস্র লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

ইহার পর হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, পর্ত্তুগালের ও মেডিরা দ্বীপপুঞ্জে এই রোগের প্রকোপ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন জর্ম্মাণীর পূর্ব্বখণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে এই রোগ দেখা দিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই বৎসরও য়ুরোপ এই ভীষণ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এই রোগ সংক্রমণের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায়, শীতের কয়েক মাস এই ব্যাধির প্রকোপ অপ্রকাশিত থাকে সম্ভবতঃ দারুণ শীতে ইহার সংক্রমণ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে—বিশেষতঃ দক্ষিণ য়ুরোপে—এই ব্যাধি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া লোক ক্ষয় করিবে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিশরে ও দক্ষিণ য়ুরোপে কলেরার যেরূপ প্রকোপ হইয়াছিল, তদপেক্ষাও এবারকার আক্রমণ গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। তবে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। বিলাতের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। তথাকার সহরে জল সরবরাহের সুবন্দোবস্তগুণে এই ব্যাধির প্রধান বিষাণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর সম্বন্ধে অনেকটা ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে; কিন্তু দক্ষিণ য়ুরোপের নগরে নগরে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হয় নাই, সেই জন্য তথায়ই গুরুতর আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান।

ডাক্তার রজার্স এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে অধিক কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যদি ভাল ভাবে চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহা হইলে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হয়। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পূর্ব্বে কয়েক বৎসর শতকরা ৫৯ জন কলেরা রোগীর প্রাণাবসান হইত। গত বৎসর কলেরা রোগীর মধ্যে শতকরা ২০ জনের জীবনান্ত হইয়াছে। আর গত তিন বৎসরে গড়ে শত করা ৩০ জনেরও কম রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে সময় কলেরা রোগ প্রকাশ পায়, সে সময় সকল জিনিসই সুসিদ্ধ করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ জল ভাল করিয়া না ফুটাইয়া পান করা কর্ত্তব্য নহে। মেলি খাওয়া পরিত্যাগ করা বিধেয়। সোডা ওয়াটার এক সপ্তাহকাল নির্দ্দোষ থাকে; কিন্তু যাহারা জলকে শোধন করিয়া উহা বীজাণু শূন্য করিয়া (Sterilized water) উহাতে সোডা প্রস্তুত করে, তাহাদের কারখানার সোডা ব্যবহার বিধেয়।

———

পুরাতন।

—:•:—

(১)

যাই—তবে যাই!
দিনান্তে এ শ্রান্ত পান্থ সাথী কারে পাই!
তুমি আসিয়াছ আজি
বিচিত্র শোভায় সাজি'
আমি চলিয়াছি ত্যজি' যা' পেয়েছি তাই!
আজ সান্ধ্য সমীরণে
এ বিশুষ্ক উপবনে
কি ফুলে তুষিব তোমা? ফুল আর নাই।
তোমারি ও পথ চাহি,'
এ জীবন গেছে বাহি',
আজ আসিয়াছ; নাই বসাবার-ঠাঁই।
ভাঙ্গিয়া চলেছি সব;—যাই—আমি যাই।

(২)

কেন এলে আজ;
সঙ্গে যবে তোমা ছাড়া জীবনের কায?
সে অর্চ্চনা, উপহার,
ব্যাকুলতা, আঁখিধার
তোমা তরে সেই নিত্য অভিনব সাজ;
নিত্য ডাকা নিরবধি,—
তখন আসনি যদি
কেন এলে আজ? এ যে সীমাহীন লাজ।
বিদায়-আহ্বান স্বর
ভরিছে এ ভাঙ্গাঘর;
আহ্বান কোথায় দিব বিদায়ের মাঝ?
এতদিন আস নাই; কেন এলে আজ?

(৩)

মিছে কেন আর ?
বিদায়ে দাঁড়ান মিছে জুড়ি' ভাঙ্গাধার।
আজ নব সুখ আশ
অদৃষ্টের উপহাস ;
যাতনে সুখের হাসি শুধু হাহাকার।
যে জীবন গেছে কেঁদে
ভাঙ্গাবুকে বল বেঁধে
তা'রে রাখা দুটো দিন আলোকে আঁধার।
ঘাটে নৌকা, ডাকে নেয়ে,
অন্ধকার আসে ছেয়ে ;
গোধূলি আঁধারে ফুটে আলো তারকার,
আমি চলিয়াছি—মোরে ফিরায়ো না আর।

(৪)

সাঙ্গ মোর সব ;
উঠিছে নবীন রবি নব কলরব।
মোর সুখ, মোর আশা,
মোর তৃষা, ভালবাসা,
সে সব মলিন আজ—বিচ্যুত গৌরব।
হেথা শুধু জীর্ণ প্রাণে
র'ব কি আশার টানে ?
পরিচিত পুরাতন কোথা সেই সব !
মোর জীর্ণ ভাঙ্গা ঘর
ভেঙ্গে পড়ে ধূলী'পর ;
মোর কি লাগিবে ভাল নবীন উৎসব !
আমি যাই—আমি যাই ; সাঙ্গ মোর সব।

——:০:——

Printed by B. B. Basak at the Shree Madhab Press
14, Shambazar Street, Calcutta.

আর্য্যাবর্ত্ত—

ফাল্গুন ১৩১৭ পুরাতন প্রসঙ্গ

৺ দ্বারিকানাথ মিত্র।

Printed by K. V. Savoe & Bros.

পুরাতন প্রসঙ্গ।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "৺দ্বারকা নাথ মিত্রের কথা আমার নিকট হইতে শুনিতে চাহ; সে ত এক আধ ঘণ্টার কর্ম্ম নহে। এতাবৎ আমার যত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺দ্বারকা নাথ মিত্রের মত সমুজ্জ্বল ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন; বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েন। অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতী না করিলে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায় না, এই নিয়ম না থাকিলে তিনি যে আরও পূর্ব্বে জজ হইতেন না, এমন কথা বলা যায় না। গ্রে সাহেব তখন বাঙ্গালার ছোটলাট; সার বার্ণ্‌স্ পীকক্ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। যখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইবেন, তখন হঠাৎ এক দিন লাট সাহেব দ্বারি বাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার হাইকোর্টের জজ হইতে আপত্তি আছে কি?' দ্বারি বাবু উত্তর করিলেন, 'না।' লাট সাহেব বলিলেন 'Did you apply for the post?' উত্তর হইল 'No, I thought that these appointments did not go by application.' কয়েক দিবস পরেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইলেন। রাসবিহারীর ভাষায় বলিতে গেলে এত দিন পরে দ্বারি বাবু The Great Unwashed এর দল হইতে বাহির হইলেন।

"তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়, আমার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ী। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগেন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। দ্বারি বাবু শুনিয়াছিলেন যে, আমি কিছু কিছু কোম্‌ৎ পড়িতাম; তাই আমার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়; দ্বারি বাবু তৎকালে কোম্‌তের পাকা শিষ্য হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৮৬৫ সালে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপপরিচয় হয়। ওকালতীতে তখন দ্বারি বাবুর খুব প্রতিপত্তি

রাইয়ৎদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে বিরাট মোকর্দ্দমা তিনি চালাইয়াছিলেন, সেটা The Great Rent Case নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রধান বিচারপতি পীকক্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। দ্বারি বাবু দশ বৎসর ওকালতী করিলেন; কিন্তু একদিনের জন্যও কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমার কার্য্য করিতেন, তাহার পরে কোম্‌তের এক Chapter না পড়িলে তিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেন না। বেলা আটটা নয়টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিতেন। বেড়ান্ কি অন্য কোন রূপ ব্যায়াম তাঁহার ছিল না; আদালতে যাওয়াআসা গাড়ীতেই হইত। তিনি পাশা খেলিতে খুব ভাল বাসিতেন, দাবাও খুব ভাল খেলিতে পারিতেন, কিন্তু পাশাই খুব বেশী খেলিতেন।

"জজ হইয়া প্রথম প্রথম তিনি প্রধান বিচারপতির সহিত বসিতেন। তিনি বলিতেন, 'দেখুন, আমি চিফ্ এর সঙ্গে বোসে অনেক শিখ্‌চি।' সার বার্ণ্‌স্ ও প্রত্যহ রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত আইন অধ্যয়ন করিতেন। দ্বারি বাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। যে দিন একটা ইংরাজী পত্রে জনৈক শ্বেতাঙ্গ দ্বারি বাবুর, তথা হাইকোর্টের প্রতি, বিদ্রূপ করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেই রাত্রিতে সার বার্ণ্‌স্ দ্বারি বাবুকে ডাকাইয়া সেই অপরাধীর নামে এক পরোয়ানা জারি করিলেন। সাহেবকে ধরিয়া আনা হইলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"সার বার্ণ্‌স্ কার্য্য হইতে অবসর লইলে একবার হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিত দ্বারি বাবুর মনোবাদ হয়; তিনি আমায় বলিতেন, 'দেখুন, Resignation (পদত্যাগপত্র) আমার পকেটে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছে দোবো।' আদালতের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিচারপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; একবার তর্কস্থলে সার নুইস্ জ্যাক্‌সন 'But my dear fellow' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'I protest against being addressed in that way.' জ্যাক্‌সন্ সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দ্বারি বাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোক প্রকাশ করেন, এই জ্যাক্‌সন্ সাহেব জজদিগের তরফ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই। প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড কুচ আইন সম্পর্কীয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বড় একটা বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না; তাই শোক-

প্রকাশ করিবার ভার জ্যাক্‌সন্ সাহেবের উপর পড়িয়া ছিল। আমি সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিলাম। এখনও জ্যাক্‌সন সাহেবের কথাগুলি আমার বেশ মনে পড়ে।

"ইংরাজী সাহিত্যে ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তখনকার দিনে লাইব্রেরী পরীক্ষা দিতে পারা বড় সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি হুগলি কলেজ হইতে লাইব্রেরী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি Alison's Europeএর আট ভলুম আট দিনে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন যে, অঙ্কেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন; অন্যায় করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু কলেজের অনৈক ছাত্রকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইল। তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন যে, হলে একজন পরীক্ষক উক্ত ছাত্রের খাতায় অঙ্ক কসিয়া দিলেন। এখন তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া এ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

"কোম্‌তের দর্শন শাস্ত্র যে দ্বারি বাবুর জীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক কোম্‌ৎ দ্বারি বাবুর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবলই বলিতেন যে, হয় আমরা কোম্‌ৎকে সমগ্র মানব-সমাজের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিব, নহে ত মানব-সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ষ্টুয়ার্ট মিলও এক দিন এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমগ্র মানবসমষ্টির পূজা একটি অত্যন্ত সুন্দর ideal। দ্বারি বাবুকে মিল্ এর মত নাস্তিক না বলিয়া আমি তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলিতে চাহি। তিনি ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না।

"কোম্‌তের পুস্তক যখন তিনি পড়েন নাই, তখন প্রথম নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; কিন্তু কোম্‌ৎ পড়িয়াই তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। কোম্‌ৎ নেপোলিয়ানকে যেরূপ গালি দিয়াছেন, বোধ হয় আর কেহই সেরূপ দেয় নাই। দ্বারি বাবুও শেষাশেষি নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। Franco-Prusisan War এর সময় যে দিন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, সেডান্ ক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট্ সৈন্যলক্ষ ফৌজের সহিত বিপক্ষহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে দিন দ্বারি বাবুর প্রাণে যেন একটা ছটফটানির মত দেখিলাম; তিনি ঘৃণায় কর্সিকার ও

কর্সিকার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করিয়া চৌদ্দ পুরুষান্ত করিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার ক্রোধের তীক্ষ্ণতা মনে করিলে এখনও আমার হাসি আসে।

"কোম্‌ৎ তিন প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—প্রথমতঃ Civil marriage,এ স্থলে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র, দম্পতীর অমিল হইলে এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ Religious marriage, এ সম্বন্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ, ইহা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন, বিপত্নীক কিম্বা বিধবা কেহই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। আর একপ্রকার বিবাহকে তিনি Chaste marriage আখ্যা দিয়াছিলেন, এ বিবাহে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ হইয়াও কোন কারণ বশতঃ সহবাস করিবে না ;—হয় ত শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি এমন কিছু আছে. যাহা সন্তানের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

"কোম্‌তের ভক্তশিষ্য ম্যারি বাবু স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিয়া প্রকান্তরে কোম্‌তের আজ্ঞা এক প্রকার উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কার্য্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহা কর্ত্তৃক করা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে তিনি কেবল এইমাত্র দোষপ্রক্ষালন স্বরূপ বলিতেন, 'কি করি'; প্রতিদিন আহারের সময় মা নিকটে আসিয়া চোখের জল ফেলেন ; আর কত দিন মা'র এই ভাব দেখিতে পারি ? কিন্তু আমার দোষ হইয়াছে বলিয়া আমার গুরুদেবের উপর দোষ স্পর্শ হওয়া ত উচিত নয়।' তদুত্তরে আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম, 'লোকে বোলবে কি জানেন ? যে doctrine লোকের conduct inspire কোর্‌তে না পারে তা'র value কি ?'

"প্যাট্রিয়টের" সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু কিছু পান-দোষ ছিল ; সেই দেখাদেখি go-ahead যুবকের দলের অনেকে মদ খাইতে শিখিয়াছিলেন ; বোধ হয় ম্যারিবাবু ও প্রথম তাঁহাদেরই দলের একজন হইয়াছিলেন। কিন্তু কোম্‌তের পুস্তক পাঠ করার পর তিনি মদ একেবারে ত্যাগ করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই ; কিন্তু শেষাশেষি তিনি পুনরায় মদ ধরিয়াছিলেন। কোম্‌তের নিষেধ যে তিনি এতদিন মান্‌িয়া চলিতে পারিয়া ছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

"Distinction of function অর্থাৎ অধিকারভেদ—কোম্‌তের একটি প্রধান কথা। Temporal Power ও Spiritual Power স্বতন্ত্র হওয়া চাহি

ইহা তাঁহার দর্শনের Cardinal Poimt। দ্বারিবাবুও বোধ হয় সকল বিষয়েই এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, Legislator এবং Judge দুইজনের কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে একজন অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। একবার লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটা আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টের মত জানিতে চাওয়া হয়। দ্বারিবাবু মত দেন নাই। তিনি লিখিলেন, 'It is not my function. My function is to interpret the law; not to make the law.' সকলেই বুঝিলেন যে, তিনি কেমন করিয়া Jus dicere হইতে Jus facere পৃথক রাখিতেন।

"দ্বারি বাবু সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু Hindu Law সম্বন্ধে যে কয়টি নজির রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সারগ্রাহিতার পরিচায়ক। দায়ভাগসম্মত উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা Law of Inheritance and Succession—তিনি যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, আমার বোধ হয় যে, আমাদিগের কোনও অধ্যাপকের দ্বারা তাদৃশ অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা সম্পাদিত হইতে পারিত না। তাঁহার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, হিন্দু বিধবা যদি স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ত্রষ্টা হয়, তাহা হইলে সে সেই বিষয় ভোগ করিতে পারিবে না, এই রকম কিছু করা যায় কি না। ফুলবেকে চৌদ্দজন জজের মধ্যে এই বিষয় মীমাংসিত হয়; —দ্বারিবাবুর পক্ষে মাত্র দুইজন জজ—Juctices Kemp and Glover মত দিয়াছিলেন।

"পিতার মৃত্যুর পর দ্বারিবাবু পিতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমার যখন কিছুতেই বিশ্বাস নাই; আত্মা, ভগবান, পরকাল কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তখন আমি লোক-দেখানো কেনই বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাই?' কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তৎকালে যদি তাঁহার কোম্‌তের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সামাজিক নিয়মে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কারণ, কোম্‌তের আর এক প্রধান কথা এই—To destroy, you must replace, অর্থাৎ যতক্ষণ সাবেকের বদলে নূতন কিছু জুটাইতে পারিতেছ না, ততক্ষণ সাবেক বাজায় রাখাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মত কোম্‌ৎ নূতন ধর্ম্মপ্রচারকালে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী-গুলির প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ বা কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি

অনেক বার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে চাঁদাস্বরূপ টাকা দিয়াছেন। তিনি বলিতেন 'কেন দিব না? ক্যাথলিক ধর্ম্ম এক সময়ে জগতের অনেক উপকার করিয়াছে, এখনও করিতেছে, আমি সেই জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা করি।' তিনি তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন—Positivism regards all the past creeds as so many preparations for the demonstrated faith। কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা যায় না। তবে হিন্দুসমাজকে এরূপ ভাবে আঘাত করা কি উচিত?

"আর একটি কথা। শ্রাদ্ধের উৎসবের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান কোম্‌তের পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে; তফাতের মধ্যে এই যে, শুধু আমার পিতৃপুরুষের * শ্রাদ্ধের একটি দিন তাঁহাদের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত না করিয়া সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ হইতে যাবতীয় পূর্ব্বতন মৃতব্যক্তিদিগের নামকীর্ত্তনস্বরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। একটু পরিষ্কার করিয়া কথাটা বলি। অন্ধসংস্কারবশতঃ মাসের নামকরণ দেবতাদের নামে করা হইয়াছে; তাই তিনি সমগ্র মানবসমাজের মধ্য হইতে তেরজন লোকের নামে তেরটি মাসের নাম করিয়াছেন তাঁহার বৎসরে তের মাস; যথা Moses, Homer, Aristotle, Archimedes, Cæsar, St. Paul, Charlemagne, Dante, Guttenbug, Descartes, Shakespeare, Frederick the Great, Bichat। প্রত্যেক মাসে ২৮ দিন; সেই দিনগুলির নামকরণও এক একজন মহাপুরুষের নামে হইয়াছে; যথা মনু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন্, কলম্বস্, বেকন ইত্যাদি। এই হিসাবে ৩৬৪ দিন পাওয়া গেল। বাকি এক দিন যাহা রহিল, সেইটাই শ্রাদ্ধের দিন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, Feast of all the dead। চারি বৎসর অন্তর আর একটা শ্রাদ্ধের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে—Festival of Virtuous Women

"কোমৎ এই ব্যবস্থার নাম Positivist Calendar দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, এই পঞ্জিকাতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতাবলম্বী এমন ব্যক্তিদিগের নাম একত্র সংযোজিত করা হইয়াছে, যাঁহারা জীবিতাবস্থায় পরস্পর একত্র দেখা হইলে গলা কাটাকাটি করিতে প্রস্তুত হইতেন।

* তবে গয়ার শ্রাদ্ধে সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞাত অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই নাম উল্লেখ করা হয় বটে।

ফলতঃ মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে বিশেষ গুণপনা ও অপক্ষপাতিতা ও সর্ব্বসংগ্রাহিতা (catholicity) প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোম্‌ৎ যেমন একটি পঞ্জিকা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তিনি একটি লাইব্রেরী স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, শরীরের সুস্থতা রক্ষার্থে আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাবধান হওয়া উচিত, যাহা তাহা না খাইয়া বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্য বাছিয়া লওয়া যেমন কর্ত্তব্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য তদনুরূপ একটি নিয়ম পালন করা আবশ্যক, যাহাতাহা পড়া অভ্যাস থাকিলে মস্তিষ্ক কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি প্রাচীন গ্রীক্, ল্যাটিন, এবং আধুনিক ইংরাজী, ফরাসী স্পেনীয়, ইটালিয়, ও জর্ম্মান এই সপ্ত ভাষার মধ্য হইতে যত সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ আছে, তাহা বাছিয়া লইয়া Positive Library বলিয়া একটি পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পুস্তকের সংখ্যা আন্দাজ আড়াই শত হইবে। সেগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—যথা, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং Synthesis। অত্যুৎকৃষ্ট পদ্যগ্রন্থগুলিও কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায় যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য কথাটি ইংরাজি poetry শব্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কারণ ছন্দ ব্যতীত poetry হয় না, কিন্তু কাব্য বলিলে রঘুবংশও বুঝায় কাদম্বরীও বুঝায়। এই লাইব্রেরীর কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলে ইহা যে কতদূর সর্ব্বসংগ্রাহিতাসহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে,—Homer, Virgil, Shakespeare, Dante, ফষ্টের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা, গোল্ডস্মিথের ভিকার, ফিল্ডিঙ্গের টম্ জোন্‌স্, বায়রণের বাছা বাছা কাব্য, পলবার্জিনিয়া, ইত্যাদি কি ছোট, কি বড়, বোধ হয় কোনও ভাল গ্রন্থ তিনি ভুলিয়া যায়েন নাই। সেই লাইব্রেরীর সংগ্রহ করিবার জন্য হারি বাবুর কতকটা চেষ্টা ছিল; কতক সংগ্রহও করিয়াছিলেন।

"এই লাইব্রেরী সম্বন্ধে মিল কিন্তু বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইবে না, এই কথা তিনি Alexandriaর লাইব্রেরী দগ্ধ করার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা একপ্রকার sweeping holocaust of books. কিন্তু আমার বোধ হয় এস্থলে কোম্‌তের অভিপ্রায়ের মিল বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কোম্‌তের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, তিনি জানিতেন যে, সাধারণ লোকে বড় একটা বোঝে না কোন বহি পড়া ভাল আর কোন্ বহি পড়া ভাল

নহে, সেই জন্য যখন যাহা পায় তাহা পড়ে। সেই কুঅভ্যাসনিবারণের নিমিত্ত যেরূপ পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক তাহারই একটি পরামর্শমাত্র তিনি দিয়া গিয়াছে।

"কোম্‌ৎ ভালরূপে পড়িবার নিমিত্ত শেষাশেষি ধারিবাবু ফরাসী ভাষা কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন পরিপাট্য জন্মিয়াছিল যে, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, ফরাসী ভাষায় লিখিত Positive Philosophyবহি খানি হাতে লইয়া তিনি এরূপ অনুবাদ করিয়া যাইতে পারিতেন যে, লোকে মনে করিত যে, তিনি একখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া যাইতেছেন; কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। কিছু দিন পরে তিনি কোম্‌ৎ প্রণীত Analytical Geometry খানি ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"কোম্‌তের দর্শনশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া মিল একখানি পুস্তক লিখিলেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি কতকটা 'খ' হইয়া গিয়াছিলাম। আমার সেই ভাব দেখিয়া ধারি বাবু একদিন বলিলেন, 'আপনি অত চঞ্চল হইবেন না। আমি মিলের বহি খুলিয়া প্রত্যেক ছত্র ধরিয়া দেখাইয়া দিব যে, তাঁহার গ্রন্থের ভিতর কতকটা আইনের চালাকির মত বদমায়েসি আছে।' কিন্তু দেখাইয়া দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না; ইহার পরেই তিনি জীবনান্তকারী ব্যাধিতে পড়িলেন। তাঁহার যে Cancer ব্যায়রাম হইয়াছিল, ইহা, বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্মা চন্দ্রকুমার দে—যিনি ধারি বাবুর খুল্লতাত স্বরূপ ছিলেন,—তিনিই বুঝিতে পারেন। এই ডাক্তার একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারি বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি জর্ম্মান্ ভাষা হইতে ডাক্তারি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; ফরাসী ভাষাও বেশ জানিতেন। ডাক্তারির পেশাদারি চালচলন তিনি বড় একটা জানিতেন না।

"Cancer এর কথা শুনিয়া ধারি বাবু একপ্রকার হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, কারণ অ্যালোপ্যাথি মতে Cancer সম্বন্ধে ডাক্তারেরা একপ্রকার কবুল জবাব দিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই বলেন যে, এ রোগের ঔষধ নাই। ধারিবাবুর চিকিৎসা নানা মতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, প্রণালী-সঙ্গত রূপে হয় নাই। আমার মনে হয় যে হোমওপ্যাথি

বা কবিরাজি ধারাবাহিকরূপে ক্রমাগত চালান হইলে, রোগমুক্ত না হউন, তিনি এতাবৎকাল এক প্রকার জীবিতাবস্থায় থাকিতে পারিতেন। উক্ত পীড়ায় তাঁহার মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ বক্রতা আসিয়াছিল; সেইটি উপলক্ষ্য করিয়া আমার একজন পরমাত্মীয় গোঁড়া ব্রাহ্ম বন্ধু সময়ে সময়ে একটা কথা বলিতেন যাহা আমি silly না বলিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলিতেন, "দেখেছো, কৃষ্ণকমল, আমি এইটি লক্ষ্য করেছি যে, দ্বারি বাবু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি দৈব বিষয় সম্বন্ধে যে রকম মুখভঙ্গী করে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথাবার্ত্তা উচ্চারণ করেন, রোগে ওঁর ঠিক সেই বিকৃত মুখভঙ্গী করে দিয়েছে, এতে আমার মনে লাগে যে, সাক্ষাৎ ভগবান তাঁর এই শাস্তি দিয়েছেন।" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক হইয়া যাইতাম. এবং বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনও এক ব্যক্তির মুখ হইতে এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কখনও নির্গত হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারিতাম না। ইহা আমি কেবল তাঁহার গোঁড়ামির উপহাস ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নাই।

"দ্বারি বাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপথে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আমৃতার নিকটবর্ত্তী আওন্‌সি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গাড়ীতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ীর নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত-সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা।

"সে প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল। কিন্তু দ্বারি বাবুর personality আমার চিত্তক্ষেত্রকে এরূপ প্রগাঢ়রূপে অধিকার করিয়া আছে যে, এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। কেবল আর একটি ব্যক্তি আমাকে বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার স্বপ্নে দেখা দিয়া থাকেন,—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কৃষিতত্ত্বের আলোচনা।

(১)

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনিঋষিগণ সকল বিদ্যারই সম্যক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃষিবিদ্যা বিষয়ে তাঁহারা এত উদাসীন ছিলেন কেন? কৃষিবিষয়ে তাঁহারা ত বিশেষ কোন কথাই লিখেন নাই। দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, জনসাধারণের বিশেষ আবশ্যক চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যন্ত তাঁহারা বিস্তৃতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃষিজীবী ভারতবাসীর পক্ষে যে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, যে বিদ্যায় অবহেলা করিলে ভারতবাসীর খাইতে পরিতে সকল দিকেই মহা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কি আশ্চর্য্য প্রাচীনেরা সেই বিষয়ের কোন ধারাবাহিক আলোচনা করেন নাই; এমন কি এই সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই নির্ব্বাক,—যেন এ একটা কোন কাযের বিষয়ই নহে। বাস্তবিক এইরূপ আক্ষেপোক্তি যে ভিত্তিশূন্য,—আমরাও এমন কথা বলিতেছি না। তবে কেন তাঁহারা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশাদি প্রদান করেন নাই, একটু অনুধাবন করিলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বকালে আমাদের জন্মভূমি প্রকৃতই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ছিল। আধুনিক কবি বর্ত্তমান সময়েও ইহাকে "সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেটা জোর করিয়া। সত্যই কি আমাদের দেশ এখনও ঐ সকল বিশেষণে বিভূষিত হইতে পারে? না,—এখন আর দেশের সে শস্যশ্যামলা অবস্থা নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। এখনকার মত সেকালের লোক "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া দিন যাপন করিত না. "অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী"—তখনও তাহাদের মনে শেল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করে নাই, এখনকার মত তখন তাহারা নিত্য দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া অকালে শমন-সদনে গমন করিত না। তখন প্রকৃতই ভূমি সুজলা ছিল;—নদনদী, খালবিল, পুকুরডোবা জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত, দুই এক বৎসর অল্পপরিমাণে বৃষ্টি হইলেও কৃষকরা ছেচ দিয়া শস্য রক্ষা করিতে পারিত, কখন্ এক বিন্দু বারিপাত হইবে তবে শস্য-রক্ষা হইবে, এই ভাব-

নায় অস্থির হইয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় সুনীল গগনে অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত না। তখন প্রকৃতই ভূমি সুফলা ছিল;—মাটির উর্ব্বরতা শক্তি তখনও প্রায় সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সামান্যরূপে ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলেই ষোল আনা ফসলে মাঠ ভরিয়া যাইত,—ক্ষেত্রে এখনকার মত অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হইত না। আর ভূমি সুজলা, সুফলা বলিয়া শস্য-শ্যামলা হইয়া কৃষকের মনে সুখের হাট বসাইয়া অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিত। তখন বাস্তবিকই "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর"—ক্ষেত্রের এইরূপ ভাব ছিল। তখন জন্মভূমি স্বীয় ঐশ্বর্য্যভারে উৎফুল্লা হইয়া স্বীতবক্ষে বিরাজ করিতেন। এক কথায় সেকালে জমীতে এরূপ তেজ ছিল, জমীর উর্ব্বরতা শক্তি এত অধিক ছিল যে, সামান্যমাত্র পরিশ্রমে জমী একটু আঁচড়াইয়া (কর্ষণ করিয়াও নহে) বীজ ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। তাহার উপর অধিকাংশ জমীই ভালরূপে জলসম্পোষ্য ছিল,—'শুকো' হইলেও শস্যের অনিষ্ট হইত না। সুতরাং মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিয়াও কৃষকরা অক্লেশে অন্নের সংস্থান করিতে পারিত, অনায়াসে পরিবার প্রতিপালন করিত। তখন তাহাদের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি।

তৎকালে কৃষিজাত দ্রব্য এইরূপ অনায়াসলব্ধ ছিল বলিয়া, প্রাচীন মনীষিগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট ছিলেন না, তাই তাঁহারা এই বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করিয়া যায়েন নাই এবং সেই জন্যই আমাদের কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদির বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখন দেখা যাউক, আমাদের কৃষিকার্য্যের এইরূপ অধঃপতনের কারণ কি। কৃষিকার্য্যের এইরূপ অবনতির কতিপয় প্রধান কারণ আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইত, এখন আর সেরূপ হয় না; বৃষ্টির পরিমাণ এখন অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য চলিতে পারে না।

২। জমীর উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস। জমীর উর্ব্বরতাশক্তি ক্রমাগত কমিয়া গিয়া, এখন জমী প্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। একই জমীতে ক্রমাগত ফসল উৎপাদন করিলে, সেই জমীর উর্ব্বরতাশক্তি কমিয়া যায়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। জমীর উর্ব্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, উহাতে

উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হয়। শস্যোৎপাদনের জন্য জমী হইতে যে পরিমাণে শস্যের খাদ্য নিঃশেষিত হইতেছে, সার প্রয়োগ করিয়া সেই পরিমাণে শস্যের খাদ্য জমীতে পুনঃ সংস্থাপন করিলে, তবে জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বা তেজ অক্ষুণ্ণ থাকে। অথবা কোন জমীতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর চাষ আবাদ করিয়া, পরে ২।৩ বৎসর আবাদ না করিয়া সেই জমী ফেলিয়া রাখিলে প্রাকৃতিক নিয়মে জমী প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া অথবা উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর জমী আবাদ না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া, জমীর তেজ বজায় রাখিবার চেষ্টা কয়জন কৃষক করিয়া থাকে? তাহাদের সেরূপ সামর্থ্য নাই। অধিকাংশ কৃষকেরই সার কিনিয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই। নিজের হালের গরু হইতে যে টুকু সার পায়, জমিতে সেই সার দিয়াই, তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, এই যৎকিঞ্চিৎ সার জমীর উর্ব্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাহার পর, অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতেই বা তাহারা পারে কৈ? তাহা হইলে তাহাদের 'পেট চলে' কিরূপে? কাযেই এইরূপে আমাদের দেশের জমীর সারাংশ ক্রমেই শোষিত হইয়া এক্ষণে জমী এত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্বে যে জমীতে যে পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না।

৩। দেশে বন্যার অভাব। পূর্ব্বে অধিকপরিমাণে বৃষ্টি হইত বলিয়া ২।১ বৎসর অন্তর নদনদী ভরিয়া গিয়া দেশে বন্যা হইত। যে বৎসর বন্যা হইত, সে বৎসর 'হাজা' হইয়া শস্যের অনিষ্ট হইত—সন্দেহ নাই; কিন্তু এই রূপ বন্যায় জমীর উপর পলি পড়িত, ফলে জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বর্দ্ধিত হইত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলে এইরূপ বন্যা হয় বলিয়া, সেই সকল স্থানের কৃষকরা ক্ষেত্রে সার না দিয়াই শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

৪। সারের অপচয়। আমাদের দেশে সারের অন্যায়রূপ অপচয় হইতেছে। দেশ হইতে ক্রমাগত অস্থি সকল বিদেশে চালান হইতেছে। এমনই ব্যাপার যে, ক্ষেত্রে দুই দশখানা হাড় পড়িয়া যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তির বৃদ্ধি করিবে, পোড়া দেশে সে উপায়ও নাই। অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, দেশের সকল "ভাগাড়"ই মহাজনরা জমা লইয়াছে এবং লোক নিযুক্ত করিয়া হাড় সংগ্রহ করিতেছে। এই সকল হাড় সংগৃহীত হইয়া বিদেশে

রপ্তানী হইয়া থাকে। সোরা একটা প্রধান সার। বিহার, পঞ্জাব, বোম্বাই মাদ্রাজ, ত্রিহুত প্রভৃতি নানাস্থানের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে সোরা মিশ্রিত আছে। নুনিয়া নামক নিম্ন শ্রেণীর লোক মাটি হইতে সোরা প্রস্তুত করে। এই অপরিস্কৃত সোরা ২।২৷৷০ টাকা মন দরে বহুপরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশে অপরিস্কৃত সোরা সারের জন্য এবং পরিস্কৃত সোরা বারুদ তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ সারের জন্য সোরা ব্যবহার করিতে হইলে আমাদিগকে ৭।৮ টাকা মন দরে বাজার হইতে সোরা ক্রয় করিতে হয়। কি বিড়ম্বনা! অধিকাংশ গোময়ই কৃষকগণ পোড়াইয়া থাকে। অতি অল্প পরিমাণ সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ঘুঁটের ছাই জমীতে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু গোময় অপেক্ষা ছাইএর সারাংশ অনেক পরিমাণে কম।

৫। দেশের শস্য দেশে না থাকা। দেশের উৎপন্ন শস্য দেশে থাকিলেই, জমীর তেজ অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই উৎপন্ন শস্যগুলিই পুনরায় অন্য প্রকারে (যথা—জীব জন্তুর বিষ্ঠা, শস্যের আবর্জ্জনা, খড়, খইল প্রভৃতি) মাটিতে পড়িলে তবে মাটির শোষিত সারাংশ বর্দ্ধিত হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ৮ কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় এবং তন্মধ্যে ২৫ লক্ষ টন, প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; অর্থাৎ উৎপন্ন খাদ্যশস্যের শতকরা৷৩ ভাগ বিদেশে চলিয়া যায়! তদ্ভিন্ন তৈলপ্রদ বীজ—রেড়ি তিসি, চীনার বাদাম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয়। এইরূপেও প্রতি বৎসর আমাদের দেশের জমী সারশূন্য হইতেছে।

৬। কৃষি যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন না হওয়া। দেশের জমীর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু কৃষি যন্ত্রাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বারিপাত কমিয়া যাওয়াতে, জলের অল্পতাপ্রযুক্ত জমী ক্রমশঃ কঠিন হইতেছে, কিন্তু জমী কর্ষণ করিতে আমরা যে লাঙ্গল ব্যবহার করি, সেই লাঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় আছে, উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যখন মাটি ক্রমেই কঠিন হইতেছে এবং উহার উপরিভাগের সারাংশ শস্যোৎপাদনে দিন দিন নিঃশেষিত হইতেছে, তখন জমী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর করিয়া কর্ষণ করিলে, জমীর উর্ব্বরতা শক্তি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে; কারণ, এইরূপ ভাবে অপেক্ষাকৃত গভীর করিয়া কর্ষণ করিলে, মাটির ভিতর হইতে

অনেক শস্য-খাদ্য ক্রমে ক্রমে পুনরায় মাটির উপরি ভাগে আসিয়া জমা হইবে। দ্বিতীয় কথা, নদনদী, খালবিল প্রভৃতি যে সকল জলাশয় হইতে পূর্ব্বে জলোত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে জল-সেচন করা হইত, সেই সকল জলাশয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা জল কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে সেগুলি পরিপূর্ণ থাকায় যে সকল যন্ত্রের (সিউনি, ডোল প্রভৃতি) সাহায্যে ক্ষেত্রে জল-সেচন করা হইত, এখন সেগুলি দ্বারা সুচারু রূপে জল-সেচন হইতেছে না। সুতরাং, জমীর পরিবর্ত্তনের সহিত কৃষি যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন অথবা নূতন যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন না হওয়ায়, কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে।

৭। গোবংশের অবনতি। আমাদের দেশে গোবংশের উত্তরোত্তর অবনতি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, কর্ম্মঠ বৃষ এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। গোবংশ ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হইতেছে। যে সকল বৃষের দ্বারা এক্ষণে কৃষকগণ হলচালনা করে, সেগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। কৃষকরা অযথা গালি বর্ষণ করিয়া ক্রমাগত প্রহার করিলেও ইহাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষম করিতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস গোবংশের এইরূপ অবনতির প্রধান কারণ দেশে গোচারণ ভূমির অভাব। তাঁহারা বলেন,—"পূর্ব্বে প্রতি গ্রামে গোচারণ ভূমি যথেষ্ট ছিল। গবাদি পশুগণ উক্ত মাঠে দিবাভাগে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারিত; সম্প্রতি জমীদারগণের অর্থ-পিপাসায় ঐ সমস্ত গোচারণ ভূমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষকগণ যে সমস্ত স্থানে গবাদি পশু রক্ষা করে, তাহা নিতান্ত কদর্য্য। তাহারা ঐ সকল পশুকে যথেষ্ট যত্ন করে না ও উপযুক্ত আহার দেয় না। ঐরূপ নানা কারণে উক্ত পশুগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে ও উহারা হীনবীর্য্য হইতেছে।" গোচারণ ভূমির অভাব যে একটা কারণ, সে কথা আমরাও স্বীকার করি; তবে ইহাই প্রধান কারণ নহে। সুতরাং কেবল জমীদারের অর্থ-পিপাসায় যে গোবংশের দিন দিন অবনতি হইতেছে, —এ কথা আমরা স্বীকার করি না। আমাদের বিশ্বাস, এই অবনতির প্রধান কারণ,—বলবীর্য্যশালী বৎসোৎপাদনকরণার্থ দেশে সুস্থ ও বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আজকাল যে সকল বৃষ গোবংশ রক্ষা করিতেছে, সেগুলি এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ সুস্থ ও সবল বৃষের অভাব প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া গোবংশ এত দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অভাব মোচন করিবার জন্য পূর্ব্বে আমাদের

সমাজে অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। তখন হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন, শ্রাদ্ধাদিতে বৃষ উৎসর্গ করিতেন। সেই বৃষ ইচ্ছামত পল্লীমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের দ্বারে গেলে অধিবাসীরা সযত্নে, ভক্তিভরে তাহাকে আহার প্রদান করিত। সে এই ভাবে পল্লীবাসীর আদর-যত্নে লালিত পালিত হইয়া পল্লী-জীবন যাপন করিত। হিন্দুদিগের উৎসর্গীকৃত বৃষ এবং মুসলমানদিগের উৎসর্গীকৃত খাসী এইরূপ আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইয়া, মনের আনন্দে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিত বলিয়া, আমাদের দেশে "ধর্ম্মের ষাঁড়" ও "খোদার খাসী" প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কোন কায়কর্ম্ম না করিয়া, কেবল খাইয়া, খেলাইয়া, নধর কান্তি লইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, তাহাকে লোকে এখনও "খোদার খাসী" বা "ধর্ম্মের ষাঁড়" নামে অভিহিত করে। তখন এই সকল নধর কান্তি, হৃষ্টপুষ্ট বৃষ গ্রামে দুই চারিটি থাকিত বলিয়া, গোবংশের অবনতি হইত না। গোজাতি ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও খর্ব্বাকৃতি হইতেছে বলিয়া, কৃষিক্ষেত্রে ভালরূপ হল-চালনা হইতেছে না। ইহাও কৃষিকার্য্যের অবনতির অন্যতম কারণ।

৮। অস্বাস্থ্যতা। দেশের জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের জন্য দেশের স্বাস্থ্য অযস্ত হওয়ায়, কৃষকরা ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিতেছে। অল্প পরিশ্রমে তাহারা কাতর হইয়া পড়ে, এখন আর পূর্ব্বের মত অষ্টপ্রহর পরিশ্রম করিতে পারে না।

৯। বিলাসিতা। কৃষকরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলাসপ্রিয় হইয়াছে। এই বিলাসিতায় তাহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত। তাহারা বিলাসী হইয়া ক্রমেই অলস হইতেছে বলিয়া, আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে অসম্মত। বিলাসের দ্রব্য সঙ্কলানের জন্য সময়ে সময়ে তাহারা বীজ শস্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। স্বীয় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনই তাহারা সকলে যোগাইতে পারে না, তাহার উপর আবার বিলাসিতার আশ্রয় লইলে, তাহারা ত শ্রীভ্রষ্ট হইবেই। বিলাসিতাই দরিদ্রের লক্ষ্মীশ্রী নষ্ট করিবার প্রধান সামগ্রী। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, সামান্য কৌপীনধারী কৃষক শারদীয়া পূজার সময় স্বীয় প্রণয়িনীর জন্য ১২৲ টাকা মূল্যের পার্শী সাড়ী এবং ২৲ টাকা দামের সেমিজ ক্রয় করিতেছে। এইরূপে কৃষকরা বিলাসিতায় হাবুডুবু খাইয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতেছে। সকলেই জানেন, আজকাল কাবুলীরা

পল্লীতে পল্লীতে বেশী সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। এই শীতকালে তাহারা কৃষকদিগকে ধারে র‍্যাপার বিক্রয় করিবে, তাহার পর সেই র‍্যাপারের মূল্য সুদে আসলে বেশ কাঁপিয়া উঠিলে, তাহারা জোর করিয়া কৃষকগণের কুটীর হইতে তৈজস পত্রাদি এবং গোলা হইতে শস্যাদি লইবে। তাহাদের লাঠির ভয়ে তখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় মাননীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"Poor as the Indian raiyat has always been, his poverty is not as intense now as it used to be, and he can afford to spend money on little luxuries which his forefathers never dreamt of enjoying." হইতে পারে কৃষকগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, কিন্তু বিলাসিতাই যে তাহাদের অধঃপতনের মূল—ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। আমাদের কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও, তাহারা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণগ্রস্ত—সে সম্বন্ধে কণামাত্র সন্দেহ নাই। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, যাহারা বিলাসিতায় মজিয়াছে, তাহারাই আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত। ঋণ করিয়া বাবুগিরি করা অপেক্ষা পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভাল নহে কি?

১০। কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া তেজারতি ব্যবসায় অবলম্বন। যে সকল কৃষক কৃষিকার্য্যে দুই টাকা জমাইতে পারিয়াছে, তাহারা আর কৃষিকার্য্য করিতে চাহে না। তাহারা সেই অর্থ লইয়া নিজগ্রামে তেজারতি ব্যবসায় করিতেছে, সুদে টাকা খাটাইতেছে। এইরূপে অনেকে বেশ উপার্জ্জন করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতেও কৃষিকার্য্যের উত্তরোত্তর অবনতি হইতেছে।

১১। কৃষক বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার ফল। এতদিন যাবৎ যে সকল কৃষক পুরুষানুক্রমে স্বহস্তে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের পুত্রগণ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, দুই পাতা ছাপার বহি পড়িয়া, ম্যাক্‌মিলনের বিজ্ঞানরিডার কণ্ঠস্থ করিয়া, আর কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে না, আর নিজের হাতে লাঙ্গল চালাইতে চাহে না। তাহারা নিজের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া—চাষবাসে মন না দিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহাও এক মহা সমস্যা। কোন গ্রামে গিয়া, প্রবীণ কৃষকগণের সহিত দুই দণ্ড কথাবার্ত্তা

কহিলেই শুনিতে পাইবেন, তাহারা আপনাদের "শিক্ষিত" সন্তানগণের জন্য আক্ষেপ করিতেছে। "শিক্ষার" এইরূপ বিষময় ফল হাতে হাতে ভোগ করিয়া, গ্রামের প্রবীণ কৃষকগণ তাহাদের অন্যান্য সন্তানদিগকে আর পাঠশালায় পাঠাইতে সম্মত নহে। পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াই, আধুনিক কৃষক-সন্তান লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয় এবং নিজের জাতীয় ব্যবসায়ে মন না দিয়া কিরূপে পাঁচ জন নিরীহ প্রতিবেশীকে ঠকাইয়া ২।৫৲ টাকা হস্তগত করিতে পারে, সেই চেষ্টায় সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে যাহারা আবার অধিক মাত্রায় চতুর, তাহারা নিকটস্থ সহরে আসিয়া উকীলের দালালি করে। কিরূপে গ্রামের মধ্যে অনর্থক বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া, দুই দশটা মামলা-মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হয়, তাহারা সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। এই সকল দালালদিগের পরামর্শে যে সকল কৃষক পূর্ব্বে কখনও আদালতে উপস্থিত হয় নাই, তাহারাও মামলা-মোকর্দ্দমা করিয়া ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"র কি অনিষ্টকর বিষময় ফল!

ওমরের পথে।

মেল নিদ্রা-নিমীলিত নীলাভ নয়ন ;
প্রাচীমূলে ফুটে, হের, তরুণ তপন ;—
আপনার ছায়াত্রস্তা কুরঙ্গিণী সম
অন্ধকার ধরা ত্যজি' করে পলায়ন।
সুপ্তি'পরে চেতনার প্রথম আভাস—
বিহগ-বিরাবে তা'র স্বাগত সম্ভাষ ;
গলিত-কাঞ্চন-আভা পূর্ব্বমেঘজালে—
রঞ্জিত বিচিত্র বর্ণে উষার আকাশ।
গেছে কাল—লয়ে তা'র সুখ, দুঃখ, ভয় ;
আজি এ নূতন ধরা—নব আলোময় ;
সঞ্চিত আশঙ্কা, আশা কাল ছিল যত
অতীত অতলে কোথা পেয়েছে বিলয়।
অনিশ্চিত ভবিষ্যত সুখের আশায়
কে ত্যজিবে বর্ত্তমান—এ মর ধরায় ?
আজ আমি আছি, আছে বিচিত্র এ ধরা
কে জানে নিয়তি কাল লইবে কোথায় ?

মুহূর্ত্তের ভূল।

বন্দী ; আমি,—চির-নির্ব্বাসিত !

দিন যায়, সন্ধ্যা হয় ; আবার দিন আসে,—আমার দিন ফুরায় না ! ঐ যে "রাঙ্গা রবি ছবিখানি" ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে মিলাইয়া যাইতেছে, উহার পশ্চাতে অন্ধকার। ততোঽধিক অন্ধকার আমার হৃদয়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চন্দ্রালোকে অপনীত হয় ; অমাশিশার অন্ধকার উষার অরুণ রাগে তিরোহিত হয় ;—আমার মনের অন্ধকার কিছুতেই দূর হয় না। সে অন্ধকার অনন্ত, অব্যয়, অবিচ্ছিন্ন !

দিবসে পাথর ভাঙ্গি রাত্রিতে দিন গণি। পাথর ভাঙ্গা নির্দ্দিষ্ট কায ; দিন গণা তাহা নহে, তবু গণি। গণিয়া লাভ নাই, তথাপি গণি। ভ্রান্ত মন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না, তাই গণি ! গণিতে গণিতে এক এক দিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় ; অবসন্ন দেহে পাথর ভাঙ্গিতে ফিরিয়া আসি ;—তবু গণি !

দীর্ঘ, বিনিদ্র নিশাবসানে মনে হয়, অতীত স্বপ্ন ; বর্ত্তমান চিরসত্য।

পাঁচ বৎসর ; দীর্ঘ—বড় দীর্ঘ ! যে মুক্ত, স্বাধীন তাহার নিকট সে মুহূর্ত্ত। আমার নিকট সে এক যুগ—এক কল্প ; তদপেক্ষাও দীর্ঘ।

যখন চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়-ভারে কর্ম্মক্লান্ত হস্ত শিথিল হইয়া আইসে, তখন অনিমেষ নয়নে ঐ বাত্যাবিতাড়িত বীচিবিক্ষুব্ধ বিশাল বারিধি-বক্ষের বিচিত্র লীলা অবলোকন করি।

উহার বক্ষে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তৎপশ্চাতে তরঙ্গ—দীর্ঘ, ঋজু, বক্র, বিলম্বিত ; আমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও তেমনই ঘাত-প্রতিঘাত, তরঙ্গ-সংঘর্ষ। সমুদ্রের বিশ্রাম নাই, আমার হৃদয়-সংগ্রামেরও বিরাম নাই। ক্ষুদ্র বিশালের তুল্য তুলনা !

যখন অতর্কিত অশ্রুবিন্দু গণ্ড গড়াইয়া হস্তস্থিত শিলাখণ্ড সিক্ত করে, তখন মনে করি, পাষাণের প্রাণ আছে ; ব্যথিতের বেদনায় তাহারও হৃদয় বিগলিত হয়।

বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিয়াছেন, পাষাণের পীড়া আছে। যাহার পীড়া আছে, নিশ্চিতই তাহার প্রাণ আছে। যখন মনে হয়, পাষাণ সপ্রাণ ; আবার

দুঃখে তাহার অশ্রু করে, তখন মনে কেমন এক অপূর্ব্ব শান্তি আইসে। কর্কশ হস্তে অশ্রু মুছিয়া, কর্ত্তব্যের অবসরে কারাগৃহের শীতল ভূমি-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। হায়, উদ্‌ভ্রান্ত মন!

কিন্তু নিদ্রা হয় না। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার আরাধনায় নয়ন নিমীলিত করি—আর অবাধ্য মন পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক শূন্য পথে প্রয়াণ করে।

নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মন এক ক্ষুদ্র পল্লীর গ্রাম্য পথে উপস্থিত হয়; তথায় এক ক্ষুদ্র গৃহের অনুসন্ধান করে। একদিন সেই গৃহ আমার ছিল।

আমি সেই গৃহের একচ্ছত্র নৃপতি ছিলাম। তথায় এক পল্লীরাণী সর্ব্বদা আমার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত উৎসুক থাকিতেন। সে দিন এখন আর নাই। অতীতের অনন্ত গর্ভে—বিস্মৃতির অন্ধ বিবরে তাহা বিলীন হইয়াছে।

সেই গৃহ,—বিদায়ের দিন তাহাকে যেমন দেখিয়া আসিয়াছিলাম, মন তাহাকে কল্পনায় আঁকিয়া তেমনই দেখিতে পায়। হয় ত তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; হয়ত সে স্থানে সে গৃহ আর নাই! কিন্তু মন তাহা ভাবিতে পারে না। সে কথা মনে করিতেও ব্যথা বড় শুরু বাজে।

সে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয় ত সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মন তাহা কল্পনায়ও আনিতে চাহে না। সে বিশ্বাস করিয়া সুখী হয়—বিপদ-বিষণ্ণ, বিরহ-ক্লিষ্ট পল্লীরাণী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি, ভালবাসা এবং নির্ভরতা লইয়া দিনের পর দিন, এই স্নেহবিচ্যুতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দুর্ব্বল মন সেই অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সেই গৃহ-সন্নিধানে থাকিতে চেষ্টা করে; যদি দর্শনলাভ ঘটে!

শ্বেত দ্বীপের এক মহাকবি গাহিয়াছেন,—যেমন নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে আলোক-তরঙ্গ প্রকম্পিত হয়, তেমনই আত্মা হইতে আত্মান্তরে ভাব-তরঙ্গ বিকম্পিত হয়। যদি তাহা সত্য হয়, তবে মন কেন কিছুই অনুভব করিতে পারে না; সেস্থানে যাহা ছিল তাহা আছে কি না, মন তাহা বুঝিতে পারে না কেন?

এ যে কি কষ্ট,—এ যে কি নিদারুণ নিরাশার ব্যথা, তাহা কে অনুভব করিবে?

মৃত্যুর পর আত্মা যখন দেহ-বিচ্যুত হইয়া প্রেতলোকে প্রয়া

করে, তখন তাহার দেহ থাকে না, কিন্তু অস্তিত্ব থাকে; লালসা থাকে, কিন্তু ভোগের উপায় থাকে না; বাসনা থাকে, কিন্তু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না।

আত্মা তখন তাহার পরিত্যক্ত গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে যেমন গৃহের সকলকেই দেখিতে পায়, অথচ আপনার উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, অথবা পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে আপনার ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারে না; আমার মনও তেমনই সেই গৃহের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গৃহের সকলই আছে মনে করে, কিন্তু যথার্থ অনুভব করিতে পারে না।

কেমন করিয়া বুঝাইব, মনের কি কষ্ট! তীব্র বেদনায় হৃদয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া আইসে। মনে হয়, কেহ হৃৎপিণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া, নিঙ্গড়াইয়া রক্তশূন্য করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে!

আবার দিন গণি, কিন্তু ঐ অফুরন্ত সমুদ্র তরঙ্গের মত অফুরন্ত দিন। দিনের পর দিন,—তাহার পর দিন, আবার দিন। মৃত্যু নাই—মুক্তি নাই; আছে কেবল বেদনা!

অশ্রু! তুমি ও কি অফুরন্ত! পাঁচ বৎসর দরবিগলিত ধারে গণ্ড গড়াইয়াও কি তোমার উৎস শুষ্ক হইবে না?

এই যে পাথর ভাঙ্গিতেছি; প্রতি শিলাখণ্ড অশ্রুসিক্ত করিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ শিলাস্তূপ রচনা করিয়াছি, ইহারা কি তোমার প্রস্রবণ বিশুষ্ক করিতে পারিবে না? দিন নাই রাত্রি নাই; তুমি বিশীর্ণ গণ্ড মসৃণ করিয়া আছ। উপাধান নাই সিক্ত করিবে; শয্যা নাই তোমাকে লুকাইয়া রাখিবে; কোমল করপল্লব নাই—স্নেহ, ভক্তি অথবা ভালবাসার সহানুভূতিতে মুছিয়া লইবে। তবে কোন্ লুব্ধ আশায় টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিতেছ? গণ্ড ভিজাইয়া, বক্ষ ভাসাইয়া শুধু শিলাখণ্ড সিক্ত করিয়া কি লাভ?

শুধু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা! মনে করিয়াছ, পাষাণে প্রাণ আসিবে! হায়! হতভাগ্য চিরনির্ব্বাসিত!

কিন্তু পাপ ত করি নাই? জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ কোন অপরাধ করি নাই; তবে এ কঠোর শাস্তি কেন, প্রভো? মুহূর্ত্তের ভুল—সে ত মুহূর্ত্তের প্রায়শ্চিত্তে অপনীত হইতে পারিত?

মনে পড়ে, কেমন করিয়া মুক্ত হস্ত যুক্ত হইয়াছিল; স্বাধীন চরণ শৃঙ্খল পরিয়াছিল। মনে হয়, তাই ত এত ব্যথা; নতুবা বিস্মৃতির বেদনা কোথায়?

তখন কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। পিতা মাতা ছিলেন - হয় ত এখনও আছেন; ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন, হয় ত এখনও আছেন। ঐশ্বর্য্য ছিল না; অভাব ছিল সত্য, কিন্তু পাপ করিবার প্রয়োজন ছিল না। একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইত।

অপকার করি নাই, অপহরণ করি নাই,—তবু শত্রু ছিল। সে জ্ঞাতি শত্রু। শত্রুর শত্রুতা যতদিন সে জীবিত; মৃত্যুতে সে যে আমার জীবন-মৃত্যুর ব্যবস্থা করিবে, তাহা কেহ কল্পনা করিলেও তাহাকে বাতুল মনে করিতাম।

কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। ইহা অদৃষ্ট, অথবা প্রাক্তন কর্ম্মফল;—মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অন্যায় অবিচারের পরাকাষ্ঠা।

পল্লীগ্রামের অধিবাসী। গ্রামে হাট বসিত না; গ্রামান্তরে হাট করিতে যাইতে হইত। প্রতি হাটে বাজার করিতে যাওয়া আমার একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল।

একদিন—সে কি ভয়ানক দিন! যদি সে দিন না আসিত; যদি জীবন-পট হইতে সেই দিনটিমাত্র মুছিয়া ফেলিতে পারিতাম; হায় মূঢ় কল্পনা!

সে দিন একাদশী! সমস্ত দিন জল গ্রহণ করি নাই। হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া জলযোগ করিব, তাই সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সে দিন বাজারে বারোয়ারী উপলক্ষে ভাল যাত্রা হইতেছিল। গ্রামের সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সঙ্গী জুটিল না। একাকী পথ চলিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম।

গৃহ হইতে অনতিদূরে, রাস্তার ধারে, নর্দ্দমার মধ্য হইতে যেন আহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম! চমকিয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরে শব্দ হইল—"জ—ল"!

মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর!

দুই হস্তে ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে শব্দাভিমুখে চলিলাম। হস্তে একটি গুরু লণ্ঠন ঠেকিল। তাহার পর কোন শীতল পদার্থে হাত ঠেকিল। বোধ

হইল যেন জমাটবাঁধা রক্ত। একটু পরে একখানি অস্ত্র হস্তে ঠেকিল। আহতের নিকটে এক খানি দা; বোধ হইল, রক্ত মাখা। শরীর শিহরিয়া উঠিল

বহু কষ্টে আহত ব্যক্তিকে পথের উপরে আনিলাম। অঙ্গের যে কোন অংশে হস্তার্পণ করি, ক্ষত! পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন, শোণিতসিক্ত। মুমূর্ষু পুনরায় যাচ্ঞা করিল—"জ—ল"! সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল!

পরমুহূর্ত্তেই মৃতের মস্তক আমার ক্রোড়বিচ্যুত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। প্রাণে সহসা বড় আতঙ্ক জন্মিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, দূরে একজন লোক আলোক হস্তে অগ্রসর হইতেছে। কেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, বিপদাশঙ্কায় গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম।

হায়! মুহূর্ত্তের ভুল!

অদূরে সাত আট জন লোক লণ্ঠন হস্তে ছুটিয়া আসিতেছিল। আমাকে রক্তাক্ত কলেবরে ছুটিতে দেখিয়া ধরিয়া ফেলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহারা বলিয়া উঠিল "খুন করিয়া পলাও কোথায়?" আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল।

আমি বজ্রাহত পথিকের ন্যায় নীরব হইয়া দাড়াইয়া রহিলাম। আমি যে নির্দ্দোষ—আমি যে আহতের সাহায্য করিতে গিয়াছিলাম, সে কথা আর মুখ হইতে বাহির হইল না।

যখন আকস্মিক বিপজ্জনিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল এবং দেখিলাম, লোকগুলি সকলেই আমার শত্রুর আশ্রিত, প্রতিপালিত এবং অনুগৃহীত, তখন যেন আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আমি নির্দ্দোষ আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

ক্রমে আরও লোক জমিল। সকলেরই ধারণা হইল, আমি খুন করিয়া পলাইতেছিলাম; কারণ, যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে সে আমার প্রধান জ্ঞাতিশত্রু—সর্ব্বস্বাপহারী!

তাহার পর পুলিশ আসিল। অনায়াসলব্ধ শীকারের চতুর্দ্দিকে প্রমাণের ব্যূহ রচিত হইল। জ্ঞাতিবহুল পরিবার,—সুতরাং শৃঙ্খলিত ঘটনাপরম্পরা আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন ধূমায়িত শত্রুতার পরিচয় প্রদান করিল, উদ্দেশ্যও প্রমাণিত হইল।

সুতরাং একাদশীর উপবাসী—দ্বাদশীর উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে কারাগৃহের কুক্ষিভুক্ত হইলাম। কারাদ্বার আমার জন্য চিরতরে রুদ্ধ হইল।

তার পর বিচার। বিচারকের বিচক্ষণতার অভাব ছিল না,—বিচারেও ত্রুটি ঘটে নাই তথাপি বিচারফলে আমার চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল।

হায় মানবের ক্ষুদ্র বিচার!

আমার অনুকূল যুক্তির মধ্যে একটি কথা বিচারকের মনে, বোধ হয়, সন্দেহের জাল সৃজন করিয়াছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ জুরীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, অসম্ভব না হইলেও দোষী ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ্য রাজপথ অবলম্বন করিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন সচরাচর, এবং সাধারণ আসামীর পক্ষে সম্ভব নহে।

প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া বিপক্ষ পক্ষ দর্শনশাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম এবং জটিল রহস্য-তথ্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; ফলে নিয়তির নির্দ্দেশে আমার দণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

বিচারক বলিয়াছিলেন,—"আইনের বিচারে তোমার চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল। মানবের বিচার-শক্তি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পর্য্যবসিত; যদি তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটে, বিচারকের বিচারক তাহার সংশোধন করিবেন।"

বিচারকের বিচারক! কোথায় তুমি অনাথ-শরণ, দীনবন্ধু, আর্ত্তের আশ্রয়। তুমি ত জান আমি নির্দ্দোষ। তবে এ কঠোর শাস্তি কেন, প্রভো? পাঁচ বৎসর প্রতিপল তোমাকে ডাকিতেছি। পাঁচ বৎসর পাথর ভাঙ্গাতেও কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, প্রভো, মৃত্যু দাও। মুক্তি চাহি না; মুক্তি বন্ধন, মৃত্যু মোক্ষ। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু! এস বাঞ্ছিত, এস অমৃত, এস চিরমুক্তি—আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে আলিঙ্গন করিব।

* * * *

তাহার পর আরও চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যে হতভাগ্য বন্দী হৃদয়ের রক্ত দিয়া প্রাণের ভাষায় তাহার অশ্রু-অঞ্জলি রচনা করিয়াছিল—আজ সে মুক্ত; বিমান-বিহারী বিহঙ্গম সদৃশ স্বাধীন!

নূতন রাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তাহার চরণের নূপুর খসিয়া পড়িয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্ম যুদ্ধার উদ্যুক্ত কৃপাণ হইতে, নিজের বক্ষ পাতিয়া, সে পরিবর্ত্তকের শির রক্ষা করিয়াছিল। সে স্বেচ্ছায় মৃত্যু আহ্বান করিয়াছিল,—মুক্তি মিলিয়াছে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যর্থ প্রভাত।

উষার কিরণ পশিল কাননে,
সে আসি' ছিল যা দেখা।
শিশিরসিক্ত তৃণ'পরে রাখি'
চরণালক্ত-রেখা।

আজি সেথা ফুল কে করে চয়ন,
রয়েছে শূন্য ডালা;
সেথা তরুতলে রয়েছে পড়িয়া,
মলিন পুষ্পমালা।

গাহিতে গাহিতে থামিল কোকিল,
ভ্রমর ঘুমিল তায়;
সযতনে বীণা কোলে তুলে লয়ে
কে আজি গাহিবে গান

প্রভাত-পবন খেলিবে আজিকে
মুক্ত অলকে তা'র।
কোন্ সুর হতে ভেসে আসে যেন
দেহ-সৌরভ তা'র।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য।

আমার বক্তব্যগুলি আরও বিশদ ভাবে বলিতেছি :—

প্রথমতঃ, যে সমস্ত প্রক্রিয় বৈদেশিক শব্দ এই বঙ্গভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের স্থানে সুবার্দ্ধিত সংস্কৃত শব্দ লইলে ক্ষতি কি?

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ঘরের ভাব প্রকাশ করিতে পরের ঘারে ভাষা ভিক্ষা করা কি বাঞ্ছনীয়? এই ভাষা ভিক্ষাতেই বঙ্গসাহিত্যের আজিও পূর্ণ উন্নতি হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, ঐ ঘার করা শব্দগুলিকে মাজিয়া ঘষিয়া সাহিত্যে চালাইবার পন্থা করিয়া দেওয়াই কি সাহিত্য-সেবা?

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথায় বলিতে গেলে "খড়াহাই" "শব-পোড়া" ভাষাই এই আধুনিক বঙ্গভাষা। যদি আমাদের সাহিত্যিকগণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়া এই সকল বৈদেশিক বাক্যগুলি বাহির করিয়া তাহাদের সমার্থবাচক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রকাশ করিতেন, তবে তাহাতে ভাষার প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। বাঙ্গালা অক্ষরে ভাষা লিখিলেই বাঙ্গালা হয় না। এই সব বৈদেশিক শব্দের সন্নিবেশে যে বঙ্গভাষা সৃষ্ট হইয়াছে, সে ভাষার কোনই নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই, ব্যাকরণ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই। যদি বঙ্গভাষার অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিখিতে চাহেন, তিনি কিছুই শিখিতে পারিবেন না। বরং তিনি দেখিবেন যে, বঙ্গভাষা সকল ভাষার সন্নিশ্রণে একটী অদ্ভুত ভাষা-সঙ্কর। কিছুদিন পরেই হয় ত কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিবেন, বঙ্গদেশে মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে কোন ভাষাই ছিল না। কিম্বা তিনি Bishop Caldwell, Anderson, Latham, Kay প্রভৃতির সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া বলিবেন যে, ইহা একটী অনার্য্য জাতির দুর্ব্বোধ্য ভাষা।

এই স্বেচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলার বলে সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়াছে

এবং এই স্বেচ্ছাচারের ফলে বিশৃঙ্খলা এবং অনুকরণের উদ্দাম তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

ভাষার এইরূপ স্বেচ্ছাচারের যুগে ব্যাকরণ কখনও থাকিতে পারে না; আর বাস্তবিক নাইও। কারণ, দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন যেমন কেহ আইন মানে না, সকলেই আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়; তেমনই আজ ভাষা-বিপ্লবের দিনে সকলে স্ব স্ব রচনা রক্ষা করিতে সচেষ্ট। অনেকে বলেন, ভাষায় ব্যাকরণ একটি প্রতিবন্ধক—অন্তরায়। ব্যাকরণ ভাষার অনুসরণকারী। ব্যাকরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভাষা চলিবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বন্ধন সকলের জন্যই আছে। দেশের বন্ধন আইন, মনুষ্যের বন্ধন সমাজ, ভাষার বন্ধন ব্যাকরণ। ব্যাকরণ লেখকের স্বাধীনতাপহারী নহে, ব্যাকরণ ভাষায় স্বেচ্ছাচারজনিত যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে তাহারই নিবারণ করে। ব্যাকরণ ভাষার তুলাদণ্ড, ভবিষ্যত যুগে পাঠকদিগের শিক্ষক ও বোধয়িতা। অপরিমিত স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতা আইসে. সুতরাং এই সামান্য অধীনতাটুকু সুখের। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নহে, স্বাধীনতা সাম্য ও সামঞ্জস্যের জন্য। সেই হেতু স্বাধীনতারও সীমা আছে।

ব্যাকরণের উপকারিতা, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। সংস্কৃত ভাষা আমরা অতি কঠোর মনে করি। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্য লইলে আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারি। যদি এই সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মত বিপথগামী হইত, তাহা হইলে আজ, বোধ হয়, আমরা এ রসজলধি হইতে একবিন্দু রসও তুলিতে পারিতাম না। এই আমার দুঃখ যে, তথাকথিত "কঠোর" সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারি, বৈদেশিক ভাষা বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার জাতীয় বঙ্গভাষার আধুনিক সাহিত্যগুলি সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তবে কি বলিব যে, সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ মানিয়া চলে বলিয়া উহাতে স্বাধীন কবিত্ব বা কল্পনার উন্মাদিনী ক্ষমতা নাই; আর বঙ্গভাষা ব্যাকরণ মানে না বলিয়া উহার স্বাধীন কবিত্ব আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই? তাহা নহে। সংস্কৃত ভাষা অনুচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন, আর বাঙ্গালা ভাষা উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন।

ব্যাকরণ অবহেলায় যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহার উদাহরণ আমি কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩১২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভাণ্ডারে' শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়

লিখিয়াছেন "তৎকালে বাংলাভাষা অতি হেয় ও নগণ্য অবস্থায় কৃষকের মেঠোসুরে ও প্রবাদ বচনে কথঞ্চিত আত্ম-রক্ষা করিয়া পল্লীকুটীরের একান্তে লুকাইত ছিল।" দীনেশবাবুরই রচনায় হইতে দ্বিতীয় উদাহরণ "উন্মাদিণী কেশরী।" ১৩১২ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের একখানি পুস্তকের সমালোচনায় দেখিয়াছি যে, লেখক "শ্বশুর" বুঝাইতে "শ্বশ্রুদেব" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। রবি বাবুর 'চোখের বালিতে' আছে, "মা তাহাকে ষ্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মত মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের মত দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।" এখন পাঠক বলুন, এ সকল রচনার ভাষা কি? এরূপ ভাষা, যদি চলিতে পারে, তবে 'হতোম প্যাঁচার' ভাষা বা 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা কোন্ দোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছে? ব্যাকরণ-নির্ব্বাসন ও ইংরাজীর অনুকরণের ফলে সাহিত্যে যে নব হাস্যরসের অবতারণা হয় তাহাই দেখাইবার জন্য আমি ঐ কয়টি রচনা উদ্ধৃত করিলাম। জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কি "ভবিষ্যৎ যুগের দূত" যে এখন ইহাঁদের রচনা আমাদের বোধ-শক্তির অতীত? (শ্রীযদুনাথ সরকার, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১৪) না Languge is given to a man to conceal his thoughts ভাবগোপনের জন্যই ভাষার প্রয়োজন, ইহাঁরা এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

যাহা হউক শাসনের শৃঙ্খলা যেমন আইন রাখে, ভাষার শৃঙ্খলাও সেইরূপ ব্যাকরণ রাখে। অতএব ভাষার শৃঙ্খলা ও রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে ব্যাকরণের প্রয়োজন, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? Grammar is the art of speaking and writing correctly "ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন ইতি ব্যাকরণম্"। ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগকল্পে ব্যাকরণের প্রয়োজন। ইহার উপরেও যদি কেহ বলেন, মাতৃভাষা শিখিতে ব্যাকরণ অনাবশ্যক, তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ অনিবার্য্য। মাতৃভাষার দুইটি স্তর আছে, এক লিখিত ভাষা, অন্য কথিত ভাষা। কথিত ভাষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন না হইতে পারে; কারণ, কথিত ভাষা কখন এক থাকে না; কিন্তু লিখিত ভাষা একই থাকে, তাহার জন্যই ব্যাকরণ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোন দেশের মাতৃভাষার জন্যই ব্যাকরণ প্রণীত হইত না।

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এখনও ব্যাকরণ-প্রণয়নের সময় হয়

নাই। একথা ও ভুল। কারণ, এমন কোন্ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য নহে। যে ভাবে যে প্রণালীতে শব্দ প্রযুক্ত হইলে শ্রুতিমাত্রই তাহার অর্থ বোধ হয়, তাহাকে বৈয়াকরণগণ শুদ্ধ প্রয়োগ বলেন। বৈয়াকরণগণ সেইরূপ প্রচলিত শুদ্ধ প্রয়োগগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেন ও তাহাই ব্যাকরণ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ব্যাকরণ-প্রণয়ণে যতই বিলম্ব হইবে ততই আরও ব্যতিক্রম আসিয়া জুটিবে। কিন্তু একবার বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইলে, আর তাহা লঙ্ঘন করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালার ব্যাকরণ সূত্রে যে এত ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় শুধু ব্যাকরণ-প্রণয়ণে বিলম্বই তাহার একমাত্র কারণ। যত অধিক বিলম্ব হইবে ততই সূত্র ও ব্যতিক্রমভার অধিক হইয়া পড়িবে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাকরণ দিয়া বন্ধন দিলে ভাষার স্বাধীনতা বদ্ধ হয়; অতএব ব্যাকরণ হওয়া উচিত নহে। এ যুক্তিও সম্পূর্ণ অসার। আমরা মনে করি, উচ্ছৃঙ্খলতাই স্বাধীনতা। তাহা নহে। সকল দেশই ব্যাকরণ মানিয়া চলিতেছে, তবে কি সকল দেশেই ভাষার অবাধ প্রবাহ রুদ্ধ? ভাষার স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতেই ব্যাকরণ। মানুষকে সংযত করিতে এতাবৎ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, শাসনশাস্ত্র প্রভৃত হইয়াছে কিন্তু সকল মানুষই কি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? অনেকে হইয়াছে ও অনেকে হয় নাই; যাহারা হয় নাই তাহারাও হইবে; তবে কিছু পরে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই? যদি তাহা না থাকে তবে ব্যাকরণেরও নাই।

শিশুকে প্রথম চলিতে শিক্ষা দিবার সময় যেমন তাহাকে হাত ধরিয়া চালাইতে হয় তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী; সেইরূপ শিশু বঙ্গভাষাকে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। এতদিন বঙ্গভাষা সংস্কৃতের নিকটে থাকিয়া সংস্কৃত ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছে; কাযেই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে আমাদের ব্যাকরণ রচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করেন; তিনটি স

(শ স ষ) দুইটি ন (ণ ন) দুইটি জ (য জ) উঠাইয়া দেন। ইহাতে বঙ্গভাষার কি উপকার হইবে? আর সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ থাকিলেই বা বঙ্গভাষার কি অনিষ্ট হইতেছে?

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতের কন্যা অতএব প্রাকৃত ব্যাকরণমতে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হউক। ইহাতেই বা কি লাভ? সতীশ বাবু চলিত কথিত ও প্রাদেশিক ভাষার এক শত পৃষ্ঠা ব্যাপী এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহার দ্বারা প্রচলিত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—রেলের-গাড়ী=রেলগাড়ী; গোরাদের জন্য বাজার=গোরাবাজার; ঠাকুর অর্থাৎ পূজনীয় দাদা=ঠাকুর দাদা; বাবাই অর্থাৎ পুত্রাদিই জীবণ=বাবাজীবন, জলের অর্থাৎ মাছের ন্যায় জীবন্ত=জলজীবন্ত ইত্যাদি। যাহা হউক গোরাবাজার যেরূপ সমাস হইল (তৎপুরুষ) বৌবাজার, শ্যামবাজার, ফিরিঙ্গি বাজার, কক্‌স্‌ বাজারও কি সেইরূপ তৎপুরুষ সমাস? সাহিত্যের ভাষার জন্য ব্যাকরণ সৃষ্ট হয়; প্রচলিত কথোপকথনের ভাষার জন্য নহে। ঐরূপ চলিত কথা সাহিত্যে কখনও স্থান পায় নাই, পাওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে।

এদিকে আবার শ্রীযুক্ত-যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালার যুক্তাক্ষর উঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে,—যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই রূপ সাহিত্যে প্রচলিত কথার প্রবেশাধিকার দিয়া, যুক্তাক্ষর উঠাইয়া দিয়া, ও ভাষাকে ব্যাকরণবন্ধমুক্ত করিয়া, বৈদেশিক ভাষাকে সাহিত্যে আসিতে দিয়া,—বঙ্গসাহিত্যে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ ইহার শান্তি বিধান করুন।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিয়া আজ বিদায় হইব। আমাদের সাহিত্য দিন দিন ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে; সাহিত্যে ধর্ম্মভাব প্রচলিত করিলে লেখকের ও পাঠকের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যু-মিলন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজসমীপে।

—:০:—

স্বামী তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন বলিয়া রাণী সোৎসাহে অজয় সিংহের পত্নীর সম্বন্ধে রাজনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। তিনি উমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়া রেবাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন।

সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় রাণী আপনার কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা বলিয়াছেন, অজয় তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু তিনি বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কারণ, অজয় ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। তবে ত রাজা ভালবাসার সম্মান করিতে ভালবাসেন। কিন্তু হায়—তাঁহার ভাগ্যে কি স্বামীর সেই ঈপ্সিত ভালবাসালাভ ঘটিবে? রাণীর এখন কেবল সেই চিন্তা। উমাকে পাঠাইয়াও রাণী সেই কথা ভাবিতেছিলেন।

তিনি কতক্ষণ এইরূপ চিন্তাবিষ্টা ছিলেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। উমা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি চিন্তালোক হইতে ফিরিলেন। উমা রেবার আগমনবার্ত্তা জানাইল।

রাজার অভিপ্রায় অনুসারে রাণী তাঁহাকে সে সংবাদ দিলেন।

রাজা আসিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবেশন করিলেন। তখন রাণী রেবাকে আনিবার জন্য উমাকে উপদেশ দিলেন।

উমা যখন রেবাকে আনিতে আসিল তখন প্রথম-পরিচয়-বিস্মিতা রেবা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া উমা সরিয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পরে যাইয়া রেবাকে জানাইল, রাণী তাহাকে ডাকিতেছেন।

রেবা কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ অতিক্রম করিয়া উমার সহিত রাণীর সম্মুখে উপনীতা হইল। আসিয়াই সে হতাশ হইল—তাহার

স্বপ্ন-রচনা চূর্ণ হইয়া গেল। কক্ষ বহুমূল্য গৃহসজ্জায় সজ্জিত—স্বর্ণসূত্র খচিত আস্তরণে আস্তৃত—গৃহে কুসুমের বাহুল্য, নানাজাতীয় কুসুমের ঘন সৌরভ কোমল দিবালোকে আলোকিত কক্ষ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রাণী রত্নরাজিকিরণকর্ব্বুর আসনে উপবিষ্টা। তাঁহার অঙ্গে, বেশে ও কেশে নানা রত্ন দীপ্তি পাইতেছে। তিনি গম্ভীরভাবাবিষ্টা।

রেবা রাণীকে প্রণাম করিল। তিনি ত উঠিয়া আসিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন না! তিনি কেবল তাহাকে সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রেবা ভাবিল, এ কি? রাণীর পদগর্ব্ব যদি তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনগণের সহিত এইরূপ ব্যবহার করায়, তবে রাজা বা রাণী সুখী কিসে?

তাহার পর রাণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেবা উত্তর করিল। কিন্তু তাহার মনে হইল, রাণীর জিজ্ঞাসা কেবল লৌকিক আচার রক্ষা মাত্র। তাহাতে আন্তরিকতার পরিচয়মাত্র নাই।

তাহার পর রাণী রেবার পিতার নাম ও তাহার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহার কোন আগ্রহ নাই। সে যখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল—তিনি যেন তখন অন্যমনস্কা। রেবা ভাবিল,—এ কি? যদি উত্তর শুনিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে প্রশ্ন করিবার সার্থকতা কি?

বাস্তবিক রাণী অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা যেরূপভাবে যে প্রশ্ন করিতে বলিয়াছিলেন, প্রশ্ন হইতে প্রশ্নান্তরে গমনের যে প্রণালী-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—রাণী সেই সব ভাবিতেছিলেন। রাজার উপদেশের বা অভিপ্রায়ের তিলমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে, রাণী সেই জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাই রেবা তাঁহার অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিতা হইতেছিল।

রাণী বলিলেন, "তুমি, বোধ হয়, জান না, অজয়সিংহ রাজার অনুমতি না লইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

রেবা বলিল, "তিনি আমাকে সে কথা বলিয়াছেন।"

"সেই জন্য তাঁহার এ বিবাহ অসিদ্ধ।"

রেবা বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"ধর্ম্ম সাক্ষী তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

রাণী বলিলেন, "সত্য। কিন্তু তুমি রাজভ্রাতার পত্নী বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিবে না।"

রেবার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "আমাকে এ আদেশ করিবার ক্ষমতা আমার স্বামী ব্যতীত আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং আমাকে না বলিলে আমি বিশ্বাস করিব না যে, এ আদেশ তাঁহার।"

রাণী পুনরায় বলিলেন, "তোমার ভরণপোষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু রাজভ্রাতার পত্নীর সম্মান ও সমাদর তুমি পাইবে না,—তুমি সে পরিচয়ে পরিচিতা হইতে পারিবে না।"

রেবার মনে হইল, যেন তাহার হৃদয়-মন্দিরের দেব-প্রতিমাকে কে ধূলি-বিলুণ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে—বিষম বেদনায় তাহার ভক্ত-হৃদয় অবসন্ন। সে উন্মত্তার মত বলিল, "ভরণ-পোষণ! হায়—আপনি নারী হইয়া—পত্নী হইয়া নারীকে—পত্নীকে এই অপমানের কথা বলিলেন? তিনি আমাকে চরণে স্থান না দেন, আমি দরিদ্র পিতার দুঃখিনী কন্যা পিতার কুটীরে ফিরিয়া যাইব—তথায় আমার আশ্রয় মিলিবে—তথায় কেহ আমাকে এমনভাবে অপমানিত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি একবার আমার স্বামীর মুখে তাঁহার আদেশ শুনিব।"

রেবার চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবালোক নিবিয়া গেল। সে অবসন্নভাবে আসনে বসিয়া পড়িল।

রাজা পার্শ্বস্থিত কক্ষে—দ্বারান্তরাল হইতে সব লক্ষ্য করিতেছিলেন—সব শুনিতেছিলেন। তিনি আজ নারী-চরিত্রের এক নূতন রূপ দেখিলেন। তিনি রাণীকে দেখিয়াছেন—ঔদাস্যপ্রতিমা,—স্নেহপ্রেমাদিভাবলেশবর্জ্জিতা,—আবেগবিহীনা; তিনি পার্ব্বতীকে দেখিয়াছেন,—আত্মস্থা,—সংযম-সাধন-সিদ্ধা,—কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিতা; তিনি রেবাকে দেখিলেন,—ভাবাবেশবিহ্বলা—প্রেমপ্রদীপ্তা,—প্রণয়সর্ব্বস্বা।

রাণী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এ বিবাহে সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"

রাজা উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন; অজয় সিংহকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

রাজার ক্ষুদ্র কথায় রাণী হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।" রাণী পুনঃ পুনঃ সেই কথা মনে করিতে লাগিলেন। তবে রাজা তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়াছেন! এই চিন্তায় রাণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এদিকে যথায় অজয় সিংহ একাকী নানা দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন, তথায় সংবাদ আসিল,—রাজা তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি ব্যস্তভাবে ভ্রাতৃদর্শনে চলিলেন। তাঁহার মনে কত আশঙ্কা!

তিনি সম্মুখীন হইলে রাজা বলিলেন, "অজয় সিংহ! তুমি আমার বিনানুমতিতে বিবাহ করিয়াছ।" রাজার কণ্ঠস্বর স্থির—গম্ভীর।

অজয় সিংহ কোন উত্তর করিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে, রাজদুহিতা বিবাহ করিতে পারিতে।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি আমার সেরূপ বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তখন আমি আমার অনিচ্ছার কারণ নিবেদন করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যোগ্য নহে। তোমাকে এ পত্নী পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অজয় সিংহ দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি যেন বিষম আঘাতে আহত হইলেন। তিনি ভ্রাতার চরণপ্রান্তে বসিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "আমি আপনাকে না জানাইয়া—আপনার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়াছি। আমার সে অপরাধের যে শাস্তি হয়, প্রদান করুন। আমি স্বয়ং সে অপরাধের জন্য অনুতপ্ত; কিন্তু আমাকে এ আদেশ করিবেন না।"

রাজা বলিলেন, "আমার অন্য আদেশ নাই।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমাকে দূর হইয়া যাইতে বলেন, আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে ত্যাগ করিবার আদেশ দিবেন না।" দৃঢ়কায় বলবান অজয়সিংহ পবনহিল্লোলে অশ্বত্থ-পত্রের মত কম্পিত হইতেছিলেন।

রাজার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দূর হইয়া গেল। তিনি সস্নেহে ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "অজয়, ভাই—উঠ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। আমি তোমার এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

অজয় সিংহ ভ্রাতার চরণধূলি মস্তকে দিলেন।

রাজা বলিলেন, "যাও, তোমার পত্নীকে লইয়া আইস। আমি আমার ভ্রাতৃজায়াকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

অজয় সিংহ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কম্পিত নন্দন বিদলিত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া রেবা তথায় বসিয়া ছিল তথায় আসিলেন।

পতিকে দেখিয়া রেবার অভিমান ও দুঃখ উথলিয়া উঠিল।

অজয়সিংহ বলিলেন, "রেবা চল, রাজা ডাকিতেছেন।"

রেবার ব্যথিত অভিমান এইবার আত্ম-প্রকাশ করিল। সে বলিল, "আমাকে যে অপমান করিতে হয়—তুমি কর। তোমার কাছে আমার মান অপমান নাই। কিন্তু—"রেবা কাঁদিয়া ফেলিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

অজয় সিংহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত হইলেন; রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, রেবা? কি হইয়াছে।

রেবা অশ্রুগদ কণ্ঠে বলিল, "তোমার জন্য রাজোদ্যানের কত ফুল ফুটিয়াছিল; তুমি প্রাসাদের ধূলির উপর পদদলিত করিবার জন্য কেন কানন-কুসুম চয়ন করিয়াছিলে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "সে কি রেবা! তোমাকে কি আমি অপমান বা অবহেলা করিয়াছি?"

এই প্রশ্নে রেবার অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমিও সেই বিশ্বাসে তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলাম। হায়-তখন যদি জানিতাম, প্রাসাদপাষাণপ্রাচীরে কেবল নিষ্ঠুর কঠোরতা আবদ্ধ! তোমার পক্ষে যাহা ক্ষণিক আনন্দ, আমার পক্ষে যে তাহা জীবনের সব!"

অজয় সিংহ বুঝিলেন, যখন এ অঘটন ঘটিয়াছে, তখন ইহার কোন বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু রাজা অপেক্ষা করিতেছেন; আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি স্নেহস্নিগ্ধ ভাবে রেবাকে বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সে কথার আলোচনা দুইজনে পরে করিব। আমি তোমাকে অবহেলা করিব,—এ আশঙ্কাকে মনে স্থান দিও না। রাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমার সহিত চল।"

রাজ সমীপে উপনীত হইয়া রেবা রাজাকে প্রণাম করিল।

রাজা বলিলেন, "কল্যাণি, আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে ও স্বজনগণকে সুখী কর—আপনারা সুখী হও।"

তাহার পর রাজা বলিলেন, "তুমি যে ভাবে আজ প্রাসাদে আসিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত নহে। আমি শুভদিন দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াকে সসম্মানে আনিতে পাঠাইব।"

অজয়সিংহের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "অজয় এই লও, তোমার পত্নীর অলঙ্কার। তিনি আধারের আবরণ মোচন করিয়া আধার ভ্রাতাকে দিলেন; অলোক-সম্পাতে অলঙ্কারে বহুরত্নদীপ্তি প্রকাশ পাইল।

রেবা ভাবিল, এ মায়া-পুরীই বটে!

দশম পরিচ্ছেদ।

আশ্রম।

দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডপ্রভাকরদীপ্ত নিদাঘ শেষ হইয়া গেল। আষাঢ়ের আকাশে জলধরা মেঘ তাহার তপ্ত অঙ্গে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিতে লাগিল। ধরাতল নবোদ্গত তৃণদলে মনোরম। সরসীর স্বচ্ছজলে কোথাও বা নীলৎপলকান্তি, কোথাও বা প্রভিন্নাঞ্জনরাশিবৎ মেঘের প্রতিবিম্ব আপনার বর্ণসঞ্চার-রত। সমীরণ প্রস্ফুটিত কদম্বসর্জ্জার্জ্জুনকেতকীবনের সৌরভে সুরভিত, সঞ্চীকরাম্ভোধরসঙ্গ শীতল। প্রকৃতির দৃশ্য নূতন।

রাজা অতি শীঘ্র আশ্রমনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জলাশয়-খনন প্রথমেই সমাপ্ত হইয়াছিল। বর্ষার আরম্ভ হইতে না হইতে গৃহ-নির্ম্মাণ ও উদ্যান-রচনা কার্য্যও শেষ হইয়া গেল।

রাজা আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতের আগমন প্রতীক্ষায় পার্ব্বতী বিলম্ব করিতেছিল। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিলেন।

পুরোহিত শুভ দিন দেখিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে বলিলেন; বলিলেন, শুভকার্য্যে বিলম্ব করিতে নাই। তিনিও যত সত্বর সম্ভব এ কার্য্য শেষ দেখিয়া পুনরায় যাত্রা করিবেন; এখনও তাঁহার কয়টি তীর্থ দর্শন করিতে অবশিষ্ট আছে।

দিন স্থির হইল। সকল উদ্যোগ শেষ হইল।

পার্ব্বতীর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। যখন সে এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত, তখন তাহার মনে হইত, সে আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে বিভোর। দরিদ্র পুরোহিতের কন্যার পক্ষে বহব্যয়সাধ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা একান্তই অসম্ভব। সে পিতাকে তাহার কল্পনার কথা বলিত; পিতাও সেই কথা বলিলেন—"একার্য্য বহব্যয়সাধ্য; আমাদের ক্ষমতার অতীত।" পার্ব্বতী তখন কেবল ভাবিত, কিছুতেই কি একার্য্য সম্ভব হয় না? সে কত দিন নিশীথে জাগিয়া শুধু এই কথাই ভাবিয়াছে। সে কত দিন দেবমন্দিরে যাইয়া দেবতার নিকট এই কল্পনার কার্য্যে পরিণতি প্রার্থনা করিয়াছে।

এখন সেই সকল কথা পার্ব্বতীর মনে হইতে লাগিল। আজ তাহার আনন্দের মধ্যে দুঃখের এক কারণ বর্ত্তমান। যে তাহার সকল কার্য্যে সহানুভূতি করিত; যে তাহার সহিত কত দিন দেব-মন্দিরে যাইয়া তাহারই প্রার্থনার পুনরুক্তি করিয়াছে; যে তাহার সমস্ত স্নেহ অধিকার করিয়াছিল—আজ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পার্ব্বতীর কেবল তাহার কথা মনে হইতে লাগিল। সে আজ কোথায়? সে থাকিলে আজ তাহার কত আনন্দ হইত! সেই কথা মনে করিয়া পার্ব্বতী অশ্রুবর্ষণ করিত। বাস্তবিক এই আশ্রমরচনার কার্য্য আরব্ধ হইলে—এই এক নূতন আকর্ষণ শোকের বেদনাকে সমাচ্ছন্ন না করিয়া দিলে পার্ব্বতীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

আর আজ পার্ব্বতীর তরুণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া তাহার অদৃষ্টাকাশে দয়ার আদর্শ রাজার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পার্ব্বতী তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তরুণ হৃদয়ের যে,—আকর্ষণ অতি পবিত্র। যাহা মানবকে দেবতার আসনে আসীন করাইয়া তাহার পূজা করে, যাহা মানুষকে আদর্শের সন্নিহিত করিতে সচেষ্ট হয়,—যাহার বিকাশ চিরমধুময়, যাহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ভক্তের—সাধকের পুণ্যভাবে বিভোর হইতে হয়, সে সেই আকর্ষণে রাজার দিকে আকৃষ্টা হইতেছিল। ঘনিষ্ট পরিচয়ে তাহার সে শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছিল; সে ভক্তি গাঢ়তর ও সে আকর্ষণ প্রবলতর হইতেছিল। পার্ব্বতী তাঁহার দয়াগুণে আকৃষ্টা হইয়া তাঁহার সন্নিহিতা হইয়াছিল। দারুণ দুঃখে উভয়ের পরিচয়। কিন্তু সন্নিহিতা হইয়া সে দেখিল,—তাঁহার গুণের অবধি নাই।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন পার্ব্বতী আপনার পরিচিত গৃহে অসীম চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিল। যে গৃহে তাহার জন্ম,—যে গৃহের সহিত তাহার জীবনের সকল স্মৃতি বিজড়িত,—যে গৃহে তাহার সকল আশা-নিরাশার অভিনয় হইয়াছে পরদিন সে সেই গৃহ ত্যাগ করিবে। পরদিন সে পরিচিত পুরাতনের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বেচ্ছায় গৃহীত নূতন বন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করিবে। সে যে পথের পথিক হইবে, সে পথ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত; কেবল আশার উত্তেজনায় সে সে পথের পথিক হইতে চলিয়াছে; কেবল কল্পনার আলোকে সে পথ আলোকিত।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার যাতনার কারণও পার্ব্বতী বিস্মৃত হইতে পারে নাই। যখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়—তখন সে বালিকামাত্র; আর তাহার ভ্রাতা তখন নিতান্ত শিশু। সেই অতর্কিত আঘাত তাহার বাল্যচাপল্য অপসৃত করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান দান করিয়াছিল; সে বালিকা পুতুলখেলা ছাড়িয়া ভ্রাতার লালনপালনভার লইয়াছিল। রমণী হৃদয়ে মাতৃত্বের যে ভাব বীজমধ্যে বৃক্ষের জীবনীশক্তির মত নিহিত থাকে তাহা আবশ্যককালে আত্মবিকাশ করে। রোগে, শোকে, বেদনায়, যাতনায় বালিকার যে ধৈর্য্য, যে সেবানিপুণতা সপ্রকাশ হয় তাহা বৃদ্ধের পক্ষেও চেষ্টালভ্য। জননীর মৃত্যুতে যখন পিতা সেই শিশু পুত্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তখন সে তাহার সকল ভার লইল। পিতা অনিচ্ছায় একজন আত্মীয়াকে তাহার পালনভার দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; শিশুকে তিনি তাঁহার নিকট রাখিবেন, স্থির হইয়াছিল। সে কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কাঁদিয়া পিতাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করাইয়াছিল। আজ সেই সকল কথা পার্ব্বতীর মনে পড়িতে লাগিল।

আজ তাহার সেই স্নেহভাজন কোথায়? পার্ব্বতীর ব্যথিত হৃদয় হইতে দীর্ঘ শ্বাস উঠিয়া শীকরশীতল পবনে মিলাইয়া গেল। তাহার হৃদয়ও আজ সজলজলদাবৃত আকাশের মত;—তেমনই জলভরা, তেমনই স্বচ্ছান্ধকার।

সমস্ত দিন সে গৃহের দ্রব্যাদি সাজাইল—গুছাইল।

মৃত ভ্রাতার দ্রব্যাদি গুছাইবার সময় তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া

সে সকলকে সিক্ত করিল। যেন তাহার শোক আবার নূতন হইয়া উঠিল। শোক কালজয়ী—সে সুযোগ পাইলেই সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

দ্রব্যাদি সাজাইতে—গুছাইতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল, তখন পার্ব্বতী যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। তখন বর্ষার মেঘে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে; বারিপাত-শব্দের বিরাম নাই—বৈচিত্র্য নাই—বৈকল্য নাই। মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর ঘনগর্জ্জনে গৃহের রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়ন কপাট কাঁপিয়া উঠিতেছে।

শয্যায় শয়ন করিয়া সে ঘুমাইতে পারিল না; তখনও তাহার কেবল ভ্রাতার সেই মৃত্যুসুপ্ত মুখ-চ্ছবি মনে পড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিল।

তাহার পর সে আপনাকে আপনি বুঝাইয়া শান্ত করিল। মাতৃহীনা পার্ব্বতীর অল্প বয়স হইতেই বুঝাইয়া শান্ত করিবার কেহ ছিল না। সে পিতার উপদেশ—শাস্ত্রের আদেশ স্মরণ করিয়া আপনার ঊচ্ছ্বসিত শোকাবেশ শান্ত করিল।

কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিল না। জাগিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে বিরক্তি বোধ হইল; সে উঠিল। তখনও পার্শ্বের কক্ষে তাহার পিতা সান্ত্বিক সুখনিদ্রায় অভিভূত; সে নিদ্রায় দুশ্চিন্তাদুঃখক্লেশ বর্জ্জিত-হৃদয় ব্যক্তিরই অধিকার।

প্রত্যূষে উঠিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত দেখিলেন, পার্ব্বতী স্নানের পর সন্ন্যাসীর গৈরিকবাস পরিধান করিয়াছে। সে বসনে তাহার মূর্ত্তি সমধিক পুণ্য-সমুজ্জ্বল দেখিতেছে।

কিন্তু কন্যার সেই বেশ দেখিয়া পিতার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। এ যে সন্ন্যাসীর বেশ! আজ যদি পার্ব্বতীর জননী বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ঘটনাস্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইত? পুরোহিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কিন্তু কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সে দিন প্রভাতেই রাজা আশ্রমগৃহে গমন করিয়াছিলেন। সকল ব্যবস্থা উপদেশানুযায়ী হইয়াছে কি না, তিনি স্বয়ং তাহা দেখিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কোন অনুষ্ঠানে কোনরূপ ত্রুটি না থাকে।

আজ তাঁহার স্বপ্ন-মন্দির কল্পনালোক হইতে বাস্তবের রাজ্যে আসি-

য়াছে। তিনি অত্যন্ত যত্নে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; শেষে তাহাতে সামান্য ত্রুটি না রহিয়া যায়। অনুচরবর্গ পূর্ব্বেই সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখিয়াছিল—সুতরাং কোনরূপ অসম্পূর্ণতার জন্য রাজার আনন্দ আজ ক্ষুণ্ণ হইল না।

আজ যেন প্রকৃতিও সদয়। প্রত্যূষেই বর্ষণের শেষ হইয়া গিয়াছে; সঞ্চিত মেঘমালা প্রভাত-পবনে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া রবিকররবিকাশের সুযোগ দিয়াছে; তরুণ রবির কিরণ বৃষ্টিস্নিগ্ধ প্রকৃতির মুখে আনন্দাশ্রুস্নিগ্ধা যুবতীর অধরপল্লবে মৃদুমধুর হাসির মত দেখাইতেছে; তরু লতা বারিপাতে সতেজ; সম্মুখে সরসীবক্ষ প্রভাতপবনোদ্গত বীচিমালায় আন্দোলিত—যেন বালিকা-হৃদয় প্রথম প্রেমানুভূতিতে অজানা আনন্দে—আশায় ও আশঙ্কায় কেবল চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; আজ কয়দিন পরে বৃষ্টির বিরামে বিহগকুল দিবালোকপুলকিত হৃদয়ে গান করিতেছে; রাজার হৃদয়ের আনন্দ যেন আজ প্রকৃতিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আজ আশ্রমপ্রতিষ্ঠাদর্শনাশায় কুতূহলী জনতা নগর হইতে সমাগত হইয়াছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তাহাদের সংখ্যা তত বর্দ্ধিত হইতেছে।

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইতে না হইতে বৃদ্ধ পুরোহিত পার্ব্বতীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে—এই আশ্রমগৃহে পুণ্যাম্বরধারিণীকে দেখিয়া সমাগত জনতা আনন্দে ও শ্রদ্ধায় বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দৃশ্যে রাজার হৃদয়ে যে পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহেরই মত অতর্কিত—তেমনই প্রবল—তেমনই সর্ব্বত্রসঞ্চারী, তেমনই সমগ্রহৃদয়ব্যাপী।

তাহার পর যথানিয়মে আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত স্বয়ং পৌরোহিত্য করিলেন। রাজা সাগ্রহে ভক্তিপূত হৃদয়ে সে কার্য্য শেষ করিয়া মনে করিলেন, তাঁহার রাজকার্য্যের এই এক অংশ এত দিন অসম্পূর্ণ ছিল—আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল।

রাজার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অপরাহ্ণ হইল। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর সমাগত দরিদ্রদিগকে আহার্য্য প্রদান করা হইল। রাজা স্বয়ং সে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলেন। কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি অভুক্ত; প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আমরা এ কার্য্য শেষ

করিতেছি।" উত্তরে রাজা বলিলেন "এই সকল দরিদ্রপ্রজা বহুকষ্টে উদরান্নের সংস্থান করে। আজ ইহাদিগের আনন্দদর্শনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারিব না।"

রাজা যখন প্রাসাদাভিমুখগামী হইলেন, তখন আকাশে আবার মেঘ সমাগম হইতেছে; দিবালোক ম্লান। তিনি প্রাসাদে উপনীত হইতে না হ'তে পুনরায় বর্ষণ আরম্ভ হইল।

রাণী পরিচারিকার নিকট আশ্রম-প্রতিষ্ঠার বিবরণ শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "হায় কেন আমি তথায় যাইতে চাহি নাই?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, কই রাজা ত তাঁহাকে যাইতে বলেন নাই! তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী; পতির পুণ্য কার্য্যে কি তাঁহার অধিকার নাই?

আগরার পথে।

লো স্মৃতি! বহাও প্রাণে কোন্ নির্ঝরিণী?
ঢালিছে মরুভূ বুকে শীততা মধুর;
চিন্তার যমুনা-সম উজান-বাহিনী
হৃদয় উথাও হ'য়ে ছুটে কত দূর!
অতীত-গৌরব-স্তূপ কীর্ত্তির কাননে,
মধুর স্মৃতির কত চিত্র মনোহর;
প্রণয়ের পারিজাত ফুল্ল শিল্প-বনে,
বিকশিত আজিও কি সৌরভে সুন্দর!
পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে হেরিব আবার,
সৌন্দর্য্য-জড়িত সেই জাগ্রত স্বপন,
ঝলিছে দামিনীসম প্রতিচ্ছায়া তা'র,
উল্লাসে অধীর চিত্ত শিহরে কেমন!
কি তরঙ্গে বিলোড়িত স্মৃতির নলিনী,
আগরার পথে দৃশ্য চির-বিমোহিনী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ভাষা-বৈচিত্র্য।

মানব-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জগতের পদার্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য বিভিন্ন ভাষা-পদ্ধতির ও বাক্য-রচনা-প্রণালীর উদ্ভব। সর্ব্বত্রই পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা-সাধন ও সংযোগ-বিধান করিয়া পদার্থের গুণ-নির্ণয় ও পরিচয়-প্রদান করা হইয়া থাকে বটে; এবং এজন্য পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা করিয়া শব্দ-যোজনার দ্বারা বাক্য-রচনা করা হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র একই উপায়ে এবং একই নিয়মে পদার্থের ধর্ম্ম প্রকাশোপযোগী পদসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত করা হয় না। যে পদার্থের বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় এবং সেই সম্বন্ধে যাহা বলিবার প্রয়োজন হয় এই দুই এর সংযোগ-সাধন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভাষার উপাদান ও লক্ষণ স্বরূপ বাক্যসমূহের দুই অংশ সকল সমাজে একই রীতিতে সংযুক্ত হয় না।

এই বাক্যরচনা-প্রণালীর বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ভাষা-পদ্ধতি ত্রিবিধ। বাক্যের অন্তর্গত বিষয়-বাচক এবং বক্তব্য-বাচক শব্দের সম্বন্ধ তিন প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, কোন কোন সমাজে বক্তব্য-জ্ঞাপন করিবার জন্য যে যে শব্দ-ব্যবহারের প্রয়োজন, তাহার আকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন বিধান করিতে হয় না। শব্দগুলির কোনরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয় না; ইহারা কোন ক্রম অনুসারে উচ্চারিত হইয়া বাক্য-সৃষ্টি করে; ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। শব্দটি ক্রমভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরিত হইলে সম্পূর্ণ নূতন ভাব-প্রকাশের ও নূতন বাক্য-সৃষ্টির কারণ হয়। এইরূপ ভাষাপদ্ধতিতে সন্নিবেশ-স্থানের দ্বারা শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়, শব্দের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না; শব্দগুলি উচ্চারণ করিবার ক্রমই বাক্যের মধ্যে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ভাষা-পদ্ধতি আছে যাহাতে বিষয়বাচক এবং বক্তব্যবাচক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য শব্দগুলির রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যাহারা

এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাক্য-ব্যবহার করে, তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে শব্দ সন্নিবেশিত করিতে হয় না। প্রত্যেক শব্দের অঙ্গেই তাহার সহিত অন্যান্য শব্দগুলির সহিত সম্বন্ধ-প্রকাশক চিহ্ন থাকে। এই কারণে যে কোন স্থানে এবং যে কোন ক্রমে উচ্চারিত হইলেও এই শব্দগুলির কোন অর্থবৈষম্য ঘটে না। আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের চিহ্ন স্বরূপ যে বিভক্তি-সকল শব্দগুলির অঙ্গে সংলগ্ন থাকে, সেই সমুদায়ই শব্দসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়া ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে।

তৃতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর ভাষা আছে যাহাতে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে বাক্য-রচনা করিতে হয়। ইহাতে শব্দ-সমূহের রূপ-পরিবর্ত্তন করিতে হয় না; অথচ অপরিবর্ত্তিত শব্দসমূহের সন্নিবেশস্থানের দ্বারাও ইহাতে ভাব প্রকাশিত হয় না। শব্দগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি সংযোজনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সংযোজনীসমূহের দ্বারা পদগুলি শৃঙ্খলীকৃত হইয়া বাক্যের সৃষ্টি করে।

সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে বিভক্তিযোগের দ্বারা শব্দের রূপ ভেদ করিয়া পদ সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্য সৃষ্ট হয়। রূপান্তরিত না করিয়া কোন শব্দই প্রয়োগ করা হয় না, এবং বিভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পদ-যোজনা করা যায় না। প্রথমতঃ বিষয়বাচক শব্দসমূহ। ইহারা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত, বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম। ইহাদের প্রত্যেকেরই শব্দগত লিঙ্গ আছে। সংস্কৃতভাষায় প্রকৃতিগত লিঙ্গের সহিত শব্দের লিঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। ভাষাগত ব্যাকরণসিদ্ধ এক প্রকার নূতন পদ্ধতির লিঙ্গভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহার ফলে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দেরই এক এক প্রকার লিঙ্গ আছে। লিঙ্গ তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রণালী। সুতরাং শব্দগুলির লিঙ্গ অনুসারে রূপভেদ এবং বিভক্তি-যোগ হয়। প্রত্যেক লিঙ্গ বিশিষ্ট বিশেষ্য শব্দ দুই বিশেষ ভাগে বিভক্ত; স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত; প্রত্যেক ভাগের ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রণালী। সুতরাং শব্দগুলি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ কেবলমাত্র ইহার উপর রূপ-পরিবর্ত্তন নির্ভর করে না; শব্দ-গুলি স্বরান্ত কি ব্যঞ্জনান্ত ইহার উপর রূপ-পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। ফলতঃ,

লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণই বিশেষ্যের রূপপরিবর্ত্তন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক শব্দের স্বাতন্ত্র্য-বিধান করে। লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ নিরীক্ষণ না করিয়া শব্দের বিশেষ অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এই জন্য বিশেষ্য শব্দগুলি ছয় শ্রেণীর অন্তর্গত—পুংলিঙ্গ (স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত), স্ত্রীলিঙ্গ (স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত) এবং ক্লীবলিঙ্গ (স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত) ; এবং প্রত্যেক শ্রেণীরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্ত্তন প্রণালী।

এই ছয় শ্রেণীর বিষয়বাচক বিশেষ্য শব্দের প্রত্যেকটির বচন অনুসারে তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে। একটি পদার্থ বিষয়ে বক্তব্যজ্ঞাপন করিবার জন্য বাক্য-রচনা করিতে হইলে শব্দের সহিত যে প্রকার বিভক্তি যোগ করিতে হয়, দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে সেই পদার্থবাচক শব্দের সেইরূপ বিভক্তি যোগ করা হয় না, এবং বহুসংখ্যক বিষয়ে বাক্য-রচনা করিতে হইলে অন্যরূপ বিভক্তিযোগ করিতে হয়। ইহার ফলে বিষয়বাচক শব্দগুলি সংখ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত সম্বোধন করিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলেও সংখ্যানুসারে শব্দের তিন প্রকার আকৃতি-পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

বিশেষ্য শব্দগুলির ন্যায় বিষয়বাচক সর্ব্বনাম শব্দেরও তিন প্রকার লিঙ্গ ; এবং লিঙ্গ অনুসারে প্রত্যেকের রূপ-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ত্যবর্ণের প্রাধান্যে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। এই জন্য প্রত্যেক সর্ব্বনাম শব্দ লিঙ্গ অনুসারে কেবলমাত্র তিন প্রকার বিভক্তি ধারণ করে।

বিশেষ্য শব্দগুলির ন্যায় ইহাদেরও বচন তিন প্রকার কিন্তু বিশেষ্য শব্দের সম্বোধনে যেমন রূপ-পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা সেইরূপ সম্বোধন অর্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না, এজন্য সম্বোধনের কোন রূপ-পরিবর্ত্তন শব্দের বৈচিত্র্য-সাধন করে না। ফলতঃ প্রত্যেক বিষয়বাচক সর্ব্বনাম শব্দ তিন প্রকার লিঙ্গের এবং তিন প্রকার বচনের ফলে সর্ব্বসমেত নয় প্রকার অর্থবাচক চিহ্ন ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ। ইহারা ক্রিয়া জাতীয়। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলি ক্রিয়াবাচক শব্দ আছে তাহারা প্রধানতঃ দশ গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া শব্দের কোন লিঙ্গ থাকে না ; সুতরাং কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়

না। কিন্তু পুরুষানুসারে ক্রিয়াপদে বিভক্তিযোগ হইয়া থাকে। যে বিষয়ে বক্তব্যজ্ঞাপন করিতে হইবে, তাহার যে পুরুষ হইবে, বক্তব্যবাচক শব্দেরও সেই পুরুষ হইবে। এই জন্য প্রত্যেক ক্রিয়ার তিন প্রকার রূপ-পরিবর্ত্তন হয়।

বিষয়বাচক শব্দের ন্যায় ক্রিয়া শব্দের ও সংখ্যানুসারে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এবং যে বিষয়ে বাক্য-রচনার প্রয়োজন হয়, তাহার যে বচন বক্তব্যবাচক শব্দেরও সেই বচন হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দ তিন প্রকার পুরুষ এবং তিন প্রকার বচনের ফলে নয় প্রকার অর্থ-বাচক নয় প্রকার চিহ্ন ধারণ করে।

আবার কাল প্রকাশ করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা কাল, এবং বক্তার ইচ্ছা, এবং বক্তা বিষয়ের সহিত বক্তব্যের সম্বন্ধ যে ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এই সমুদায়ই এক সঙ্গে ব্যক্ত হয়। এই চিহ্নসমূহ দশ ভাগে বিভক্ত। সুতরাং সর্ব্বসমেত প্রত্যেক ক্রিয়াশব্দও নব্বই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নব্বই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দের মৌলিক রূপই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা, প্রেরণা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বক্তব্যবাচক শব্দগুলি মূলতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ নূতন শব্দ চারি প্রকারের। এই নূতন শব্দগুলিরও পুরাতন শব্দের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বচন, পুরুষ, কাল, প্রথা প্রভৃতি অনুসারে নব্বই প্রকার বিভিন্ন আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং, প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য তিনশত ষাট্ প্রকার রূপ ধারণ করে।

এই সকল রূপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাক্য পরিবর্ত্তন করিলে ক্রিয়ার যে রূপ-পরিবর্ত্তন হয়, তাহারও গণনা করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক-সমূহ। যে সমুদায় বস্তু বা ব্যক্তি-বাচক শব্দের বিশেষকস্বরূপ এইগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের যেরূপ লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয়, ইহাদের ও সেইরূপ লিঙ্গাদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ইহারা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া। বিশেষ্য শব্দগুলি তিন প্রকারে বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে—প্রথমতঃ, সরল ও অযুক্তভাবে; দ্বিতীয়তঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত ও সমাসবদ্ধ হইয়া; তৃতীয়তঃ, সম্বন্ধ পদের রূপ প্রাপ্ত

হইয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারে এই শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন বিষয়-বাচক শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের অনুরূপ হয়। তৃতীয় প্রকারে সম্বন্ধ-প্রকাশক এক ভিন্ন জাতীয় বিভক্তি যুক্ত হয়।

সর্ব্বনাম শব্দগুলি দুই প্রকারে বিষয় বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে; প্রথমতঃ সরল ও অযুক্ত ভাবে; দ্বিতীয়তঃ, ষষ্ঠী-বিভক্তির রূপ প্রাপ্ত হইয়া। বিশেষণ শব্দ দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়। কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা মূলতঃই গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতির বাচক। ইহারা কোন বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষক ভাবে ভিন্ন অন্য কোন রূপে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহারা সরল ও অযুক্ত থাকে। অপর কতকগুলি বিশেষণ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক হয়।

ক্রিয়া শব্দগুলি বিভিন্ন বাচ্যানুসারে বিভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষক হয়।, নিষ্পত্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি অর্থে এই সমুদায় বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে, যথা ক্ত, তব্য, অনীয়, শতৃ ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, বক্তব্যবাচক ক্রিয়া শব্দের বিশেষকসমূহ। ক্রিয়া শব্দের বচন, পুরুষ, কাল প্রভৃতি অনুসারে যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ক্রিয়ার বিশেষক গুলির সেই প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে হইয়া থাকে।

ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত—বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় ও বিশেষণ বিশেষ্য। শব্দগুলি দুই প্রকারে বক্তব্যবাচক ক্রিয়া শব্দের বিশেষক হইতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যশব্দের সহিত যুক্ত ও সমাসপ্রাপ্ত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া। কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারকে এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে বিশেষ্য শব্দসমূহ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বক্তব্যের বিশেষক হয়।

সর্ব্বনাম শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ার বিশেষক হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক সর্ব্বনাম শব্দ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নসমূহযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

তিন বচন এবং পাঁচ বিভক্তির ফলে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দ বক্তব্য-বাচক শব্দের বিভিন্ন বিশেষক হইবার জন্য পঞ্চদশ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

অসমাপ্ত ক্রিয়াগুলি বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষক হয়। ইহাদের অঙ্গে চিহ্ন যুক্ত থাকে, অন্য কোনরূপ আকৃতি-পরিবর্ত্তন হয় না। অব্যয় শব্দগুলিরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

কতকগুলি শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন সংযুক্ত থাকিলে তাহারা বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষক হইতে পারে।

উপরে যে সমুদায় বিভক্তি ও শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বিচিত্র সমাবেশেই সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক বাক্যসমূহ রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনের অপর কতকগুলি কারণ আছে। ইহাদের ফলে বাক্যের ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, উচ্চারণ ও ধ্বনির পরিবর্ত্তনমাত্র ঘটে। এই পরিবর্ত্তনসমূহ যে নিয়মে সাধিত হয়, তাহাকে সন্ধি বলে। শব্দের সহিত শব্দের ধ্বনিঘটিত যোগ হইলেই ধ্বনি-সন্ধি হইয়া যায়, এবং দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিয়া এক অখণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে। প্রথম শব্দের অন্ত্যবর্ণ ও দ্বিতীয় শব্দের আদিবর্ণের বৈচিত্র্য অনুসারে সন্ধি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; স্বর সন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি। ধ্বনির পরস্পর আকর্ষণী শক্তিই ইহার কারণ বলিয়া বাক্যের মধ্যে যে যে স্থলে ধ্বনিদ্বয়ের সান্নীধ্য ঘটে, সেই সেই স্থানেই সন্ধির সৃষ্টি হয়; এবং যে যে স্থলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য দুই বা ততোধিক শব্দের সমাস রচনা করা প্রয়োজন হয়, সেই সেই স্থলে ও ধ্বনি-সান্নীধ্য ঘটিলে সন্ধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সন্ধিসমূহের দ্বারা কি শব্দগত, কি বাক্যগত কোন রূপই অর্থবৈষম্য ঘটে না বটে, কিন্তু ইহাতে ভাষার বৈচিত্র্য হয়, এবং বাক্যের রূপ যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়। এজন্য অন্যান্য পরিবর্ত্তনসমূহের আলোচনার সঙ্গে ইহাদের ও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। সন্ধিসমূহ সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

উপরে যে তিন শ্রেণীর ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে তাহার কোন একটিরও অন্তর্গত নহে। ইংরাজী ভাষায় বাক্যে পদ-সমূহের সম্বন্ধ প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চারণ-ক্রম ও সন্নিবেশ-স্থানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। শব্দসমূহ অপরিবর্ত্তিত থাকে, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে। ইহার ফলে ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ব্যাকরণঘটিত ভ্রমের সংখ্যা অল্প; কিন্তু বাক্য-গুলি বৃহৎ হইলে জটিল ও অপ্রাঞ্জল হয় এবং অর্থ-প্রকাশে বিঘ্ন উৎপাদন

করে; কারণ, ইহাতে পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে, এবং বক্তা বিষয়ের গুরুত্বানুসারে স্বাধীন ভাবে শব্দ গুলির সমাবেশ করিতে পারেন না; কারণ কোন শব্দের স্থান পরিবর্ত্তিত হইলেই বাক্যটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষায় বক্তব্যবাচক এবং বিষয়বাচক শব্দের সম্বন্ধ কতকগুলি সংযোজনীর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

তৃতীয়তঃ কোন কোন স্থলে শব্দগুলি বিভক্তির চিহ্ন ধারণ করিয়া রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই বিভক্তির সংখ্যা অতি অল্প ও নগণ্য, ভাষার প্রধান অবলম্বন নহে। সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যত বিচিত্র রূপ ধারণ করে, ইংরাজী ভাষায় তত বিভক্তির প্রয়োগ নাই।

প্রথমতঃ, বিষয়বাচক শব্দসমূহ। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইংরাজী ভাষায়ও এই শব্দগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইংরাজীতে শব্দগত ব্যাকরণ ঘটিত লিঙ্গ প্রথা নাই; ইহাতে প্রকৃতি-গত লিঙ্গ পদ্ধতিই প্রচলিত। সুতরাং প্রত্যেক শব্দেরই এক একটি লিঙ্গ নাই। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক লিঙ্গ অনুসারে শব্দের লিঙ্গ হয়। সুতরাং লিঙ্গ-নির্ণয় শব্দের মূল্য-নির্দ্ধারণের প্রধান উপায় নহে। ইংরাজীতে লিঙ্গের প্রাধান্য নাই। যে কয়েকটি শব্দের লিঙ্গ পরিবর্ত্তনের ফলে রূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তাহাদের অতি অল্প সংখ্যক পরিবর্ত্তনই বিভক্তি-যোগের দ্বারা সাধিত হয়। প্রত্যেক শব্দের লিঙ্গ নাই বটে, কিন্তু অধিকাংশ শব্দেরই বচন আছে; এবং রূপ-পরিবর্ত্তন বিভক্তি যোগের দ্বারা সংঘটিত হয়। ইংরাজীতে দুইটিমাত্র বচন। ইহার ফলে বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দগুলি সংখ্যানুসারে দুই প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত সম্বোধন করিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলেও সংখ্যানুসারে শব্দের দুই প্রকার অকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ। ইহারাও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ক্রিয়া জাতীয়। সংস্কৃতের ন্যায় ইংরাজীতেও ক্রিয়ার তিন পুরুষ আছে বটে কিন্তু এজন্য শব্দের বিশেষ রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটে না, বিষয়বাচক শব্দের ন্যায় বক্তব্য-বাচক শব্দেরও সংখ্যানুসারে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য। ইহার দ্বারা বাক্যের এবং ভাষার বিশেষ কোন বৈচিত্র্য জন্মে না। সুতরাং বচন ও পুরুষের ফলে সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যেরূপ

ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে, ইংরাজী ভাষায় সেরূপ হয় না। একই রূপবিশিষ্ট বক্তব্য-বাচক শব্দের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে; একই ক্রিয়া শব্দ বিষয় বাচক বিভিন্ন বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে।

কাল, বক্তার ইচ্ছা এবং বক্তা বিষয়ের সহিত বক্তব্যের সম্বন্ধ যে ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এই সমুদায় ব্যক্ত করিবার জন্য সংস্কৃতের ন্যায় ইংরাজীতেও কতকগুলি প্রণালী অবলম্বন করা হয় বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে সংঘটিত হয় না। অতি অল্পসংখ্যক বিভক্তির যোগে অথবা বানানের পরিবর্ত্তনের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষকসমূহ। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি-বাচক শব্দের বিশেষক স্বরূপ এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের লিঙ্গ বা বচন প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ, গুণ, রূপ, পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি বাচক শব্দ। ইহারা কোন বিষয়বাচক শব্দের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহাদের কোন বচন নাই। তুলনা বুঝাইবার জন্য কোন কোন শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম শব্দও বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে। কোন কোন স্থলে বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দ ইহাদের বিধেয় বিশেষণ হয়; এতদ্ভিন্ন ইহাদের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ এই অর্থ বুঝাইবার জন্য সম্বন্ধ পদের বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধ বিভক্তি ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সংযোজনী ব্যবহার করিয়াই সাধিত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ, বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষকসমূহ। এই শব্দগুলি সাধারণতঃ সংযোজন সাহায্যে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বাক্য সৃষ্টি করে। বিভক্তি-যোগের দ্বারা কেবলমাত্র দুই একটি সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বিশেষত্বগুলি আলোচনার ফলে জানা যায় যে, দুই ভাষা দুই বিভিন্ন প্রণালীতে গঠিত। শব্দের আকৃতি-পরিবর্ত্তনই সংস্কৃতের প্রধান লক্ষণ। ইংরাজীতে এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় বাক্য রচনা করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরাজীতে বাক্য রচনা করিতে হইলে রূপ-পরিবর্ত্তনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হয় না।

——— শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

গয়া।

যে স্থানে মধ্যভারতের মালভূমি বাঙ্গালা ও বিহারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমতল ভূখণ্ডে অবতরণ করিয়াছে তথায় যে অসংখ্য পর্ব্বতমালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই কয়েকটি শৃঙ্গ গয়াতীর্থকে মনোরম করিয়াছে। ব্রহ্মযোনি, রাম-শীলা প্রভৃতি পাহাড়গুলির উপরে অনেকটা স্থান পরিষ্কৃত করিয়া প্রাঙ্গণের ন্যায় করা হইয়াছে; তাহারই মধ্যস্থলে দেবদেবীর মন্দির। পাহাড়ে উঠিবার জন্য সোপানশ্রেণী আছে; তাহার সাহায্যে দুর্ব্বল বৃদ্ধাগণও উপরে উঠেন।

আমরা সে দিন যখন ব্রহ্মযোনির উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সোপানে না উঠিয়া পাহাড় যে স্থানে অত্যন্ত খাড়াই সেই দিক দিয়া উঠিতে আমাদের ইচ্ছা হইল। গয়া-প্রবাসী দুইজন শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আমাদিগকে সে দিক দিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন—কেন না, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহাদের নিষেধ সত্ত্বেও যখন আমরা উঠিতে লাগিলাম, তখন আমাদিগের কি হয়, দেখিবার জন্য তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে পর্ব্বতপার্শ্বস্থলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা নিরাপদে উপরে উঠিলে তাঁহারা হয় ত আমাদিগকে কোন পার্ব্বত্য-জাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

পর্ব্বতের উপর হইতে অতি সুন্দর দৃশ্য নয়ন-গোচর হইল। নিকটস্থ উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র, অনতিদূরস্থ বালুকাময় ফল্গুতীরবর্ত্তী পাষাণময়ী গয়ানগরী এবং দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা এক মনোমুগ্ধকর চিত্রের সৃষ্টি করিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া পাহাড়ের উপর হইতে তীর্থযাত্রিগণ এবং পূজারী ব্রাহ্মণ সকলেই নামিয়া গেলেন। সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে, নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে আমরা কয়টিমাত্র মানব রহিলাম।

সে সময় আমাদের মনে যে অপরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা উপভোগের বিষয়, বর্ণনার নহে। মনে হইতে লাগিল, এইরূপ একটি স্থানে বুদ্ধদেব কতবৎসর যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন—যোগের উপযুক্ত স্থান বটে। মন স্বভাবতঃই জগৎ হইতে জগৎকারণের দিকে আকৃষ্ট হয়। সে দিন গোস্বামীকৃত দশাবতারস্তোত্র এবং শঙ্করবিরচিত শিবস্তোত্র যেরূপ মধুর শুনাইয়াছিল সেরূপ আর কখনও শুনি নাই। মন হইতে স্বতঃই বাহির হইতেছিল—

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যং।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্রবিশ্বং॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাষকং ভাষকানাং
তুরিয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনম্
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥

গয়া হইতে একটি সুন্দর রাস্তা দিয়া সাত মাইল দূরে বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিতে যাইলাম। উত্তর ভারতে ইহার তুল্য প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি আর কিছুই নাই—বহুকাল ভগ্ন ও মৃত্তিকা-প্রোথিত থাকায় ইহা ধ্বংসের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে।

যাঁহারা দুই একটি শ্লোক বা স্থানীয় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুকর্ত্তৃক বৌদ্ধগণের নির্য্যাতনের কাহিনী প্রচার করিয়া বেড়ান, তাঁহারা একবার বুদ্ধগয়ায় আসিয়া দেখিয়া যাউন, প্রকৃত পক্ষে কি উপায়ে উদার হিন্দুধর্ম্ম আপনার বিস্তৃত ক্রোড়ে বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছে। এইস্থানে বুদ্ধদেব নারায়ণের অবতাররূপে পূজিত হইতেছেন—পিতৃশ্রাদ্ধকারী হিন্দু তীর্থযাত্রী বোধীদ্রুমের * তলদেশে ভক্তিভরে পিণ্ডদান করিতেছে। হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস অন্য যত কলঙ্কেই কলঙ্কিত হউক না কেন, ইহাতে একটা বড় গৌরবের কথা আছে; পৃথিবীর আর কোনও জাতি হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা দেখাইতে পারে নাই। অন্য জাতির ইতিহাসের ন্যায় এই ইতিহাস ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় বিবাদজনিত রক্তস্রোতে রঞ্জিত নহে। †

---

* ইহা একটি অনতিবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ।

† কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় বৌদ্ধ নির্য্যাতনের কাহিনী মিটার কোলব্রুক বিশ্বাস করায় কয়েকজন ঐতিহাসিক তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রিজ ডেভিডস্ ও বুলার ইহা আদৌ বিশ্বাস করেন না। নিম্নে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইল—

ব্রাহ্মণ্যদিগের বিবরণ অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শেষ অবস্থায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারক কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে ভীষণ বৌদ্ধ নির্য্যাতন হইয়াছিল, তাহাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। বিখ্যাত য়ুরোপীয় মনীষী উইলসন ও কোলব্রুক উল্লিখিত মতের পক্ষপাতী হওয়ায় অনেকেই এই মতের

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সম্প্রতি এই মন্দিরটি লইয়া বুদ্ধ গয়ার হিন্দু মোহন্ত ও সিংহলবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে—অনেক মামলামোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি বহুকাল হইতে মোহন্তের অধিকারে আছে—সিংহলীয়গণ এক্ষণে উহা বৌদ্ধগণের তত্ত্বাবধানে রাখিতে চাহেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহারা সফলকাম হয়েন নাই। মন্দির-পার্শ্বে একটি আশ্রমে কয়েকজন ভিক্ষু বাস করিতেছেন—তথায় জাপান হইতে আনীত একটি সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি সুরক্ষিত আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন জাপানী ভিক্ষু বুদ্ধদেবের সেবায় কালযাপন করিতেন—কিছুদিন হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সিংহলীয়গণ কাশীর সমীপবর্ত্তী সারনাথেও একটি আশ্রম করিয়াছেন। তথায় ইহাঁদের প্রধান ব্যক্তি ধর্ম্মপালের পরিবার-বর্গের চিত্র দেখিয়া আমি বলিলাম "ইহাঁরা ঠিক বাঙ্গালীর মত দেখিতে।" নিকটস্থ ভিক্ষু উত্তর করিলেন—"And we are Bengalces, Babu"—"বাবু, আমরা ত বাস্তবিকই বাঙ্গালী।" তাঁহার মুখ হইতে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

আমরা মোহন্তের প্রাসাদে আতিথ্য লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অট্টালিকার বহির্দ্দেশে বিশিষ্ট অতিথিগণের বাসের জন্য একটি 'বারদোয়ারী' গৃহ (Guest house) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রেভারেণ্ড বিটার উইকিন্‌স্ লিখিয়াছেন—বৌদ্ধমতাবলম্বিগণকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতন করা হইয়াছিল যে, প্রায় সকলেকেই হয় নিহত, নহে ত নির্ব্বাসিত নতুবা স্বধর্ম্মত্যাগী হইতে হইয়াছিল। বৌদ্ধগণকে যেরূপ ভাবে নিপীড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্তিত করা হইয়াছিল, এরূপ নির্য্যাতনের বিবরণ জগতের ইতিবৃত্তে কদাচিৎ দৃষ্ট হয় না।

আমি কিন্তু উপরোক্ত বৃত্তান্তের এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। শালী টেক্‌ষ্ট সোসাইটীর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিয়াছি; এবং স্বনীয় অধ্যাপক বুলারের ন্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিমূলক ধারণা অনিশ্চিত, বৃথাগর্ব্বপূর্ণ, অনির্দ্দিষ্টভাবপ্রাণী ও অপ্রামাণিক উক্তিসমূহ হইতে গৃহীত একটি ভ্রান্ত মত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধেয়। আমার মতে নিম্নলিখিত কারণেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে (১) বৌদ্ধধর্ম্মে যে সকল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। (২) জন সাধারণের বুদ্ধি-বৃত্তির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। (Rhys Davids—Buddhist India)

বারদোয়ারীটি ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত—সময় সময় য়ুরোপীয়গণও এই গৃহে বাস করেন।

মোহন্তের প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত—মধ্যে হিন্দুস্থানী ধরণের চৌতলা পাতরের প্রকাণ্ড বাড়ী। উঠানের এক পার্শ্বে হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, বলদ ও অনেক গাড়ী রহিয়াছে। বাড়ীর নিকটেই তাঁহার খাস জমীতে চাষ হইতেছে। বাড়ীর ভিতরে নিম্নতলে বহুসংখ্যক লোক জমিদারীর হিসাবপত্র করিতেছে। চৌতলায় মোহন্ত মহারাজ বাস করেন।

মোহন্তের অধীনে কয়েক শত সন্ন্যাসী আছেন—তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার গুরুভাই (অর্থাৎ তাঁহার গুরুর শিষ্য) কতকগুলি তাঁহার চেলা বা শিষ্য। এই সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সকল প্রকৃতির লোকই আছেন, এবং তাঁহারা সকল রকম কাযই করিতেছেন। কোন গেরুয়াধারী দ্বারবানের কায করিতেছেন, কোন গেরুয়াধারী জমীতে জল সেচন করিতেছেন, কেহ জমীদারীর হিসাব রাখিতেছেন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা কেহ পাইকের কার্য্য করিতেছেন। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যোগ্য সন্ন্যাসীও আছেন—তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন। এইরূপ একজন সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের আলাপ হয়—তিনি বলিলেন, তিনি উৎকলবাসী, এক্ষণে 'বিদ্যার্থী' (ছাত্র) ভাবে অবস্থান করিতেছেন—একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসীর নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করেন। তিনি এমন সুন্দর হিন্দী বলেন যে, তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই মনে হয়।

মোহন্ত মহারাজের দরবারে সন্ন্যাস ও জমীদারীর অদ্ভুত সমাবেশ, দেখিতেই এক রকম! মহারাজের গৈরিক বাস ও দীর্ঘ কেশের সহিত গদী, তাকিয়া আলবোলা ও ইজিচেয়ার কেমন খাপ খাইয়াছিল তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি বুদ্ধিমান ও ভদ্র—অন্ততঃ আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য শুধু মোহন্তগিরী ও জমিদারী করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; ঔষধবিক্রেতার ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার কিছু কিছু সৎকার্য্যও আছে, তিনি একটি ধর্ম্মশালা ও একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন।

দরবারে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন স্থানীয় কৃষক আসিয়া একটি টাকা প্রণামী দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর তাহার মোহন্ত জমীদারের

নিকট একটি অভিযোগ জ্ঞাপন করিল। প্রণামী না দিলে কে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে?

মহারাজের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম; সুবিধা হইল না,—তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার বিষয়বুদ্ধির তুল্য নহে। যে সকল য়ুরোপীয় আমাদিগের দেশে হিন্দু ধর্ম্মের বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তিনি দেখিলাম তাঁহাদের বড় একটা পছন্দ করেন না।

এখন কথা হইতেছে, ভারতের নানা স্থানে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হস্তে যে অগাধ ধনরত্ন রহিয়াছে, তাহা কি দেশের প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না? বিষয়টি যেরূপ প্রয়োজনীয়, সাময়িক পত্রাদিতে তাহার উপযুক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে গভর্মেণ্ট আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন না— কেন না, তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। আইন করিয়া যে কিছু হইবে না তাহা স্বনামধন্য আনন্দ চার্লু মহোদয়ের অকৃতকার্য্যতাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে, বোধ হয়, যদি দেশের লোকের মনের ভাব কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহারা যদি এই সকল দেবোত্তর সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে এবং তাহা সাধারণের হিতার্থ ব্যয়িত হইতে দেখিতে চাহে তাহা হইলে অনেক সুফল আশা করা যায়। এতদর্থে, বাঙ্গালা হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি সাপ্তাহিকগুলিতে রীতিমত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসিগণও সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে অর্থের সদ্ব্যবহারের উপায় ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে। ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ ও বক্তৃতাদিদ্বারাও এতদ্বিষয়ক আন্দোলনের সহায়তা হইতে পারে।

একটি যুবক মুটিয়া আমাদের মোট লইয়া গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যাতায়াত করিয়াছিল। লোকটি কষ্টসহিষ্ণু, স্বল্পে সন্তুষ্ট ও সদাই প্রফুল্ল। তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আসিবার সময় আমার বন্ধু তাহাকে একখানি ভাল কাপড় বখ্‌শিস করিলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা তাহাকে যাহা দিয়াছি, সে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে, কখনও আমাদের কাছে কিছু চাহে নাই। এবার কিন্তু তাহার মনে অসন্তোষের আবির্ভাব হইল। এতদিন তাহার কোনও অভাব উপলব্ধি হয় নাই, কিন্তু এই ভাল কাপড়খানি পাইয়া সে দেখিল, একখানি ভাল চাদর ভিন্ন উহা ব্যবহার করা চলে না। কাযেই সে একখানি চাদরের জন্য প্রার্থনা করিল। বাস্তবিক, একজন দরিদ্র লোককে একটা

মূল্যবান্ দ্রব্য ব্যবহার করিতে দিলে তাহাকে বিপন্ন করা হয়। তাহার উপযুক্ত চাল সে কেমন করিয়া বজায় রাখিবে। একজন দরিদ্রকে যদি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে সামান্য বিপদগ্রস্ত করা হয়? সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাব বহু প্রকারে ও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অনন্ত সত্য।

প্রভাত গগনে হেরি' তরুণ তপন
কি মধু সঙ্গীতে পাখী ঢালে মধু স্বর?
চন্দ্রের মূরতি হৃদে করিয়া ধারণ
কি মহা গম্ভীর গীতে উছলে সাগর?
প্রেম বিশ্বজয়ী—প্রেম অজর-অমর।

দীপ্ত সূর্য্যপানে চাহি' মধ্যাহ্ন সময়
সূর্য্যমুখী কোন্ কথা কহে নিরন্তর?
বিকশিত উপবনে প্রফুল্ল-হৃদয়
ফুলে ফুলে কোন্ কথা গুঞ্জরে ভ্রমর?
জীবনে মরণে প্রেম পবিত্র-সুন্দর।

চন্দ্রের হৃদয়-জ্যোতিঃ হৃদয়ে মাখিয়া
কি অনন্ত সত্য কহে অসীম অম্বর?
উজল দামিনীদীপ্তি হৃদয়ে আঁকিয়া
কি কথা গম্ভীর মন্দ্রে কহে জলধর?
প্রেম শুধু কালজয়ী—জগৎ নশ্বর।

সুদীর্ঘ বিরহ'পরে ঈপ্সিত মিলনে
কি সত্য আপনি বুঝে বিহ্বল অন্তর?
আকুলপ্রণয়দীপ্ত তৃষিত চুম্বনে
কি নীরব কথা কহে প্রিয়ার অধর
কঠোর ধরায় প্রেম অমৃত-নির্ঝর।

সমালোচনা।

শঙ্খ।

অ্যাণ্ড্রু ল্যাং এক স্থানে বলিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে অসার ও বিশেষত্ব-বিহীন পদ্য-লেখকের সংখ্যা এত অধিক যে, কবির পক্ষে যশ অর্জ্জন করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের মত বাঙ্গালায়ও পদ্য-লেখকদিগের অত্যাচারে পাঠক সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত-সমালোচকগণ ভীত। আজকাল প্রতিদিন যে রাশি রাশি কবিতা প্রকাশিত হয় তাহার অধিকাংশই মৌলিকতালেশবর্জ্জিত—প্রতিভাদীপ্তিহীন। এই সকল লেখকের রচনা গলিতআবর্জ্জনাস্তূপমধ্যবাহী আবিল জলপ্রবাহের সহিত তুলনীয়। এই অবস্থায় যদি গ্রীকবর্ণিত সুবর্ণসিকতাসঙ্কিত শৈকতমধ্যবাহী স্ফটিকবারি প্যাকটোলাসের সন্ধান পাওয়া যায় তবে যেমন আনন্দ হয়, আজ বহুদিন পরে বড়াল কবির নূতন পুস্তক লইয়া আমাদের তেমনই আনন্দ হইয়াছে। 'ভূলে'র কবি বঙ্গ-ভারতীর বেদীর উপর যে 'প্রদীপ' জ্বালিয়াছেন—তাহার স্নিগ্ধ আলোকে দেউল আলোকিত; তিনি যে 'কনকাঞ্জলি' দিয়া দেবীর পূজা করিয়াছেন তাহার সৌন্দর্য্য বিস্ময়কর। আজ তিনি 'শঙ্খ' লইয়া ভারতীর দেউলদ্বারে উপস্থিত। *

শঙ্খ বঙ্গবাসীর নিকট সমাদৃত। শঙ্খ হিন্দুর মঙ্গল কার্য্যে মাঙ্গল্য-বাদ্যযন্ত্র। শঙ্খ রমণীর সৌভাগ্যসূচক অলঙ্কার। শঙ্খ বীরের প্রিয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে যে যুদ্ধে অমঙ্গল-বিনাশে স্বয়ং ভগবান সারথ্য করিয়াছিলেন সে যুদ্ধের বর্ণনায় দেখিতে পাই :—

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥

* শঙ্খ—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তী পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥

সর্ব্বোপরি শঙ্খ হিন্দুর পুণ্যকার্য্যে সহচর। কবি বলিয়াছেন ;—

"হে রমণী, লও—তুলে লও;
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি গানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল রবে!

"হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বলদৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে' যাক্ এ বজ্রনির্ঘোষে!

"হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
আনি বহে' আশীর্ব্বাদ-ভার।"

অক্ষয় বাবুর শব্দ-সম্পদ ও ছন্দ-সম্পদ যথেষ্ট। কিন্তু সে দুই সম্পদ পদ্যলেখকমাত্রেরই থাকিতে পারে। 'শঙ্খের' কবির গৌরব—ভাবে—ভাবের গাঢ়তায়—গভীরতায়—উদারতায়। লঘুতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। 'কনকাঞ্জলি'তে তিনি তাঁহার গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ;—

বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কিরূপা কবিতা—কত সুধা রস,
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত মত্ততায় মুগ্ধ দিকদশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী।"

'শঙ্খে' তিনি কবির কথায় বলিয়াছেন ;—

"আমরা জীবন গড়ি
মরণে মধুর করি,
নিরাশায় নব আশা ;
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা।
পীড়িতের লাগি যুঝি,
পতিতের ব্যথা বুঝি,
সচেতন রাখি দেশ ;
আমরা দেশের প্রাণ,
প্রীতি, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান ;
আমরা আদি ও শেষ।

এক টেনিসন ব্যতীত আর কোন্ কবি কবির কার্য্যের এমন বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন ?

বলিয়াছি, লঘুতা বড়াল কবির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই তিনি প্রেমের চটুল চাকচিক্য পরিহার করিয়া তাহার বিশাল ব্যাপকতা—নেব-ভাবে তন্ময়। থিয়ক্রিটসের মত তিনি যুবজনের চিত্তবিনোদনে চেষ্টিত নহেন। তাঁহার নিকট "নারী কত গরীয়সী।"—"সন্ধ্যায়" এই ভাব সপ্রকাশ—

"এস প্রিয়া—প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা !
দিবসের পাপ-তাপ হোক হতমান !
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্ত-প্রধান !"

এই ভাবগভীরতায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যেই বড়াল কবির গৌরব। তাই যে স্থানেই তিনি লঘু ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন সেই স্থানেই তিনি অকৃত-কার্য্য হইয়াছেন ; ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার দৈন্য ও ছন্দের বিকৃতি সুস্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয় তাঁহার রচনায় এরূপ চেষ্টার দৃষ্টান্ত বিরল।

অক্ষয় বাবুর বর্ণনা শক্তি অসাধারণ। সন্ধ্যার—

"গলে নীহারিকা-মালা,
করে সপ্ত ঋষি-বালা,
রাশিচক্র মেখলায় কি ক্রীড়া মঙ্গল !

জলদ চরণ-তলে
কাঁদিছে মঞ্জীর ছলে ;
বনানী-বসনপ্রান্তে—চিত্র ঝল্‌মল্ !"

তিনি বাঙ্গালী কবি—

"সারাটা দুপুর কাটিয়া কাটে না,
বসিয়া বসিয়া নদীর তীরে—
উড়ে' যায় চিল, ভেসে যায় মেঘ,
ভিঙ্গি বেয়ে' গেয়ে' জেলেরা ফিরে।"

এরূপ বর্ণনা তাঁহার রচনায় অনেক আছে। তাঁহার "বঙ্গভূমির" স্তুতিগীতি আমাদের সাহিত্যে অমূল্যরত্ন। তাঁহার সহিত আমরাও "ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী" জননীকে প্রণাম করিয়া বলি ;—

"এস—চণ্ডীদাসগীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি।
প্রতাপ-কেদার-বাহা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !"

বলি,—

"মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি !
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি !"

আর কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা না থাকিলেও কেবল এই কয়িবার জন্য 'শঙ্খ' পাঠক সমাজে সমাদৃত হইত। কিন্তু ইহাতে উল্লেখযোগ্য কবিতার অভাব নাই ; পরন্তু প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট হয়। এরূপ উপাদেয় কবিতাপুস্তক সচরাচর সমালোচকের হস্তগত হয় না।

কিন্তু দুইটি বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারকে আমাদের আপত্তি জানাইব। প্রথম, তিনি যে ভাবে 'ভুলের' কবিতাগুলি তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতেছেন, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা হয়, হয় ত তিনি 'ভুলকে' আর পাঠকসমাজে আনিবেন না। ইহাতে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ, 'ভুলের' অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতায় প্রতিভার দীপ্তদামিনীস্ফুরণ আছে, সেগুলির বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে। দ্বিতীয়, তিনি 'প্রদীপ', ও 'কনকাঞ্জলিকে' যে সাজে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, 'শঙ্খকে'ও সেই সাজে সাজাইয়া আনিলে ভাল হইত।

সংগ্রহ।

সাহিত্য।

নাটকে নীতিশিক্ষা।

নাটক দুই প্রকারে লোকহৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। নাটক পঠিত এবং অভিনীত হয়;—পাঠক ও দর্শক দুই দল নাটকের শিক্ষা লাভ করেন। সকল দেশেই এক সময় নাটক দেশের লোকের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষাবিধানে বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। গ্রীসে, ভারতে ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র এক সময় নাটকের অত্যন্ত আদর ছিল। নাটকও বহুবিধ; পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি। ঐতিহাসিক নাটক ছাঁকা ইতিহাস না হউক, তাহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রিত ও ঐতিহাসিক ঘটনা অঙ্কিত হয়। পৌরাণিক নাটক, যথা য়ুরোপে 'ম্যাসান প্লে', এখনও সমাদৃত। বাঙ্গালায়ও ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ব্বে পৌরাণিক নাটকই আদর লাভিয়াছিল। 'সীতার বনবাস,' 'নন্দবিদায়' প্রভৃতির প্রতিপত্তির কথা অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালে য়ুরোপীয় নাটকে দুর্নীতির দুর্গন্ধ পাইয়া সমালোচকগণ বিরক্ত হইয়াছেন। সংপ্রতি 'আমেরিকান ম্যাগাজিনে' মিষ্টার ওয়াণ্টার প্রিচার্ড ইটন এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

দুর্নীতি।

ইবসেন হইতে বহু নগণ্য নাট্যকার নাটকে পাপের চিত্র চিত্রিত করিয়া সমালোচক-সমাজে নিন্দিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বহু সুনীতিপূর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত নাটকেও দুর্নীতির দুর্গন্ধ দুর্ল্লভ নহে! পাঠক-সমাজ অনেক সময় দুর্নীতিদুষ্ট পূতিগন্ধময় নাটককে সুনীতিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করে! পাঠকগণ বুঝেন না, এই সকল উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ অস্বাভাবিক।

অস্বাভাবিকতা।

একখানি পুস্তকে দেখা যায়, একজন অনায়াসে পাপীকে পুণ্যবান করিতেছেন। রঙ্গমঞ্চে ইঁহাকে দেখিয়া দর্শকদল শ্রদ্ধায় ও আনন্দে আত্মহারা হয়েন। অথচ প্রকৃত পক্ষে পাপী বহুকষ্টে আপনার পাপকে জয় না করিয়া পুণ্যপথের পথিক হয় না। লোককে পুণ্যপথের পথিক করা যদি এমন সহজ হইত তবে ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের কার্য্য সহজ হইত—জগৎ তাঁহাদিকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিত না। এরূপ চিত্র ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের অপমান।

মাতৃচরিত্র।

একখানি নাটকে মাতৃচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সন্তানগণ মিথ্যাকথা বলে, জাল করে, জননীর অপমান করে। জননী সকল দোষ আত্মকৃত বলিয়া সন্তানদিগকে রক্ষা করেন। এই চরিত্রের অভিনয় দেখিয়া দর্শকদল মুগ্ধ হয়েন—রমণীরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। মাতৃস্নেহ অতি প্রবল—পবিত্র বৃত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জননী এরূপ করিতে পারেন তিনি যে মাতৃ-কর্ত্তব্য পালনের অনুপযুক্তা তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

জীবন সংগ্রাম: জীবনে মানুষকে পাপকে পরাজিত করিয়া পুণ্যপথের পথিক হইতে হয়—অমঙ্গলকে পরাজিত ও পদদলিত করিয়া মঙ্গলকে অবলম্বন করিতে হয়। এই সংগ্রামেই মানুষের মনুষ্যত্ব। সেই সংগ্রামকে বর্জ্জিত করিয়া মানবের উত্থানের ও উন্নতির অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানব-সমাজের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না।

মিষ্টার ইটস যুরোপে নাটকে যে অস্বাভাবিকতার প্রাবল্যের ও আদরের কথা বলিয়াছেন অন্য দেশেও তাহা বিরল নহে। আমাদের দেশের পুরাণ সাহিত্য অন্য সকল দেশের পুরাণ সাহিত্য অপেক্ষা বিপুল। এই সাহিত্যে পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় বহুস্থানে ঈশ্বরানুগ্রহে অমানুষী উপায়ে সম্পন্ন হইবার কথাই দেখা যায়। আর আমাদের নাটককারগণও সেইরূপ চিত্র বর্ণবৈচিত্র্যে সুন্দর করিয়া তুলিতে প্রয়াসী। অন্য দেশে সাধুসন্ন্যাসী সম্প্রদায় জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য—এদেশে তাহাদের সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর; এদেশে তাহারা একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী সম্প্রদায়। কিম্বদন্তীবলে তাহারাও বহুবিধ অলৌকিক কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ অবস্থায় নাটককারের পক্ষে সরল ও বিশ্বাসী পাঠক ও দর্শকদিগের জন্য অলৌকিক চিত্র চিত্রিত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা সর্ব্বত্র সহজ নহে। কিন্তু যে নাটককার সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব জীবনের চিত্র চিত্রিত করিয়া মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী করিতে পারিবেন, তিনিই মানব-সমাজের প্রকৃত উপকার করিবেন।

বিজ্ঞান।

হিন্দু রসায়ন।

ইদানীন্তন অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ও শিক্ষিত-ভাবাপন্ন ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, প্রাচীন ভারতে জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চা আদৌ হইত না,—প্রাচীন মনীষিগণের বুদ্ধি কেবল "তৈলাধার পাত্র" কি "পাত্রাধার তৈল" প্রভৃতির বিচারেই ব্যাপৃত থাকিত। প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা অনন্যসাধারণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি যে হয় নাই, এরূপ অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। বর্ত্তমান যুগের সতর্কতাপূর্ণ অনুসন্ধানের আলোক-সম্পাতে বিস্মৃতির তমোময় বিবরস্থ অনেক মুখ্য তথ্যের ক্ষীণ রশ্মি ইদানীং লোকলোচনে প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি ভারতের সুসন্তান অসামান্য প্রতিভাশালী মনস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ও অদম্য উৎসাহের ফলে, প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতিসম্পর্কে কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত ও শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'ডন' পত্রে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে।

ইতিহাসে যুগান্তর।

প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যা (Chemistry) যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা ডাক্তার পি. সি. রায় মহাশয় তাঁহার History of Hindu Chemistry নামক গ্রন্থে অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। হিন্দুগণ রসায়ন বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং সেই আলোচনার ফলে তাঁহারা ঐ বিদ্যায় অসাধারণ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন,—প্রফুল্ল বাবু তদীয় গ্রন্থে এই সত্য বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাহার ফলে প্রতীচ্য খণ্ডে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার মনীষিগণ ভারতকে এতদিন যে দৃষ্টিতে দেখিতেন,—এখন আর সে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না। জর্ম্মানীর বিখ্যাত রসায়ন-বিদ্যাবিশারদ হার্ম্মাণ শিলুজ (Hermann Schelcuz) প্রফুল্ল বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। জীবিত রসায়নবেত্তৃগণের মধ্যে ইঁহার মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত। ভৈষজ্য-রসায়ন সম্বন্ধে ইঁহার সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান কালে অভ্রান্ত বলিয়া সম্মানিত। এই সর্ব্বজন-সম্মানিত রসায়নবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত স্পষ্ট ভাষায় অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে 'রসরত্ন সমুচ্চয়' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতীচ্য রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত শাস্ত্রে যেরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের সমকালীন হিন্দু রসায়নবিদ্‌গণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার রায় মহাশয়ের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলেই য়ুরোপে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফলে য়ুরোপখণ্ডে রসায়ন-বিদ্যার ইতিহাস নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে।

স্বাধীন বিকাশ।

গ্রীকদিগের প্রভাবেই ভারতে অনেক বিদ্যার আলোচনা হইয়াছিল,—ইদানীং অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তার রায় মহাশয় অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দুর রসায়ন-বিদ্যা বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই। নাগার্জ্জুনপ্রমুখ প্রাচীন মনীষিগণের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতে রসায়ন-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল। নাগার্জ্জুন সম্রাট শালিবাহনের বন্ধু ছিলেন,—ইহা তাঁহার শিষ্য বসুঘোষের উক্তি এবং প্রাচীন জনশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। নাগার্জ্জুন বৌদ্ধদিগের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র আবৃত করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে এই বিদ্যা কিছুদিন অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু রসায়নবিৎ গোবিন্দাচার্য্য তাঁহার প্রণীত 'রসসার' নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বৌদ্ধদিগের এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের অনেকগুলি রসায়নতন্ত্র এখনও বিদ্যমান আছে। যথা,—রসেন্দ্রচূড়ামণি, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্ন সমুচ্চয় এবং রসসার। ডাক্তার রায় বলেন বৌদ্ধগণ রসায়ন শাস্ত্রের প্রচুর উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, হিন্দুদিগের তন্ত্রগ্রন্থ বৌদ্ধগণের রসায়নগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

ডাক্তার রায় ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ক্রমিক বিকাশ।

বৌদ্ধযুগ যে সময় আরম্ভ হইয়াছে—তাহারও পূর্ব্বতন কাল হইতে ইনি হিন্দু রসায়নের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু রসায়ন বিদ্যার আলোচনার পর্য্যায় পাওয়া যায়। প্রথম আয়ুর্ব্বেদিক কাল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা প্রসৃত। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তনের কাল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাল ব্যাপ্ত। তৃতীয় তান্ত্রিক কাল; খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। চতুর্থ পর্য্যবসান কাল—ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়। ডাক্তার রায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত করেন। তাহার পর তিনি বোল খানি তন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি গ্রন্থই দাক্ষিণাত্যে নেপালের, বারাণসীর ও কাশ্মীরের পুস্তকাগারে অনাদৃত অবস্থায় কীটদষ্ট হইতেছিল। নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত হয়। রসার্ণব তৃতীয় কালের গ্রন্থ। নেপালের দরবারে অনুসন্ধানের ফলে রসায়ন বিদ্যার একখানি অতি প্রাচীন শৈবতন্ত্র ও কুব্জিকা তন্ত্র নামে আর একখানি রসায়ন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত অক্ষরে লিখিত। দাক্ষিণাত্যের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধানের ফলে অনেকগুলি বৌদ্ধ রসায়ন তন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীন রসায়ন বিদ্যা চরক সংহিতা, সুশ্রুত, বাগভটের অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, তৃন্দা ও চক্রপাণি দত্তের গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতই মনে করিতেন যে, চরক ও সুশ্রুতে যে রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দুগণ তাহা আরব ও য়ুরোপিদের নিকট হইতে আনিয়া লইয়াছেন। ফরাসী রসায়নবিৎ বার্থালেঁ৷ও এই মতের পক্ষপাতী। ডাক্তার রায় ঐ মত বিশেষরূপে খণ্ডিত করিয়াছেন। সুশ্রুতসংহিতায় প্রদাহক ক্ষারের (Caustic alkali) উল্লেখ আছে। বার্থালেঁ৷ প্রভৃতি মনীষিগণ তাহা দেখিয়া বলেন—চরকের কোনও কোনও অংশ অত্যন্ত আধুনিক; য়ুরোপীয়গণের সহিত হিন্দুদিগের পরিচয়ের পর উহা প্রণীত হইয়াছে। ডাক্তার রায় এই মত বিশেষরূপে খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন বাগ্‌ভট ও চক্রপাণি উভয়েই তাঁহাদের গ্রন্থে সুশ্রুতোক্ত উক্ত ক্ষারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ঐ উভয় গ্রন্থকারই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা মিলিন্দার প্রশ্নাবলীতেও দুইবার ক্ষার প্রয়োগে দগ্ধ করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মিলিন্দা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ নানা প্রমাণ-প্রয়োগে ডাক্তার রায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ মুরনিকট হইতে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। আরব ও মুর জাতিই হিন্দুদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া প্রতীচ্যখণ্ডে ঐ বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের সময়ে Distillation, Sublimation প্রভৃতি করিবার পদ্ধতি পরিজ্ঞাত ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে ও বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক রাসায়নিক তত্ত্ব

হিন্দু রসায়নই প্রাচীনতম।

নিহিত আছে। কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ও প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন বিদ্যার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ডাক্তার রায় সেগুলিও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ডাক্তার রায় মহাশয়ের অনুসন্ধান ফলে পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রাচীন হিন্দুদিগের উদ্ভাবিনী প্রতিভার প্রচার হইয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আশা করি, অধ্যাপক রায় মহাশয়ের যশোভাতি মার্ত্তণ্ডিন ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর হইয়া অচিরকালে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

আশীর্বাদের আশা।

মূষিক ও প্লেগ।

সম্প্রতি বিলাতে প্লেগ দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই রোগ বিলাতের অধিবাসী ও সতর্ক পরিদর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে তথাকার লোক ক্ষয় করিতেছিল। প্লেগ বাতগ্রৈষ্মিকরূপে তথায় আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া সহজে তাহার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যাহারা এই প্লেগে মরিতেছিল, তাহাদিগের রোগের লক্ষণ দেখিয়া লোক, এমন কি চিকিৎসকগণও, মনে করিতেছিলেন যে, নিউমোনিয়া বা বাতশ্লেষ্মা বিকারই উহাদিগের মরণের কারণ। শেষে দেখা গেল, ঐ নিউমোনিয়ায় প্লেগের সংক্রামকত্ব সপ্রকাশ। ফলে এ বিষয়ে সতর্ক অনুসন্ধান হয়। সেই অনুসন্ধান-ফলে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে,—তাহাতেই গ্রেটব্রিটনে প্লেগের উৎকট মূর্ত্তি লোকলোচনের সম্মুখে বিকট ভাবে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতের টাইম্‌স পত্রের অনেক লেখক এ সম্বন্ধে একটি নানাতথ্য সম্বলিত সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। স্পেক্টেটর তাহার উপর আর একটি সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা শেষোক্ত সন্দর্ভের সার-সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

স্পেক্টেটর লিখিয়াছেন, গত আড়াই শত বৎসর পরে আবার ইংলণ্ডে প্লেগের বীজাণু আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার প্রসার-স্থান ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার প্রসার-রোধকল্পে বিরাট প্রতিষেধোপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এখন এই রোগ স্থানবিশেষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু জাতীয় মঙ্গলামঙ্গলের সহিত এই ব্যাপার বিশেষভাবে বিজড়িত। সুতরাং ইহার প্রসার-রোধকল্পে বিশিষ্ট উপায়াবলম্বনই আবশ্যক।

প্লেগ প্রকোপ।

গত ২২শে ডিসেম্বর টাইম্‌স পত্রের অনেক বিশিষ্ট সংবাদদাতা ইষ্ট এঙ্গেলিয়ার প্লেগের বিস্তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। সেই সন্দর্ভে লেখকের ঐ বিষয় আলোচনা করিবার ও ঐ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি তথ্য এই যে, গত সেপ্‌টেম্বর মাসেই কেবল ষ্টেইন অঞ্চলে মূষিক ও মানব সমাজে প্লেগ আত্মপ্রকাশ

প্রথম প্রকোপের স্থান।

করে নাই; গত চারি বৎসর বা ততোধিককাল ঐ অঞ্চল নিউমোনিক প্লেগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। শটলি নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের বহিঃস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রথমে এই দারুণ রোগ দেখা দিয়াছিল। অয়ওল নাম্নী ক্ষুদ্রা তটিনীর তটে এই পল্লী অবস্থিত। যে কুটীরে প্রথমে প্লেগ প্রকাশ পায়, তাহার চারিশত হস্ত দূরে আর একটি ক্ষুদ্র কুটীর বর্ত্তমান। এই দুই কুটীরের অর্দ্ধ মাইল মধ্যে আর কোনও মানবের বসতি নাই। এই অঞ্চলটি যে বিরল-বসতি এবং উক্ত কুটীরদ্বয় যে লোকালয় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহা এই তথ্যেই সপ্রকাশ।

সন্দেহ।

গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথমোক্ত কুটীরে জনৈক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। সকলে মনে করে যে, বৃদ্ধা নিউমোনিয়া বা বাতশ্লেষ্মা বিকারে মরে। তাহার পর মৃতার দুই কন্যা ঐ রোগে আক্রান্তা হয়। একজন আরোগ্য হয়, আর একজন ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাণত্যাগ করে। নিকটস্থ কুটীরের জনৈক মহিলা পূর্ব্বোক্ত পীড়িতাদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। লোকে মনে করে, তিনিও ঐ রোগে মরিয়াছেন। ইহার কয়েকদিন পরে ঐ রোগে তাঁহার স্বামী এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী তাঁহার মাতা ঠিক ঐ রোগেই মরেন। পেষোক্ত রমণীর দুইটি সন্তান ঐ রোগে আক্রান্ত ও তন্মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ক্ষেত্রেই প্রথম সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু তাহা সন্দেহমাত্র। ইহার কিছুকাল পরে অয়ওলের নদীর অপর তীরে ব্রিমলি গ্রামে দুইটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন সন্দেহ হয়, যে তাহারা হয় ত প্লেগে মরিয়াছে।

নিশ্চয়তা।

গত বৎসর সেপ্‌টেম্বর মাসে শটলি হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ক্লেইন নামক পল্লীতে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। যে কুটীরে এই রোগ প্রথম দেখা দেয়, সেই কুটীর নামতঃ ক্লেইনের অন্তর্গত হইলেও গ্রাম হইতে উহা বহু দূরে অবস্থিত। সে কুটীর হইতে কোনও জনবাসই নয়নগোচর হয় না। ১১ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে উল্লিখিত কুটীরে একটি বিড়াল মরে। সেই দিন সেই বাটীর একটি নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা পীড়িতা হয়। বালিকা বিড়ালটি লইয়া খেলা করিত। ১৬ই তারিখে মেয়েটিও মরিয়া যায়। ক্রমে ২০শে মেয়ের জননী, ২১শে মেয়ের জনক, যমালয়ে গমন করেন। আর একটি মহিলা মেয়েটির জনকের সহিত পীড়িতাদিগের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনিও ঠিক ঐ দিন শমনসদনে নীত হয়েন। ইতঃপূর্ব্বেই লোকের সন্দেহ অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। উপযুক্ত চিকিৎসকগণ তখন ইহার মধ্যে দুইজন রোগীর রক্ত পরীক্ষা ও তাহা হইতে রোগ জীবাণুর পরিণতি করিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ। তাহাদের রক্তে প্লেগ বীজাণু বর্ত্তমান। তখন সকলে বুঝিল, উহারা কেহই নিউমোনিয়ায় মরে নাই,—নিউমোনিক প্লেগই উহাদিগের মৃত্যুর কারণ। তাহার পর আর ঐ অঞ্চলে কেহ ঐ রোগে মরে নাই।

মূষিক ও প্লেগ।

ক্লেইনে প্লেগের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে ঐ অঞ্চলে সতর্ক অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, তথায় বহুদিন হইতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ অঞ্চলে দলে দলে মূষিক

করিতেছে। কৃষক ও মজুরদিগের মধ্যে যাহারা এই অনুসন্ধান-ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল যে,সে একদিন প্রাতেই তিন শত মৃত ইন্দুর দেখিয়াছিল। তাহার পর ইপ্সউইচ অঞ্চলের জীবিত ইন্দুর ধরিয়া তাহার রক্তাদি পরীক্ষা করা হয়। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, তথায় শতকরা পাঁচটী ইন্দুর প্লেগে আক্রান্ত। মৃত মূষিক পরীক্ষা-দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহারা প্লেগেই মরিয়াছে। যেখানে অঞ্চলে যখন প্লেগ প্রকট মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, সে সময় তথায় জীবিত মূষিকদিগের মধ্যে শতকরা ৬টির অধিক প্লেগাক্রান্ত হয় নাই।

টাইমসের পত্রলেখক এ সম্বন্ধে একটি অতি আবশ্যক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন।

নিদান সম্বন্ধে নূতন মত।

বহুদিন হইতে জানা ছিল যে,"পিউলেক্স চিওপিস্" (pulex cheopis) নামক ইন্দুরের উৎকুণের দংশনে মানব-দেহে প্লেগ রোগ বিসর্পিত হয়। ভারতেই এই জাতীয় উৎকুণ যথেষ্ট পুষ্ট হয়। কিন্তু বিলাতে উহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূষিকের বিলাতী উৎকুণের নাম ceratophyllus fasciatus। এই বিলাতী উৎকুণ নিজদেহে প্লেগ বীজাণুদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে আশ্রয় দেয় বটে, কিন্তু এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, উহা মানুষকে একেবারেই দংশন করে না। টাইমসের লেখক লিখিয়াছেন যে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বিলাতী উৎকুণ না পাইলে অনন্যোপায় হইয়া মানুষকে দংশন করে। সম্ভবতঃ নিরীহ বলিয়া বিবেচিত এই বিলাতী উৎকুণের দংশন-ফলেই ক্রেইনে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই ব্যাপারে দুইটি নূতন তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ, প্লেগাক্রান্ত মূষিক ceratophyllus fasciatus নামক উৎকুণের দ্বারাও মানবদেহে প্লেগ রোগ বিসর্পিত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতে প্লেগাক্রান্ত মূষিকাধ্যুষিত অঞ্চলের পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও জানিয়া রাখা আবশ্যক। প্লেগের বাতস্নৈষ্মিক রূপ অতিশয় সংক্রামক ও সঙ্ঘাতিক। ইহা নিশ্বাসের দ্বারা এক মানবের দেহ হইতে অন্য মানবের দেহে বিসর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার গ্রন্থি-স্ফীতি রূপ মূষিকের উৎকুণের দংশন ব্যতীত বিসর্পিত হয় না। সুতরাং ইহার বাতস্নৈষ্মিক মূর্ত্তি যদি কোনও ঘনবসতি অঞ্চলে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া লোক-সংহার করিতে থাকিবে। লণ্ডনে যদি ইহা একবার দেখা দেয়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। ইহাতে যে কেবল বহুলোকের প্রাণহানি হইবে, তাহা নহে,—ইহাতে বিলাতের বাণিজ্যেরও প্রভূত ক্ষতি হইবে।

অন্যান্য কথা।

তাহার পর আর একটি কথা,—শীতে বা বর্ষায় এই রোগ দ্রুত বিসর্পিত হয় না, কারণ ঐ সময় ইন্দুরের উৎকুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। গ্রীষ্মের সময় ও শরৎ কালে এই রোগ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিবে, অনেকের ইহাই বিশ্বাস। সেই জন্য ইহার বিস্তার-রোধ-কল্পে বিলাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ডাক।

ডাক মহাপুরুষ ছিলেন। এই মহাপুরুষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সে ইচ্ছার তৃপ্তি-সাধনের উপায় কোথায়? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিয়াছেন, "তাহাদের (ডাকের ও খনার) জীবনের উদয় অস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত; আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। * * * হয়ত প্রাচীন কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের (বচনরাশির) রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।" তাঁহার ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যসেবী পণ্ডিতই যখন ডাকের অস্তিত্বে সন্দিহান, তখন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার আশা কোথায়? যাহা হউক, সুদূর ব্রহ্মপুত্রোপত্যাকায় ডাকের বিষয় কিছু জানা যায় কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

"লেহি ডঙ্গরা ডাকর গাঁও।
তিনি-শ পথুরির তিনি-শ নাওঁ॥"

প্রসিদ্ধ মহাপুরুষীয় তীর্থ বরপেটা হইতে সাত মাইল দূরে বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট পল্লী যনদিয়ার সন্নিকট লেহি ডঙ্গরা গ্রাম ছিল। এই গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল। এই গ্রামেই ডাকের জন্ম। প্রবাদ আছে, ডাকের পিতারা ছয় সহোদর ছিলেন। এই সহোদরদিগের প্রত্যেকেরই সন্তানাদি হইয়াছিল; কেবল ডাকের পিতার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় ডাকের পিতামহী বড়ই দুঃখ করিতেন। সহসা একদিন সন্ধ্যার সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে ডাকের পিতামহী ডাকের জননীকে সন্ন্যাসীর সেবা করিতে নিয়োগ করেন এবং বলেন, "মা, তোমার সন্তানাদি নাই, তুমি সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া পুত্রবর লাভ কর।" সন্ন্যাসী ডাকের জননীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবর দিয়া গমন করেন। এই পুত্রই ডাক।

"এক দিন ডাক জন্ম লভিলা।
ভূমিতে পরিয়া মনে গুনিলা॥
দেখে অন্ধকার প্রদীপ নাই।
চক্ষু টের করি মারুক চাই॥

হেন দেখি পাছে মাতিলা ডাক।
পোয়াতী রাখিয়া চা পুতাক॥"

ডাক জন্মমাত্রই অমর বচনে সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ ভিন্ন জন্মমাত্র কাহারও কথা নির্গত হয় না। পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ জন্ম-মাত্রই বলিয়াছিলেন, "আমাকে যশোদার অঙ্কে রাখিয়া আইস।" ডাক ও জন্মমাত্র বলিয়াছেন, "পো এড়িয়া পোয়াতী রাখ।" ডাকের মৃত্যুও অকস্মাৎ ঘটিয়াছিল।

"ডাক মরে আপোন বুদ্ধি।
অপঘাত মৃত্যু তে-রাত্রি শুদ্ধি॥"

ডাক জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মণ ও গণকদিগের* জীবিকা অর্জনের অন্তরায় হইবে এই চিন্তা করিয়া সকলে একত্র হইয়া ডাককে ব্রহ্মপুত্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিল।

"জী থাকে যদি ডাক ভাবিল মনত।
আমার জীবিকা সবে অস্তছিব ভাবত॥
ডাকক মারোহো সবে স্নান সময়ত।
সকলো শিস্তক সাতি আনিলা গণক।
রাখিব গোয়ারি ডাক আসিলা মনক॥
ব্রহ্ম পুত্রতীরে আহি বান্ধিলন্ত আরি।
সকলো শিস্তরুলগে দিলে জাপ মারি॥

উত্তম ব্রাহ্মণ ঘরে জনম ধরিলা।
এ দিন এক দুপরতে শাস্ত্রক কহিলা॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কোন আসিআছে ফের।
কিবা তাহারে সে মায়া না জানিলে ফের॥
সকল প্রাণীয়ে সিতো অদ্ভুত মানিয়া।
অহিংসক ডাক শিশু পেলাইলা মারিয়া॥

ডাকের জীবন ঘোর অন্ধকারাবৃত হইলেও উক্ত মহাপুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার আমাদের শক্তি নাই। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বর্ণনা একবারে কল্পনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। যখন দেখি, ডাক পুরুষের

* ডাক গোয়ালাকে কোন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বে বরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

বচনে, ডাক চরিত্রে ও ডাক ভণিতায় ডাক গোয়াল ভণিতা দিতেছে তখন কেমন করিয়া বলিব, ডাক গোয়ালের অস্তিত্ব ছিল না।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

ডাকের কথা।

নেপাল হইতে যে ডাকার্ণব তন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা ডাকের বচনের মত অনেকগুলি বচন পাওয়া গিয়াছে। ডাকার্ণব তন্ত্র, ডাকতন্ত্র, ডাকিনী তন্ত্র,—এ সকল তন্ত্রের নাম তান্ত্রিকগণ অবগত আছেন। ডাক, ডাকিনী,—এই দুইটি শব্দও সকলেই জানেন। এই তন্ত্রগুলিতে যখন ডাকের বচনের মত বচন প্রাকৃত ভাষায় পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা ডাকের বচন যে সেই সকল বচনের ছায়া অবলম্বনে রচিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কি? নেপালের ডাকার্ণব তন্ত্রের বচনের সঙ্গে বাঙ্গলা ডাকের বচনের ভাষাগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এ দেশে অনেক হেঁয়ালীতে কবি কালিদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর বরাহমিহিরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ খনা বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে; অথচ এদেশে প্রচলিত খনার জীবন চরিতে বাঙ্গলা বচনের রচয়িত্রী স্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। "ডাক গরল:"—এই প্রবন্ধের উদ্ধৃত একটি পদে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "জন্ম মাত্র বলে ডাক। পো এড়িয়া পোয়াতি দেখ" এই পদটির অর্থে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, ডাক জন্মিয়াই জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই চরণের অর্থ অন্যরূপ; ডাক বলিতেছেন, (সন্তানের) জন্মমাত্র তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পোয়াতিকে যত্ন করিতে হইবে। প্রবন্ধকার ভাবিয়াছেন ডাক জন্মিয়াই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ইত্যাদি। সুতরাং তাহার জীবন চরিতের একটি অধ্যায় অমনিই আবিষ্কৃত হইয়া গেল, ডাক সূতিকা গৃহ হইতেই জগতের হিতার্থ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ডাকের জীবন-চরিত সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ সম্বলিত প্রবাদেরও এই রূপে সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

* বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই কয় পংক্তি লিখিতে Major P. R. T. Gordon's Some Assamese Proverbs ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নোটের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

কুনালের পিতৃভক্তি।

আমরা অশোক-অবদান ও দিব্য-অবদান হইতে অশোক ও তাঁহার আত্মীয়গণ সম্পর্কীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হই। যে লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাবে ভারতে এক সুবিশাল সম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও, আপনার কর্ম্মময় জীবনকে একদিনের জন্যও বিলাসিতার সুকোমল অঙ্কে স্থাপন করিয়া বিশ্রামের অবকাশ পায়েন নাই, তাহার কর্ম্ম-বহুল জীবন-ইতিহাস রচনা করিবার পক্ষে অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে অশোক-অবদান একখানি উৎকৃষ্ট ও উপযোগী গ্রন্থ সন্দেহ নাই। আমরা বিদেশীয় জীবন-কাহিনী রচনা করিবার জন্য যে পরিমাণ ব্যস্ততা দেখাইয়া থাকি, আমাদের মধ্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি সেই পরিমাণে স্বদেশীয় মহাত্মগণের চরিত-সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, তবে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে ভারতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের জীবনচরিতের জন্য আমাদিগকে অপরের দ্বারের দিকে দীন নয়নে চাহিয়া থাকিতে হইত না। অশোক এই জাতীয় পুরুষসিংহ, তাহার কর্ম্মময় জীবনের সহস্র উপাদান নানা-ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার পুত্র কুনালের পিতৃভক্তি-জ্ঞাপক এক আখ্যায়িকা হইতে, মহাবীর প্রিয়দর্শীর কর্ম্ম-বহুল জীবন-নাটকের কতিপয় অঙ্কের বিবরণ প্রদান করিব।

প্রিয়দর্শন কুনাল কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যৌবন সুলভ রূপের দীপ্তি তাঁহার সমস্ত দেহে সপ্রকাশ। কুনাল, অশোক-নির্দ্দিষ্ট রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। এই রাজপ্রাসাদে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষিতাও বাস করিতেন। বিমাতাও যুবতী; বর্ষার নদীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে উদ্দাম চাঞ্চল্য ক্রীড়া করিতেছিল। কথিত আছে যে, অশোক মহিষীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধবয়সে ইঁহাকে বিবাহ করেন। বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত অশোককে লইয়া যুবতীর মনস্তুষ্টি হইত না, সপত্নীপুত্র যুবক কুনালের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তিনি কুনালকে স্বীয় অভি-প্রায় জানাইলে কুনাল বিমাতার ঘৃণিত প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। লালসার নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া মন্দবুদ্ধি নারী

সেই দিন মনে মনে কুনালের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিছুদিন মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া; এক দিন তিনি অশোককে সুমিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া কুনালকে সুদূর তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা রূপে প্রেরণ করিলেন। সুদূর তক্ষশিলায় কুনালকে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কোনরূপে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর দেশে পাঠাইতে পারিলেই, অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহাকে পিতৃসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করা সহজ হইবে; অধিকন্তু অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করাও দুষ্কর হইবে না। এই পিতৃ আজ্ঞার পশ্চাতে কুনাল বিমাতার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞার বিপরীতাচরণ করা তাঁহার অভ্যাসবিরুদ্ধ; সুতরাং, তিনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ও চিরপরিচিত স্বর্গাদপী গরীয়সী জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় লইয়া, চিরপোষিত পরিম্লান আশা বক্ষে ধারণ করতঃ, ভবিষ্যজীবনের নূতন অঙ্ক কিরূপে রচনা করিবেন তাহা চিন্তা করিতে করিতে সুদূর প্রবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কুনাল নূতন স্থানে আসিয়া নূতন করিয়া "ঘর কন্না" পাতিয়াছেন। আবার কুহকিনী আশা তাঁহার মনোরাজ্যে কল্পিত ভবিষ্য সুখরাজ্যের কল্পনার সৃষ্টি করিয়া সেই তাপদগ্ধ জীবনের স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছিতেছিল। কিন্তু নিয়তি কোন অজানিত রাজ্যে বসিয়া অন্যরূপে তাঁহার জীবননাটক গঠিত করিয়া তুলিতেছিল। একদিন রাজকার্য্য শেষ হইলে, অশোক মহিষীর কক্ষে বিশ্রামার্থ নিদ্রিত ছিলেন। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, অশোকপত্নী তক্ষশিলার মন্ত্রিবর্গকে এই পত্র লিখিলেন, তোমারা আদেশলিপি প্রাপ্ত হইবামাত্র কুমার কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। তিষ্যরক্ষিতা নিদ্রিত অশোকের চিহ্ন উক্ত পত্রের উপর অঙ্কিত করিয়া ঐ আদেশ-লিপি অবিলম্বে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন।

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহাদিগের হতবুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কুমার পত্রের মর্ম্মার্থ তাঁহাকে জ্ঞাত করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্যগণ সেই কুলীশ-কঠোর আদেশ ব্যক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু এই কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া কুনালের কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। তিনি রাজাদেশ অবিলম্বে

পালন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অমাত্যগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু উৎপাটিত হইল; তিনি সস্ত্রীক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

পিতৃ-আদেশ পালন করিবার জন্য, জীবনের জ্যোতি-স্বরূপ চক্ষুর্দ্বয় হারাইয়া কুনাল নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে পাটালিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি একদিন কোন সুযোগে রাজপ্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন-নাটকের করুণ অঙ্কটি তালমান সংযোগে সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক পুরীমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কুনালের কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি সত্বর বহির্দ্বারে আসিলেন। পুত্রের এবম্বিধ অবস্থার বিষয় তিনি অবগত ছিলেন না। পিতাপুত্রের মিলনের পর অশোক সমুদায় বিষয় জানিতে পারিলেন।

কথিত আছে যে, ঐ সময় গোসা নামক এক জন দিব্যশক্তিসম্পন্ন ভিক্ষু পাটালিপুত্রের সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেন। পুত্রের দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের জন্য অশোক তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়েন। ঐ মহাত্মার আদেশে পরদিন প্রাতে একটি বৃহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। গোসার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য দলে দলে নরনারী সমবেত হইলে, তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলে সমবেত জনমণ্ডলীর নয়নে সংক্ষুব্ধ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। কারুণোচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা প্রত্যেকের হস্তস্থিত পাত্রে রক্ষিত হয়। ধর্ম্মোপদেশ শেষ হইলে গোসা উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি যদি চিরজীবন বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম্মের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, তবে কুনাল দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া পাইবেন।" এই বলিয়া তিনি পাত্রস্থিত নয়নাসার যুবকের নয়নে লিপ্ত করিলেন। ইহাতেই কুনাল আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

কথিত আছে যে, যুবক পিতৃ-আদেশ পালন করিবার জন্য যে স্থানে আপনার চক্ষু উৎপাটিত করেন, তক্ষশিলার সান্নিধ্যে সেই স্থানে অশোক-কুনালের পিতৃআজ্ঞানুবর্ত্তিতা স্মরণার্থ একটি স্তূপ নির্ম্মিত করান। এই স্তূপই তাঁহার কীর্ত্তি ইতিহাসে জাগরূক রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ভারতের এক রাজপুত্র একদিন পিতৃআদেশ পালনের জন্য শাসনদণ্ড ফেলিয়া বনাশ্রয় করিয়াছিলেন। আর একজন "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম"

জানিয়া আপনার চক্ষু উৎপাটিত করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। এক জনের জীবনকথা আদি কবির লেখনীমুখে অমরতা লাভ করিয়াছে—সমস্ত জগতবাসী তাঁহাকে দেবতার পদে উন্নীত করিয়া ভক্তি পুষ্পে পূজা করিতেছে,—আর একজনের কাহিনী আলোচনার ও সহানুভূতির অভাবে কোনরূপে আপনাকে বহুশতাব্দী ধরিয়া বিস্মৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পুরাতন প্রসঙ্গের কথা।

গতবারের প্রবন্ধে যে হরিনাথ শর্ম্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন :—রামের অরণ্যযাত্রা বিরাটপর্ব্ব, মুদ্রারাক্ষস ও রচনাবলি। রাসেলাসের অনুবাদক ৺ তারাশঙ্কর ; ৺হরিনাথ শর্ম্মা নহেন। উভয়েরই নিবাস নদীয়া জেলায় কাঁচকুলি গ্রামে। ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নিবাস নদীয়া জেলায় বিল্বগ্রামে নামক গ্রামে। কাঁচকুলি ও বিল্বগ্রাম পরস্পর নিকটবর্ত্তী। তিনজনেরই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। ৺ হরিনাথ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিত ছিলেন এবং শিবপুরে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

৺ হরিনাথ ন্যায়রত্নের সাত পুত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর জ্যেষ্ঠ, তিনি সম্প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজের কার্য্য করিয়া পেন্‌সন লইয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র দার্জ্জিলিঙ্গের বিখ্যাত উকীল Mr M. N.Banerjee (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই ক্ষুদ্র লেখক ৺ হরিনাথ ন্যায়রত্নের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক)

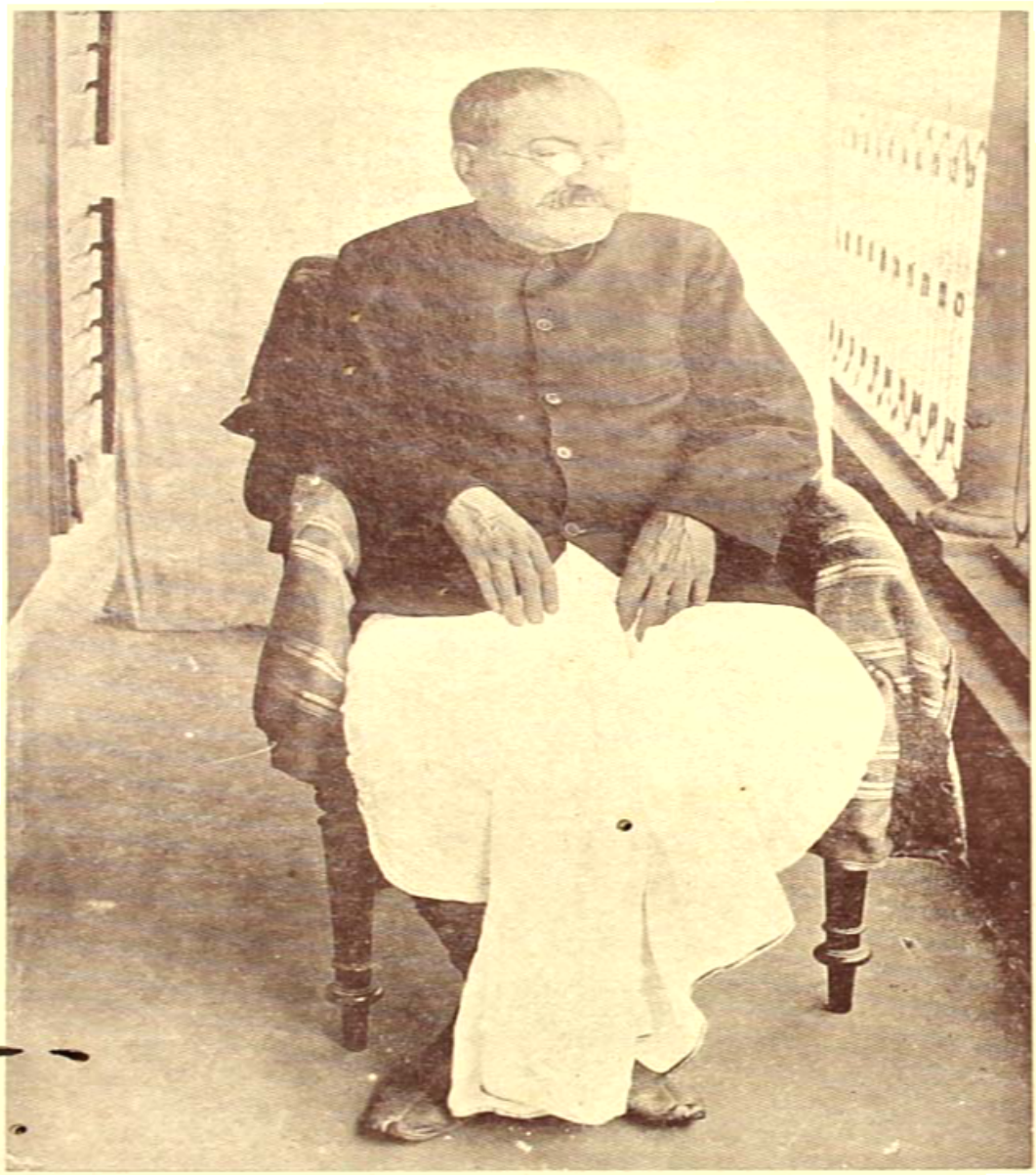

অন্ধাবস্থায় ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ছবির জন্য মানসীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঋণী।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

—:০:—

১

১৫ই পৌষ, ১৩১৭।

পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বঙ্কিম বাবু কি কখনও আপনার Law lectures শুনিতে আসিতেন?" তিনি বলিলেন—"আমার Law lectures? বঙ্কিম বাবু?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁ; আপনার।" তিনি বলিলেন—"না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?" আমি বলিলাম—"একজন প্রবীন সাহিত্য-সেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনাপ্রসঙ্গে এইরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিম বাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেক্‌চার শুনিতেন।" তিনি বলিলেন—"দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম বাবু ও আমি একত্র Law classএ লেক্‌চার শুনিতে যাইতাম। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটা analogous ঘটনা আমি বলিতে পারি। তারাপ্রসন্ন বাবু বঙ্কিম বাবুর সমসাময়িক লোক। তিনি যখন বহরমপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, গুরুদাস বাবু তখন তথায় ওকালতী করেন ও কলেজে Law lecturer। তারাপ্রসন্ন বাবু গুরুদাস বাবুর Law classএ উপস্থিত হইয়া লেকচার শুনিতেন। এ কথা আমি গুরুদাস বাবুর মুখে শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"আপনার বঙ্কিম বাবুর সহিত intercourse বরাবর ছিল কি?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"ছিল বৈ কি? তিনি যখন আলিপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, তখন হাওড়ায় প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসিতেন। যখন হাওড়ায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার এজলাসে প্রায়ই যাইতাম। এখনও বেশ মনে পড়ে, একদিন হাওড়া হইতে এক গাড়িতেই আমরা দু'জনে যোগেন্দ্র বাবুর বাড়িতে গেলাম। পথে কোম্‌ৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। আমি

বলিলাম,—'দেখুন, আমার মনে হয়, কোম্‌তের দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it.' বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—'কেন? সেটা Truth তা'র আবার সময় অসময় কি?' অবশ্যই বঙ্কিম বাবু যে কোম্‌ৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন তিনি বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।

"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ বোধ হয় ইংরাজী ১৮৬০ সাল হইতে। আমার বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রের বাড়ী খিদিরপুরে; হেমচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় সেই স্থানেই হইয়াছিল। যখন তিনি ৺রমাপ্রসাদ রায়ের ছেলে দু'টির শিক্ষকতা করেন, তখন বুঝিতে পারা যায় নাই যে, তিনি একজন বড় দরের কবি হইতে পারিবেন। বালককাল হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু তখন ভবিষ্যতের সূচনা পাওয়া যায় নাই। তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষকতা করিলেন। বৎসর খানেক মুন্সিফি করিলেন। সেই সময়ে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে টাকা দিয়া Norton's Law of Evidence বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া লয়েন। ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি একপ্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন উকিলের জুনিয়রি করিতেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং হেম বাবুকেই argue করিতে হইল। মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের বৃদ্ধি হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; আয় মাসে দুই চারিশ আড়াই হাজার টাকা হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে, কি কারণে তাঁহার কাব্য রচনার দিকে ঝোঁক গেল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের সহিত ভাল রূপ আলাপ হওয়াতে,—তিনি মেঘনাদবধের preface লিখিয়া দেন,—তাঁহারও খণ্ডকাব্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

"কিন্তু হেম বাবুর 'চিন্তাতরঙ্গিনী' ইহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এটা তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘটনাটা কি? কবে ঘটিয়াছিল?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"আত্মহত্যা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। আমার দাদার মৃত্যুর ঠিক মাস খানেকের ভিতর এই ঘটনাটি ঘটে। বোধ হয় তাঁহার দেখাদেখি। দাদার মত intellect সে সময় ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে, তিনি বোধ হয় অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। অন্ধ হইয়া আজীবন পরাধীনতার কষ্ট হইতে মুক্তির বাসনায় তিনি বোধ হয় ঐ tragic ব্যাপারের সংঘটন করিয়া বসিলেন। গ্রীক দর্শন শাস্ত্র তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল নিশ্চয়ই তিনি Epictetusএর কথায় নিজের পন্থা ঠিক করিয়া লইলেন। Epictetus বলিতেন—বাঁচিয়া থাকা যখন কষ্টকর, তখন মনে রাখিও যে, there is a door always open; রোমান বীরের ন্যায় বোধ হয় তিনি Epictetusএর কথা মানিয়া লইয়াছিলেন।

"আত্মহত্যাও সংক্রামক। দ্বিতীয় ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া হেম বাবু কবিতাটি লিখিলেন। আমিই প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন না হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের

"Man's love, of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।

"মাসিক পত্রিকায় হেম বাবুর ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইত। বোধ হয়, 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। 'বৃত্রসংহার' সুরু হইলে তাহার ওকালতীতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না; হেম বাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

"হেম বাবু অত্যন্ত sensitive ছিলেন। কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারি উকিল অন্নদা বাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'হেম বাবু বলেন কি জান? Other people's poetry survives them; but I shall survive my poetry.' হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেম বাবু অস্থির

হইয়া উঠিতেন। Dryden's Alexander's Feast হেম বাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে আছে। ঐ যে Third Number Poetical Readerএ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন সুকবি) বলেন, 'হেম বাবুর poetry ত কেবল third number poetry দেখ্‌তে পাই।' আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

"আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই; ভাব সকল যেন luscious যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায় তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, Somehow or other it never came to the surface.

"হেম বাবুকে আমি 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, 'আমার ভাল লাগে না।' কিন্তু এ বিষয়ে সারদাচরণ মিত্রের মতও ঠিক আমার অনুরূপ। আমি সারদাকে ভাল মন্দ পূর্ব্বে কিছুই বলি নাই; এমন কথা তুমি বলিতে পারিবে না যে, আমার কথায় তিনি সায় দিয়া গেলেম। দেখিলাম সারদা গ্রন্থখানিকে বিশেষরূপে admire করেন।

"যখন রব উঠিল যে, জগদানন্দ বাবু হেম বাবুর নামে নালিশ করিবেন, এবং গভর্মেণ্ট জগদানন্দ বাবুকে সাহায্য করিবেন, তখন হেম বাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কথাটার কোনও ভিত্তি আছে।

"মাইকেল হেমবাবুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; মাইকেলের প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার ছন্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু আমি একটি বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালীর flexibility of intellect অসাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।

"বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি Caricature করিতেন,—

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না; কিন্তু manner সম্বন্ধে style সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature. সে revolution এর চূড়ান্ত হইল Wordsworth এ। Edinburgh Review Wordsworthকে গোড়াতেই জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল.—'This will never do'—কিন্তু কবি অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন ও Port Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন, 'কান্নার জোলাপ'।

"বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না; আমার দাদার বেকনও তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট ছোট সাধারণ বাঙ্গালা কথা ছিল। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁর bigotry, তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে তাঁহার অনবরতবিগলিতবাষ্পাকুলিতলোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গ-হস্ত।

পরগুণপরমাণূন্ পর্ব্বতীকৃত্য নিত্যং
নিজহৃদিবিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।

এই দুই ছত্রে 'ভামিনীবিলাসে'র কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে উদারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরে সে উদারতা কোথায়? পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্ব্বতপ্রমান করিয়া তুলা ত দূরের কথা, তিনি ইংরাজী শিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

"বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল।* একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করেন বলে বাঙ্গালা

ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে দিয়ে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।

"কিন্তু আমিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সাধারণো সমর্থন করি। এ কথা আমায় জোর করিয়া বলার কারণ আছে। যখন আমি রিপণ কলেজে কায করি, একদিন আমার একটি পুরাতন ছাত্র—শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট আমার সহিত কলেজে দেখা করিতে আসিলেন। তখন আমি বিদ্যাসাগরের ভাষার একটু তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন 'সে কি মশাই? আমরা যখন আপনার কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালা পড়িতাম, তখন ত আপনিই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতায় চলিত কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বটে? তা সে কথাও ত ঠিক।'

* * * *

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। তখন বেলা ৩টা শীতকালে এই সময়ে তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হয়েন। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া আমিও উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার দাদার কোনও প্রতিকৃতি আছে কি?"

তিনি বলিলেন—"না। তবে বহুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন মেট্‌কাফ হলে Moor's Life of Lord Byron পড়িতেছিলাম। তাহাতে বায়রণের যে চেহারা অঙ্কিত ছিল, তাহা অবিকল আমার দাদার। এমন আশ্চর্য্য similarity of features দেখা যায় না;—ললাট, নাসিকা, চক্ষু, ওষ্ঠাধরের ভঙ্গি, কেশবিন্যাস, এমন কি বসিবার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত, সমস্তই মিলিয়া গেল।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কৃষিতত্ত্বের আলোচনা।

১

কৃষিকার্য্যের অবনতির অনেকগুলি কারণ আমরা একে একে উল্লেখ করিলাম। এখন আমাদের উপায় কি? আমাদের কৃষিকার্য্যে কি এইরূপ ভাবে ক্রমেই অধিকতর অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? অনেকে বলেন,—"মা ভৈঃ"—ভয়ের কোন কারণ নাই। স্বয়ং সরকার বাহাদুর বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন। গভর্মেণ্ট কোমর বাঁধিয়া যখন এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তখন আর চিন্তা কি? আমরা কিন্তু এইরূপ উক্তির পক্ষপাতী নহি: এই বিষয়ে গভর্মেণ্টের কার্য্য দেখিয়া, আমরা হতাশ হইয়াছি। গভর্মেণ্টের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আমরা তাহার প্রতি বিশেষ আস্থাবান নহি। গভর্মেণ্ট কৃষির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা "বল্ল আটুনি ফস্কা গেরো।" গভর্মেণ্টের কার্য্যে আস্থাস্থাপন না করিবার প্রধান কারণগুলি আমরা এইবার আলোচনা করিব।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ হইতে আমাদের কৃষিকার্য্যের প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে তাঁহারা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বৎসরে সরকারী কৃষি-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে গভর্মেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষিত ছাত্রকে বাৎসরিক বৃত্তি দিয়া বিলাতের সরকারী কৃষি-কলেজ সিসেসটারে শিক্ষা লাভ করিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা তথা হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গভর্মেণ্টের নিকট স্ব স্ব শিক্ষানুযায়ী কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই ডেপুটী মাজিষ্টার পদে নিযুক্ত করিলেন; যাঁহারা ডেপুটীগিরি গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা কেহ বা ব্যারিষ্টার, কেহ বা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া জীবিকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্যের উন্নতির এইরূপে সূত্রপাত হইল! ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে বিলাতের সিসেস্টার কলেজের প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ডাক্তার Voelcker, ভারতের

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং কিরূপে ইহার উন্নতি হইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য বিলাত হইতে প্রেরিত হইলেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার মন্তব্যপূর্ণ বিস্তৃত বিবরণী গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটু হতাশভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ভারতের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু এই কার্য্য বহু-সময়-সাপেক্ষ। তিনি তাঁহার রিপোর্ট মধ্যে কৃষির উন্নতি বিষয়ে বহুতর উপদেশ এবং নব পদ্ধতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সেই সুবৃহৎ রিপোর্টের মধ্য দিয়াই আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইল!

ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ৮।১০টি কৃষি-পরীক্ষা (Experimental) অথবা কৃষি-প্রদর্শনী (Demonstration) ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষের অধীনে এইগুলি ন্যস্ত হইয়াছে। অধ্যক্ষগণ প্রায়ই সিবিলিয়ন। সিবিলিয়নগণ এ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিশেষ এই সকল সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে এ পর্য্যন্ত এক পয়সাও লাভ হয় নাই। এই সকল ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যেন, সেইগুলির কার্য্য—

"কোম্পানিকা মাল,
দরিয়ামে ঢাল"

এই নীতিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ফলে কিছুই হইতেছে না—কেবল টাকার অপব্যয়। এই সকল কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতি করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া যাহাতে কৃষকেরা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া কৃষির উন্নতি করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু যখন এ পর্য্যন্ত কোন সরকারী ক্ষেত্র হইতে এক পয়সাও লাভ হয় নাই, কেবল ক্ষতি হইতেছে, তখন কৃষকগণ তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রথা কেন অবলম্বন করিবে? কৃষকদিগের চক্ষুর সম্মুখে যদি দেখান যায় যে, তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা দুই টাকা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল।—তখন বিপ্রদাস বাবুর 'পার্কপ্রণালী' সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; কয়েকজন ভদ্রসন্তান সেই

পুস্তক অবলম্বনে কোন খাদ্য পাক করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর পুস্তকের প্রণালী অনুসারে বেগুন পোড়া প্রস্তুত হইল, বেগুন পোড়া তৈয়ার করিতে তাঁহাদের ১৷৷০ টাকা খরচ হইল। অবশ্য উপাদেয় বেগুন পোড়া হইল; কিন্তু খরচ পড়িল ১৷৷০ টাকা। সখের উপর এক আধদিন মাত্র এইরূপ ১৷৷০ টাকা খরচ করিয়া বেগুন পোড়া খাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের কৃষকগণের কৃষিকার্য্য ত সখের উপর নহে; ইহাই তাহাদের উপজীবিকা। সুতরাং ১৷৷০ টাকা খরচ করিয়া বেগুন পোড়া খাওয়ার মত, বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত কৃষিকার্য্য করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে তাহারা একেবারেই অসম্মত।

কৃষিবিভাগের সুযোগ্য য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ দুঃখ করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে একেবারেই অসম্মত তাহারা বলে যে, এতদিন যে ভাবে তাহাদের বাপ-পিতামহ কৃষিকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাই ভাল; তাহাদের নূতন পদ্ধতি শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণের মতে আমাদের চাষারা ভারি বোকা, বড়ই conservative। শুধু য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নহেন, কৃষিতত্ত্ববিৎ মাননীয় রায় ভূপালচন্দ্র বসু বাহাদুর পর্য্যন্ত এই মতের পক্ষপাতী। তিনি লিখিয়াছেন,—"To my mind the Indian cultivator is a living emblem of inertia and those whose duty it is to inculcate doctrines of improvement upon his mind cannot help feeling at times that his task promises a scarcely more hopeful issue than the proverbial labour of the mountain." কিন্তু আমরা কৃষকগণের কোন দোষ দেখিতেছি না। যেদিন তাহাদের চক্ষুর সমক্ষে কার্য্যে, (কাগজ-কলমে নহে) দেখাইয়া দিবেন যে, কোন একটি বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদের দুই টাকা অর্থাগমের সুবিধা আছে, সেই দিনই তাহারা সাগ্রহে সেই প্রথা অবলম্বন করিবে। কিন্তু যতদিন তাহারা দেখিবে যে, সরকারী প্রণালী কেবল "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—কেবল টাকার শ্রাদ্ধ, ততদিন তাহারা উপদেষ্টার—সংস্কারকের যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, কেবল হাস্য-পরিহাস করিবে এবং কাযেই সংস্কারকগণের চক্ষুতে মূর্খ ও conservative বলিয়া বিবেচিত হইবে। বাস্তবিক তাহারা যে মূর্খ বা conservative নহে, তাহা আমরা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

অনন্তর বেঙ্গল গভর্মেণ্ট কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহিত একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। নিয়ম করিলেন, সকলকেই বি, এ, পাশ করিয়া এই কলেজে প্রবেশ করিতে হইবে; তবে যে সকল ছাত্রের নিজের ভূসম্পত্তি আছে অথবা যাহারা ভূস্বামী কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইবে, তাহারা বি, এ, পাস না করিলেও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এই কলেজের শিক্ষনীয় বিষয় এবং পাঠ্য পুস্তক সকল এতাদৃশ কঠিন ছিল যে, বি, এ, পাস করিয়া না গেলে ছাত্রগণ পাঠ্য বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তদ্ভিন্ন এই বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পারদর্শী কৃতি ছাত্র লাভ করিবার আশায়, গভর্মেণ্ট একটি প্রলোভন দেখাইলেন; নিয়ম করিলেন, এই কলেজ হইতে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা ডেপুটি ও সাবডেপুটির পদ প্রাপ্ত হইবে। ডেপুটিগিরি বাঙ্গালীর জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া, অনেক ছাত্র কলেজে শিক্ষা-লাভ করিতে লাগিল, যাহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিল, তাহারা ডেপুটি হইল, যাহারা না পারিল তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া কৃষিবিভাগে সামান্য চাকরী লইয়া জীবন কাটাইতে লাগিল। আর যাহারা বি, এ, পাস না করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া কেবল কয়েক বৎসর বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই ভাবে ১০ বৎসর শিবপুরের কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহারা তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইল, তাহাদের মধ্যে একজনও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল না, সকলেই চাকরী করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গভর্মেণ্টের চক্ষু ফুটিল, এই কলেজ হইতে কৃষি কার্য্যের কোনরূপ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া তাঁহারা কলেজ উঠাইয়া দিলেন।

তাহার সম্প্রতি শীঘ্রই ভাগলপুরের সন্নিকটে সাবৌরে এক বৃহৎ প্রাদেশিক কৃষিকলেজ খুলিয়াছে। যদিও এই কলেজের শিক্ষনীয় বিষয়ের গুরুত্ব শিবপুর কলেজ অপেক্ষা অনেকাংশে কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকে যে তথা হইতে কোন কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে আগত বড় বড় কৃষিতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের উপর এই কলেজের শিক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। হইতে পারে, তাঁহারা বিলাতের কৃষিকার্য্য সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, কিন্তু বিলাতের কৃষিকার্য্যের সহিত আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের আকাশ-পাতাল

প্রভেদ। তাঁহারা ত এ দেশের কৃষিকার্য্যের কোন তত্ত্বই জানেন না; সুতরাং এই কলেজের ফলও যে আশানুরূপ হইবে, তাহাও বোধ হইতেছে না। তাহার পর পুষায় এক বৃহৎ ব্যাপার হইতেছে,—তথায় একটি প্রকাণ্ড কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহার নাম Imperial Agricultural Research Institute; এই স্থানে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। বিলাতী অধ্যাপক, তত্ত্ববিদ্, বিশেষজ্ঞ, রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি মোটা মোটা মাহিনায় পুষা কলেজ পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পুষা কলেজ এতই বৃহৎ ব্যাপার যে, ইহার ভাল-মন্দ ফলাফল আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই; তবে "কলের পরিচয় ফলে"—আরও ২।৫ বৎসর অপেক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে।

গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; তবে দুঃখের বিষয় তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সেই সাধু উদ্দেশ্য সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আর এই জন্যই আমাদের কৃষকগণ গভর্মেণ্টের কার্য্যে বিশ্বাসবান হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থানুসারে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে সাহস করিতেছে না। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারিগণ রিপোর্টে অনবরত দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন যে, যাহাকে বুঝাইলে বুঝে না, তাহাকে কিরূপে শিক্ষিত করিব—যে চোখ চাহিয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে কেমন করিয়া জাগাইব—যে এতদূর নির্ব্বোধ, এতদূর conservative, তাহার অবস্থা কিরূপে উন্নত হইবে?

বাস্তবিকই কি আমাদের কৃষকরা এতই নির্ব্বোধ যে, কৃষিকার্য্যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে, অথবা যে পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তিত করিলে তাহাদের উপকার আছে, যাহাতে তাহাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে,—তাহারাও ২।৪ টাকা অধিক উপার্জ্জন করিয়া স্বীয় দুরবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি করিতে পারিবে,—সেই প্রথার উপকারিতা আপনাদের চক্ষুর সমক্ষে দর্শন করিয়াও, আগ্রহ সহকারে উক্ত প্রথা অবলম্বন না করিয়া তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতেছে? তাহা কখনই হইতে পারে না—আমাদের চাষারা এরূপ গণ্ডমূর্খ নহে। পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়া কৃষির উন্নতিকল্পে তাহারা অনেক নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছে। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

(১) নূতন ফসলের চাষ। পূর্ব্বে যে সকল ফসল আমাদের দেশে উৎপন্ন

হইত না, এক্ষণে পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্‌গণের সংস্পর্শে আসিয়া কৃষকরা সেই সকল ফসলের আবাদ করিতেছে। এই সকল ফসল আমাদের দেশের নহে। সকলগুলিরই বীজ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া প্রথমে আমাদের দেশে রোপিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল ফসল আমাদের দেশের জলবায়ু সহ্য করিয়া আমাদের দেশের ফসলমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভুট্টা, গোল আলু, চীনা বাদাম, তামাক, বাঁধাকপি, বিটপালং, পেঁপে, নানাবিধ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান্য, ইক্ষু, কদলী প্রভৃতি বিদেশ হইতে আনীত ফসল। এই সকল ফসল এক্ষণে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে এবং কৃষকরাও এই সকল ফসল উৎপন্ন করিয়া বেশ লাভ করিতেছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আলু না খাইয়া কিরূপে যে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এখন আমরা ধারণাই করিতে পারি না। আলু আজকাল আমাদের প্রধান তরকারী। এখনও পুরীধাম প্রভৃতি স্থানে দেবসেবায় আলু ব্যবহৃত হয় না, নৈবেদ্যাদিতে মর্ত্তমান কলা দেওয়া হয় না। এ সকল ম্লেচ্ছদেশসম্ভূত সামগ্রী। সুতরাং লাভজনক নূতন ফসলের আবাদ করিতে আমাদের কৃষকরা অসম্মত নহে এবং জনসাধারণও সেগুলি তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত।

(২) নূতন সারের ব্যবহার। পূর্ব্বে যে সকল সার কৃষকরা ব্যবহার করিত না, এক্ষণে তাহারা সেই সকল সার ব্যবহার করিতেছে। খইল পূর্ব্বে সাররূপে ব্যবহৃত হইত না, এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ অনেক জিলার নীচজাতীয় কৃষক অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিতেছে। তবে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করা হিন্দু আচারের অনুমোদিত নহে, তাই সকল কৃষক এখনও ইহা ব্যবহার করে না। সুতরাং যদি তাহাদের ধর্ম্মে না বাধে এবং যদি তাহারা দেখে যে, মূল্যবান সার প্রয়োগ করিয়াও তাহারা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বিনা আপত্তিতে সেই সকল সারের ব্যবহার করিবে। সবজী সার (Green manuring) পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। ধঞ্চে, শোন, নীল, চীনাবাদাম প্রভৃতি শস্য আবাদ করিলে যে, জমির তেজ কমিয়া না গিয়া বর্দ্ধিত হয়, একথা পূর্ব্বে কৃষকগণ জানিত না। এক্ষণে অনেক কৃষক সবজী সার ব্যবহার করিতেছে। পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানাস্থানের কৃষকরা জমীতে শোনের চাষ করার পর পাটের আবাদ করিয়া, অত্যন্ত উর্ব্বরা জমীতে যে

পরিমাণ পাট জন্মায়, সেই পরিমাণ ফসল লাভ করিতেছে। হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ধঞ্চের চাষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

(৩) কৃষিপর্য্যায়। (Rotation of crops) পূর্ব্বে যেরূপ কৃষিপর্য্যায় অবলম্বিত হইত এক্ষণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক জমীতে কোন্ শস্যের পর কোন্ শস্যের আবাদ করা উচিত, এই বিষয়ে কৃষকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উপকার পাইতেছে। একখণ্ড জমিতে অল্প সার দিয়া উপর্য্যুপরি ৪।৫ বৎসর চাষ করিয়া, পরে সেই জমি ২।১ বৎসর ফেলিয়া রাখিলে যে, উহার উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, এ জ্ঞানও কৃষকরা বৈজ্ঞানিক কৃষিতত্ত্ববিদ্ গণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে।

(৪) কৃষিযন্ত্রের পরিবর্ত্তন। আমাদের কয়েকটি কৃষিযন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাঠের আঁক মাড়াই কল এখন আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; সকল কৃষকই লোহার আঁকমাড়া বিহিয়া মিল ব্যবহার করিতেছে। কাঠের কল অপেক্ষা লোহার কলের মূল্য অনেক বেশী হইলেও, লোহার কল হইতে অধিক পরিমাণে রস বাহির হয় বলিয়া প্রায় সকল কৃষকই লোহার কল ব্যবহার করিতেছে। পূর্ব্বে ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য কাঠের ডোন্ ব্যবহৃত হইত এখন অনেকেই লোহার ডোন্ ব্যবহার করে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যে যন্ত্রটির ব্যবহার করিলে কৃষকের লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না, সেই যন্ত্রই তাহারা আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিতেছে।

উপরে লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের কৃষক কিন্তু অজবোকা বা "যা আছে তাই ভাল—উন্নতি চাই না" প্রকৃতির লোক নহে। তাহারা পেটের দায়ে ভাল করিয়া লাভ-লোকসান আলোচনা করিয়া নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে বলিয়া যদি তাহারা conservative হয়, তাহা হইলে চিরদিন এইরূপ conservative থাকিলেই তাহাদের মঙ্গল এবং দেশের কল্যাণ হইবে।

যখন কৃষকের উন্নতি করা গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায়, তখন কৃষককে মহামূর্খ ও conservative ভাবিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না; অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সহিত মিলিয়া, মিশিয়া কৃষিকার্য্যে তাহার অভাবগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিয়া সেই গুলির বিমোচন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুর সমক্ষে পরীক্ষাদ্বারা নব নব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপকারিতা প্রদর্শন করিতে হইবে, তবে

সে গভর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিবে। আর পাশ্চাত্য উপদেশকবৃন্দকে সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও তাঁহাদের কৃষিকার্য্য বিজ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়াছে, তথাপি ভারতবর্ষের কৃষকগণের সহিত তুলনা করিলে কৃষিবিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। ভারতবাসী অতি প্রাচীন জাতি। কত যুগযুগান্তর হইতে পুরুষানুক্রমে তাহারা কৃষিকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছে; ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কৃষিকার্য্য যুগযুগান্তরব্যাপী পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আর পাশ্চাত্য উপদেশকগণ—তাঁহারা ত ভারতবাসীর তুলনায় সে দিনের লোক; কৃষিবিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যৎকিঞ্চিৎ—নগণ্য। এই কথাটা মনে রাখিয়া আমাদের কৃষিকার্য্যের দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া, বিচার করিয়া, যেন পাশ্চাত্য উপদেশকগণ আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান হয়েন। আমাদের প্রকরণ পদ্ধতিগুলি ভালরূপে না বুঝিয়া সেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করিতে গেলে "শিব গড়িতে বানর হইবে,"—হিতে বিপরীত হইবে।

আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে—আমাদের দেশের মঙ্গলকাননায় যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া গভর্মেণ্ট বিবেচনা করেন, তাহা তাঁহারা সম্পন্ন করুন, —কিন্তু দেশের লোকেরও এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা উচিত নহে। যদি দেশের জমীদারগণ এই বিষয়ে সচেষ্ট হয়েন তবেই কৃষিকার্য্যের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া পালঙ্কের উপরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়, আলবোলার নল হস্তে করিয়া সুষুপ্ত। জমীদারগণকে এই সুষুপ্তি অবস্থা কাটাইয়া দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান হইতে হইবে। এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলে, অবশ্য প্রথমে তাঁহাদিগকে অর্থব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষিকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইলে তাঁহাদের প্রচুর লাভ ভিন্ন যে ক্ষতি হইবে না, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রজার উন্নতি হইলে জমীদারের যে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আর অবস্থার উন্নতি হইলে কৃষকরা অধিক পরিমাণে কর দিতেও দ্বিরুক্তি করিবে না। ইতোমধ্যে বঙ্গদেশের দুই চারিজন জমীদার এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য জমীদারগণকেও আমরা এই কার্য্যে যত্নবান হইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিতেছি। প্রজার শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও যদি জমীদার তাহাকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প না হয়েন, তাহা হইলে প্রজার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের

জমীদারগণ যদি এখনও তাঁহাদের সুষুপ্তি অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন, তবেই দেশের মঙ্গল, নতুবা—"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীঅমরচন্দ্র সরকার।

ব্যর্থ সন্ধ্যা।

—:•:—

বেলা বহে যায়, স্নিগ্ধ ছায়ায়
আবৃত ধরণীতল,
আসি নূল বনে প্রতি আলবালে
কে আজি সেচিবে জল!

কে দিবে তরুণী মাধবী লতায়
সঁপি' সহকার করে!
নব মল্লিকা ফুটিয়া শোভিবে
কাহার কবরী 'পরে!

হরিণ শিশুটি ছুটিয়া আসিয়া
লুকাবে কাহার বুকে!
কাহারে ঘিরিয়া কপোতকপোতী
নৃত করিবে সুখে।

সন্ধ্যা তিমির আসিছে ঘনা'য়ে,
শূন্য কানন মাঝে
তাহারি চরণ মঞ্জীর যেন
নীরবে হৃদয়ে বাজে!

শ্রীরমনীমোহন ঘোষ।

পাষাণের কথা।

(৭)

সম্রাট আসিতেছেন। আবার উৎসব আসিতেছে, কিন্তু জীবনের প্রথমে মানবজাতির যে উৎসব দেখিয়াছিলাম, তেমন উৎসব আর কখনও দেখিব না। বলিয়াছি, পরে কত শত উৎসব দেখিয়াছি, কিন্তু সেরূপ আনন্দ আর কখনও অনুভব করি নাই। প্রত্যেক উৎসবেই কিছু না কিছু নূতনত্ব ছিল, নূতনত্ব দেখিয়া আনন্দ হইত বটে, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী; আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ ভোগ আর কখনও করি নাই। কারণ বুঝিয়াছ কি? প্রথম উৎসবে মানবজাতি নূতন ছিল। এখন মানবের নূতনত্ব কাটিয়া গিয়াছে, মানবসংশ্লিষ্ট সমস্ত নূতনত্বের জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম উৎসব যেন পুষ্পোৎসব, আটবিক রাজ্যের সমস্ত পুষ্পভার বহিয়া আনিয়া আটবিক নগরবাসী আমাদিগের চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল। দ্বিতীয় উৎসব সাজ-সজ্জা ও বাহ্যাড়ম্বরের উৎসব, সে উৎসব আমাদিগের জন্য বটে, কিন্তু তথাপি যেন আমাদিগের নহে। তখনও মনে হইত, অতীত কালের পরপারে বসিয়া এখনও মনে হয় সে উৎসব আমাদিগের নহে, সে উৎসব কণিষ্কের। তথাগতের শরীর গর্ভস্তূপের সম্মাননার জন্য উৎসব আরব্ধ হয় নাই, সেই উৎসব কুরুবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে উৎসব বিশাল শক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কণিষ্কের। মহারাজরাজাধিরাজ দেবপুত্রস্বাহী কণিষ্ক তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উৎসবের আয়োজন। মেষচর্ম্মপরিহিত পর্ব্বতবাসীর পক্ষে সেরূপ উৎসবের আয়োজন করা অসম্ভব। সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের নিমিত্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়া উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। ইহা আটবিকজাতির উৎসব নহে, পর্ব্বতের সানুদেশবাসী বর্ব্বরজাতির উৎসব নহে, সপ্তদ্বীপবাসী প্রাচীন সভ্যজগতের সমগ্র মানবজাতির সমবেত চেষ্টার ফল। ইহাতে নগরবাসিগণ বন হইতে পত্রপুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনে নাই, পর্ব্বতবাসী বর্ব্বরজাতি সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্যানজাত অনায়াসলভ্য পুষ্পরাশি ভারে ভারে আনিতে পারে নাই। প্রাচীন আটবিকনগরবাসিগণের বংশধরেরা দূরে পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসব দর্শন করিয়াছিল। তাহারা উৎসব ক্ষেত্রের বেষ্টনের মধ্যেও আসিতে সাহসী হয় নাই। এমন কি

মেষচর্ম্মপরিহিত যে পথপ্রদর্শক গভীর বন ভেদ করিয়া শকরাজপুরুষকে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাকে পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া হয় নাই। ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে শুনিতাম যে, চীনযুদ্ধের জন্য সমবেত বিশাল বাহিনী লইয়া সম্রাট তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন, পঞ্চ লক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে তিনি মথুরা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এই পঞ্চ লক্ষের সহিত সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিতেছেন, তাঁহাদিগের যাত্রার ব্যবস্থা ও শুশ্রূষার জন্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আয়োজন হইয়াছে। সেই পঞ্চ লক্ষের মধ্যে শকদ্বীপ, বাহ্লীক, কপিশা, গান্ধার উরস, কাশ্মীর, টঙ্ক, ত্রিগর্ত্ত, উদ্যান, মরু, জালন্ধর, মারীপুর, সুরসেন, মৎস্য, অহিচ্ছত্র, কান্যকুব্জ, বারাণসী, কক্কয, কীকট, তীরভুক্তি, এমন কি রাঢ়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশবাসী সৈনিক আছে। এতদ্ব্যতীত সকোন শিরস্ত্রাণধারী দুর্দ্ধর্ষ শকসৈন্য আছে; কুষাণবংশের অভ্যুত্থানের সহিত দলে দলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী যবন আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শকসম্রাটের বেতন-ভোগী হইয়াছে, চর্ম্মপরিহিত শক অশ্বারোহিগণের আক্রমণের তীব্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীরের উত্তর সীমান্তবাসী তুষার-ধবল দরদজাতি শকসম্রাটের বশীভূত হইয়াছে, দলে দলে তাহারাও সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। দরদগণের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু জাতি আর নাই, সারমেয়ের ন্যায় তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবলা, তাহারা ঘ্রাণে অনুভব করিতে পারে, নিকটে শত্রু আছে কি না; তৃণমণ্ডিত পথে মনুষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহারা বহুদূরে চলিয়া যাইতে পারে। শকসৈন্যের মধ্যে দরদজাতি ব্যতীত অপর কোনও জাতি চরের কার্য্য করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে এইরূপ কত কথাই হইত, আমরা শুনিয়া যাইতাম ও প্রথম উৎসবের কথা ভাবিতাম।

পঙ্গপালের ন্যায় শ্রমজীবিগণ আসিয়া বিশাল অরণ্যের বৃক্ষসমূহ নির্ম্মূল করিল। একদিন দূরে উচ্চ মৃৎপিণ্ড দৃষ্ট হইল, কে যেন আমাদিগকে বলিয়া দিল, সেই নগর—যে নগরের অধিবাসী আমাদিগকে পর্ব্বতের সানুদেশের শয্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। যে নগরবাসীরা তথাগতের শরীর স্তূপগর্ভে স্থাপিত করিয়াছিল তাহাদিগের বহু যত্নের, বহু শ্রমের নগর মৃৎপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! যে ভীষণদর্শন বিশালতোরণপথে আমরা নগরমধ্য হইতে প্রান্তরে আনীত হইয়াছিলাম সে তোরণের চিহ্নমাত্র নাই, বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের উপরে কে যেন দুইটি ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিয়াছে, কে যেন

আমাদিগকে বলিয়া দিল, উহাই বিশাল তোরণের ধ্বংসাবশেষ। ভুলি নাই, বিশাল আয়োজনের কলরবের মধ্যেও দেখিতে পাইলাম, তোরণ হইতে যেন দেবযাত্রা নির্গত হইতেছে; মনে পড়িল, কালভারাবনতদেহ মহাস্থবির, চিরস্মরণীয় পৌরববংশজ সিংহদত্ত, আর অগ্রাজ্ঞ। সিংহদত্তের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে, বর্ষাগমে সিন্ধু নদের প্লাবনে তৃণমুষ্টির ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের দেশীয় ও বিদেশীয় রাজগণ শকজাতির সম্মুখে ভাসিয়া গিয়াছেন, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমান্তে জলপথাবৃত সমতটেও শকসম্রাটের শক্তি অনুভূত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হস্তে কলিঙ্গ রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। চিরতুষারাবৃত কুরুবর্ষের উত্তর মরু হইতে বাবিরুশ ও মিস্রাইমের পণ্যবাহী ভৃগুকচ্ছ পর্য্যন্ত রাজার অঙ্গুলী হেলনে কম্পিত হইতেছে। দূরদর্শী পৌরব সত্য বলিয়াছিলেন, সঙ্কর্ষেরও দিন ফিরিয়াছে, নতুবা এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ভেদ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে পথ-প্রদর্শক আনিয়া শকরাজপুরুষ তথাগতের শরীর গর্ভের অনুসন্ধানে আসিবে কেন?

যাহারা সম্রাটের অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা অরণ্যের বৃক্ষ-রাজি নির্ম্মূল করিয়া সেই কাষ্ঠে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল; সেই দারু নির্ম্মিত নগরের কয়েক খণ্ড পাইয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে, প্রাচীনকালে প্রস্তর শিল্প ছিল না, সকলেই চিরসুগমমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছ; জানিয়া রাখিয়াছ, এ-ই একমাত্র পথ। পথিপার্শ্বে বনান্তরালে যে উদ্দিষ্ট শত্রু লুক্কায়িত থাকিতে পারে, তাহা ভাব নাই। স্তূপের পার্শ্বে কারুকার্য্যশোভিত কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া স্থির করিয়াছ, পাষাণ নির্ম্মিত স্তূপের পূর্ব্বে এইস্থানে দারু নির্ম্মিত স্তূপ ছিল, কিন্তু এ কথা কেহ কখনও কোথাও স্বপ্নেও ভাব নাই যে, স্তূপে আগত তীর্থযাত্রীর জন্য দারু নির্ম্মিত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে, তোমাদিগের জন্য অতীত কাল স্তরে স্তরে ধ্বংসাবশেষ সাজাইয়া রাখে নাই, প্রকৃতির আলোড়নে ঊর্দ্ধের স্তর নিম্নে গিয়াছে, নিম্নের স্তর ঊর্দ্ধে আসিয়াছে, মধ্যের স্তরগুলি অন্যত্র দেশে চলিয়া গিয়াছে। অতীতের গতি নিরূপণ করিবার জন্য যে বিশ্লেষণ শক্তির আবশ্যক তাহা সকলের থাকে না, তাহা বহুশিক্ষার ফল, গুরুপরম্পরায় শিক্ষার ফল, এক দিনে তাহার লাভ হয় না। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ স্তূপের দক্ষিণ তোরণের সান্নিধ্যে কূপ খননকালে কারুকার্য্য-শোভিত যে কাষ্ঠ খণ্ড পাইয়াছিলেন, তাহা প্রস্তর শিল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নহে, তাহা শকাধিকার কালের। তুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। আমি অতীত যুগের সাক্ষী, আমার কথা জানিয়া লইও। আমার যদি সময় নিরূপণ করিবার ক্ষমতা থাকিত

তাহা হইলে আমি তোমাদিগের ন্যায় বর্ষ, মাস, দিবস সম্বলিত মান গণনা করিয়া দিতাম। তোমরা প্রত্যক্ষবাদী, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখিয়া কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহ না; আমার যদি চক্ষু থাকিত তাহা হইলে আমি বলিতাম, আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তোমাদিগের ভাষায় কি বলিব জানি না ইন্দ্রিয়-বিহীন পাষাণের কি অনুভব শক্তি আছে, সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাহার কণামাত্র তোমরা জানিয়াছ, সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পকলার আভাস-মাত্র পাইয়াছ, সেই আভাস প্রত্যক্ষ জানিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিয়া লও। শকাধিকার কালে—কনিষ্কের রাজত্বকালে স্তূপসন্নিধানে যে দারুময় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তোমাদিগের আবিষ্কৃত কাষ্ঠখণ্ডগুলি সেই দারুময় নগরের অংশমাত্র, মানবজাতির সভ্যতার প্রারম্ভের নহে।

নগর নির্ম্মিত হইল, বিশাল শক সাম্রাজ্যে যাহা কিছু দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল রাজপুরুষগণ তাহাই আনিয়া দারুময় নগর শোভিত করিল। প্রাচীন আটবিক নগরবাসীরা কেহ কখনও এত দ্রব্যসম্ভার একত্র হইতে দেখে নাই, তাহারা বহু যত্নে—বহু পরিশ্রমে অর্থরাশি সঞ্চিত করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অর্থসাহায্যে শরীরগর্ভস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; রাজপুরুষগণের আদেশে আমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান সেই পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে রাশি রাশি পাষাণ দারুময়নগরের পথ-নির্ম্মাণের জন্য আনীত হইল। পথের আচ্ছাদনের পাষাণে সিন্দুর লেপন করিয়া বর্ব্বর গ্রামবাসিগণ তাহার সম্মুখে শূকর কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। পথ আলোকিত করিবার জন্য যে দীপস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে; ভূমিশয্যায় শয়ান বর্ব্বরলোচনগণের বক্ষে দাঁড়াইয়া বনদেবী চম্পক বৃক্ষ হইতে পুষ্প আহরণ করিতেছেন, দেবীর মস্তকোপরি চম্পক বৃক্ষের শাখায় দোদুল্যমান কাচমণ্ডিত দীপাধার, তোমরা মথুরার স্তূপ বেষ্টনীর স্তম্ভে এইরূপ মূর্ত্তি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে, দারুময় নগরে প্রতি রাত্রিতে এইরূপ লক্ষ লক্ষ দীপাধার ব্যবহৃত হইয়াছিল, কল্পনা করিয়া রাখ কত অর্থব্যয়ে কত পরিশ্রমে তীর্থযাত্রিগণের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। আমি এখন যেরূপ ভাবিতেছি, নগর ভোরণের ধ্বংসাবশিষ্ট পাষাণগুলিও বোধ হয় সেইরূপই ভাবিয়াছিল।

সম্রাট আসিতেছেন। উত্তরে উপত্যকার প্রান্তে মেঘের ন্যায় অশ্বারোহীর শ্রেণী দেখা দিয়াছে, মেঘের পর মেঘ উত্তরপ্রান্তে দৃষ্ট হইয়াছে, ক্রমে নিকটে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যালোকে প্রদ্দিপ্তাসিত

হইয়া তাহাদিগের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণগুলি দূরে তারকামালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল কিন্তু নিকটে আসিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতেছে। ইহারা শকজাতীয় অশ্বারোহী। যে অসুরতনাসা মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহিগণ নগর ধ্বংস করিয়াছিল ইহারা সেরূপ নহে। ইহাদিগের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও অবয়বসমূহ সুগঠিত। সমস্ত অশ্বারোহীই রক্তবস্ত্রবর্ম্মাচ্ছাদিত। তাহাদিগের এক হস্তে ভল্ল ও অপরহস্তে বল্গা, কটিদেশে ক্ষুদ্র অসি, এতদ্ব্যতীত কাহারও কোনরূপ অস্ত্র ছিল না। শুনিয়াছি, সুদূর প্রতীচ্যে রোমক সৈনিকগণ এইরূপে সজ্জিত হইত। সর্পের ন্যায় অশ্বারোহিশ্রেণী আসিয়া স্তূপ বেষ্টন করিল। প্রভাত হইতে অনুমান দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত কেবল অশ্বারোহী সৈন্যই আসিয়াছিল, তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রের বা বেশভূষার কোনই পার্থক্য ছিল না। অশ্বারোহিশ্রেণীর পর বন্যার স্রোতের ন্যায় পদাতিক সৈন্য আসিতে আরম্ভ করিল। নানা দেশ হইতে নানারূপ পরিচ্ছদধারী সৈনিক, পদাতিক সৈন্যের মধ্যে দৃষ্ট হইল। স্বল্পপরিচ্ছদপ্রিয় মগধবাসী, উষ্ণীষধারী কান্যকুব্জবাসী, নানাবর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদপ্রিয় সৌরসেন, উষ্ণীষে লৌহচক্রধারী জালন্ধরবাসী, দীর্ঘকায় বস্ত্রমণ্ডিত টক, মলিনবেশধারী শ্বেতবর্ণ কাম্বোজ ও গান্ধারবাসী ও অল্পসংখ্যক চর্ম্মাবৃত শক সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হইল। যতক্ষণ সূর্য্যালোক ছিল ততক্ষণ পদাতিক সৈন্যই দেখিতে পাইয়াছিলাম, সন্ধ্যাসমাগমে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ সহস্র সহস্র উল্কার আলোকে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন দূর হইতে শকটচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইল, বহুসংখ্যক দ্বিচক্র ও চতুশ্চক্র অশ্ববাহিত রথ আসিতে আরম্ভ হইল; শক সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ এই সকল রথারোহণে আসিলেন; সেই শব্দই শ্রুত হইল। শ্বেতবর্ণ ষোড়শ অশ্ব যোজিত রথে কান্যকুব্জের মহাক্ষত্রপ বনস্পর আসিলেন, তাঁহার সহিত শতাধিক রথে তাঁহার পরিজনমণ্ডলী আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উষ্ট্র-চতুষ্টয় যোজিত রথে মগধ-বিজয়ী মহাক্ষত্রপ খরপল্লান আসিলেন। অশ্বারোহণে স্ত্রীবণ্ডলীপরিবৃত হইয়া তক্ষশিলার মহাক্ষত্রপ মহাদণ্ডনায়ক লল্ল আসিলেন, সমবেত জনসঙ্ঘ বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে কোমলাঙ্গী কাম্বোজ গান্ধার ললনাগণের নিপুণ অশ্বচালনা দেখিতে লাগিল; কারণ ইহার পূর্ব্বে মহাকোশলে অশ্বপৃষ্ঠে স্ত্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় নাই। হস্তিপৃষ্ঠস্থাপিত দারুনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট কপিশার মহাক্ষত্রপ বেল্পশি আসিলেন, তাঁহার সহিত মহাকায় গজসমূহের পৃষ্ঠে স্থাপিত বৃহৎ সিংহাসনে মহল্লিকা পরিবৃত

কপিশা ও বাহ্লিক-মহিলা-মণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে রজনী দ্বিপ্রহর কাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে সমুপস্থিত অমাত্য ও সভাসদ্‌মণ্ডলী উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে বোধ হইল, যেন দূরে পর্ব্বতের সানুদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; ক্ষণেকের মধ্যেই বোধ হইল, প্রজ্বলিত অগ্নি দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই দণ্ড পরে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ও কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে, সম্রাট আসিতেছেন—কেবল এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। অগ্নি নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হইল, পাষাণাচ্ছাদিত পথের পার্শ্বে উল্কা হস্তে সহস্রাধিক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগের বাহন ক্ষীণ দীর্ঘকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্ব, পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণ ও দক্ষিণ হস্তে সপ্তহস্ত পরিমিত উল্কা, বিসহস্র উল্কার আলোকে যে পথ আলোকিত হইতেছিল সেই পথে দুইজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, একজন মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র কণিষ্ক ও অপর জন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ হুবিষ্ক। সম্রাটের আকার দীর্ঘ, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত, নাসিকার ও দক্ষিণ গণ্ডে দীর্ঘ আঘাত চিহ্ন; দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার জীবনের অধিকাংশই যুদ্ধযাত্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার কটিদেশে সার্দ্ধদ্বিহস্ত পরিমিত খড়্গ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুবিষ্ক—দীর্ঘকায়, কোমলাঙ্গ, শ্মশ্রুবিরহিত, নবীন যুবক; আজীবন সুখানুসন্ধানের চিহ্ন যেন তাঁহার মুখে অঙ্কিত রহিয়াছে। অশ্বারোহিশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে বিংশতি বা ততোঽধিক পরিচারক দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আসিতেছিল।

সম্রাট আসিতেছেন, শুনিয়া কাষ্ঠ-নির্ম্মিত-নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পাষাণাচ্ছাদিত পথাভিমুখে ধাবিত হইল। জনতার পেষণে বনস্পতির রত্নখচিত উষ্ণীষ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইল; দণ্ডনায়ক লক্ষের শিরস্ত্রাণ পাদপেষণে চূর্ণ হইয়া গেল। বেপ্পশির মহাদেবী জনতার তাড়নায় স্তূপের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আর সম্রাটের আগমন দর্শন ঘটিল না। অত্যন্ত পীড়িত হইয়া খরপাণান খড়্গ হস্তক্ষেপ করিয়া দেখেন, তাহা নিষ্কাশনেরও উপায় নাই। প্রধান অমাত্য, সভাসদ্ ও পরিচারক, দৌবারিক ও ভিক্ষু, অশ্বারোহী ও পদাতিক, স্ত্রী ও পুরুষ সেই বিশাল জনসঙ্ঘে একত্র মিলিত হইয়া গেল, পদমর্য্যাদা অন্তর্হিত হইল। সম্রাট উপস্থিত হইলে তাঁহার বাহিনীর জন্য পথ মুক্ত হইল বটে; কিন্তু জয়ধ্বনি ব্যতীত তাঁহার আর কোনও অভ্যর্থনা

হইল না। তিনি আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগর হইতে দূরে পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। অনসঙ্ঘ যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বদিকের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল, শিশিরসিক্ত প্রভাতে উৎসবের দিনে নৌবারিক ও প্রহরী ব্যতীত সমস্ত নগর সুষুপ্তিমগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হইল। প্রভাতে উৎসব আরব্ধ হইল; সাম্রাজ্যের উৎসব আটবিকনগরের উৎসবের ন্যায় নহে, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খলতার লেশমাত্র দেখা যায় নাই। ধীরে ধীরে কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী স্তূপ-বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সমাগত হইলেন। প্রাচীন স্তূপ নবসংস্কারের জন্য নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল, মহাস্থবির পার্শ্ব স্তূপের আর কোনও সাজসজ্জার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তবে রাজপুরুষগণ বেষ্টনীর বাহিরে ও পরিক্রমণের পথে যথাযোগ্য সজ্জা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই উৎসব আরব্ধ হইল। রাজস্কন্ধাবার হইতে বেষ্টনীর পূর্ব্ব তোরণ পর্য্যন্ত পাষাণ নির্ম্মিত পথ বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল, সমান্তরালে প্রোথিত হৈমদণ্ডশ্রেণীর উপরে মণিমুক্তা-খচিত বহুমূল্য পট্টবাস স্থাপিত হইল, বিবিধ সুদৃশ্য বর্ণরঞ্জিত কৌষেয় বস্ত্রে সুবর্ণদণ্ডগুলি মণ্ডিত হইল, পথের আচ্ছাদনে বহু দূরদেশ হইতে আনীত বহুযত্নে সংগৃহীত পুষ্পরাশি বিকিপ্ত হইল, পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গন্ধবারির কৃত্রিম প্রস্রবণ নির্ম্মিত হইল। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরে পথের উভয় পার্শ্বে একশ্রেণী পদাতিক ও একশ্রেণী অশ্বারোহী সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, ইহারা শোভাবর্দ্ধন করিল বটে কিন্তু ভীত দর্শকগণের দৃষ্টি ও গতি উভয়ই রোধ করিল। অল্পক্ষণ পরে নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত ভিক্ষুগণ স্তূপাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা বহু কষ্টে যোদ্ধৃগণের পংক্তি চতুষ্টয় ভেদ করিয়া ভীতিচকিত পাদক্ষেপে মহার্ঘবস্ত্রদলনহেতু স্খলিতচরণে বহুকষ্টে বেষ্টনীর তোরণদ্বার প্রাপ্ত হইলেন। সৈনিকগণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, কাষায় বা গৈরিকধারী সম্প্রদায় যেন তাহাদিগের অনুগ্রহের পাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার কোনই কারণ নাই। তখন মনে হইল যে, আর্য্যাবর্ত্তে নূতন বিপ্লবে সঙ্ঘের ও সদ্ধর্ম্মের স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, পাশবিক বলে বলীয়ান শকজাতি সদ্ধর্ম্মের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়াছে বটে; কিন্তু সদ্ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। সম্রাট ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন সেই জন্যই সাধারণে সঙ্ঘের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সম্মান দেখাইয়া থাকে;

তদতিরিক্ত নহে। সম্রাট বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, বাহিরূপ বা ইরাণীয় ধর্ম্মের প্রতিও তদনুরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সৈনিকগণের সদ্ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইবার কোনই কারণ ছিল না। কিয়ৎকাল পরে সম্রাট স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের মহাক্ষত্রপগণ পরিবৃত হইয়া স্তূপের সান্নিধ্যে আসিলেন। তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে পরিচারকগণ আতপত্র ও ব্যজনী লইয়া আসিতেছিল, পশ্চাতে মহারাজ হুবিষ্ক ও শকজাতীয় ক্ষত্রপগণ আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম তোরণে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ ও দ্বিতীয় তোরণে উপস্থিত হইলে মহাস্থবিরগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ও মহাস্থবির পার্শ্বকে অগ্রণী করিয়া অপরাপরসঙ্ঘ স্থবিরগণ তাঁহাকে স্তূপ অর্চ্চন ও প্রদক্ষিণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুবর্ণগৌরকান্তি নবীন যুবক হুবিষ্ককে পার্শ্বে লইয়া সম্রাট ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুগমন করিয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ করিলেন ও অর্চ্চনার জন্য পূর্ব্ব তোরণের সম্মুখীন হইলেন। ফিরিবার সময় সম্রাটের কটিবদ্ধ অসি অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার স্তূপগাত্রে লাগিয়া গভীর শব্দ উৎপাদন করিল। সম্রাট শব্দ শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন ও অর্চ্চনার সময় অন্যমনস্ক ছিলেন। অর্চ্চনান্তে কোষনিবদ্ধ অসি কটিবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া সম্রাট ধীরে ধীরে স্তূপগাত্রে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া প্রধান অমাত্যগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আঘাত করিবার পর বিশাল প্রস্তর খণ্ডে খড়্গের অগ্রভাগ লাগিয়া ধাতু পাত্রদ্বয়ের সংঘর্ষণের ন্যায় শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া সম্রাট কণিষ্ক ও মহাস্থবির পার্শ্ব চমকিত হইলেন, সম্রাটের আদেশে দীর্ঘকায় কপিশাবাসী সৈনিক চতুষ্টয় বৃহৎ প্রস্তরে গুরুভার পাষাণ স্থানচ্যুত করিয়া স্তূপের পার্শ্বে প্রবিষ্ট করাইল। শতাব্দীদ্বয় পরিমিত কালের পর গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সম্রাট আসিয়াছেন, যক্ষগণের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে; কনিষ্কের স্পর্শমাত্রে গর্ভগৃহের লুক্কায়িত দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে এইরূপ শব্দই ঘোষিত হইতে লাগিল। পার্শ্ব শরীর নিধানের অনুসন্ধানে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন কিন্তু সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন, ইতোমধ্যে গর্ভগৃহের দ্বারের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল ও কয়েকখণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গর্ভগৃহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল; পরে বর্ম্মাবৃত পদাতিকগণ প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড লইয়া গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল ও সমস্ত গৃহটি পর্য্যটন করিয়া আসিল। মহাস্থবিরগণের পশ্চাতে সম্রাট্ ও হুবিষ্ক

গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাষাণনির্ম্মিত আধারের অর্চ্চনা করিলেন, কম্পিত হস্তে বর্ষীয়ান স্থবিরগণ গুরুভার আধার উন্মোচন করিয়া প্রথমে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ও পরে তন্মধ্যস্থ স্ফাটিক শরীর-নিধান উত্তোলন করিলেন। সেই সময় কে যেন আসিয়া শত শত বিগ্রহের রক্ত-পিপাসু সম্রাটের জানুদ্বয় ভগ্ন করিল, স্ফাটিকাধার উন্মুক্ত হইবামাত্র ভীষণদর্শন নিষ্ঠুর শকসম্রাট ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইলেন। কে জানে সুদূর অতীতে শাক্যরাজকুমারের কি প্রতিভা ছিল, কি মোহিনী শক্তি ছিল, যাহার বলে নির্ম্মম—কঠোর নরঘাতকের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। সম্রাটের সহিত গর্ভগৃহস্থ ব্যক্তিমাত্রেই শরীর নিধানের সম্মুখে নতশীর্ষ হইলেন, সংক্রামকতা ক্রমে গর্ভগৃহের বহির্দ্দেশে ও পরে বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে ব্যপ্ত হইল; আনন্দে ও গর্ব্বে পার্শ্বের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি তখনও অপরাজুর প্রদত্ত স্ফাটিকাধার হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন বুঝিলাম, শরীর-নিধান রক্ষা কালে বর্ষীয়ান মহাস্থবির কি বলিয়াছিলেন। শকপ্লাবন আসিয়াছে, কপিশা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ শকজাতির হস্তগত হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা প্রায় ভাসিয়া গিয়াছিল কিন্তু যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহারই ফলে আর্য্যাবর্ত্তের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। সত্য সত্যই প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মরুবাসী বর্ব্বর শকজাতির মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। শকজাতির শকত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়াছে,। বিশাল শকসাম্রাজ্যের অধীশ্বর সেই জন্যই অঙ্গুলি পরিমিত স্ফাটিকাধারে নিবদ্ধ অস্থিখণ্ডের সম্মুখে নতশির হইয়াছেন। বর্ষীয়ান মহাস্থবিরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, শকজাতি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতির দিন আসিয়াছে, নবীন গৌরব মৌর্য্যাধিকার কালের অতীত গৌরবের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। শরীর-নিধান হস্তে লইয়া পার্শ্ব ও অপরাপর সকলে গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলেন। সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও তাঁহাদিগের মহিলা-গণ অস্থিখণ্ড স্পর্শ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সম্রাটের আদেশে স্ফাটিক স্বর্ণ ও পাষাণনির্ম্মিত আধার যথাস্থানে স্থাপিত হইল, সশব্দে গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; যাহারা দ্বার রুদ্ধ করিল তাহারা জানিত না যে, তাহারা চিরকালের নিমিত্ত তথাগতের শরীর-নিধান মানবের দৃষ্টির বহির্ভূত করিতেছে। সম্রাটের যাত্রা সফল হইয়াছে, গর্ভগৃহের দ্বারের সম্মুখে গান্ধার হইতে আনীত নবোৎকর্ষ প্রাপ্ত যবনশিল্পের নিদর্শন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইল, যেন গর্ভগৃহের দ্বার আর কেহ স্পর্শ না করিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে কখনও মূর্ত্তি দেখি নাই। আমাদিগের গাত্রে চিত্র আছে বটে কিন্তু মূর্ত্তি নাই; সদ্ধর্ম্মে মূর্ত্তি

পূজা এই সময়ে আরব্ধ হয়। ইহার পূর্ব্বে চিত্রে চরণদ্বয় তথাগতের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিত। সম্রাটের আদেশে স্থাপিত মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন; তখন ভাবিতাম ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই, হইতে পারে না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তিনির্ম্মাণের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যবন শিল্পী কর্ত্তৃক শিক্ষিত ভারতবাসী মূর্ত্তি-তক্ষণে অপেক্ষাকৃত পারদর্শিতা-লাভ করিয়াছিল। সে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইত, গান্ধারের মূর্ত্তিগুলি যবনের মূর্ত্তি ও মধ্যদেশের মূর্ত্তিগুলি আর্য্যাবর্ত্তবাসীর মূর্ত্তি। সন্ধ্যাসমাগমে পূর্ব্বের ন্যায় উষ্ট্রারোহী অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া সম্রাট্ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত শিবির ভাঙ্গিয়া গেল। অরণি সংগ্রহ করিতে আসিয়া পার্ব্বত্য উপত্যকাবাসিগণ মহাবনের কাষ্ঠ মহাবনে লইয়া গেল। আমাদিগের পূর্ব্বসহচর ভিক্ষুগণ অতি সন্তর্পণে আসিয়া ক্ষুদ্র সংঘারাম অধিকার করিলেন।

কণিষ্কের বিশাল বাহিনী সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় চীনপ্রান্ত আক্রমণ করিল শিলাসঙ্কুল তটবিক্ষিপ্ত ঊর্ম্মিরাশির ন্যায় পরাজিত সৈন্য কাশ্মীরে আশ্রয়-লাভ করিল। কুরুবর্ষ চীনসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, পারদগণ কপিশা অধিকার করিল, বিংশতিবর্ষব্যাপী চেষ্টার বর্ষীয়ান সম্রাট সসৈন্যে মরুপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন চীনসৈন্যের অধিনায়ক পাঞ্চাল দেহত্যাগ করিয়াছেন, জিঘিংসাবৃত্তি সফলা হইল, কিন্তু কণিষ্ক আর আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আইসেন নাই। বাহ্লীকে তাঁহার সমাধি বহুদিন পর্য্যন্ত হূনগণের অর্চ্চনার স্থান ছিল। ক্ষুদ্র সঙ্ঘের ভিক্ষুগণের কথোপকথনে যাহা জানিয়াছি তাহাই বলিলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোকে আঁধারে।

আলোকিত স্থান বলে,—"আমি বড় ভবে।"
অন্ধকার উঠি' বলে,—"আলো আছে যবে।"

শ্রীহরিপদ মজুমদার।

স্বভূম্য-মিলন।

তৃতীয় খণ্ড।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:৩:—

দূত।

বর্ষার শেষ সময় এক দিন মধ্যাহ্নে রাজা সংবাদ পাইলেন, অতিরিক্ত বর্ষণে বিপুলবারিপ্রবাহচঞ্চলা তরঙ্গিণীর কূল ছাপাইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। কূল ছাপাইলে জলরাশি নগরোপকণ্ঠ প্লাবিত করিবে। সর্ব্বাগ্রে আশ্রমগৃহপ্রাঙ্গণ জলমগ্ন হইবে। রাজা সংবাদ পাইয়াই কর্ম্মচারীদিগকে যাহাতে জল সহজে কূল ছাপাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সে কার্য্যের পরিদর্শনকল্পে যাত্রা করিলেন।

রাজা নদীতীরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দূর হইতে জল-কল্লোল শুনিতে পাইলেন। তিনি আশ্রম-সন্নিহিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা যেমন রমণীয় তেমনই ভীষণ। যে জলবেণীরম্যা স্রোতস্বতী অন্য সময় নগর-নিতম্বে কাঞ্চীবৎ শোভা পায়—যাহার মধুর কলগান অলঙ্কার সিঞ্জিতেরই মত প্রতীয়মান হয়—আজ তাহার এ কি মূর্ত্তি? নদীগর্ভস্থ শিলারাশি আজ জলমগ্ন—বিপুল বারিপ্রবাহ ভীষণ বেগে উন্মত্তের মত বহিয়া যাইতেছে—তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, যেন ভৈরবী তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্তা হইয়াছে। দূরে কোথায় কূল প্লাবিত হইয়াছে। মৃত ও জীবিত জীব জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে, বর্ষণসিক্তপক্ষ বিহঙ্গম কোনরূপে জলে পড়িয়া আর উঠিতে পারিতেছে না। রাজধানীর নিম্নে দারুময় সেতু জলপ্রবাহবেগে কম্পিত হইতেছে—বুঝি এখনই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

রাজা স্বয়ং কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবীরা মৃত্তিকা বা বালুকাপূর্ণ বস্ত্রনির্ম্মিত আধার আনিয়া কূলে সজ্জিত করিতে লাগিল। আত্মরক্ষাতৎপর নগরবাসীরা আসিয়াও সে কার্য্যে যোগ দিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইরূপ কার্য্য চলিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই স্বীকার করিলেন, জল আর বাড়িতেছে না; সম্ভবতঃ অতিরিক্ত বারি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কূলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া প্রাসাদে ফিরিবেন, স্থির করিলেন। প্রহরীরা নদীর অবস্থা লক্ষ্য করিবে, যদি জলরাশি আবার বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, বা বারিবেগ বর্দ্ধিত হয়, তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ও তত্ত্বাবধায়ককে সংবাদ দিবে। তিনি শ্রমজীবিগণকে প্রস্তুত রাখিবার জন্য কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিলেন।

তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্ত্তনপর হইলেন। তখন তিনি বারিপাতে সিক্ত-বেশ; শ্রমজীবিগণের সহিত কার্য্য করায় তাঁহার করতলও মলিন।

আশ্রমদ্বার হইতে রাজা দেখিলেন, আশ্রমবাসিনীর গৃহের অভ্যন্তরে আলোক জ্বলিতেছে; আর সেই আলোকে আশ্রমবাসিনীর গৈরিক অঞ্চল পবনে বিকম্পিত হইতেছে। পার্ব্বতী তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল।

রাজার ইচ্ছা হইল, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের সংবাদ লইয়া যাইবেন। তিনি কিছু কাল আশ্রমে আইসেন নাই। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তিনি অন্য নানাকার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। তিনি আপনার হৃদয়হর্ষে—একপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র-ছিদ্র-সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার নিবারণ চেষ্টায় চেষ্টিত ছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, যেমন করিয়াই হউক, এ দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে। তাই তিনি আর আশ্রমে আইসেন নাই। আজও তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না।

গৃহে আসিয়া রাজা সংবাদ পাইলেন, শঙ্কর সিংহ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শঙ্কর সিংহ প্রাসাদে রাজাকে না পাইয়া গৃহে গিয়াছিলেন; সংবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন,—তিনি অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

রাজা ভাবিতে ভাবিতে সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিলেন। অজ্ঞাত আশায় ও আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় জলকল্লোল-মুখরিত—তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ স্রোতস্বতীর মত অস্থির হইয়া উঠিল। না জানি শঙ্কর সিংহ কি সংবাদ আনিয়াছেন! তিনি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—তাহার ফল—হয় রাজপুত-গৌরবের উদ্ধার, নহে ত তাঁহার সর্ব্বনাশ। কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ তাহার ফল জানা যাইবে। আজ হয় আশার উৎস উৎসারিত হইবে, নহে ত ধ্বংসের প্রলয় ঝটিকা গর্জ্জিয়া আসিবে। দুই পথেই বিপদ বিদ্যমান।

ভাবিতে ভাবিতে রাজা সজ্জাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলেন; বিশ্রামগৃহে চিন্তাচঞ্চলচিত্তে শঙ্কর সিংহের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন কত বিলম্ব হইতেছে; প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন প্রহরের মত দীর্ঘ হইয়াছে। প্রতীক্ষায় ও আশঙ্কায় সময়ের গতি অত্যন্ত মন্থর বোধ হয়।

কোথাও সামান্য শব্দ হইলে রাজা চমকিয়া চাহেন, বুঝি শঙ্কর সিংহ আসিতেছেন। কেহ কথা কহিলে তিনি মনে করেন, শঙ্কর সিংহ প্রহরীর সহিত কথা কহিতেছেন।

সকলেরই শেষ আছে; রাজার প্রতীক্ষার ও শেষ হইল—শঙ্কর সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শঙ্কর সিংহ উপবেশন করিলেন।

উভয়েই নীরব।

রাজা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—না জানি কি সংবাদ পাইবেন! তিনি তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। শঙ্কর সিংহ ভাবিতেছিলেন, কিরূপে সংবাদ দিবেন—কিরূপে কথার আরম্ভ করিবেন? তিনি জানিতেন, তিনি যে কার্য্যের জন্য দূতরূপে গিয়াছিলেন, সে কার্য্য রাজার অতি প্রিয়—সে কার্য্য সিদ্ধ না হইলে তিনি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইবেন। তাই তিনি ভাবিতেছিলেন—বিষদন্ত উৎপাটিত করিয়া কিরূপে বিষধরকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন?

শেষে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শঙ্কর সিংহ সংবাদ কি?" শঙ্কর সিংহের ভাব দেখিয়া তিনি মনে করিতেছিলেন, আশার অবসর অল্প।

শঙ্কর সিংহ ধীরে ধীরে আপনার কার্য্য-বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজধানী ত্যাগ করিয়া তিনি কোন্ পথে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, কোন্ রাজার পর কোন্ রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি কি উপায়ে কাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, কাহার সহিত কিরূপ কথা হইয়াছিল—শঙ্কর সিংহ ক্রমে ক্রমে সেই বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন।

রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শঙ্কর সিংহের মুখে সংস্থাপিত। তিনি স্থির হইয়া সেই বিবরণ শুনিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিংহের সে বিবরণ শেষ করিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ পুরোহিত সত্যই বলিয়াছেন,

—ভীতির স্পর্শ বিষবৎ কার্য্য করে; তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। রাজপুতের তাহাই হইয়াছে।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে কয়জনমাত্র এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন। আর সকলেই অসম্মত। কেহ আশঙ্কায় শঙ্কিত। কেহ মোগলের প্রসাদভিক্ষারত। কেহ বা অভিমানহেতু একজন ক্ষুদ্ররাজ্য-শাসকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

রাজা শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

উভয়ে একত্র আহার করিলেন।

আহারের পর আবার উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল। শঙ্কর সিংহের বিবরণ-বিবৃতি-কালে রাজা স্থির হইয়া সব শুনিয়াছিলেন; কোন প্রশ্ন করেন নাই। এক্ষণে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া সকল বিষয় বিশদ করিয়া লইতে লাগিলেন। শঙ্কর সিংহ একে একে সে সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা শক্তি-সঙ্ঘে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের বল কিরূপ,—তাঁহাদিগের নিকট কার্য্যকালে কিরূপ সাহায্যের আশা করা যাইতে পারে; যাঁহারা এখনও দোলায়মানচিত্ত—সঙ্ঘে যোগদান করিবেন কি না স্থির করিতে পারেন নাই—তাঁহাদিগের শক্তির পরিমাণ কিরূপ, তাঁহাদিগকে পক্ষভুক্ত করা সম্ভব কি না; যাঁহারা সঙ্ঘে যোগ দিবেন না, তাঁহাদিগের অভিমত—রাজা এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিংহের উত্তরে রাজা স্পষ্ট বুঝিলেন—স্বার্থের বিষে রাজপুত রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ,—স্বার্থসহচর আশঙ্কা রাজপুতদিগকে কাপুরুষ করিয়াছে,—স্বার্থসঞ্জাত চিন্তা তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবাবেশের স্থান রাখে নাই। এ রোগের ঔষধ কি? ব্যাধি বিষম—ভেষজ স্বার্থত্যাগ। তিনি জানিতেন,—যত দিন যাইবে তত ব্যাধির বিস্তারে সমস্ত সমাজ শক্তিহীন হইবে—তত ভাবের প্রাধান্য দূর হইবে—তত স্বার্থসহচর হীনতা বীর্য্যে ও সাহসে দীনতা আনয়ন করিবে। যত বিলম্ব হইবে, তত তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির পথ বিঘ্নবিষম হইবে; রাজপুত তত আদর্শভ্রষ্ট—হীন হইবে; তাহার উদ্ধার-সাধন তত দুষ্কর হইয়া উঠিবে; আবার মোগল ততই তাহার শক্তি দৃঢ় করিবে—ততই ছলে, বলে, কৌশলে রাজপুত রাজশক্তিতে তাহার সিংহাসনে শৃঙ্খলিত করিয়া প্রাসাদে তুষ্ট রাখিবে লোক ততই মোগল-প্রাধান্যে অভ্যস্ত হইবে।

ভেষজ-প্রয়োগে বিলম্বে বিপদ বাড়িবে, একথা রাজা বুঝিয়াছিলেন। রাজপুত ইহারই মধ্যে এত দূর অধঃপতিত—জড়ত্বজর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতাপ সিংহের আদর্শেও তাহার রাজপুত-গৌরব-সংরক্ষণ-চেষ্টা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই। তাহাকে উৎসাহিত করিতে আরও আদর্শের প্রয়োজন।

রাজা যখন রাজপুতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন, শঙ্কর সিংহ তখন আরও একটি কথা ভাবিতেছিলেন। সে কথা তিনি পর্য্যটন-কালেও ভাবিয়াছেন,—ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "যদি এ কথা মোগল রাজসভায় প্রকাশ পায়, তবে আমাদের বিপদ অনিবার্য্য।"

রাজা বলিলেন, "এ কথা প্রকাশ পাইবে। তুমি রাজপুতকে যেরূপ অধঃপতিত দেখিয়া আসিয়াছ, তাহা রাজপুতের হৃদয়ে হীনতাবিকাশের ফল। সে হীনতা রাজপুতকে, দেশের জন্য নহে, আপনার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, মোগলের আশ্রয় লইতে প্ররোচিত করিয়াছে। অধঃপতিত রাজপুত এ কথা প্রকাশ করিয়া সে আশ্রয় স্থির রাখিতে ব্যগ্র হইবে। একজন নহে, দশজন রাজপুত মোগলকে এ সংবাদ দিবে।"

রাজার কথা শুনিয়া শঙ্কর সিংহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে আমাদের উপায়?"

রাজা কোন উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহার চিন্তাগম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

উপবনে বিহগ-বিরাব শ্রুত হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, অলিন্দে মুক্তবাতায়নপথে দিবালোক প্রবেশ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

একি!

রাজা কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিতে উপদেশ দিলেন।

শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রমণে বাহির হইবেন?"

রাজা উত্তর করিলেন, "নদীতীরে কার্য্য-পরিদর্শনে যাইব।"

রাজা মুখপ্রক্ষালনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর সিংহ ভাবিলেন, এ কি মানুষ না দেবতা? সঙ্গে সঙ্গে রাজার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রাজা ফিরিয়া আসিয়া জানিলেন, অশ্ব প্রস্তুত। তিনি শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "সমস্ত দিন পথশ্রমের পর নিশাজাগরণে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইল। কথা কহিতে কহিতে আমি সে বিষয় বিবেচনা করি নাই। যাইয়া বিশ্রাম কর।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আপনি সমস্ত দিন শুরু শ্রম করিয়া আবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন; এখনই আবার যাইতেছেন! বিশ্রাম করিলে ভাল হইত না?"

রাজা হাসিলেন, বলিলেন, "আমার বিশ্রাম চিতায় বা রণক্ষেত্রে।"

"এত শ্রম শরীরে সহিবে না। অনভ্যস্ত শ্রমে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে।"

"শঙ্কর সিংহ, আপনার সুখের জন্য বহুদিন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ছিলাম। এখন কি আবার স্বাস্থ্যের জন্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব?"

"একবার সংবাদ লইলে হইত।"

"স্বয়ং না দেখিলে তৃপ্ত হইতে পারিব না। বন্যায় হয় ত কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।"

"কর্ম্মচারীরা সংবাদ দিবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "রাজকর্ম্মচারীরা দুঃখী প্রজার ক্ষতির কথা রাজার শ্রবণযোগ্য মনে করে না। ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।"

রাজা শঙ্কর সিংহের নিকট বিদায় লইয়া কক্ষত্যাগ করিলেন।

শঙ্কর সিংহ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজার প্রকৃতি নখদর্পণে দেখিতে পারিতেন। বলিতে গেলে রাজার কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি শৈশব হইতে রাজার সঙ্গী। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাজা সত্য সত্যই রাজগুণে বিভূষিত। কিন্তু তাহার পর রাজার ব্যবহারে সে বিশ্বাস—সে ধারণা সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর এখন আবার সেই বিশ্বাস মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সন্দেহ আসিয়াছে। শঙ্কর সিংহ দৌত্যকার্য্যব্যপদেশে রাজপুতানায় বহু রাজসভায় উপনীত হইয়াছেন—বহু রাজচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের রাজসজ্জা কেবল অসারতার আবরণমাত্র—সৈন্যসজ্জা কেবল কাপুরুষতাকে আবৃত রাখিয়াছে—বাহুল্য কেবল

নীচতাকে লুক্কায়িত করিয়াছে! তাই—সেই অভিজ্ঞতার ফলে রাজার রাজগুণ সকল তাঁহার নিকট প্রদীপ্ততর প্রতীয়মান হইয়াছে—তাঁহার রাজার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

তাই আজ শঙ্কর সিংহের মনে হইতে লাগিল, একাধারে এতগুণ আর কোন্ রাজার আছে? কোন্ মানবে এত দেবোচিত গুণ বিদ্যমান? কে তাঁহার রাজার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ।

এদিকে রাজা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজপথ আশ্রম গৃহের প্রাঙ্গণ-প্রাচীরসন্নিকটে সেতুমূলে সংলগ্ন হইয়াছে। রাজা সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

সম্মুখে নদীর জল নামিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু দীর্ঘরজনীব্যাপী প্রবাহেও অতিরিক্ত বারিরাশি শেষ হইয়া যায় নাই—প্রবাহ প্রবল। এখনও খর-স্রোতে উন্মূলিত তরু-লতা-গুল্ম ভাসিয়া যাইতেছে; এখনও প্রবাহ কোন্ দূর পথ হইতে গতপ্রাণ জীব-দেহ ভাসাইয়া আনিতেছে; এখনও দুই একটি জন্তু জলে পড়িয়া উদ্ধারের জন্য নিষ্ফল চেষ্টায় চেষ্টিত হইতেছে। কূলে স্থানে স্থানে মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শ্রমজীবীরা—কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ মতে সেই সকল স্থানে সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত—কূলে কোথাও একবার মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িলে ভাঙ্গন বাড়িতেই থাকে—জলতাড়নে শিথিলমূল মৃত্তিকা স্তূপে স্তূপে জলগর্ভে নিপতিত হয়। তাই ভাঙ্গন ধরিতেই সংস্কারের প্রয়োজন। কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া রাজা দেখিলেন, আশ্রমসীমার মধ্যে একস্থানে নদীকূলে কতকগুলি শ্রমজীবী কার্য্য করিতেছে। কারণ সন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন, সে স্থানে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য স্থান পর্য্যবেক্ষণের পর রাজা সেই স্থানের কার্য্যপরিদর্শনাভিপ্রায়ে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

আশ্রম-দ্বারে তিনি যেন সামান্য চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিলেন—যেন মন্দানিল-স্পর্শে সরসী-সলিল সামান্য কম্পন অনুভব করিল: রাজা ভাবিলেন,—অদৃষ্টের এ কি গতি? আমি যাহা পরিহার করিতে চাহি,—আমার নিয়তি আমাকে তাহারই সন্নিকটে নীত করিতেছে! যাহাই হউক, চিত্ত জয় করিতেই হইবে,—বাসনাবহ্নির লেশমাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতে তাহাকে চরণচাপে নির্ব্বাপিত করিতে হইবে, হৃদয় দগ্ধ হয়,—হইবে। এইরূপ মনে করিতে করিতে রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

রাজা প্রাঙ্গণ-সীমায় যে স্থানে শ্রমজীবীরা কার্য্য করিতেছিল, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহার মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্ব্বে—আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণকালে এক দিন প্রভাতালোকে সেই স্থানে শিলাসনে বসিয়া তাঁহার জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি সহসা হৃদয়ে নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া ভীতিতাড়িত জনের মত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই কথা মনে করিয়া তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইলেন। তিনি সত্বর পর্য্যবেক্ষণ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপরায়ণ হইলেন।

রাজা আসিয়াছেন, জানিয়া পার্ব্বতী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল; পথে রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন? কিন্তু চক্ষু আপনি নত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পার্ব্বতীর নয়নে অপূর্ব্ব দীপ্তি দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি দেখিতে পাইলেন না—পার্ব্বতীর দৃষ্টি ক্ষিতিতললগ্ন হইল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বলাকর্ষণে অস্থির অশ্বের মত চঞ্চল চিত্ত সংযত করিয়া পার্ব্বতীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

পার্ব্বতীর উত্তর শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না—তাহার কণ্ঠস্বর কেন কম্পিত।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "অনাথদিগকে দেখিবেন কি?"

রাজার ইচ্ছা হইল বলেন, সময় নাই আর একদিন আসিয়া দেখিবেন। কিন্তু তিনি যতই ফিরিতে চাহিতেছিলেন—অলক্ষিত আকর্ষণ তাঁহাকে ততই আকৃষ্ট করিতেছিল। তিনি পার্ব্বতীর সঙ্গে অনাথদিগকে দেখিতে চলিলেন। তখন আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ মধ্যে মধ্যে রবিকর মলিন করিতেছে। আশ্রম-গৃহের দীর্ঘ দীধিকায় রাজহংসের শুভ্র দেহ বারিপাতে তুষারধবল দেখাইতেছে; আশ্রমগৃহের উদ্যানের শ্যাম শোভায় স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হইয়াছে।

রাজা একে একে অনাথদিগের সংবাদ লইতে লইতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিলেন।

তখনও আনাথাশ্রমের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হয় নাই। লোক এরূপ অনুষ্ঠানে অনভ্যস্ততাহেতু আশ্রমে আশ্রয় হইতে সংশয় ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। ক্রমে দুই একটি করিয়া লোক আসিতেছিল। আর পার্ব্বতী কয়টি দরিদ্র শিশুকে পালন করিতেছিল।

রাজাকে সমাগত দেখিয়া অনাথদিগের মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজা তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া শিশুদিগকে দেখিতে আসিলেন। তাহাদের মুখে—চক্ষুতে আনন্দ-দীপ্তি—পার্ব্বতীকে দেখিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যেন তরুণ অরুণ-কিরণে কমল কলি বিকশিত হইয়া উঠিল। সকলে আসিয়া পার্ব্বতীকে বেড়িয়া ধরিল, পার্ব্বতী একে একে তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিল।

রাজা মুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিলেন। বুঝি তাঁহারও অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রান্ত হইতে একটি দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

রাজা যখন গমনোদ্যোগ করিলেন তখন বর্ষার মেঘে আবার বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। অগত্যা রাজাকে আরও বিলম্ব করিতে হইল।

কিন্তু ক্রমেই মেঘের সমাগম হইতে লাগিল—স্বচ্ছ জলদজাল ঘনীভূত হইয়া গগন হইতে দিবালোক মুছিয়া দিবার উপক্রম করিল। রাজা বুঝিলেন, শীঘ্র বর্ষণ শেষ হইবে না। তিনি সত্বর আশ্রম ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিলেন। তিনি আপনি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। শেষে সেই বৃষ্টির মধ্যেই তিনি প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। তেজস্বী অশ্ব কশাস্পর্শ-মাত্র বেগে প্রাসাদাভিমুখগামী হইল।

রাজা ফিরিয়া দেখিলেন, মন্ত্রী নানা কার্য্যের উপদেশ লইতে উপস্থিত। সমস্তদিনব্যাপী পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠা—তাহার পর দীর্ঘ নিশায় জাগরণ ও চিন্তা; রাজা শ্রান্তি বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল, মন্ত্রীকে সময়ান্তরে আসিতে বলেন। কিন্তু তিনি আপনাকে কর্ত্তব্য-মন্দিরে বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় শঙ্কর সিংহ আসিয়া দেখিলেন, রাজার মুখে শ্রান্তির প্রগাঢ় ছায়া সুস্পষ্ট। তিনি রাজাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া অল্পক্ষণমধ্যেই বিদায় লইলেন।

রাজা কার্য্যব্যপদেশে প্রায় মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে শয়ন করিতে যাইতে পারিতেন না। আজ তিনি সে সময়ের পূর্ব্বেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম-লাভপ্রয়াসী হইলেন।

অন্তঃপুরে দীর্ঘ পথকক্ষের দক্ষিণে শয্যাগৃহ। উত্তরে একটি বিশ্রাম গৃহ—সেই কক্ষে পার্শ্ব করিতে করিতে রাজা নিদ্রিত হইতেন। আজও তিনি সেই

কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিশাবসানের কিছু পূর্ব্বে চরণে কোন বস্তুর স্পর্শ বোধে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, রাণী তাঁহার চরণ-প্রান্তে উপবিষ্টা ছিলেন—তাঁহাকে জাগিতে দেখিয়া উঠিলেন।

রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী, কি আবশ্যক?"

অতি দ্রুত "কিছু নহে" বলিয়া রাণী কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কোমলজ্যোতিঃ আলোকে রাজা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল, রাণীর কণ্ঠস্বর যেন বিকৃত। রাজা আবার ডাকিলেন, "রাণী"! কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে পড়িল, পূর্ব্বেও একদিন জাগিয়া মনে হইয়াছিল, যেন কে কক্ষ ত্যাগ করিল।

রাজা শয্যাত্যাগ করিয়া যাইয়া দেখিলেন, রাণী শয়ন-মন্দিরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শয্যায় উপবেশন করিয়া সহসা তাঁহার বোধ হইল—যে স্থানে তাঁহার চরণ ছিল, সে স্থানে শয্যা সিক্ত। রাণী কি কাঁদিয়াছেন?

রাজা ভাবিলেন, একি? সব যেন প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল।

মাঘ-মণ্ডল।

—:০:—

পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রায় সমস্ত পল্লীতে মাঘ মাসের প্রবল শীতে কুমারীরা এই ব্রত করিয়া থাকেন। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সমাজের সুবিশাল গতি হইতে দিন দিন এই সকল ব্রতনিয়ম স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে প্রত্যূষে শয্যা হইতে খেলার ভাণে বা ব্রতের টানে গাত্রোত্থান করাইয়া গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবার এমন দ্বিতীয় উপায় আর নাই। ইহাতে খেলার ছলে ধর্ম্মোপদেশ, ইন্দ্রিয়-সংযম, পাপে ভয়, ভগবানে আস্থা প্রভৃতি নানা সৎশিক্ষাদান হয়। এই সকল ব্রতে অর্থ-ব্যয় প্রায় নাই; কেবল শৈশব হইতে চরিত্রকে গঠিত করিয়া সামাজিক, পারিবারিক

ও দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য অশেষ প্রকার মধুর উপদেশ শুনিতে হয় এবং না বুঝিয়া তাহাই কণ্ঠস্থ করিতে হয়। পরে তাহাই ধারণার বিষয়ীভূত হইয়া যায়।

পৌষ মাস যায়, মাঘ মাস আইসে—পৌষের এই সংক্রান্তিই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতেই মাঘ মণ্ডল আরম্ভ। বাস্তবিক আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে মাঘ-মণ্ডলের সূচনা হয়। যমপুকুর, আগন-তোয়া, পৌষ-তোয়াও মাঘ-মণ্ডলের অঙ্গীয়। অনায়াসলব্ধ ফুল, দুর্ব্বা, তুলসীপত্র, ইষ্টকচূর্ণ ও তুষের ভস্ম এ ব্রতের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। ব্রতের পূর্ব্বদিবস কয়গাছি দীর্ঘ দুর্ব্বা তুলিয়া তাহার সহিত ফুল-তুলসী একত্র করিয়া বাঁধিতে হয়। সংক্রান্তির দিন প্রাতঃস্নান করিয়া উক্ত দুর্ব্বা লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে যাইয়া "কাক ও বককে" জল দিতে হয়। মন্ত্র এই :—

কাকে না ছুঁতে বকে না ছুঁতে।
ছুঁইলাম ছুঁইলাম দুর্ব্বার আগে॥
দুর্ব্বা সয়ম্বরী কি বর মাগে।
আই-বর ভাই-বর বিয়ার বর মাগে॥

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে জল নাড়িতে হয় এবং পরে দুর্ব্বা জলে ফেলিয়া দিতে হয়। নিত্য নব দুর্ব্বা বাঁধিতে হয়। "কাক ও বক"কে জল দিয়া পরে ফল ভাসাইতে হয়। সাত দিনে সাত প্রকার ফল। ফল ভাসাইবার মন্ত্র এইরূপ :— "সুশীলা আইতে সুশীলা যাইতে, কইও চিত্রগুপ্তের মায়েরে বার বছর পরে ফলটা পাঠাইয়া দেয়"। প্রথম সাত দিন ব্রতচারিণীকে নিরামিষ আহার করিতে হয়। অষ্টম দিনে "ভেরুয়া" ভাসাইতে হয়, ও পরে মৎস্য আহার করিতে পারা যায়। ফল ভাসাইয়া আসিয়া বাড়ীর উঠানে অঙ্কিত মণ্ডল পূজা করিতে হয়। বাড়ীর প্রাঙ্গণে পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দিয়া মণ্ডল আঁকিতে হয়। মধ্যে গোলাকার নণ্ডল আঁকিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে সূর্য্য, পশ্চিমে চন্দ্র অঙ্কিত করিতে হয় ও তাহার বামে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে উদয় আঁকিয়া তাহার পূর্ব্বে সূর্য্য ও পশ্চিমে চন্দ্র দিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী—পাড়ে একটি পাখী জল পান করিতেছে, একখানি খাট, দোলা, ত্রিকোণা পৃথিবী, এক জোড়া খড়ম, পান, গুপারী গাছ, পানের বাটা, শাটী, হস্তী, অশ্ব, ছত্র, পঞ্জিকা, পুঁথি, দর্পণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অঙ্কিত করিয়া একটি তুলসীপত্র দ্বারা স্পর্শ করিয়া পূজা করিতে হয়। কথা এইরূপ :—

প্রথম মণ্ডলকে স্পর্শ করিয়া—

সাধ-মণ্ডল সোনার কুণ্ডল বাপ ধলা ভাই প্রজা
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী

থালে ভাত ভৃঙ্গারে পানি—জন্মে জন্মে এয়ো রানী।

(চাঁদে হাত দিয়া)—চান্দ পুজি চন্দনে (সূর্য্যে হাত দিয়া) সুরুজ পুজি বন্দনে।
চাঁদ পূজিয়া ঘরে যাই, সুরুজ পূজিয়া ঘি ভাত খাই।

(উদরে হাত দিয়া)—উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা
ঘৃত ভাত কর্পূর হাত
মুই পুজি উদর হাত

(খাটে হাত দিয়া)—খাটে আইলাম খাটে গেলাম বাপের বাড়ী গিয়া দুধ ভাত খাইলাম।

পুষ্করিণী— মামায় দিল পুষ্করিণী ভাগিনায় দিল পার,
সোয়া পাখী পানি খায় দেখয়ে সংসার।

পান— পান গঙ্গাজল গুয়া ঋষি ফল তারে খাই বর্ত্তী বইনে বর্ত্ত কর।

শাড়ী — আমি পুজি শুঁড়ির শাড়ী আমার লাগিয়া আইব পাটের শাড়ী।

আয়না— আয়না ,, আভের আয়না।

কটুয়া— কটুয়া কাঠের কটুয়া।

কাঁকই— ,, কাঁকই হাড়ের কাঁকই।

মচকা— মচকা কাঠের মচকা।

শাঁখা— ,, শাঁখা ,, ,, শঙ্খের শাঁখা।

খড়ম— শ্বশুরমে দিয়া পাও স্বামীর ঘরে চলিয়া যাও।

পাঁজি— পাঁজি-পুঁথি পাঞ্জীযন্ত্র
বাপ ভাই লক্ষেশ্বর।

ত্রিকোণা— তিন কোণা পৃথিবী যায় ভাসিয়া
দুই বর্ত্তী বর্ত্ত করি সিংহাসনে বসিয়া।

কৌয়াল— ওরে ওরে কৌয়াল ভাল তোর বাসা খাল তোর আশা
দুই বর্ত্তী বর্ত্ত করি, শুঁড়ি খাইতে তোর বড় আশা।

তালগাছ— তাল পুজি তালেশ্বর
বাপ ভাই লক্ষেশ্বর।

ঘোড়া— উতল ঘোড়া নকল ঘোড়া
ষোল ভাইয়ের সোল ঘোড়া
তেল কলসী হাতে ঘি কলসী মাথে
প্রথম পুতে করে কাজ
প্রথম বউ ভোগে রাজ
অনন্তকাল শ্রীকৈলাস।

মণ্ডল পূজিয়া গুঁড়িগুলি একত্র করিয়া রাখিতে হয়। ইহারপর সূর্য্যোদয় হইলে আবার পুকুর-ঘাটে যাইয়া সূর্য্য প্রণাম করিয়া সূর্য্যকে অগ্র এক গুচ্ছ দুর্ব্বাদ্বারা জল দিতে হয়। মন্ত্র এইরূপ :—

লও সূর্য্যাই লও তোমার পানি
দেখিয়া শুনিয়া ছয় কুড়ি পানি।
ছয় কুড়ি পানির মধ্যে এক কুড়ি উনা
উনা দোনা ভরিয়া দিলাম মেঘের কাণের সোণা।
মেঘের কাণের সোণা নাড়ে নাড়িয়া পিত্তল
ধাক্কা দিয়া কালাইয়াদিলাম বাড়ীর ভিতর?
বাড়ীর ভিতর নাড়ে আড়ু গাড়ু পানি
তাড়েক্কা দিয়া আইলাম সূর্য্যেরে পানি।
সুরুহ ঠাকুর সুরুহ ঠাকুর দিয়া যাও বর
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর।

সাত দিন অন্তর ভেরুয়া ভাসাইবার রীতি। ভেরুয়ার সঙ্গে মণ্ডলের সঞ্চিত চূর্ণগুলি ও প্রতি দিনের ৭ গুচ্ছ দুর্ব্বা দিতে হয়। ভেরুয়া ভাসাইয়া স্নান করিতে হয়। যে দিন ভেরুয়া ভাসাইতে হয় সে দিন নিরামিষ আহার ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার করিতে হইবে। প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বেই মণ্ডল প্রভৃতির পূজা করিতে হয়। ৮ম দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে খাইয়া উদয়ের ও নক্ষত্রের পূজা করিতে হয়। সাত দিনের সাত নক্ষত্র ও সাত উদয় পশ্চিম দিকে আঁকিয়া পূজিত হইবে।

মন্ত্র এইরূপ :—

উদয় পুষ্যি অর্থ না জানি
সন্ধ্যা হইলে ভাত না খাই
গোয়ালে গাই গরু বাঁধি

ঘৃত ভাত কর্পূর হাত
মুই পুজি উদয় হাত।*

(চাঁদে হাত দিয়া)—চাঁদ পুজি চন্দনে (সূর্য্যে হাত) সুরুষ পুজি বন্দনে
চাঁদ পুজি ইত্যাদি

নক্ষত্রে হাত দিয়া—

ওরে ওরে তারা তুই আমার সাক্ষী ঘৃত মাখি পক্ক গ্রাসী
এই ঘরে কে জাগে তারা বালি দুই বইন জাগে
জাগে বালি মাগে বর খুঁজিয়া লইলাম বিয়ার বর
শাস্তাশাস্তি বাড় ভাতস্তি মাইল পুত্তস্তি
তারা পুজিয়া ঘরে যাই যে বর মাগি সেই বর পাই।

এই দিন রাত্রিতে আহার নিষেধ, এমন কি রাত্রিতে ঘরের বাহির হওয়া নিষেধ—পাছে নক্ষত্র দেখিতে হয়।

কুমারীকে প্রতি দিন প্রাতে স্নান করিতে হয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন বৃহৎ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য আঁকিতে হয়। ব্রাহ্মণ আসিয়া সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে। পূজার পর ভেরুয়া ভাসাইতে হয়। ভেরুয়া ভাসান হইয়া গেলে, ব্রতচারিণী মণ্ডলের মধ্যে গইলের উপর উপবেশন করিয়া একটা ছাতি ঘুরাইতে থাকে ও তাহার ভ্রাতা তাহাতে খৈ ও দুধের লাড়ু ঢালিয়া দেয়। তাহারপর মণ্ডলে বসিয়া সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে একত্র বসিয়া দধি-চিড়া ভক্ষণ করে। চারি বৎসর এ ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এক বৎসর করিয়াও প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

এই সকল ব্রত-কথাগুলি প্রাদেশিকতায় পূর্ণ। কিন্তু ইহার ভিতর পাশ্চাত্য বিলাসিতার কোন হাবভাব নাই। ইহাতে আপনাদের পারিবারিক জীবন কি ভাবে গঠিত করিয়া লইতে হইবে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতে জীবনের প্রতি কার্য্যে ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্রতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

* উদয় গিরি অস্ত যায়।
গোয়ালে গাই বাছুর বাঁধা।
ঘৃত হাত কর্পূর ভাত।
মুই পুজি উদয় হাত।

ফাল্গুন দোলা ও মাঘ-মণ্ডলের অন্যায়। ফাল্গুন মাসে প্রতিদিন বাড়ীর প্রাঙ্গণে দোলা আঁকিয়া পূজা করিতে হয়: প্রথম বৎসর বাড়ীর বাহিরে, দ্বিতীয় বৎসর প্রাঙ্গণে, তৃতীয় বৎসর ঘরের দ্বারে ও চতুর্থ বৎসর ঘরের ভিতর এই দোলা আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। মন্ত্র এইরূপ :—

ফাল্গুন দোলা গুণ-প্রতিষ্ঠা
গুণে স্থিতা গুণে নিষ্ঠা।
পিন্দন পাঠ ভোজন পাট।
পাট কাপড়ে রাএবাস।
অন্তকালে শ্রীকৈলাস।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

করমেতি বাই।

—:০:—

খাজল গ্রাম দক্ষিণাপথের একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এক সময়ে একজন বৈষ্ণব রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। পরশুরাম পণ্ডিত নামা জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌরহিত্যে ব্রতী ছিলেন। রাজার ন্যায় তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণবোচিত আচারঅনুষ্ঠানাদি বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিতেন। এই একধর্ম্মতা বশতঃ রাজার সহিত পুরোহিত মহাশয়ের সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনি প্রায় সকল সময়েই রাজ-ভবনে অবস্থিতি করিতেন এবং সতত কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে রাজার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেন। অদ্য আমরা যে মহীয়সী মহিলার পবিত্র জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, তিনি এই খাজল গ্রামবাসী রাজপুরোহিত পরশুরাম পণ্ডিতের দুহিতা।

করমেতি শিশুকাল হইতেই পিতৃগুণগ্রামের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। পিতার যত্নে তিনি যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পিতার আচরিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও তদনুরূপ অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার অপেক্ষা কন্যার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। করমেতি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়াছিলেন এবং পারমার্থিক

সুখের নিকট, ঐহিক সুখ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তিনি কোনও কার্য্যেই আসক্তি প্রকাশ করিতেন না, পরন্তু সাংসারিক ভোগ-বিলাসকে, ভক্তিপথের প্রধান পরিপন্থী বোধে, তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের তুলনা ছিল না। তিনি দশদিক কৃষ্ণময় দেখিতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বিভোর হইয়া পাগলিনীর ন্যায় কখনও হাসিতেন কখনও কাঁদিতেন এবং কখনও বা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। করমেতি শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। পরশুরাম, কন্যার বিবাহ-সময় সমাগত দর্শনে উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সত্বর তাঁহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। করমেতি বিবাহে অভিলাষিণী ছিলেন না—চিরকৌমার্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক, কেবল কৃষ্ণসেবায় নিরতা থাকিবেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা ছিল। অতএব পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন কিন্তু বিবাহে অমত করিলেন না; শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহারই উপর সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া পিত্রাদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। যথাসময়ে পরশুরামের চেষ্টা সফল হইল—করমেতি পিতৃ-নির্দ্দেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া জনৈক বিভবশালী ব্রাহ্মণ যুবাকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং মহাসমারোহে স্বামিসদনে নীতা হইলেন।

পরিণয় প্রীতিকর না হইলেও, করমেতি আশা করেন নাই যে, তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত ঘটিবে; কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দর্শনে—স্বামীকে বিষ্ণুভক্তিহীন ও ঘোর বিষয়াসক্ত দেখিয়া, তাঁহার বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি, সেরূপ স্বামীর দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—জীবন থাকিতে আর কখনও পতি-গৃহে আগমন করিবেন না, বিষয়ী স্বামীর মুখদর্শনও করিবেন না, পিতৃগৃহে থাকিয়া কেবল কৃষ্ণার্চ্চনেই দেহপাত করিবেন। করমেতি তাহাই করিলেন—পিতৃভবনে প্রত্যাগতা হইয়াই, তিনি সমস্ত সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিলেন, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্জ্জনবাস আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণ-পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিল। শ্রীকৃষ্ণের অভয় পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া

—কৃষ্ণপ্রেমামৃতপানে মাতোয়ারা হইয়া, করমেতি কয়েক মাস পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার সেই আনন্দময় জীবনে নিরানন্দের ছায়া পড়িল। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহার শ্বশুর-গৃহ হইতে লোক আসিল। করমেতি অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন—কৃষ্ণবিমুখ বিষয়ী স্বামীর ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিলেন না, কিছুতেই স্বামী গৃহগমনে সম্মতা হইলেন না। যিনি একবার ভগবৎ প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তিনি কি আর নশ্বর সংসার-সুখে আকৃষ্ট হইতে পারেন? পরশুরাম কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা কত বুঝাইলেন, হিত উপদেশ দিলেন কিন্তু করমেতি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুতা হইলেন না, কোনও মতেই পতিগৃহবাসে স্বীকৃতা হইলেন না। কেবল অধোমুখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ভাব দর্শনে, কাহারও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না; কেহই তাঁহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিল না; বরঞ্চ কেহ কেহ আবার বলপ্রয়োগে তাঁহাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার জন্য, পরশুরামকে পরামর্শ দিতে লাগিল।

করমেতি যখন বুঝিলেন,—কিছুতেই তাঁহার স্বামিগৃহ-গমন রহিত হইবার নহে, যেরূপেই হউক, তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন, তখন তিনি দুঃখের পাথারে ভাসিলেন। নিদারুণ মনস্তাপে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু ক্ষণ চিন্তার পর উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইল। করমেতি গোপনে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। গভীর নিশীথে তিনি ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং বাটীর বহির্ভূত হইবার জন্য বহির্দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না—প্রাচীরদ্বার লৌহ অর্গলে দৃঢ় নিরুদ্ধ থাকায় তিনি বহির্গমনে সমর্থা হইলেন না। তখন মুহূর্ত্তকাল স্থির ভাবে কি চিন্তা করিয়া তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহের উপরিতলে গমন করিলেন এবং একবার ভক্তিভাবে ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া তথা হইতে বেগে লম্ফ দিয়া বাটীর বহির্দ্দেশে ভূতলে পতিতা হইলেন! কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিপদ ঘটিল না—সেই উচ্চ গৃহচূড়া হইতে ভূপতিতা হইয়াও তিনি কোনওরূপ আঘাত পাইলেন না, তাঁহার পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইল না। তিনি অনায়াসেই উপস্থিত সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং উন্মাদিনীর ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিতা হইলেন।

রাত্রি প্রভাতা হইলে, পরশুরাম কন্যার পলায়ন-সংবাদ অবগত হইলেন। করমেতি যে এরূপভাবে গৃহত্যাগ করিবেন—কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকিনী একদিকে চলিয়া যাইবেন, ঘুণাক্ষরেও তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য সাবধানতা অবলম্বনেও সমর্থ হয়েন নাই। অধুনা সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠার—মনঃপীড়ার অবধি রহিল না। একে এই বিপদ, তাহাতে আবার লোক-নিন্দার ভয় বিষম ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল। নিদারুণ দুঃখে, দুশ্চিন্তায় তাঁহার বোধশক্তি বিলুপ্ত হইল। পরশুরাম কাঁদিতে কাঁদিতে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নিকটে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রিয় সুহৃদের তথাবিধ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ করমেতির সন্ধানজন্য প্রহরিপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরশুরাম কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

করমেতি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও গৃহের বহির্ভূত হয়েন নাই। বৃন্দাবন যে কোন্ দিকে, কত দূর, এবং কোন পথেই বা সেস্থানে যাইতে হয়, তাহাও তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি গমনে ক্ষান্ত হইলেন না: কৃষ্ণ-বিরহে অধীরা ও বিষয়ী স্বামীর সঙ্গভয়ে ভীতা হইয়া যে দিকে নয়ন চলিল সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া দিবাভাগে তিনি এক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সহসা পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন,—কয়েকজন সশস্ত্র রাজ-প্রহরী দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। করমেতি তাহাদিগের গতি-বিধি পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আত্মগোপনে অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু সেস্থানে সে অভিলাষ পূর্ণ করা কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। বহুদূর-প্রসারিত বিরাট প্রান্তর সর্ব্ববিধ তরুগুল্মাদি অন্তরাল পরিশূন্য। যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবল ধূ ধূ করিতেছে। তথায় লুক্কায়িত থাকা কি প্রহরীদিগের উপস্থিতির পূর্ব্বে সে প্রান্তর অতিবাহন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এ অবস্থায় করমেতি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ভগবানকে—সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরুসভামধ্যে অসহায়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন তিনি কি আজ এই বিষম বিপদপাৎ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন? করমেতি তাঁহারই একমাত্র আশ্রিতা—একান্ত শরণাগতা সেবিকা

কেন তাঁহাকে প্রহরিহস্তে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে? করমেতি অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অতি নিকটে এক প্রকাণ্ড উষ্ট্র-দেহ পতিত রহিয়াছে। উহার সমস্ত মাংস নিঃশেষিত, শৃগালকুক্কুরাদি মাংসাশী জীবের উদরস্থ হইয়াছিল, কেবল শুষ্ক চর্ম্মাবৃত শূন্যগর্ভ অস্থির আবরণটিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সেই আবরণ হইতে আবার এরূপ ন্যক্কারজনক পূতিগন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল যে, নিকটস্থ হয় কাহার সাধ্য? কিন্তু করমেতি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না; সে দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ করিলেন না, কর্পূরাদির সুগন্ধ বলিয়াই ধারণা করিলেন এবং ভগবদ্দত্ত দান, আত্মগোপনের একমাত্র উপায়বোধে, প্রফুল্লচিত্তে সেই কঙ্কালাবরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল—সেই বৃহদাকার উষ্ট্রদেহে তাহার ক্ষুদ্র শরীর সহজেই প্রচ্ছন্ন হইল। অনুসরণকারী রাজভৃত্যগণ অবিলম্বে উষ্ট্র দেহের নিকটে আসিল কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধ বশতঃ সেস্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সেদিকে ভালরূপে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দ্রুতপদে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

রাজপ্রহরিগণ প্রস্থান করিলেও করমেতি উষ্ট্রদেহ পরিত্যাগ করিলেন না। ধৃত হইবার ভয়ে একক্রমে তিন দিবারাত্র তন্মধ্যে লুকায়িতা রহিলেন, অনাহারে, অনিদ্রায়, কেবল শ্রীহরিরচরণ ধ্যান করিয়াই সেই দুঃসহ দুর্গন্ধক্লেশ সহ্য করিলেন। চতুর্থ দিন, অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং গঙ্গাস্নানান্তে শুচি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত ছুটিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, বহুদিন বহু ক্লেশভোগের পর তাঁহার প্রাণের পিপাসা উপশমিত, শ্রীধামদর্শনলালসা চরিতার্থ হইল। করমেতি বৃন্দাবনে পঁহুছিলেন এবং ভক্তিসহকারে বৃন্দাবনে সমস্ত পবিত্র স্থল দর্শন করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটস্থ বনাংশে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কামনায় সমাধিস্থা হইলেন।

রাজানুচরগণ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পরশুরাম হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং রাজাকে কিছু না বলিয়া, চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি নানা দেশ, নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে মনের আবেগে অস্থির হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিলেন, বৃন্দাবনের প্রত্যেক বন, প্রতি দেবমন্দির ও সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমাদি তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিলেন, কোনও স্থলেই কন্যার সাক্ষাৎকার ঘটিল না। পরশুরাম তথাপি নিবৃত্ত হইলেন না।

বৃন্দাবনের প্রতি উচ্চবৃক্ষে আরোহণ ও তথা হইতে দূর দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাঁহার সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন,—এইবার ভগবান তাঁহার বাসনা সফল করিলেন,—একদা উন্নিখিতরূপে সন্ধান করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে এক নিভৃতস্থানে বৃক্ষমূলে ধ্যাননিমগ্না করমেতির দর্শন পাইলেন; পরশুরাম হৃষ্টচিত্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে দুহিতার নিকটস্থ হইলেন।

করমেতির সেই পুণ্যপ্রভামণ্ডিত মুখমণ্ডল ও অভিনব ভাবভঙ্গি অবলোকন করিয়া পরশুরামের বিস্ময় জন্মিল। তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব নবীন ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি যে তাঁহার কন্যা—তাঁহার সেই স্নেহলালিতা দুহিতা করমেতি বাই, তাহা আর তাঁহার মনে রহিল না। তিনি তাঁহাকে দিব্যজ্যোতির্ম্মণ্ডিতা বনদেবী বলিয়াই ধারণা করিলেন এবং এক অভিনব পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শিষ্য যেমন গুরুকে প্রণাম করে, সেইভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। বাস্তবিকই করমেতি তখন আর সে করমেতি ছিলেন না। কৃষ্ণভক্তিপ্রভাবে তাঁহার শরীর-মনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তিনি এক দিব্য পবিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে স্নিগ্ধ লাবণ্যপ্রভা নিঃসৃত হইতেছিল, ভক্তি-প্রভা-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখকমল হইতে ভগবৎ প্রেমের সুধাধারা ক্ষরিত হইতেছিল। পৃথিবীর সে সঙ্কীর্ণতা—সে পাপতাপ চিরদিনের মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি নিমীলিত নেত্রে নিশ্চলদেহে উপবিষ্টা থাকিয়া হৃদয়মন্দিরে শ্রীহরির সেই যোগিজনদুর্লভ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন; আর তাঁহার উভয় অপাঙ্গ বহিয়া প্রেমের পূত সলিল-ধারা বিগলিত হইতেছিল। করমেতির অবস্থা দর্শনে পরশুরামের বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। তিনি প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে করমেতির চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন; কিন্তু কথা কহিলেন না। পিতাকে ইঙ্গিতে প্রণিপাত করিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরশুরাম ভাবিয়াছিলেন,—ধ্যানভাব অপনীত হইলে করমেতি কথা কহিবেন, তাঁহাকে সংসারের কত কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। "করমেতি",—নিতান্ত বিনীতভাবে রুদ্ধকণ্ঠে পরশুরাম ডাকিলেন,—"করমেতি, মা আমার"। করমেতি উত্তর করিলেন না। পরশুরাম

আবার বলিলেন,—"মা! কেন তুমি গৃহ ছাড়িয়া বনে আসিয়াছ? তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী, কুলের প্রদীপ, তোমার কি, মা, এ কায করা ভাল হইয়াছে? তুমি গৃহে চল। গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণভজন করিবে, আর তোমার কৃষ্ণপূজার ব্যাঘাত ঘটিবে না।" করমেতি সমস্ত কথা শুনিলেন, এবং কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"পিতঃ! কেন আমাকে এরূপ অনুনয় করিতেছেন,—কেন আমাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখাইতেছেন? আমার প্রাণ শ্যামসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইয়াছে, আর তাহার তথা হইতে উঠিবার সামর্থ্য নাই। অতএব আমার প্রাণহীন দেহটিমাত্র লইয়া গিয়া আপনার কি লাভ হইবে? আপনি আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাউন, যে মরিয়া গিয়াছে,—সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, তাহার দ্বারা সংসারের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আপনি গৃহে গিয়া কৃষ্ণভজনে নিরত থাকুন, কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ গ্রহণ করুন; আপনার সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হইবে এবং দিন দিন সেই আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তখন সাংসারিক কোনরূপ যন্ত্রণাই আর আপনাকে বিহ্বল করিতে পারিবে না।" এইরূপ ভাবে কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতে করিতে করমেতির চক্ষু অশ্রুসিক্ত ও সংজ্ঞা তিরোহিত হইল। তিনি কিয়ৎকাল নিঃশব্দে নিস্পন্দভাবে উপবিষ্টা রহিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার চৈতন্য সঞ্চারিত হইল। আবার তিনি পূর্ব্ববৎ কথা কহিতে লাগিলেন।

করমেতির ঈদৃশ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ও অসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম দর্শনে পরশুরামের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি আর করমেতিকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকটে বিদায় লইলেন এবং নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে খাজল গ্রামে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরোহিতের মুখে করমেতির কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া খাজল গ্রামাধিপতি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য সদলবলে ত্বরিৎগতিতে বৃন্দাবনে আসিয়া পঁহুছিলেন। করমেতির নিকটে তত্ত্বকথা শুনিয়া পরশুরামের ন্যায় তাঁহারও তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল; বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া গেল। তিনি করমেতিকে আশ্রয়হীনা—শীতাতপে উন্মুক্ত স্থানে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। করমেতি তাহাতে বহুল প্রাণিহত্যার সম্ভা-

বনা বুঝিয়া অমত করিলেন; কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না। অচিরকাল মধ্যে খাজনরাজের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে করমেতি এক ইষ্টকময় সাধন-কুটীর নির্ম্মিত হইল। করমেতি রাজানুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই কুটীরে আসিয়া বাস করিলেন; তাঁহার সাধনভজনপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই আশ্রম যাত্রীদিগের এক প্রধান দর্শনীয় স্থলরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, করমেতি নশ্বর মনুষ্যশরীর পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সেই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন—পুণ্যপূত আশ্রম, "করমেতি বাইর কুটরী" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। বৃন্দাবনগামী সাধু ভক্ত মাত্রই ভক্তির সহিত উহা দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

সহানুভূতি।

—:•:—

(১)

জল-ভরা অভ্রগুলি গগনের তলে
নীল নভে যেতে যেতে ভাসি',
তুহিন-মণ্ডিত গিরি পরশে যখনি,
দেয় ঢালি স্নিগ্ধ বারিরাশি।

(২)

দয়াবান্ যেই, সেও ভ্রমিতে ভ্রমিতে
দুঃখরাশি পূর্ণ এ ধরায়,
যখনি নেহারে কোন মুরতি করুণ,
দ্রব হয় সমবেদনায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

—:০:—

বসন্ত কাল। কোকিল কেবল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। দক্ষিণ পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া কুসুমের কোমল হৃদয়ে মৃদু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীহীন বৃক্ষলতাদি নবপত্রপুষ্পমঞ্জরীভূষিত হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। চূতশাখার পল্লবান্তরালে কোকিলা কাকনীড়ের প্রতি তীব্র লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকে,—যেমন তাহার সঙ্গীর কুহকে ভুলিয়া কাক নীড় পরিত্যাগ করিবে অমনই সে স্বপ্রসূত ডিম্বগুলি বায়সের আশ্রয়ে রক্ষা করিয়া পঞ্চাশন করিবে।

সন্ধ্যার সময় ঘোষালদের বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রশস্ত চত্বরে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কতিপয় বন্ধু মিলিয়া এইখানে চা, সরবৎ এবং পরচর্চ্চার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়।

সেদিনও বেশ আসর জমিয়াছিল। বিপিন মেদিনীপুরে থাকে; বড় একটা আসিয়া জুটিতে পারে না। সে দিন সেও আসিয়াছিল।

মনে নাই,—কি সূত্রে জননায়কগণের পরিবর্ত্তে সে দিন প্রসঙ্গক্রমে ভূতের গল্প হইতেছিল। ক্রমে সাপের গল্প, তাহার পর বাঘের গল্প হইতেছিল।

পল্লীনিবাসী একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক এক অদ্ভুত অসম্ভব গল্পের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই স্বকপোলকল্পিত। আবার উপক্রমণিকার সহিত উপসংহারের সামঞ্জস্য তিনি কখনও রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। অনেকে এমনও বলিত যে, সেটা তাঁহার আপনার অপেক্ষা তাঁহার আফিঙ্গের মাত্রার দোষেই অধিক সময় ঘটিত।

বিপিন তাহার প্রতি তত শ্রদ্ধাবান ছিল না। সে বলিল,—"আপনার ও ত আষাঢ়ে গল্প। আমি আপনাকে একটি সত্য গল্প বলিতেছি শুনুন। এটি আমার স্বীয় জীবনের ঘটনা। আপনি যেরূপ বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধে বিক্রম দেখাইয়াছিলেন, বলিতেছেন, তাহাতে আমার মত বিপদে পড়িলে হয় ত ভালুকের সহিত যুদ্ধে আপনাকে ভূশয্যায় চিরশান্তি লাভ করিতে হইত।"

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, আমরা কিন্তু বিপিনকে ছাড়িলাম না; তাহার গল্পটি শুনিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শন করিতে

লাগিলাম। বিপিন প্রথমে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তাহার পর বলিতে লাগিল :—

"তখন আমার একবৎসরমাত্র বিবাহ হইয়াছে; বিবাহের পর বিন্দুকে লইয়া মেদিনীপুরে গিয়াছি। মেদিনীপুরে দুই এক দিন থাকিবার পর একটি দুঃসংবাদ শুনিয়া কলিকাতায় আসিতে হইল।

"জান'ত সেস্থানে আমার কেহ ছিল না কেবল আমি, আমার সেই উড়িয়া চাকর—আর নবাধিষ্ঠিতা গৃহিণী বিন্দুবাসিনী। তথায় এত দস্যুতস্করের ভয় যে, রাত্রিতে বিন্দুকে রাখিয়া কলিকাতায় থাকিতে ভরসা হইল না। বিশেষতঃ বিন্দুকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, যেমন করিয়া হউক, রাত্রিতেই ফিরিয়া যাইব।"

জনৈক বন্ধু এইস্থানে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। বিপিন খুব চতুর; সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও গ্রাহ্য করিল না। সুতরাং বন্ধুর রসিকতা স্ফূর্ত্তি পাইল না।

বিপিন হস্তস্থিত চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে ভূমিতে নামাইয়া রাখিল এবং সৌরভরম্য রুমালে মুখ মুছিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল :—

"শ্বশুর-বাড়ীতে আহারাদি করিয়া মাদ্রাজ-মেলে রওনা হইলাম।

"বর্ষাকাল। মধ্যে মধ্যে বেশ দুই এক পশলা বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতার রাজপথ কর্দ্দমাক্ত। স্থানে স্থানে জল জমিয়া রহিয়াছে। আকাশ মেঘযুক্ত —অন্ধকার।

"শ্যালিকারা বলিলেন,—এ দুর্য্যোগে আজ না গেলেই হইত ভাল। কিন্তু বিন্দু একা থাকিবে শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলেন না। সুতরাং ঈষৎ সিক্ত পরিচ্ছদে রেলগাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

"আমাকে নামিতে হইবে নারায়ণগড় ষ্টেসনে, কিন্তু নারায়ণগড়ে মেল থামে না। সুতরাং পরবর্ত্তী ষ্টেসনে নামিয়া অন্য ট্রেনে আমাকে নারায়নগড়ে আসিতে হইল।

"ইতোমধ্যে আরও দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। রাজধানী হইতে যত দূরে যাইতে লাগিলাম বৃষ্টির প্রকোপ তত অধিক অনুভূত হইতে লাগিল। রেলের রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রান্তরসকল জলে পরিপূর্ণ।

"যখন নারায়ণগড়ে পঁহুছিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিভূত হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

"ষ্টেসন-মাষ্টার আমার বন্ধু। তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন,

তাঁহার আশ্রয়েই রাত্রিবাস করি। কিন্তু প্রকৃতি যত আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, আমার গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বর্ষাতিটুপি, ছাতা এবং একটি লণ্ঠন সংগ্রহ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

"ষ্টেসন হইতে আমার বাড়ী তিন মাইল দূরে অবস্থিত। মেটে রাস্তা জানু পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত। বিদ্যুদালোকে উভয় পার্শ্বে ধান্য-ক্ষেত্র সকল অনন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রবৎ দিকচক্রবাল স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল। আমি সেই সমুদ্র ভেদ করিয়া যেন অনন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তীরা-বেগে ছুটিতে লাগিলাম।

"রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত ধান্য-ক্ষেত্র, কোথাও লোকের বসতি নাই। দূরে—বহুদূরে কৃষকগণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গৃহালোক শূন্যবিহারী ক্ষুদ্রাকৃতি পক্ষীর মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যে দুই একটি খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যাইতেছিল তাহারা অন্ধকারে আকাশের গাত্রে দীর্ঘাকৃতি দৈত্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। দস্যুভয়ে হৃদয় শঙ্কিত।

"রাস্তায় আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় মানব আছে বলিয়া অনুমিত হইল না। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, যেন আমার সহিত তালে তালে ঝপ্, ঝপ্, করিয়া পা ফেলিয়া কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে।

"প্রথমে সিদ্ধান্ত করিলাম, ইহা আমার শঙ্কাবিহ্বল চিত্তের অবশ্যম্ভাবী কল্পনামাত্র। কিন্তু আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে মনে হইল, পশ্চাদ্ধাবমান শব্দ ক্রমশঃ আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তখন মনে শঙ্কা হইল, বুঝি বা কোন দস্যু আমার অনুসরণ করিতেছে। সাহসে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলাম এবং ষ্টেসনের এক-মুখ-খোলা আলোকটি ফিরাইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল—আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

আমার সেই অর্ব্বাচীন বন্ধু পুনরায় বাধাপ্রদান পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন—"তখন তোমার বিন্দুর মুখ মনে পড়িল?"

বিপিন তাহার প্রতি ভ্রূকুটী করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে গল্প করিতেছে একথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেই বিপদের দিনে আপনাকে যেরূপ বিপন্ন মনে করিয়াছিল তখন সেইরূপ ভাবে অভিভূত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। তারপর বিপিন পুনরায় আরম্ভ করিল :—

"পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি একটি দীর্ঘাকৃতি ভালুক আমার প্রতি অগ্রসর হইতেছে।

"পর মুহূর্ত্তেই আমার হস্তস্থিত লণ্ঠন জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল এবং ছাতাটি ভালুকের নখে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। তন্মুহূর্ত্তে যেন আমার মনে নূতন বলসঞ্চার হইল। আমি সেই ছাতা দ্বারা ভালুককে এমন ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়িয়া গেল এবং আমি ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু দীর্ঘ ঋজু পথ। পালাইবার উপায় নাই।

"সৌভাগ্যক্রমে মনে হইল যে, ভালুক যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। শীকারান্বেষণে ধাবিত হইয়া প্রথমে যাহা পায় তাহাই লুটিয়া সন্তুষ্ট হয়। তৎক্ষণাৎ মাথা হইতে টুপিটি খুলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলাম।

"বাড়ী পৌঁছিয়া এক পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম।

"আমার প্রভুপরায়ণ ভৃত্য—"চোর আয়ুড়ি" বলিতে বলিতে যষ্টি-হস্তে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল।

"আমি তাহাকে শীঘ্র দ্বারের সম্মুখে একটা বৃহৎ কাষ্ঠ আনিয়া দিতে বলিলাম। ভৃত্য বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তাহাকে অর্গল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝাইয়া দিলাম। তাহারপর উভয়ে ধরাধরি করিয়া একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা দ্বার আটক করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত মনে অন্দরে প্রবেশ করিলাম।

"কিন্তু একি? আমি যাহার জন্য এরূপ বিপন্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিলাম, সে নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে!

"গৃহে প্রবেশ করিয়া কাপড় ছাড়িয়া যখন বসিয়া পড়িলাম, তখন বিন্দু আমার মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। একটা কিছু বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা সে সহজেই অনুমান করিয়া লইল এবং সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়া নিতান্ত অপরাধিনী হইয়াছে, তাহার কাতর দৃষ্টি দ্বারা তাহাই আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।"

আমার সেই নির্লজ্জ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার পর।"

এবার বিপিন তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিল—"তাহার পর?—তাহার পর 'দেহি মুখকমলমধুপানং'।" আমার বন্ধু নীরব হইলেন, কিন্তু বিপিনের মুখ মলিন ভাব ধারণ করিল এবং তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

বুঝিলাম, বিপিনের বেদনা কোথায়। বন্ধু জানিতেন না, বিপিনের স্ত্রী নাই।

বিপিন বলিল—"তাহার পরদিন ভাঙ্গা ছাতা এবং ছেঁড়া টুপি ষ্টেসন-মাষ্টারকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার হাত হইতে যে লণ্ঠন পড়িয়া গিয়াছিল সেটা আমার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইলেও আমার পক্ষে শুভ হইয়াছিল। নতুবা বিন্দুর সহিত সে রাত্রিতে সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু বিন্দু —আজ কোথায়?"

আমাদের হৃদয়ে সমবেদনার বাথা বাজিয়া উঠিল। একবার ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া বিপিন পুনরায় বলিতে লাগিল—"প্রথম প্রণয়ই যথার্থ প্রণয়। সে প্রণয়ে পরস্পরের হৃদয়ের অবিকুণ্ঠিত বিনিময় সংঘটিত হয়। তাহার পর মোহ—মোহ হইতে মায়া জন্মে। কিন্তু সে ভালবাসা নহে—ভালবাসার অনাচার অথবা ব্যভিচার। প্রথম প্রণয় যেমন মধুর, তাহার স্মৃতি তেমনি প্রবল।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিধ্বনি।

(সুরের অনুকরণে।)

নিশীথ মুরলী বোলে
কেমন ললিত রোলে
প্রতিধ্বনি কেঁপে উঠে আকুল সুস্বরে,—
জাগিয়া বীণার তারে
প্রান্তর সরসীপারে
চকিতে মিলায় যবে দূরদূরান্তরে।

জোছনা পুলকে ভুলে
বাঁশরী যে তান তুলে,—
তরল উদাস সুর সুষুপ্ত নিশায়,—
তারো চেয়ে মাতোয়ারা
বাঁধা সুর সুধাধারা
প্রেমের কারণে বাজে পরাণ-বীণায়।

প্রেমিক বঁধুর বুকে
বেদনা ভরিলে দুঃখে
—হিল্লোল উপজে তায়' বঁধুর পরাণে,
সে বাথা যখন ধীরে
বঁধুর মরম ঘিরে'
গুমরি কাঁদিয়া উঠে নরমের টানে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা।*

ভারতবর্ষের মত জাতিবহুল দেশ জগতে আর কোথাও নাই। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচারব্যবহার, বেশভূষা, ভাষা, সমস্তই পরস্পর বিভিন্ন। পাশাপাশি এমন ঘর বাঁধিয়া থাকিয়াও যে আমরা কেহ কাহারও সহিত ঘনিষ্টরূপে পরিচিত নহি, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। যে মহারাষ্ট্রীয় গাথা, মহারাষ্ট্রীয় বীরত্ব আজ আমাদের কাব্য, নাটক, উপন্যাসের মূলীভূত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন পুস্তকে সেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির এমন কোনও বর্ণনা নাই যাহার দ্বারা আমরা এই বিরাট জাতির একদিকও জানিতে পারি।

একটি জাতির সহিত পরিচিত হইতে গেলে নানা দিক্ দিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সম্যক্ বুঝিতে নাও পারা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে, অথবা সমাজের অধিবেশনে জাতির যেরূপ কৌলিক ও অবিমিশ্র ভাব দেখা যায় এমন আর কোনও সময়েই লক্ষিত হইবার সুবিধা হয় না।

আমি যে নিমন্ত্রণের কথা বলিতেছি, ইহাও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। এইরূপ প্রথাই যে তাহাদের কৌলিক, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিমন্ত্রণ বা যে কোনও কায়কর্ম্মে পুরনারীগণই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা বাজারের বা দোকানের খাদ্য যতদূর পারেন বর্জ্জন করেন; এমন কি মিঠাই পর্য্যন্ত ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। ঘরে প্রস্তুত করান অর্থে ঘরে ময়রা আনাইয়া প্রস্তুত করান নহে, বাটীর মহিলাগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এস্থানে সন্দেশরসগোল্লার তাদৃশ ধুমধাম নাই, শুধু লাড্ডু। ইহার উপর যদি কেহ ক্ষীরের বা ছানার কোনও সামগ্রী প্রস্তুত করিতে চাহেন তবে করিয়া লইতে পারেন। অধিকন্তু ন দোষায়; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করন বিষয়ে স্ত্রীলোকের একাধিপত্য।

একটি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে সেই সময় সকলে আসিয়া সমবেত হয়েন। ভোজনের পূর্ব্বে বসিয়া থাকার প্রথা ইঁহাদিগের নাই। যদিই অপেক্ষা করিতে হয় তবে খুব সামান্য সময়ই অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত

* 'চুঁচুড়া হিন্দু-সমিতি'র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

হইতে সকলেই ব্যস্ত। ভোজনাদিও যথাসম্ভব সত্বর শেষ হয়। বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যেই প্রায় সমস্ত শেষ হয়।

আমাদের দেশে যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাটী ফিরিতেই সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হয়েন, এবং দিবসের নিমন্ত্রণ গুলিলেই সে দিন রাত্রিতেও গৃহে আহার বন্ধ করিতে হয়, এস্থানে সেরূপ আশঙ্কার কারণ হয় না।

আমাদের দেশে (অধিকাংশ স্থলেই) ভূমাসনে বসিয়াই—মহাসমারোহ ব্যাপারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়; এবং অগ্রে বসিয়া—"পাতা নিয়ে এস" "এ দিকে পাতা পড়ে নাই" ইত্যাদি রূপে কোলাহল করিতে হয়, কিন্তু এস্থানে ব্যবস্থা তাহার একবারে বিপরীত। প্রথমতঃ চা' খড়ির ভাঁড়া এবং গুলান্(আবীর) দিয়া বর্গ দুইহস্ত পরিমিত এক একটি রাঙ্গোড়ী (ঘর) কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে এক এক খানি (১) পাঠ (পিঁড়ি), গ্লাস (জলপূর্ণ), থালা বা পাতা পূর্ব্ব হইতেই সাজাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কর্ম্মকর্ত্তা এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নাম ধরিয়া ডাকিবেন, ইহার উদ্দেশ্য, সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন কি না জানা। তখন সকলে বিনা কোলাহলে এক এক জন এক একটি চৌকা অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত আসন পাতা ঘর অধিকার করিয়া বসিবেন। সকলে যখন স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিলেন তখন পুরাঙ্গণাগণ উচ্চৈঃস্বরে একবার হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন; এবং ভোজন-পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। আমাদের দেশের মত পুরুষরা এস্থানে আহার্য্য বিতরণ করেন না। বাটীর পুরুষরাও এই সঙ্গে আহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নিন্দিত হইতে হয় না।

প্রথমে লবণ ও চাট্‌নি দেওয়া হয়। চাট্‌নি প্রায় ৪।৫ প্রকারের। আদার, দধির, আচার, কাসুন্দী, এবং "পঞ্চামৃত"। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে প্রথমতঃ এইগুলি দেওয়া হয়। "পঞ্চামৃত" অর্থাৎ আদা, মরিচ, তেঁতুল, চিনি এবং ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গা চীনা বাদাম। এই অমৃত পঞ্চের মধ্যে দ্বিতীয় অমৃতটির প্রাবল্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট।

যেমন লবণ ও চাট্‌নি প্রদত্ত হইল অমনই প্রত্যেক ভোক্তার পার্শ্বে এক একটি উদ্‌বাত্তি (ধূপশলাকা) জ্বালিয়া দেওয়া হইল। অগ্রে ধূপ দীপ দুই ই

(১) মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা আসনে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করেন না। কারণ, যদি সূতার আসন হয় তবে অশুচি। রেশমের হইলেও তাঁহারা অশুচি বলিয়া জ্ঞান করেন। কাযেই তাঁহারা আসনে বসিয়া ভোজন করিলে নিষ্ঠাহানি হয়, বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের মত ইহাদিগের উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই।

ছিল এখন সে প্রথা "বাঙ্ক" হইয়া শুধু ধূপে দাঁড়াইয়াছে। সুগন্ধে মন প্রফুল্লিত হয়, এবং আহারে রুচি বৃদ্ধি হয় বলিয়া এরূপ ধূপ দীপ দেওয়া হয়। এই সময় ভোক্তৃগণ সকলে তারস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন—

"হরির্দাতা হরির্ভোক্তা হরিরন্নং প্রজাপতিঃ।
সোহি সর্ব্বাত্মা ভোক্তাচ ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে হরি।"

এই শ্লোকটি সকলে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে গান করিলে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রথম চাটনি দেওয়ার পর যত প্রকার তরকারী থাকিবে, সমস্ত দেওয়া হইবে; তাহার পর পাঁপর ভাজা, কুড়ডাই ও সমস্ত প্রকার ভাজা পরিবেশিত হয়। কুড়ডাই—ময়দা (জিলাপির আকার করিয়া) ঘৃতে ভর্জ্জিত হয়, জিলাপী শেষে রসে ফেলিয়া মিষ্ট করা হয়। কুড়ডাই রসে ফেলা হয় না। তাহার পর পুরী। যেমন পুরী পর্য্যন্ত দেওয়া হইল, অমনি সকলে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন। তার পর লাড্ডু, কাঢ়ি (ঘোলের তরকারী) ও শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ড বস্তুটি অতিশয় তৃপ্তিদায়ক; দধি ও চিনি একত্র মিলাইয়া জাফ্‌রান মিশ্রিত করিয়া একটি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এই গেল ভোজন পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়।

এগুলি যেমন খাওয়া শেষ হইল, অমনই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইল। প্রথমে আবার কাঢ়ি আসিল, তার পর বাঙ্গালীর জীবন ভাত;—কিন্তু অতি সামান্য পরিমাণে; এক হাতা কি দেড় হাতা। মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইহা আমাদের "শত অন্ন" মাত্র। তাহার পর ডাল ও ঘৃত। ঘৃতও একহাতা পরিমাণ।

এই ত গেল ভোজ্য দ্রব্যের নাম ও প্রকার। ইহার মধ্যে কিছু বেশী বা কিছু কমও হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ এই গুলিই হইয়া থাকে। এইস্থলে এ কথাটি বলিয়া রাখি, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা সকলেই নিরামিষাশী, এমন কি, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেও অনেকগুলি শাখায় মৎস্য মাংস ব্যবহৃত হয় না।

আমাদের দেশের প্রথা যেমন পরিবেশকগণ যথেচ্ছ পরিবেশন করিয়া কায সারিয়া যায়েন, কোনও পাতে কোনও দ্রব্য অতিশয় কম পড়িল, কিম্বা কোনও পাতে পড়িয়া নষ্ট হইল, এস্থানে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। পৌরাঙ্গনাগণ প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে পরিবেশন করেন, তাহার পর যাঁহার যত ইচ্ছা, তাঁহাকে তত দেওয়া হয়। একবারে উপর্য্যুপরি ভাতের পর ডাল, ডালের পর তরকারি দিয়া ভোক্তাদের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া আহার্য্য

বিতরণ করা হয়। অনেকে লাজুক থাকিতে পারেন, তাঁহারা একবারে অধিক পরিমাণে কোনও জিনিষ পাতে রাখিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং অনেক সময় আহারেও অসুবিধা হইতে পারে। কিম্বা পাতে পড়িয়া বৃথা নষ্ট হইবে বলিয়া এস্থানে সকল দ্রব্যই অল্প পরিমাণে বিতরিত হয়। পরিবেশিকা গৌরাঙ্গনাগণ নির্ব্বিরোধে আহূত ভদ্রমণ্ডলীকে অন্নপূর্ণারূপে খাদ্য বিলাইবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন না। বাটীস্থ ব্যক্তিবর্গ মধ্যস্থ হইয়া নিমন্ত্রিতগণের অভাব জ্ঞাপন ও মোচন করেন।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ একে একে নিমন্ত্রক মহাশয়ের বাটীতে চরণরেণু প্রদান করতঃ চন্দ্রাতপনিম্নে বসিয়া ভোজনের পূর্ব্বে তামাক সেবন করেন; কিন্তু ভোজনান্তে সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া (এমন কি মুক্তকচ্ছ হইয়া*) গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে ব্যস্ত হয়েন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথা ইহার ঠিক বিপরীত। ভোজনান্তে সমস্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিবেন। সেস্থানে থালা ভরা পান ও অন্য পাত্রে কাটা সুপারি, ধনের চাল, লবঙ্গ, এলাচি ইত্যাদি প্রস্তুত থাকে। এইস্থানে আমার ধূমপায়ী পাঠক ভাবিতেছেন যে, এক ছিলিম তামাক হইলে বড় ভাল হয়, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা ধূমপানকে অতিশয় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তবে ধূমপায়ীও আছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আহারান্তে তাম্বূলচর্ব্বণে যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়, ইহাতে বেশ বিশ্রামের কায হয়। তাহার পর নিমন্ত্রিকগণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম, সম্মান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অঙ্গে সুগন্ধি লেপনপূর্ব্বক বিদায় দিয়া থাকেন।

ভোজনান্তে এরূপভাবে বিশ্রাম করার কারণ, আমার বোধ হয় নিমন্ত্রকের বাটীস্থ পুরুষরাও এক সঙ্গে ভোজন সমাপন করেন, কাযেই সকলে মিশিয়া বেশ বিশ্রম্ভালাপ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে নিমন্ত্রিতগণ যদি আহারের পরও মজ্‌লিশ্‌ করেন, তবে হয় ত নিমন্ত্রকদের ভোজনেও অনেক বিলম্ব হয়, কারণ সকলকে না খাওয়াইয়া তাঁহারা খান না—প্রথা নাই;—এই জন্যই বোধ হয় সকলে সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমাদের দেশেও যেমন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পৃথক্ পৃথক্ ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রীয় দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

—:•:—

বাজে কথা।*

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প অল্প দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীচ্য আদর্শে সেই গল্পকে নূতন সাজে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন—তিনি বাঙ্গালা উপন্যাসকে নূতন সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়া কেবল বাঙ্গালার নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্য জগতের নিকট সমাদৃত করিয়াছেন, তিনিই বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাস স্বতন্ত্র। যে আখ্যান বস্তু উপন্যাসের মেরুদণ্ড, সে আখ্যান বস্তু ছোট গল্পের অত্যাবশ্যক উপাদান নহে। ছোট গল্প একটিমাত্র ঘটনাকে তাহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে প্রাধান্য দান করিয়া তাহাকেই সম্পূর্ণ ও সমুজ্জ্বল করিয়া দেখায়; তাই সাহিত্যরথ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনায় যেরূপ অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন,—ছোট গল্প-রচনায় সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের তুলনায় তাঁহার ছোট গল্প ম্লান। বোধ হয়, তিনি স্বয়ং ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরী' ও 'ইন্দিরা' এই তিনটি ছোট গল্পের মধ্যে 'ইন্দিরা'কে শেষে উপন্যাসে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবান ভ্রাতা—সূক্ষ্মদর্শী—নিপুণ শিল্পী সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' উল্লেখযোগ্য রচনা। সঞ্জীব বাবু যেরূপে খুঁটিনাটি দেখিতেন, সেরূপ দেখা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই খুঁটিনাটি দেখিবার ক্ষমতা ও প্রয়াস ছোট গল্পে শোভা পায় না—তাহাতে ছোট গল্পের স্বাভাবিক লঘু ও দ্রুত গতি নষ্ট হয়।

ইহার পর 'ভারতী'তে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর অনেকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। তাহার পর 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'—বহু উৎকৃষ্ট ছোট গল্পে

* বাজে কথা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ঘোষী প্রণীত। কলিকাতা, ৯৯ নং প্যারী দাসের লেন হইতে এ, সি, রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

সম্ভিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট গল্প 'হিতবাদীতে' ও 'সাধনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে বহু ছোট গল্প-লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

ছোট গল্প রচনায় ফরাসী লেখকগণ যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইংরাজ লেখকগণ সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা গল্পের আদর্শও ফরাসী।

আমাদের আলোচ্য পুস্তকে চারিটি ছোট গল্প আছে :—

করুণা
৺চন্দ্রনাথ দর্শন
প্রকৃত মানুষ
নির্ম্মলার অদৃষ্ট

পুস্তকখানিতে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—সরল রচনাভঙ্গী ও ভাষার দোষ।

রচনাভঙ্গীর সরলতাহেতু লেখিকা গল্পগুলিতে সাধারণ মানুষই চিত্রিত করিয়াছেন। লেখকগণ—বিশেষতঃ লেখিকারা, অনেক স্থানেই আতিশয্য বর্জ্জন করিতে পারেন না; চিত্র চিত্রিত করিবার সময় হয় দেবতার, নহে ত পিশাচের চিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। অথচ সংসারে মানুষ দেবতাও নহে, পিশাচও নহে—মানুষ।

'করুণা' গল্পের নায়ক ভগিনীর প্রতি পত্নীর দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পত্নীর মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিল, তাহা নীতিশাস্ত্রে প্রশংসিত নহে।—সে মিথ্যা বলিল, কিন্তু যে দ্রব্যগুলি বন্ধুপত্নীর জন্য আনিয়া পত্নীর নিকট কোন চরিত্রহীনার জন্য আনিয়াছে বলিল, সে দ্রব্যগুলি বন্ধু-পত্নীকে দিতে পারিল না।—"আমি সাধ্যান গল্প বাহিরে আনিয়া বৈঠকখানায় তাকে তুলিয়া রাখিলাম। সেগুলি আর বন্ধুর স্ত্রীকে দেওয়া হইল না। নিভার কাছে যখন সেগুলিকে অন্য নামে বলিয়াছি, তখন সেগুলি কি বিবেচনায় দিই?"

এক দিকে সদুদ্দেশ্যসাধনচেষ্টায় মিথ্যা আচরণ ও অপর দিকে এই সঙ্কোচ—সংসারে মানুষের ব্যবহারে অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। এই চিত্রে লেখিকার মানবচরিত্রজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে।

রমেশকে বাইজির কুহকমুক্ত করিবার জন্য এই গল্পের নায়ক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তাহার সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"লীলার বিবাহে তিন হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলাম। রমেশকে কুহকিনীর হাত হইতে উদ্ধার করিতে আর এক হাজার ছয় শত টাকা খরচ করিলাম। অবশ্য সে বাগবত্ত দশ হাজার টাকা দিই নাই। দুটা ধনকেই দালালকে তাড়াইয়াছিলাম।"—উভয় স্থলেই তিনি উদ্দেশ্য বিবেচনায় অবলম্বিত পথের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই; যাহাতে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টাই করিয়াছেন।

'৺চন্দ্রনাথ দর্শন' গল্পের নায়িকা ভ্রাতার সহিত চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইবেন; কিন্তু তাঁহার জ্বরের জন্য তাঁহার স্বামী তাহাতে অসম্মতঃ তিনি বলিলেন,—জ্বর হয় নাই। স্বামী দেখিলেন,—স্ত্রীর ললাট তপ্ত; তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখি।"—নায়িকা লিখিতেছেন, "তখন আমার ভয় হইল। এ মিথ্যা কথা এখুনি ধরা পড়িবে। যাহা হউক, তখন আর একটা ফন্দি আমার মাথায় আসিল। জোর করিয়া বলিলাম.—'দেখ না, আজ জ্বর হয় নাই। বিছানায় সমস্তক্ষণ শুইয়া আছি. তাই কপালটা গরম বোধ হইতেছে. এখুনি যদি বারান্দায় হাওয়ায় গিয়া বসি, দেখিবে ঠাণ্ডা হইবে।' উনি বলিলেন,—'বেশ তো থার্ম্মোমেটারেই জানা যাবে।' আমার গায়ে একখানি চাদর ছিল। উনি থার্ম্মোমিটার দিয়া বসিলেন। আমি এক মিনিট সেটি রাখিয়া ধীরে ধীরে খুলিয়া হাতে করিয়া ধরিয়া রহিলাম। অবশ্য সে কৌশল আমায় খুব সাবধান হইয়া করিতে হইয়াছিল, যাহাতে উনি বুঝিতে না পারেন যে, আমি হাতে করিয়া উপর দিক ধরিয়া আছি। আবার নোটেই না দিলে কিছু না উঠিলে সন্দেহ করিতে পারেন, সেই জন্য ঘড়ির দিকে নজর রাখিয়া এক মিনিট রাখিলাম।"

মহিলা শিল্পীর অঙ্কিত স্ত্রী চরিত্রের এই অনায়াসলভ্য চাতুরীর চিত্র আমরা অত্যন্ত উপভোগ করিয়াছি। উপভোগ করিবার বিশেষ কারণ এই যে, ইহাতে আমাদের "ঢেরা সহি" থাকিলেও এ চিত্র অঙ্কিত করিতে আমাদের সাহসে কুলায় না।

লেখিকা বঙ্গাঙ্গনা। গৃহের বাহিরে বিশ্বের জড়জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে না। তাই তিনি বাহিরে জগতের রূপ দেখিয়া সহজেই মুগ্ধ হয়েন। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে নূতনত্বের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আর তেমন

সুস্পষ্ট বোধ হয় না; সংসার-সংঘাতে হৃদয় বিকৃত হইতে আর তেমন করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিবার ও অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না। লেখিকার নিকট বাহিরের বিশাল বিশ্ব "নূতন দেশ" তাঁহার অনাবিল হৃদয়ে সেই নূতন দেশ দর্শনে যে আনন্দ অনুভূত হইয়াছে, তিনি তাঁহার রচনায় তাহাই প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বালিকা কাল হইতে আমি দেশ-বিদেশের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতাম। যে কেউ বিদেশভ্রমণের কাহিনী বলিত, আমি আগ্রহ করিয়া শুনিতাম। আমার সেজ দাদা কুমিল্লা হইতে আসিয়া আমার কাছে সে দেশের গল্প করিলেন। তার ভিতর এমন কোন আশ্চর্য্য কথা ছিল না। কিন্তু আমার নাকি ঐ বিষয়ে নেশা ছিল, তাই আমি উৎসুক নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতাম। তিনি যখন বলিতেন,—'পদ্মার এক একটি তরঙ্গে পাড়গুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে, বেশ দেখিতে। আমি জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিতাম, তাহাতে বড়ই আনন্দ পাইতাম।' সেজ দাদা তো দু' চারিটি কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত; আমি কিন্তু কবির মত ধ্যানমগ্ন হইয়া মানসনেত্রে সেই পদ্মা তীর তরঙ্গ ও কুমিল্লা দেশের রাস্তা দেখিতাম। যখন কল্পনা ছুটিয়া যাইত, তখন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতাম ও ভাবিতাম সেই কল্পনাই সার, কখন তো কোথাও যাইতে পাইব না।"

পুস্তকে বর্ণনগুলি স্নিগ্ধ ও সুন্দর।

প্রথমে যে ভাবাগত দোষের উল্লেখ করিয়াছি, উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। এই দোষে পুস্তকখানির অত্যন্ত সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। সূচীপত্রে তিনটি গল্পের উল্লেখ আছে; কিন্তু পুস্তকে চারিটি গল্প আছে। বিরামচিহ্ন সংস্থাপনে কোনরূপ নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। একান্ত দুঃখের বিষয়, লেখিকা এ সকল বিষয়ে অতিরিক্ত অমনোযোগের পরিচয় দিয়াছেন এবং আর কেহও এগুলি দেখিয়া দেন নাই।

উপসংহারের আর একটি কথা বলিবার আছে, লেখিকা সকল গল্পেই যে ভাবে গল্পের মধ্যে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন,—অনেকগুলি চিত্রে একটি চিত্রপট শোভিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, তিনি চেষ্টা করিলে উপন্যাস-রচনায় সফলকাম হইতে পারেন। আমরা আশা করি, তিনি সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

লেখিকা যে বিনয়বশে পুস্তকের 'বাজে কথা' নামকরণ করিয়াছেন, পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বলিতে পারি, তাঁহার সে বিনয়ের কোন কারণ নাই।

সংগ্রহ।

ইতিহাস।

প্রাচীন ভারত।

(খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী।)

মহাবীর আলেকজান্দরের আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। যদিও ঐতিহাসিকগণ তৎপূর্ব্বের ইতিহাস সঙ্কলনে সচেষ্ট আছেন, তথাপি তাঁহারা উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর অন্ধকারগর্ভ ভারতেতিহাসসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিককে আলোক পাত করিতে দেখিলে আমাদের মনে স্বতঃই আনন্দের উদয় হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের 'নর্থ রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই আলোচনার সারমর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পারস্য সম্রাট দারায়াসের (৫২১—৪৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) কতিপয় ক্ষোদিত লিপিতে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যকে পারস্য ছত্রপ (Satrapies) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে সমগ্র সিন্ধুদেশ এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী পঞ্জাবপ্রদেশ পারস্য সম্রাটের অধিকারভুক্ত ছিল। পার্সেপোলিস অনুশাসনে পারস্যপতি দারায়াসের ত্রয়োবিংশ ছত্রপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বিংশস্থানে ভারতবর্ষের নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ নক্সিরুস্তম শিলালিপিতে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের যে সকল অংশ মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশ ব্যতীত দারায়াসের সাম্রাজ্যভুক্তরূপে ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতেও পারস্যের সহিত ভারতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ও শিল্পকলায় পারস্যপ্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষের সহিত যে বৈদেশিক রাজগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সে বিষয়ে হেরোডোটাসের পুস্তকও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, একদল ভারতীয় প্রবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা সম্রাট Xerxesএর সৈন্যভুক্ত ছিল। হেরোডোটাস আরও লিখিয়াছেন যে, দারায়াস স্বীয় ভারতবর্ষীয় ছত্রপ হইতে প্রায় সেড় কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণরেণু কর স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার অধিকৃত অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসিগণ এত অধিক কর প্রদান করিতে পারিত না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহারা এত স্বর্ণ কোথা হইতে পাইত? এই প্রশ্নের উত্তরে হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইত; ইহার মধ্যে কতক খনিজ, কতক নদীস্রোতে আনীত এবং কতক বা পিপীলিকা-

সংগৃহীত। স্বর্ণ সংগ্রহের শেষোক্ত উপায় সম্বন্ধে তিনি একটি হাস্যোদ্দীপক গল্প লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—পূর্ব্বে ভারতের মরুভূমি প্রদেশে শৃগাল অপেক্ষা বৃহৎ এবং দ্রুতগামী একপ্রকার পিপীলিকা বাস করিত। এই পিপীলিকাগণ মৃত্তিকা হইতে যে সকল বালুকাপুঞ্জ উত্থিত করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিত, তাহার সহিত স্বর্ণরজঃ মিশ্রিত থাকিত। ভারতবাসিগণ পূর্ব্বাহ্নে যখন পিপীলিকাগণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ নিবারণ করিত,—সেই সময়ে দ্রুতগামী উষ্ট্রের সাহায্যে পিপীলিকার আবাসে গমন করিয়া তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণমিশ্রিত বালুকা অপহরণ করিত এবং সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কারণ, গ্রীষ্ম-তাপ অপনীত হইলে, পিপীলিকাগণ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া অপহরণকারীদিগকে দেখিতে পাইলেই তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিত। প্লিনি, এলিয়ন এবং এমন কি মেগাস্-থিনিস প্রভৃতি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণও উক্ত গল্পের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার উইলসন প্রথমে এই গল্পের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, পিপীলিকার ন্যায় আকার ও বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া স্বর্ণকণাকে সংস্কৃত ভাষায় "পৈপ্পলক" বলে। গ্রীকগণ এই শব্দের তাৎপর্য্য যথাযথ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পিপীলিকাগণ মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ আহরণ করে, ইত্যাদি ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। তবে তৎকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে সিন্ধু ও ইহার শাখানদীগুলি যে স্বর্ণগর্ভ ছিল, সে বিষয় প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, হেরাডোটাসের সময়ে —সেই সুদূর কালেও, ভারতবর্ষ ধনশালী দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

বুদ্ধের জাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে বাবিলনে সর্ব্বপ্রথমে ময়ূর বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বুলার ইহা হইতে অনুমান করেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম এবং সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের বণিকগণ পারস্য উপকূলে বণিজ্যযাত্রা করিত।

সুশ্রুতসংহিতার দ্বিষনিকরে (রিস্ ডেভিডসের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত) ভারতীয় পোতের দূর সমুদ্র যাত্রার কথার উল্লেখ আছে।

তদ্ভিন্ন উক্ত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত নেপাল সীমান্ত প্রদেশস্থিত পিপ্রব স্তূপের আবিষ্কার হওয়ায়, প্রাচীন ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, এই স্তূপের নির্ম্মাণপদ্ধতি এবং ইহার মধ্য হইতে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দৃষ্টে নিশ্চিত অবধারণ করিতে পারা যায় যে, ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারতে সুদক্ষ গৃহনির্ম্মাতা, কুশল ভাস্কর এবং নিপুণ রত্নব্যবসায়ী ছিল। স্তূপমধ্যস্থিত স্ফাটিক পানপাত্র ও প্রস্তরময় সুদৃশ্যপাত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কাহাদের সাহায্যে গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের শিল্পিগণ যে কুশের ব্যবহার বিশেষভাবে অবগত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালের রত্নব্যবসায়িগণ যে অতিশয় কঠিন রত্নখণ্ড কাটিয়া বিভিন্ন গঠনে পরিণত করিতে, মসৃণ করিতে এবং ছিদ্র করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল এবং তৎকালে যে প্রচুর পরিমাণে রত্নাদি ব্যবহৃত হইত, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

বিবিধ।

—(•)—

পারিপার্শ্বিক প্রভাব।

কথায় বলে, "অশ্বস্য শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"—জড়জগতে যেমন জীবজগতেও তেমনই পুরুষানুক্রমিক স্বাভাবিক বিশেষত্ব নাকি কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না। য়ুরোপে এই বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। সংপ্রতি 'মেডেল জর্ণালে' এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে।

এক ব্যক্তি তদীয় চেষ্টায় যে সকল বিশেষত্ব লাভ করে, সে সকল কি তাহার সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে? বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ বাইসম্যান বলিয়াছেন—তাহা হয় না। মিষ্টার মাজ ও বলেন, তাহা হয় না। এক জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বীয় চেষ্টায় সংগৃহীত গুণের শেষ হয়। আজকাল যে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অক্ষমকে সক্ষম ও অযোগ্যকে যোগ্য করিবার চেষ্টা হইতেছে সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। ডাক্তার কবেট বলেন, যদি দুর্দ্দান্ত পিতামাতার সন্তানদিগকে উৎকৃষ্ট পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত করা যায়, তবে তাহারা পৈত্রিক দোষের উত্তরাধিকারী হইলেও সেই সকল দোষ পরিস্ফুট হইতে পারে না।

মতামত।

উত্তরে মিষ্টার মাজ বলেন, দেখা গিয়াছে, এ চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবার নহে। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম কূলে প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোজ্ঞ—সে প্রদেশের অধিবাসীরাও তেমনই সরল। গ্লাসগো সহরে অন্য সকল সহরের মত বহু দুর্দ্দান্তের বাস। ইহাদিগের বংশবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া গ্লাসগো সহরের কর্ত্তারা স্থির করিলেন, ইহাদিগের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থির হইল, এই সকল দুর্দ্দান্তদিগের সংশোধনের উপায় করা অসম্ভব, কিন্তু তাহাদিগের সন্তানদিগকে সুসংস্কৃত নাগরিকে পরিণত করা অসম্ভব নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা সহরের বস্তি হইতে শিশু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সকল শিশুকে স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে কোন দ্বীপে পাঠান হইল। তথায় তাহাদিগের লালনপালনের ও শিক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইল। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষাবসানে কার্য্যের জন্য অন্য স্থানে গমন করে; কেহ কেহ সেই দ্বীপেই অবস্থান করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

ফল।

কোন কোন স্থলে এই সকল শিশু শিষ্ট শান্ত যুবকে পরিণত হইয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সাধু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। প্রবাদ আছে—যাহা অস্থিতে থাকে, তাহা মাংসে বিকশিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এত চেষ্টা, শিক্ষার ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক প্রভাব সবই বিফল হইয়াছে।

এই দ্বীপে স্বভাবতঃ সরল, শিষ্ট ও শান্ত অধিবাসীদিগের মধ্যে একদল অশিষ্ট দুর্ব্বৃত্তের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল দুর্ব্বৃত্ত শিক্ষায় ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই; পরন্তু সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার দোষভাগের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। তাহাদিগের ব্যবহারে দ্বীপবাসীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা অশ্লীল সঙ্গীতে নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করে। ইহারা রাজপথে ধাবিত হইয়া পথিকদিগকে বিরক্ত করে; দাসীদিগের সন্নিহিত হইয়া অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে। ইহারা প্রস্তর ছুড়িয়া লোকের গবাক্ষ-কবাট ভাঙ্গিয়া দেয়, লোকের গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহারা জীবজন্তুর প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে। মিথ্যাবাদে ও মিথ্যাচরণে ইহাদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; চৌর্য্যবিদ্যায় ইহারা বিশারদ।

এই দ্বীপের পারিপার্শ্বিক অবস্থা শান্তিস্নিগ্ধ; কিন্তু গ্লাসগোর দুর্ব্বৃত্ত সন্তানদিগের উপর প্রভাব। পারিপার্শ্বিক প্রভাব নিষ্ফল হইয়াছে; তাহাদের চরিত্রে কুলক্রমাগত দোষ সকলই বিকাশ পাইয়াছে। এখন কথা এই—দেখাগেল,—

"ইন্নত যায় ধুলে
স্বভাব যায় মলে।"

তবে কি এখনও গ্লাসগোর কর্ত্তারা তাঁহাদিগের নগরের আবর্জ্জনা পাঠাইয়া এই দ্বীপের স্নিগ্ধ শান্তিপ্রিয় সরল অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন? সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। বিদ্যালয়ে, সংশোধনাগারে, সমাজে সর্ব্বত্র দেখা যায়—কুলক্রমাগত দোষভাগই বিকশিত হয়। আমাদের দেশেও কত পবিত্র পরিবারের শুভ্র যশঃ কুপরিধায় হইতে গৃহীত পোষ্যপুত্রের কুব্যবহারে কলঙ্কিত হইয়াছে।

সমাজে অশিষ্টদিগের সংশোধনের উপায়-বিধান করা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষার ফলে যে সত্য সপ্রকাশ হইল, সংশোধনের ব্যবস্থা তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।